পঞ্চম বর্ষ প্রথম সংখ্যা

CALCUTTA UNIVERSITY LIBRARY

# কবি

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
ও
নির্মাল্য আচার্য
সম্পাদিত

সাহিত্য
ও
সংস্কৃতি
বিষয়ক
ত্রৈমাসিক

# বিদেশে আমাদের
# বড়ো দশজন খরিদ্দার

ভারতীয় বাটার জুতো বিদেশে যে সব জায়গায়
রপ্তানি করা হয়, তাদের প্রধান দশটির নাম : যুক্তরাজ্য,
কানাডা, অস্ট্রেলিয়ার যুক্তরাষ্ট্র, জর্মানি, ওলন্দাজ ইন্দোনেশিয়া,
বেলজিয়াম, অস্ট্রোলিয়া, সৌদি আরব, ফিজীদ্বীপ এবং
ডেনমার্ক। ১৯৬৬ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর
এই দশটি দেশে মোট ৩,৫৬০,০০০ জোড়া জুতো
রপ্তানি করা হয়েছে।

**Bata**

১৯৬৬ সালের ১লা থেকে ১৪ই জুন পর্যন্ত টাটা ষ্টীল ওয়ার্কসে মোট চব্বিশ লক্ষ শ্রমঘণ্টার মধ্যে সময় নষ্ট হতে পারে এমন একটিও দুর্ঘটনা ঘটেনি···কাজের নিরাপত্তার দিক থেকে ভারতের ভারি শিল্পের ক্ষেত্রে এ একটি রেকর্ড।

**টাটা ষ্টীল**

—সবচেয়ে নিরাপদ কারখানা

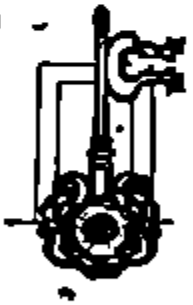

**পরিকল্পনা ও সমৃদ্ধির সোনার কাঠি**

ব্যক্তির কল্যাণ ও জাতীয় সমৃদ্ধি পরস্পর সংশ্লিষ্ট। এই কল্যাণ বা সমৃদ্ধি সাধন একমাত্র পরিকল্পনানুযায়ী প্রচেষ্টার দ্বারাই স্বল্পকালে সম্ভবপর। এবং পরিকল্পনার সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে জাতীয় তথা ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের উপর।

যুদ্ধকালীন যানের ব্যবহার সফল যেমন যান্ত্রিকের ইঞ্জিনিয়ার দূর করে, তেমনি জাতীয় পরিকল্পনারও ভার যোগায়।

**ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ**

হেড অফিস : ৪নং চার্চিল ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

ভারত ও পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র ব্রাঞ্চ অফিস এবং পৃথিবীর যাবতীয় প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে করেস্পণ্ডেণ্ট ব্যবস্থা

আপনার ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যভার গ্রহণে প্রস্তুত

# জানি জানাই

কতটুকু জানি তাকে ?
কতটুকু চিনি ? স্বদেশকে জানা,
দেশকে আপন করার সাধনা।

শুধু মানচিত্র বা পণ্ডিতের
পুঁথি থেকে দেশকে জানা
সম্পূর্ণ হয় না। দিনে দিনে
প্রত্যক্ষ পরিচয়ে সেই জ্ঞান
পূর্ণতা পায় বাংলা দেশের পরিচয়
মূর্ত হয়ে আছে তার অগণ্য
মন্দিরে মসজিদে, পোড়ামাটির কাজে,
ইতিহাসের নানা কীর্তিস্তম্ভে,
শান্তিনিকেতনে। ভবিষ্যৎ গড়ছে যে
মানুষ তার বহুবিচিত্র কর্মকাণ্ডে।

ICM 11

ইনফরমেশন সেন্টার পশ্চিমবঙ্গ সরকার
৩/২, ডালহৌসি স্কোয়ার ইস্ট
কলিকাতা-১ ফোন : ২৩-৮১৭১

শারদীয় এক্ষণে প্রকাশিত বহু আলোচিত উপন্যাস

অসীম রায়ের

# দেশদ্রোহী

প্রকাশের অপেক্ষায়

## সুবর্ণরেখা

কলকাতা ৯

---

## এক্ষণ

কার্যালয়ের নতুন ঠিকানা

৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড

কলকাতা ৯

# মেগাফোনের
## সুরের অর্ঘ্য

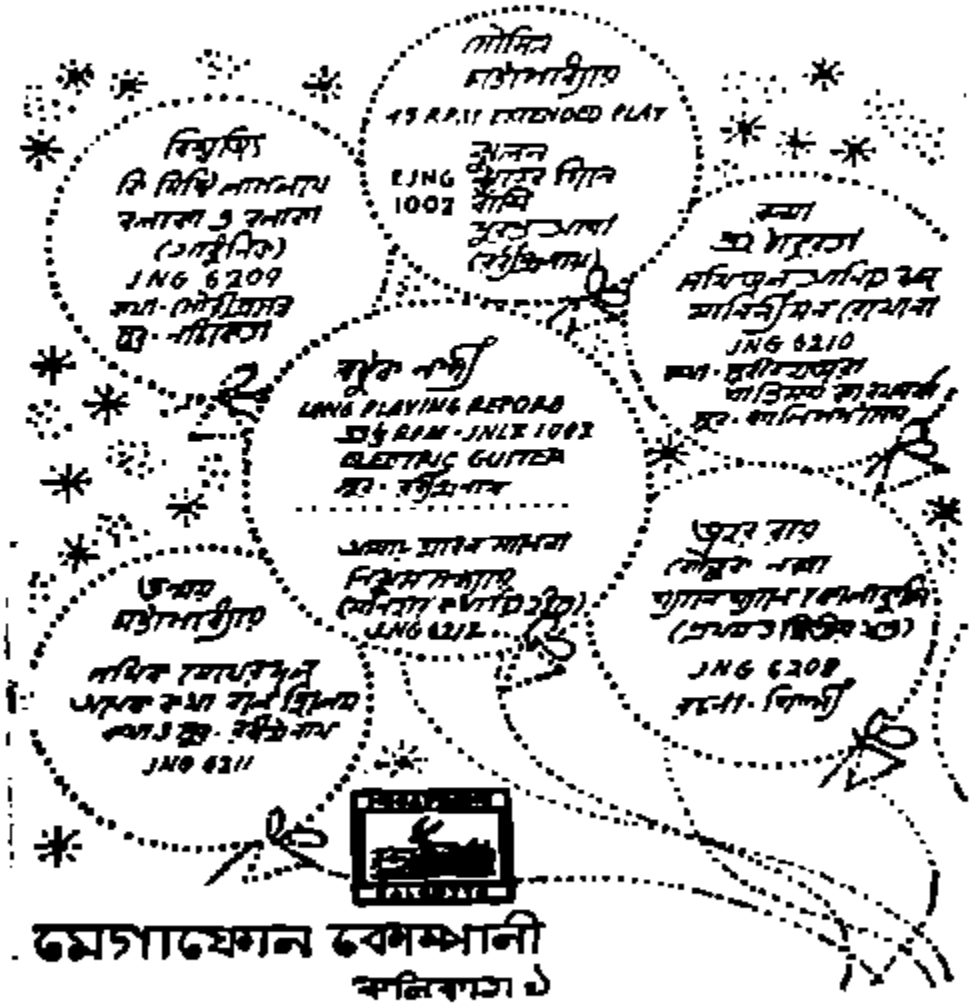


মেগাফোন কোম্পানী
কলিকাতা ১৯

সাহিত্যও সংস্কৃতি বিষয়ক

# এক্ষণ

ত্রিমাসিক পত্রিকা

পঞ্চম বর্ষ : প্রথম সংখ্যা

## সূচীপত্র


| | | |
|---|---|---|
| **প্রবন্ধ** | | |
| রবীন্দ্রনাথের পড়াশোনা | উজ্জ্বলকুমার মজুমদার | ১ |
| আত্মারামের বিবর্তন | নীলরতন সেন | ২৩ |
| **অনুবাদ** | | |
| উইলিয়ম বটলর ইয়েট্‌স ও পার্সেটারি | দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় | ৪১ |
| **গ্রন্থসমীক্ষা** | | |
| এ যুগের একটি নাটক | দেবব্রত মুখোপাধ্যায় | ৬৪ |
| 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের' বিচার | সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় | ৭১ |
| **কবিতা** | | |
| আমি যাঁটছি | অসীম রায় | ৮৩ |
| **গল্প** | | |
| অহিংস | কার্তিক লাহিড়ী | ৮৭ |
| **স্মরণ** | | |
| নিখিল বিশ্বাস | রথীন রায় | ১০১ |
| কালিদাস নাগ | পার্থ বসু | ১০২ |
| নীরেন্দ্রনাথ রায় | | ১০৩ |


**প্রচ্ছদপট**

সত্যজিৎ রায়

**সম্পাদক**

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নির্মাল্য আচার্য

কার্যালয় : ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা ৯

৭৫৮.১
৩৫/১

# পত্রিকার কথা

এক্ষণ পঞ্চম বর্ষ প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হলো। নতুন বর্ষ আরম্ভ উপলক্ষে আমরা পত্রিকার শুভানুধ্যায়ী সমস্ত লেখক গ্রাহক বিজ্ঞাপনদাতা ও সাধারণ পাঠকসমাজকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। সেই সঙ্গে পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আমাদের সব বন্ধুদের জানাই কৃতজ্ঞতা।

এই সংখ্যা প্রকাশিত হতে খুব দেরি হয়ে গেল। ছাপাখানার কাজের চাপ, আমাদের সাংগঠনিক দুর্বলতা এবং কার্যালয়ের ঠিকানা-পরিবর্তন এর জন্যে মূলত দায়ী। তাই মাঝখানের অনেক মাস সময়কে ছুটে দেওয়া হয়েছে— কার্তিক থেকে মাঘ ১৩৭০।

অতঃপর পত্রিকার সমস্ত কাজকর্ম যথাসাধ্য নিয়মিত করার জন্যে আমরা চেষ্টার ত্রুটি করবো না।

পঞ্চম বর্ষের সূচনায় দু-টি বিষয়ের দিকে আমরা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। বার্ষিক গ্রাহক-চাঁদা এক টাকা বেশি করতে অর্থাৎ মোট সাত টাকা ধার্য করতে আমরা বাধ্য হলাম। ছাপা ইত্যাদির মূল্যবৃদ্ধি যেমন এ জন্যে দায়ী তেমনি ত্রৈমাসিক পত্রিকায় ডাক খরচের কোন সুবিধা না পাওয়ায় পত্রিকার বার্ষিক ব্যয়বৃদ্ধি এইভাবে কিছুটা পূরণ করার চেষ্টাও রয়েছে। অবশ্য গ্রাহক হলে বিশেষ সংখ্যার জন্যে অতিরিক্ত মূল্য বা ডাকখরচ গ্রাহকদের দিতে হবে না।

দ্বিতীয়ত এক্ষণ কার্যালয়ের ঠিকানা পরিবর্তন। অতঃপর পত্রিকার যাবতীয় কাজকর্ম ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা ৯ থেকে পরিচালিত হবে।

বর্তমান সংখ্যায় 'রবীন্দ্রনাথের পড়াশোনা' প্রবন্ধের সঙ্গে 'রবীন্দ্রনাথ-পঠিত দাতের কাব্য'-এর যে পৃষ্ঠাটি মুদ্রিত হয়েছে তার জন্যে আমরা বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রভবনের কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

ডব্লিউ. বি. ইয়েট্‌স-এর 'পার্গেটরি' কাব্যনাট্যের যে অনুবাদটি প্রকাশিত হলো সে উপলক্ষে আমরা এক্ষণের পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে ইতিপূর্বে এই কাব্যনাট্যের অন্য একটি অনুবাদ এক্ষণে প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমান অনুবাদটি প্রকাশের উদ্দেশ্য, মহৎ কাব্যের বিভিন্ন অনুবাদ তুলনাপূর্বক আস্বাদের সুযোগ গ্রহণ।

# এক্ষণ

১৩ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা ৯

## বিজ্ঞপ্তি

এক্ষণ বছরে মোট ছয়টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়।
যে কোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বার্ষিক গ্রাহক-চাঁদা সাত টাকা। বিশেষ সংখ্যার জন্য গ্রাহকদের অতিরিক্ত দাম দিতে হয় না। গ্রাহকদের পত্রিকা সার্টিফিকেট অফ পোস্টিং-এ পাঠানো হয়, সম্ভব স্থলে পত্রিকার অফিস থেকে নিজেও নিতে পারেন।

•

এক্ষণে প্রকাশের জন্য যাঁরা লেখা পাঠাতে ইচ্ছুক, তাঁদের লেখা সাগ্রহে আহ্বান করি। অনুলিপি রেখে লেখা পাঠাবেন। উপযুক্ত ডাক-টিকিট না পাঠালে লেখা ফেরৎ দেওয়া বা চিঠির উত্তর দেওয়া সর্বদা সম্ভব হয় না, এজন্য আমরা দুঃখিত।

•

বার্ষিক গ্রাহকদের মোট ছয়টি সংখ্যা প্রাপ্য। যাঁদের চাঁদা ফুরিয়ে গেছে তাঁদের কাছে পৃথক বিজ্ঞপ্তি পত্র পাঠানো হয়েছে। তাঁদের গ্রাহক-চাঁদা সাত টাকা পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। পত্রিকা পাঠানো অব্যাহত রাখতে আমাদের সাহায্য করুন।

•

পত্রিকার নতুন কার্যালয়ের ঠিকানা লক্ষ্য করতে সকলকে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

---

সমস্ত বিষয়ে যোগাযোগ ও টাকা পাঠানোর ঠিকানা :

ম্যানেজার, এক্ষণ
১৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৯

Tearful she turn'd aside; whereat I felt
Rekindled zeal to serve them. As she will'd,
Thus am I mute: I mov'd thee from the least,
Who thy near way across the goodly mount
Prevented. What is this esteem o'er them?
Why, why dost thou hang back? why in thy breast
Harbour vile fear? why hast not courage there
And noble daring? Since three maids so blest
Thy safety plan, e'en in the court of heaven;
And so much certain good my words foretode."
As florets, by the frosty air of night
Bent down and clos'd, when day has blanch'd their leaves,
Rise all unfolded on their spiry stems:
So was my fainting vigour new restor'd,
And to my heart such kindly courage ran,
That I as one undaunted soon replied:
"O full of pity she, who undertook
My succour! and thou kind who didst perform
So soon her true behest! With such desire
Thou hast dispos'd me to renew my voyage,
That my first purpose fully is resum'd.
Lead on: one only will in us both.
Thou art my guide, my master thou, and lord."
So spake I: and when he had onward mov'd,
I enter'd on the deep and woody way.

## CANTO III.

"Through me you pass into the city of woe:
Through me you pass into eternal pain:
Through me among the people lost for aye.
Justice the founder of my fabric mov'd:
To rear me was the task of power divine,
Supremest wisdom, and primeval love.
Before me things create were none, save things
Eternal, and eternal I endure.
All hope abandon, ye who enter here."
Such characters in colour dim I mark'd
Over a portal's lofty arch inscrib'd.
Whereat I thus: "Master, these words import
Hard meaning." He as one prepar'd replied:
"Here thou must all distrust behind thee leave;
Here be vile fear extinguish'd. We

UNIVERSITY

প্রবাসী
পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ১৩৫৮

# রবীন্দ্রনাথের পড়াশোনা

(১৮৮৮—১৮৯৯)

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

রবীন্দ্রনাথের মতো কবির পক্ষে বইপড়া ব্যাপারটা যে নিতান্তই প্রয়োজনীয় ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অথচ কবি বলেই তাঁর পড়াশোনার স্বভাবটিকে আমরা ঠিকমতো বিশ্লেষণ করে দেখি না। তাঁর পড়াশোনার হিসাব নেওয়ার চেষ্টা করলে (পড়াশোনার ব্যাপারে অনেক জিনিসই অনুল্লিখিত থেকে যায়, রবীন্দ্রনাথের ব্যাপারেও তাই) তাঁর অনেক বিদ্যাচর্চার হিসাব আমাদের অবহেলার সাক্ষ্য-প্রমাণের বাইরে চলে গেছে। তবু যা পাওয়া যায় তা-ও খুব সামান্য নয়। দেখা যায়, খুব অল্প বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিচিত্র বিদ্যাচর্চাকে প্রতিভার স্বাতন্ত্র্যের বলে এমন সহজপাচ্য করে ফেলেছিলেন যে তাঁর রচনা থেকে প্রভাবের সূত্রগুলি খুঁজে বার করা সহজ নয়। সৃষ্টির অন্তর্নিহিত প্রমাণ দ্বারা প্রভাব নির্ণয়ের অন্য পথ যেগুলি — যেমন চিঠিপত্র, প্রবন্ধ, বক্তৃতা, আত্মজীবনীমূলক রচনা বা বইএর ভূমিকা— সেগুলিতেও তিনি প্রকাশকুণ্ঠ, প্রবাবিমুক্ত, রবীন্দ্রগবেষকের চোখে হয়তো 'অসচেতন'। তবু ইতস্তত বহু উল্লেখ তাঁর রচনা থেকে গবেষক খুঁজে পাবেন। কিন্তু সেক্ষেত্রেও অনেক কথাই যেন প্রসঙ্গক্রমে 'বলে ফেলা', জানিয়ে দিয়ে কৈফিয়তি দেখাবার ইচ্ছা তাতে নেই।

আরও একটি কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথ বইপড়ার ব্যাপারে দেশী-বিদেশী সাহিত্য সম্পর্কে দুটি বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করতেন বলে মনে হয়। উপনিষদ, কালিদাসের সাহিত্য ও বৈষ্ণব সাহিত্য তাঁর কাব্যজীবনে যে প্রভাব বিস্তার করেছে তা তিনি যেমন স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন, রোমান্টিক কবিদের বা অন্যান্য বিদেশী কবি, ঔপন্যাসিক বা চিন্তা-নায়কদের প্রভাব সম্পর্কে তেমন কোনো স্পষ্ট ঘোষণা তাঁর লেখায় নেই। অথচ শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত তাঁর পড়াশোনা ও সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য করলে দেখবো, ধীরে ধীরে তিনি এক আন্তর্জাতিক মনের অধিকারী হয়েছিলেন। স্বদেশী ও

বিদেশী সংস্কৃতির প্রতি তাঁর সমান টান ছিল। বহুক্ষেত্রেই তিনি বলেছেন যে পাশ্চাত্য জীবনের গতি ও প্রাচ্যের স্থিতি তাঁর জীবনকে টানা-পোড়েনে বিচিত্র সুরের জালে জড়িয়ে ফেলেছে। তাঁর নিজের রুচি প্রসঙ্গে একবার বলেছিলেন :

> আমার দেশের লোক বোধহয় একটা জিনিস জানতে পেরেছে যে আমি কোনো বিশেষ জাতের মানুষ নই; এই জন্যেই ভিতরে ভিতরে তারা আমার প্রতি বিমুখ, কটূক্তি করতে তাদের একটুও বাধেনি। আমি যে শতকরা একশো ভাগে বাঙালি নই, আমি যে সমান পরিমাণে য়ুরোপেরও, এই কথাটারই প্রমাণ হোক আমার রুচি নিয়ে।

রুচি প্রসঙ্গে শুধু একথা খাটে তা নয়, তাঁর সমগ্র সৃষ্টির সম্পর্কেই একথা সত্য। তাঁর বিচারচর্চার প্রমাণ নিলেও দেখবো এই কথাই সত্য।

কত বয়সের কী ধরনের বই কবি পড়তেন সে সম্পর্কে কিছু বলবার আগে রবীন্দ্রনাথে বইপড়ার কোন ধরনটিকে পছন্দ করতেন সে সম্পর্কে দু-এক কথা বলা দরকার। বরাবরই তিনি শাসনের পড়াকে নিন্দা করেছেন। জীবনস্মৃতিতেই কবি লিখেছেন যে ( পরে সে প্রসঙ্গে আসবো ) বাংলা সাহিত্যের তৎকালীন যাবতীয় বই তিনি পড়েছিলেন। পাঁচ রকমারি বই পড়তে পড়তে নিজের যখন রুচি গড়ে ওঠে এবং সেই রুচির টানেই মানুষ যখন স্বেচ্ছায় বইপড়াটাকে অভ্যাসে পরিণত করে তখনই সে সার্থকভাবে বই পড়তে পারে। অর্থাৎ নিজের রুচি মতো বই পেয়ে পঠিত বইগুলি থেকে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়। বইপড়ার ব্যাপারটা তখনই মনের খোরাক জুগিয়ে সুন্দর অভ্যাসে পরিণত হয়। এই বোধহয় রবীন্দ্রনাথের চোখে ছিল আদর্শ বইপড়া বা পড়াশোনা। এই ধরনের পড়ার পাঠকের আত্মনির্ভরশীলতা ও সাহস বাড়ে বলেই তাঁর ধারণা ছিল। তাঁর নিজের জীবনের কথা ভাবলে দেখতে পাই, পড়ার শাসন ছেড়ে যখন আপন মনে বইপড়ার অভ্যাসটাকে আয়ত্তে আনলেন তখন দুটি ব্যাপার স্পষ্ট হলো। প্রথমত, কবি পড়াশোনায় জাতবিচার রাখলেন না। বিচিত্র বিষয়ে উৎসুক হলো তাঁর মন। দ্বিতীয়ত, যুগের নতুন নতুন ভাবনাচিন্তার সম্মুখীন হবার সৎসাহস তাঁর হয়ে গেল। এছাড়া আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কয়েকজন বিশেষভাবেই তাঁর পড়াশোনার উৎসাহ ও খোরাক জোগাতেন।

• ২

গুরুমশাইয়ের কাছেই প্রথমে বালক রবীন্দ্রনাথের পড়াশোনা আরম্ভ হয়। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স বছর পাঁচেক হবে ( ১৮৬৫-৬৬ )। 'জল পড়ে

পাতা নড়ে'— যাকে বর্ণপরিচয়ের বানান-মন্থনের ফুরান কাটিয়ে পাওয়া 'আদি কবির প্রথম কবিতা' বলে উল্লেখ করেছেন জীবনস্মৃতিতে — সেই প্রথম কবিতার মিলের যাদুনা ছাড়িয়ে কৈলাস মুখুজ্জের ছড়ার কাছে রবীন্দ্রনাথ আত্মসমর্পণ করলেন এছাড়া বৃষ্টির ছড়া — যাকে জীবনস্মৃতিতে বলেছেন 'শৈশবের মেঘদূত' —তাঁর বালকমনের আদিমতম সাহিত্যসৃষ্টি হয়ে আছে।[১] 'ছেলেবেলা'য় এই প্রসঙ্গে বলেছেন[২] : 'বইপড়ার কথা প্রথম যা মনে পড়ে সে বস্তাপচা মুনির পাঠশালার বিষম ব্যাপার নিয়ে, আর হিরণ্যকশিপুর পেট চিরছে নৃসিংহ অবতার. ঘোষহয় লীলের কলকে খোদাই করা তার একখানা ছবিও দেখেছি সেই বইয়ে। আর মনে পড়ছে কিছু কিছু চাণক্য শ্লোক।'

এর পর যখন দাদা সোমেন্দ্রনাথ আর ভাগনে সত্যপ্রসাদ স্কুলে গেলেন তখন বালক রবীন্দ্রনাথ কাঁদা জুড়লেন। অবশেষে ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে তাঁকে ভরতি করে দেওয়া হলো।

কিন্তু এখন স্কুলের শিক্ষার চেয়ে শাসনপ্রণালীই তাঁকে বিরক্ত করে তুললো। এদিকে বাড়িতে 'কৃত্তিবাসকক্ষে' যে সব বই প্রচলিত ছিল তা নিয়েই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত। তার মধ্যে চাণক্য শ্লোকের বাঙলা অনুবাদ ও কৃত্তিবাসী রামায়ণের কথাই বিশেষভাবে তিনি উল্লেখ করেছেন। ঐ মেঘাচ্ছন্ন আকাশের পটভূমিকায় অন্ধকারের ম্লান আলোয় বাংলা কাগজে মুদ্রিত কোণ-ছেঁড়া ময়লা-ওয়ালা মলিন বইখানি (কৃত্তিবাসী রামায়ণ) নিয়ে মা-র ঘরে মায়ের কাছে বসে রামায়ণ পড়তে পড়তে কোনো এক করুণ বর্ণনায় চোখে জল এসে পড়তো। ঝিঝিয়া (মা-র সম্পর্কের এক বুড়ী) তাঁর হাত থেকে বই কেড়ে নিতেন। এ ঘটনা পরে জীবনস্মৃতিতে তিনি বলেছেন।[৩]

কৃত্তিবাসকক্ষের অন্তত কৃত্তা ঈশর সন্ধ্যেবেলায় বাড়ির ছেলেদের বসিয়ে রামায়ণ-মহাভারত শোনাতো। একদিন প্রায় ঘুম এসেছে এমন সময় মহর্ষির অনুচর কিশোরী চট্টোপাধ্যায় এসে মাস্তারের পাঁচালি গেয়ে রামায়ণের যে অংশটুকু ছেলেরা শুনছিল তার পরবর্তী অংশটুকু শুনিয়ে দিলেন। জীবন-স্মৃতিতে সে ঘটনাকে স্মরণ করে লিখেছেন : 'কৃত্তিবাসের সরল পয়ারের মৃদুমন্দ কলধ্বনি কোথায় বিলুপ্ত হইল— অগ্নিপ্রাসের ঝকঝকি ও ঝংকারে আমরা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম।'[৪]

ওরিয়েন্টাল সেমিনারি ছেড়ে নর্মাল স্কুলে যখন গেলেন (১৮৭৮) তখন সেখানকার পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারলেন না রবীন্দ্রনাথ।

শিক্ষকদের সকলকেই যে ভালো লাগতো তা নয়। কোনো এক শিক্ষকের অভদ্র ভাষা প্রয়োগ তাঁকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল। যাই হোক এই স্কুলেই মধুসূদন বাচস্পতি নামে এক শিক্ষকের কাছে তিনি বাংলা পড়েছিলেন [১] এবং তাঁর কাছে বাংলা পরীক্ষায় প্রথম হন।

এই সময়েই অর্থাৎ সাত-আট বছর বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথের পদ্য লেখার হাতেখড়ি হলো। তাঁর ভাগনে জ্যোতিঃপ্রকাশ তখন হাফপ্যান্ট আওড়াতেন। তিনিই বালক রবীন্দ্রনাথকে কবিতা লিখতে প্রবৃদ্ধ করেন। তিনিই তাঁকে পয়ারের রহস্য বুঝিয়ে দিলেন।[২] তাতে পদ্য-লেখার সাহস তাঁর বেড়ে গেল। খাতা-পেন্সিল নিয়ে গাল-ভরা সংস্কৃত শব্দ বসিয়ে বসিয়ে কবিতা লিখতে লাগলেন।

নর্ম্যাল স্কুলের শিক্ষক নীলকমল-ঘোষাল রবীন্দ্রনাথকে বাড়িতে পড়াতেন। বেতের মতন শুকনো চেহারার সেই শিক্ষকের কাছে সকাল ছ-টা থেকে সাতে ন-টা পর্যন্ত পড়তে হতো। বোধোদয়, চারুপাঠ, বস্তুবিচার, প্রাণিবৃত্তান্ত থেকে মাইকেলের মেঘনাদবধকাব্য পর্যন্ত সবই পড়তে হতো তাঁর কাছে। সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের উৎসাহেই রবীন্দ্রনাথের নানা বিদ্যাশিক্ষার আয়োজন হয়। সকালে কুস্তি করার পরেই মাটি-মাখা শরীরে জামা পরে নিয়ে অক্ষয় কুমার দত্তের পদার্থবিদ্যা, মেঘনাদবধকাব্য, জ্যামিতি, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল পড়তে হতো। স্কুল থেকে ফিরেই ড্রয়িং আর জিমনাস্টিকের পর ইংরিজির শিক্ষক অঘোরবাবু আসতেন। রাত ন-টায় নিষ্কৃতি হতো।[৩]

রবিবারে গান শিখতে হতো বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে। তাছাড়া সীতানাথ দত্ত আসতেন 'যন্ত্রতত্ত্বযোগে' প্রাকৃতবিজ্ঞান শিক্ষা দিতে। সীতানাথ দত্তের এই প্রাক্টিকাল শিক্ষা রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ আনন্দ দিতো। এছাড়া ক্যাম্পবেলের একটি মেডিকেল ছাত্রের কাছে অস্থিবিদ্যা শিক্ষা শুরু হয়।[৪] পরবর্তী কালে রচিত 'কঙ্কাল' গল্পের মধ্যে এই স্মৃতি যে প্রেরণা দিয়েছিল তা সকলেই জানেন।

এই রকম ঠাসা পড়াশোনার ফটিনের মধ্যে আবার মুগুবোধের সূত্র মুখস্থ করতে হতো হেরম্ব তত্ত্বরত্নের কাছে। এই সূত্রগুলি সম্পর্কে পরে জীবনস্মৃতিতে বলেছেন : 'অস্থিবিদ্যার হাড়ের নামগুলা এবং মোগ্ধবোধের সূত্র, দুয়ের মধ্যে ভিন্ন কারণে ভিন্ন তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। আমার বোধহয় হাড়গুলিই কিছু নরম ছিল।'[৫]

বাঙলা শিক্ষার কিছুটা অগ্রগতি হলে ইংরিজি পড়ানো হতে লাগলো। আগেই বলেছি অঘোরবাবু ছিলেন ইংরিজি শিক্ষক। বিদেশী ভাষা শিক্ষার নীরসতাকে কাটাবার জন্য মাঝে মাঝে কলেজ থেকে নানা রকম জিনিস এনে দেখাতেন। যাই হোক প্যারীচরণ সরকারের প্রথম ও দ্বিতীয় ইংরিজি পাঠ (First and Second Book of Reading) শেষ হতে না হতেই মকলকৃত (Macculloch's ?) কোর্স অব রিডিং শ্রেণীর একখানা বই ধরানো হয়। সেটি বালকের পক্ষে বিশেষ কঠিন মনে হতো। সেই বইটি সম্পর্কে জীবনস্মৃতিতে বলেছেন: 'প্রত্যেক পাঠ্য বিষয়ের গোড়াতেই থাকে-থাকে লাল-কালো সিলেব্‌ল্-কাটা-করা বানানগুলো অ্যাকসেন্ট-চিহ্নের তীক্ষ্ণ সঙ্গিন উঁচাইয়া শিশুপালবধের জন্য কাওয়াজ করিতে থাকিত।'[১১]

যাই হোক এর মাঝে মাঝেই কবিতা লেখার অভ্যাস ঠিকই চলছিল। সে অভ্যাসের কথা কখনও ভুলে ছড়িয়ে পড়লো। কোনো কোনো শিক্ষক তাঁকে উৎসাহ দিলেন। বাড়িতেও এই সময় এক উপযুক্ত শ্রোতা জুটে গেল। তিনি হলেন গ্রীকণ্ঠ সিংহ। গানবাজনায় গ্রীকণ্ঠ সিংহের বিশেষ ঝোঁক ছিল। ঠাকুরবাড়ির ছেলেদের মধ্যেও সে ঝোঁক তিনি কিছু সঞ্চার করেন।

নর্মাল স্কুল থেকে ছেড়ে গিয়ে (আনুষ্ঠানিক ১৮৭২) বেঙ্গল একাডেমি নামে এক আংলো স্কুলে ভর্তি হলেন রবীন্দ্রনাথ। এ স্কুলে এসে পড়াশোনার অবস্থা আরও খারাপ হলো। এই সময় রবীন্দ্রনাথের পৈতে হয়। পৈতে হওয়ার পর গায়ত্রীমন্ত্রের অর্থহীন পুনরাবৃত্তি মনে কোনো ভাবোদ্রেক করতো না। পরে জীবনস্মৃতিতে এই প্রসঙ্গ স্মরণ করে লিখেছেন: 'শিক্ষার সকলের চেয়ে বড়ো অঙ্গটা— বুঝাইয়া দেওয়া নহে, মনের মধ্যে পাওয়া। সেই আঘাতে ভিতরে যে জিনিসটা নাড়িয়া উঠে যদি কোনো বালককে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে হয় তবে সে যাহা বলিবে, সেটা নিতান্তই একটা ছেলেমানুষি কিছু। কিন্তু যাহা সে মুখে বলিতে পারে তাহার চেয়ে তাহার মনের মধ্যে আছে অনেক বেশি; যাহারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিয়া কেবল পরীক্ষার খাতাই ফল নির্ণয় করিতে চান, তাঁহারা এই জিনিসটার কোনো খবর রাখেন না।'[১২] এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি বইএর নাম করেছেন যেগুলি ছোটবেলায় পুরোপুরি না বুঝলেও তাঁর মনকে বিশেষ নাড়া দিয়েছিল। আর এই মনকে নাড়া দেওয়া মানেই অবচেতনের গভীরে তাকে পরিপাক করে ফেলা। মূলাজোড়ে গঙ্গার ধারে বেশ উঠলে দ্বিজেন্দ্রনাথ

মেঘদূত আওড়াতেন। শিশুর কাছে তা বোধ্য ছিল না সম্পূর্ণ, কিন্তু তার আবেগ-আবেশপূর্ণ ধ্বনিত পরিবেশটিকে বালকের বুকতে দেরি হতো না। এই প্রসঙ্গের আগে দুটি বইয়ের কথা তিনি বলেছেন। প্রথমটি The Old Curiosity Shop, আরেকটি বাবার সংগ্রহ থেকে পাওয়া কোট উইলিয়ামের ছাপা জয়দেবের গীতগোবিন্দ। প্রথমটির বিচিত্র ছবির সঙ্গে গল্প গাঁথা হয়ে এক আবছায়া আলোয় তৈরি করেছিল বালকের মনে। আর গীতগোবিন্দখানি ছিল গদ্যের মতো টানা লাইনে ছাপা। বালকের উৎসাহ ছিল সেই গদ্যরীতি থেকে জয়দেবের বিচিত্র ছন্দকে খুঁজে বার করা। পরে যখন অর্থ বুঝেছেন তখন এই সঙ্গীত-স্মৃতির সঙ্গে অনেক সময়েই খাপ খাওয়াতে পারেন নি। শৈশবে পড়া এই অর্ধস্ফুট বইখানি অর্থযুক্ত হয়ে দেখা দেবার আগেই শব্দ-ছন্দের আশ্চর্য কৌশল নিয়ে বালকের কবিমনে গেঁথে গিয়েছিল। পরে এই শব্দ-ছন্দ-স্মৃতি অ-বোধপূর্বভাবে বহু কবিতায়, গদ্যে অজস্রভাবে উৎসারিত হয়েছে।

যখন রবীন্দ্রনাথের বয়স এগারো বা বারোর কাছাকাছি (১৮৭৩) তখন বাবার সঙ্গে বোলপুর হয়ে[১৩] উত্তর ভারত পরিক্রমে যান। অমৃতসরে গিয়ে সন্ধে-বেলা প্রায়ই বাবাকে গান শোনাতে হতো। সেখানে দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে পড়ানোর জন্য Peter Parley's Tales[১৪] (এই সিরিজের অনেকগুলি বই বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে আছে। টীকা দ্রষ্টব্য।) পর্যায়ের অনেকগুলি বই নিয়ে যান। তার মধ্যে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের জীবনী ছিল। এছাড়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' দ্বিতীয় ভাগ পড়াও সেখানে আরম্ভ হয়। এর সঙ্গে চললো উপক্রমণিকার শব্দরূপ মুখস্থ। বাবার কাছে পড়তে গিয়ে স্কুলের মাস্টারমশাইয়ের রক্তচক্ষুর সম্মুখীন হতে হয় নি রবীন্দ্রনাথকে। পুরোর দুঃসাহসিক স্কুলজীবনকে মহর্ষি উপহাস করেন নি কোনোদিন।

ইংরিজি ও সংস্কৃত ছাড়া চলতো জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা। Richard A. Proctor ,,-এর লেখা 'সরলপাঠ্য ইংরাজি গ্রন্থ' (টীকা দ্রষ্টব্য) থেকে অনেক বিষয় বাবা পড়ে বুঝিয়ে দিতেন। রবীন্দ্রনাথ তা বাংলায় লিখতেন।

অমৃতসর থেকে বাবার সঙ্গে গেলেন ডালহৌসি পাহাড়ে। সেখানকার পার্বত্য জগতের সৌন্দর্য বালককে মুগ্ধ করলো। পাহাড়ী পথের বাঁক, নিবিড় বনস্পতির ছায়া, ছোট ছোট ঝরণা তাঁকে মুগ্ধ করলো। এই পরিবেশেও কিন্তু নিয়মিত চলতো ইংরিজি ও সংস্কৃত পড়া। সন্ধেবেলা আকাশে তারা উঠলে আরম্ভ হতো নক্ষত্র ও জ্যোতিষচর্চা। রাজনারায়ণ বসুকে লেখা এই সময়ের

মহর্ষির একটি চিঠিতে পাওয়া যায় ( ১৮৭৩, ২৫ এপ্রিল ) : 'রবীন্দ্র···আমার নিকট সংস্কৃত ও ইংরাজি অল্প অল্প পাঠ লিখিতেছে। ইহাকে ব্রাহ্মধর্ম পড়াইয়া থাকি।'[১৬] জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : 'সূর্যোদয় কালে··· পিতৃদেব তাঁহার প্রভাতের উপাসনা-অন্তে···আমাকে পাশে লইয়া দাঁড়াইয়া উপনিষদের মন্ত্রপাঠ দ্বারা আর একবার উপাসনা করিতেন।'[১৭] এই বোধ হয় প্রথম উপনিষৎ-মন্ত্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পরিচয়।

কলকাতায় ফিরে বাবার অনুচর কিশোরী চট্টোপাধ্যায়ের কাছে অনেক পাঁচালির গান শিখে ফেলেন রবীন্দ্রনাথ। কিশোরী চট্টোপাধ্যায় আগে পাঁচালির দলের গায়ক ছিলেন। দাশরথি রায়ের পাঁচালি গানে অনেক কৈশোর সন্ধ্যার আসর জমে উঠতো। 'জীবনস্মৃতি'তে ও 'ছেলেবেলা'য় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে এই সময়ে অন্দরমহলে, বিশেষ ক'রে মা-র কাছে, গুরুপাঠে পড়া বাল্মীকি রামায়ণের শ্লোক মুখস্থ বলে দিতে তাঁকে হতো। বাড়ির ছাদে বৌদিদের আসরে একমাত্র দেওর রবীন্দ্রনাথকে আসন পাতায় দিতে ও সুপুরি কাটতে হতো। তার সঙ্গে প্রতাপচন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গবিপ পরাক্রম' পড়ে শোনাতে হতো।[১৮]

বেঙ্গল একাডেমি থেকে নানা ঘরপড়ুয়ার পালাতে আরম্ভ করলে রবীন্দ্রনাথকে নর্মালস্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয় ( ১৮৭৪ )। স্কুলে অমনোযোগের জন্য দ্বিজেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে বাড়িতে পড়াবার চেষ্টা ইতিমধ্যে করেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখছেন[১৯] : 'জ্যোতি, স্কুলে বালকেরা টেঁকিতে পারিল না, আমি দুই প্রহর হইতে ৪-টা পর্যন্ত এবং পণ্ডিত ( রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য ? ) সকালবেলায় তাহাদিগকে পড়াইতেছেন। তাহাদের স্কুল অপেক্ষা ভাল পড়া হইতেছে' ( ২৫ মাঘ ১৭৯৫ শক, ইং ১৮৭৪ )। দাদাদের সঙ্গে রাজনারায়ণ বসুও চেষ্টা করেছিলেন। একটি চিঠিতে লিখেছিলেন[২০] : 'রবীন্দ্রের ইংরাজি পড়া যে ভাল হইতেছে আমার এমন বোধ হয় না, তুমি তাহাকে শ্রেষ্ঠ ইংরাজী কবিদিগের এক স্বর্গ করিয়া দিয়াছ। তাহা কি রবীন্দ্র আপনা আপনি পড়িয়া বুঝিতে পারিবে ?' ( বক্তাটা শেষের, ১১ শ্রাবণ, ১৭৯৭ : ইং ১৮৭৫ )।

স্কুলে পড়াশোনায় মন না থাকায় বাড়িতেই রবীন্দ্রনাথ পড়তে লাগলেন। আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের পুত্র জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য গৃহশিক্ষক হলেন। তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথ 'মুগ্ধবোধব্যাকরণ' পড়লেন, বাংলা অনুবাদও করলেন। জীবনস্মৃতির

পাণ্ডুলিপিতে আছে : [১] '[ কুমারসম্ভব ] তিন সর্গটা যতটা পড়াইয়াছিলেন তাহার আগাগোড়া সমস্তই আমার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল।' কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গ রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অনূদিত হয়ে এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সংশোধিত হয়ে ভারতীতে প্রকাশিত হয় ( ১২৮৪ আশ্বিন )। বালতী-পুঁথিতে দুটি পাঠই — রবীন্দ্রনাথের পাঠ এবং দ্বিজেন্দ্রনাথের সংশোধিত পাঠ— পাওয়া যায় [২] কুমারসম্ভব ছাড়া জ্ঞানচন্দ্রের কাছে রবীন্দ্রনাথকে 'ম্যাকবেথ' পড়ে বাংলা মানে বলতে হতো। বাংলা গদ্যে সম্পূর্ণ 'ম্যাকবেথ' নাটক অনুবাদ করেছিলেন। সেই অনুবাদের সমস্তই হারিয়ে গিয়েছিল। জীবনস্মৃতির পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে : 'কেবল ডাকিনীদের অংশটা অনেকদিন পরে ভারতীতে বাহির হইয়াছিল।'[৩] ভারতীর ১২৮৭ আশ্বিন সংখ্যায় তা প্রকাশিত হয়।

জ্ঞানচন্দ্র ছাড়া মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনের হেড পণ্ডিত রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য রবীন্দ্রনাথকে সংস্কৃত পড়াতেন। তিনি ব্যাকরণ শেখাতে গিয়ে যখন হলে 'শকুন্তলা' পড়াতে লাগলেন বাংলা অনুবাদ করে। এই রামসর্বস্ব পণ্ডিত রবীন্দ্রনাথের ম্যাকবেথের অনুবাদটি নিয়ে বিদ্যাসাগর মশায়ের কাছে হাজির হলেন রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে ক'রে। সেখানে বঙ্গদর্শনের লেখক ও বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন : 'নাটকের অন্যান্য অংশের অপেক্ষা ডাকিনীর উক্তিগুলির ভাষা ও ছন্দের কিছু বিশেষত্ব থাকা উচিত।'[৪]

জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য অকালমৃত্যু বরণ করতে চলে গেলে মেট্রোপলিটান কলেজের প্রফেসর্‌ব্রেন্‌ব্রেন্ট ব্রজনাথ যে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষক হলেন। তাঁর কাছে গোল্ডস্মিথের 'ভিকার অব ওয়েকফিল্ড'এর বাংলা অনুবাদ করেন রবীন্দ্রনাথ।[৫] কিন্তু শেষ পর্যন্ত শিক্ষক-শাসনের বাধ্যবাধকতায় কিছু করাই তাঁর পক্ষে দুঃসহ হয়ে উঠলো। কাজেই বাড়ির মধ্যেকার সাহিত্যের আবহাওয়াতেই মেতে গেলেন তিনি। তাঁর চরিত্রস্বভাব পড়াশোনার স্বাধীনতাকেই চাইতো, পড়াশোনার শাসনকে নয়।

৩

কিন্তু এখন থেকে স্কুলের চেয়ে বাড়িতেই পড়াশোনার চাপ পড়লো বেশি। কাজেই স্কুলের শাসন গেলেও বাড়ির শাসন গেল না। শুধু এক শাসনের অবসানে অনেকখানি নিশ্চিন্ত ভাব। যাই হোক, বাড়িতে পণ্ডিত ও

শিক্ষকেরা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ব্যস্ত হইলেন। অন্যদিকে নানা সুযোগ-সুবিধা এলো। নামী মনীষীদের সংস্পর্শ ঘটতে লাগলো। সাহিত্যের আবহাওয়ার মধ্যে এসে পড়লেন। তাঁর সৃষ্টিক্ষমতার প্রতিও শিক্ষক ও বাড়ির লোকেদের সস্নেহ দৃষ্টি পড়লো। তার ওপর হইল বাড়ির সাহিত্য-পরিবেশ, যে পরিবেশকে অগ্রাহ্য করা নিতান্ত অসাধিত্যিকের পক্ষেও বোধহয় অসম্ভব। নিজের পড়াশোনা ও লেখার ব্যাপারে তাঁর কোনো বাধাই রইল না। পরিবেশ, উৎসাহ এবং আন্তরিক প্রেরণা এই তিনের সম্মিলন হলো তাঁর ভাগ্যে। স্কুল ছাড়ার পরের জীবন সম্পর্কে 'আশ্রম বিদ্যালয়ের সূচনা' প্রবন্ধের আরম্ভে ( প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৪০, পৃ ১০৭ ) বলেছিলেন :

> 'যখন আমার বয়স ষোলো, তখন এডুকেশন বিভাগীয় ঘাঁড়ের শিঙল ঘিন্ন করে বেরিয়ে পড়েছিলেম। তারপর থেকে যে বিদ্যালয়ে হলেম ভরতি তাকে যথার্থই বলা যায় বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে আমার ছুটি ছিল না, কেন না অবিশ্রাম কাজের মধ্যেই পেয়েছি ছুটি। কোনো কোনো দিন পড়েছি রাত দুটো পর্যন্ত।...মাঝে মাঝে অন্তঃপুর থেকে বড়দিদি এসে জোর করে আমার বই কেড়ে নিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিতেন বিছানায়। তখন আমি যে সব বই পড়ার চেষ্টা করেছি কোনো কোনো গুরুজন তা আমার হাতে দেখে মনে করেছেন—স্পর্ধা। শিক্ষার কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে যখন শিক্ষার স্বাধীনতা পেলুম তখন কাজ বেড়ে গেল অনেক বেশি, অথচ তার গেল কমে।'

জীবনস্মৃতিতে 'ঘরের পড়া' অধ্যায়ে এই সময়কার পড়াশোনা সম্পর্কে বলেছেন : 'যোগ করি তখন পাঠ্য অপাঠ্য বাংলা বই যে-কটা ছিল সমস্তই আমি শেষ করিয়াছিলাম।' 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে ( সাধনা : ১৩০১ বৈশাখ ) এই সময়কার কথা স্মরণ ক'রে বলেছেন : 'কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, একত্র-বাঁধানো 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', আরব্য উপন্যাস, পারস্য উপন্যাস, বাংলা রবিন্‌সন্ ক্রুসো, সুশীলার উপাখ্যান, রাজা প্রতাপাদিত্য রায়ের জীবনচরিত, বেতাল পঞ্চবিংশতি প্রভৃতি তখনকার কালের প্রবন্ধগুলি বিস্তর পাঠ করিয়াছিলাম।' কিন্তু আগে প্রকাশিত দীনবন্ধু মিত্রের 'জামাই বারিক' তাঁকে পড়তে দেওয়া না হলেও কি ভাবে চাবি চুরি করে আলমারি খুলতে গিয়ে ধরা পড়ে যান সে-গল্প জীবনস্মৃতিতে বলেছেন ( 'ঘরের পড়া' দ্রষ্টব্য )। পরে চুরি সফল হয়। বই পড়ে বই ও চাবি একসঙ্গেই স্বত্বাধিকারীকে ফিরিয়ে দেন।

এই প্রসঙ্গে খাতা-পুঁথির কথা বিশেষভাবে স্মরণ করা দরকার।[১৭] কারণ এই খাতা'র সূত্রেই খাতা-পুঁথির রচনাগুলি লেখা। রামসর্বস্ব পণ্ডিত যে রবীন্দ্রনাথের মতো অনিচ্ছুক ছাত্রকে সংস্কৃত ব্যাকরণ শেখাবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিলেন তার প্রমাণ খাতা-পুঁথির প্রথম পৃষ্ঠায় সংস্কৃত রচনা চর্চার মধ্যেই রয়েছে। এই পুঁথিতে সাপ্তাহিক পাঠক্রমের একটি তালিকা ইংরিজিতে লেখা পাওয়া যায় ( পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা ৪৮/২৬ ব )। এটিকে রবীন্দ্রনাথ-কথিত 'বিশ্ববিদ্যালয়'-এর আংশিক পাঠক্রম বলতে পারি। নিজের স্বাধীন পড়াশোনার পাশাপাশি এই পাঠক্রম কিছুকাল চলেছিল। পাঠক্রমটি তুলে দিচ্ছি :

Monday : Eng. Prose—Geometry—Eng. History—Sanskrit

Tuesday : Grammar—Algebra—History of India—Sanskrit

Wednesday : Eng. Prose—Arith—Geography Physl [cal]-Do

Thursday : Grammar—Mensuration & Algebra] —England History-Do

Friday : Eng. Pros.—Arithmetic—General Geography—Do

Saturday : Do—Geometry—History of India—Do

Sunday : Exercises—

নর্মাল স্কুল ত্যাগের সঙ্গে-সঙ্গেই বাড়ির শিক্ষার অবসান হয়েছিল। এই পাঠক্রমে ইংরিজি, গণিত ( জ্যামিতি, বীজগণিত ও পাটিগণিত ), ভূগোল এবং সংস্কৃত। যাই হোক এই খাতা-পুঁথিতে যে সমস্ত রচনা লেখা যায় তাতে বিভিন্ন সংস্কৃত ও ইংরিজি কবিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ যোগ চোখে পড়ে। সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের অনুবাদের কথা আগেই বলেছি। ইওরোপীয় সাহিত্য, ইংরিজি কাব্যসাহিত্য— বিশেষ ক'রে রোমান্টিক কবিতা যে রবীন্দ্রনাথ পড়ছিলেন তা এই সময়ের অনেকগুলি অনুবাদের খাতা দিয়েই বুঝতে পারা যায়। মুরের আইরিশ মেলডিজ,[১৮] বায়রনের কবিতা, পেত্রার্কের কবিতা ( যা পরে 'পিত্রার্কা ও লরা' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত ) এবং আরও কিছু বিদেশী কবিতার অনুবাদ দেখা যায় এই খাতা-পুঁথিতে।

এই সময়ে একটি পত্রিকা বিশেষ রবীন্দ্রনাথের মনের মোরাক বিশেষ ভাবেই যোগাতো। সে হচ্ছে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদিত বিবিধার্থসংগ্রহ

( প্রকাশকাল ১৮৭১ )। সেজদাদা যোগেন্দ্রনাথের আলমারি থেকে এই পত্রিকা সংগ্রহ করে রবীন্দ্রনাথ পড়তেন। এই পড়বার স্মৃতিকে জীবনস্মৃতিতে উল্লেখ করে গেছেন[১৮]: 'সেই বড়ো চৌকা বইটাকে বুকে লইয়া আমাদের শোবার ঘরের তক্তাপোশের উপর চিত হইয়া পড়িয়া যাইতাম তিমি মৎস্যের বিবরণ, কাজির বিচারের কৌতুকজনক গল্প, কল্পকুমারী উপন্যাস পড়িতে কত ছুটির দিনের মধ্যাহ্ন কাটিয়াছে।' বিবিধার্থসংগ্রহে 'বিজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান, পুরাবৃত্ত' ছাড়া 'প্রচুর গল্প কবিতা ও ক্ষুদ্র ভ্রমণকাহিনী' প্রকাশিত হতো। পাঠ্য বইয়ের বাইরে এই পত্রিকাই রবীন্দ্রনাথের চোখের সামনে সাধারণ জ্ঞানের রাজ্য খুলে ধরেছিল।

ইতিমধ্যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'অভিলাষ' নামে কবিতা প্রকাশিত হয়েছে ( ১৮৭৪ )। এটি তাঁর প্রথম মুদ্রিত কবিতা। তখন তাঁর বয়স তেরো। এই সময়েই যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা 'আর্যাবর্তু' পত্রিকা ( প্রকাশ ১৮৬৩, পুনঃপ্রকাশ ১৮৭১ ) বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের আলমারি থেকে পড়তে থাকেন। এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। এবং এই পত্রিকাতেই বের্নার্দাঁ দা সাঁ পিয়েরের রচিত উপন্যাসের কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য-কৃত অনুবাদ 'পৌলবর্জিনী' প্রকাশিত হয়েছিল ( ১২৭৫-১২৭৬ )। এই উপন্যাস তাঁর বালকমনে বিশেষ নাড়া দিয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের পরবর্তী আকর্ষণ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা ( প্রকাশ ১৮৭২ )। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি মাসের পর মাস প্রকাশিত হতে থাকে এই পত্রিকায়। বাড়লা উপন্যাস সাহিত্যের সঙ্গে বালক রবীন্দ্রনাথের পরিচয় এই পত্রিকাতেই। এই সময়কার আরেকটি 'লোভের সামগ্রী' ছিল নগেন্দ্রনাথ মিত্র ও অক্ষয় সরকারের 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' ( খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত ১৮৭৪-১৮৭৬ )। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এর গ্রাহক ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে নিয়েই পড়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বিদ্যাপতির কাব্য ও ভাষার সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠ পরিচয় এখানেই। এর আগে গ্রন্থ হিসাবে প্রথম বৈষ্ণব পদাবলী সম্পাদন করেন জগদ্বন্ধু ভদ্র ( ১৮৭০ )। সেটির নাম 'মহাজন পদাবলী'। এতেও বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস সম্বন্ধে সমালোচনা এবং বিদ্যাপতির পদাবলী ও টীকা প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণে এই বই পুরোনো বইএর দোকান থেকে শ্রীনৃপসিংহ নাথার সংগ্রহ করেন। গ্রন্থের প্রভাত মুখোপাধ্যায়

এটি দেখেছেন ( রবীন্দ্রজীবনী : প্রথম খণ্ড, পৃ ৬৮ )। এ ছাড়া বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধ ( ১২৮০ পৌষ ), এবং রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাপতি' ( ১২৮০ জ্যৈষ্ঠ ), ভারতী ( ১২৮০ মাঘ ), বঙ্গদর্শন ( ১২৮০ চৈত্র ) ইত্যাদি প্রবন্ধগুলি বঙ্গদর্শনের পাঠক রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই পড়েছিলেন। এই সব সঙ্কলন ও সমালোচনাই বৈষ্ণব কবিতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের আগ্রহের মূল উৎস।

৪

বাড়িতে যেমন সাহিত্যপাঠের পরিবেশ ছিল, তেমনি ছিল সাহিত্যসৃষ্টিরও। দাদারা শুধু তাঁকে বই-পত্র-পত্রিকা পড়বার সুযোগ দিয়েছেন তাই নয়, দাদাদের সাহিত্যসৃষ্টি ও তার উপভোগেও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সমান অংশীদার। নাটক, অভিনয়, কাব্য, গান সব কিছুর সৃষ্টির সঙ্গেই আমরা তিনি পরিচিত ছিলেন। 'জ্যোতিস্মৃতি'তে ( পৃ ১৪৭ ) পাওয়া যাচ্ছে যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রামসর্বস্ব পণ্ডিত দুজনে যখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সদ্যরচিত নাটক 'সরোজিনী'র এক সংশোধন করছিলেন ( ১৮৭৫ ) তখন মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথ এসে সংশোধনের ব্যাপারে মতামত দিতেন। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশেই নাটকে রাজপুত মহিলাদের চিতাপ্রবেশের পূর্ব-মুহূর্তে একটা বড় গদা বক্তৃতা বাদ দেওয়া হয় এবং তার বদলে রবীন্দ্রনাথেরই লেখা 'জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ' গানটি যোগ করে দেওয়া হয়।[১৯]

বাড়িতে কাব্য-নাটকের চর্চা ছাড়া ছিল গানের চর্চা। জ্যোতিদাদা এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের নিত্যসঙ্গী ও উৎসাহদাতা ছিলেন। এই ব্যাপারে জীবনস্মৃতিতে 'গীতচর্চা' অধ্যায়ে বলেছেন : 'আমার পক্ষে তাহার একটা সুবিধা হইয়াছিল, অতি সহজেই গান আমার সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার অসুবিধাও ছিল। চেষ্টা করিয়া গান আয়ত্ত করিবার উপযুক্ত অভ্যাস না হওয়াতে শিক্ষা পাকা হয় নাই। সংগীত বিদ্যা বলিতে যাহা বোঝায় তাহার মধ্যে কোনো অধিকার লাভ করিতে পারি নাই।' এই উক্তি বিনয়বশত। কারণ কিছু পরে ইংলণ্ড থেকে ফিরে রবীন্দ্রনাথ দেশি-বিদেশী সঙ্গীতের সম্পর্কে বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল হয়ে তাদের মিশ্রণ সম্পর্কে পরীক্ষা করতে থাকেন গীতিনাটকের মধ্যে। আর তাঁর শত শত গানে তিনি যে সুরের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন তাতে সংগীতবিদ্যায় তাঁর অসাধারণ অধিকারকেই কি প্রমাণ করে না?

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন ছয়-সাত বছর তখন তাঁর খুড়তুতো দাদা গণেন্দ্রনাথ রামনারায়ণ তর্করত্নকে দিয়ে 'নবনাটক' লিখিয়ে বাড়িতে তার অভিনয় করাচ্ছিলেন (প্রথম অভিনয় ১৮৬৭, ৫ জানুয়ারি)। রবীন্দ্রনাথ সে অভিনয় দেখেছিলেন। এ ছাড়া গণেন্দ্রনাথের সাহিত্য ও ললিতকলাতেও বিশেষ অনুরাগ ছিল। কিন্তু সবচেয়ে আকর্ষণ ছিল ইতিহাস চর্চায়। বাঙলার ইতিহাস লিখে তা অসমাপ্ত রেখে গেছেন তিনি। বাঙলার দেশানুরাগের গান, ধর্মসংগীত, নাটকের অনুবাদ (বিক্রমোর্বশী-র অনুবাদ) সমস্ত ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ ছিল অসীম। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির ব্যাপারে ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে গণেন্দ্রনাথের সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব বিশেষভাবে প্রেরণা দিয়েছিল। গণেন্দ্রনাথের কবিত্ব তাই গুণেন্দ্রনাথেরও সৌন্দর্যবোধ ও গুণগ্রাহিতা ছিল প্রশংসনীয়। বড়দাদার লেখা কৌতুকনাট্যের রিহার্সালে গুণেন্দ্রনাথের উৎসাহের ঢেউ রবীন্দ্রনাথকে যা দিয়েছিল।[৩১] অনেকদিন দুপুরে কাছারি-ঘরে গুণেন্দ্রনাথের কাছে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের ইতিহাসের গল্প শুনতেন। তাঁকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ কবিতাও সংশোধন করিয়ে নিতেন। গুণেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ স্কুলের প্রাইজ পাওয়ার একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। একবার সচ্চরিত্র পুরস্কার হিসাবে 'হুতোমপ্যাঁচা' নামে একটি বই পেয়েছিলেন। এটি মধুসূদন বাচস্পতির লেখা। (প্রকাশ ৩১ বৈশাখ, ১২৭৫, ইং ১৮৬৮)। এ ঘটনা নর্ম্যাল স্কুলে পড়বার সময়েই ঘটে থাকবে মনে হয়। কারণ মধুসূদন পণ্ডিত এই স্কুলেরই শিক্ষক ছিলেন। আগেই বলেছি, তাঁর কাছেই রবীন্দ্রনাথ স্কুলে যাবার পড়েছিলেন। কাজেই এ ঘটনা ১৮৭২ বা তার আগেই হবে।

১৮৭৪ সালে বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখলেন 'স্বপ্নপ্রয়াণ' (প্রথম সর্গ, প্রকাশ বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১২৮০। গ্রন্থাকারে প্রকাশ, ১৮৭৫)। গুণেন্দ্রনাথ ছিলেন তার রসিক শ্রোতা। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'বড়দাদার লেখনীমুখে তখন ছন্দের ভাষায় কল্পনার একেবারে কোটালের জোয়ার— বান ডাকিয়া আসিত ...। স্বপ্নপ্রয়াণের দাম কি আমরা বুঝিতাম। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, লাভ করিবার জন্য পুরাপুরি বুঝিবার প্রয়োজন করে না। সমুদ্রের জল পাইতাম কিনা জানি না, পাইলেও তাহার মূল্য বুঝিতাম না, কিন্তু মনের সাধ মিটাইয়া ঢেউ খাইতাম, তাহারই আনন্দ-আঘাতে শিরা-উপশিরায় জীবনস্রোত চঞ্চল হইয়া উঠিত।'[৩২]

এইভাবে ষোলো-চোদ্দ বছরের রবীন্দ্রনাথ বাড়িতেই আত্মীয়স্বজনের মাধ্যমে সাহিত্য-শিল্প-ইতিহাস-দর্শনতত্ত্ব চর্চার শিক্ষা পেয়েছিলেন।

বাড়ির বাইরের অনেকের সঙ্গেও পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁদের অনেকেই ঠাকুরবাড়িতে যাতায়াত করতেন। এঁদের মধ্যে দুজন বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। অক্ষয় চৌধুরী ও বিহারীলাল চক্রবর্তী। অক্ষয় চৌধুরীর 'উদাসিনী' (১৮৭৪) এবং আর্যদর্শনে প্রকাশিত বিহারীলালের 'সারদা মঙ্গল' (১৮৭৯) তাঁকে বিশেষ নাড়া দিয়েছিল। অক্ষয় চৌধুরী ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহপাঠী। ইংরিজির ছাত্র অক্ষয় চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবোধ শক্তির জাগরণে বিশেষ সহায়তা করেছিলেন। 'জীবনস্মৃতি' রচনার সময়ে প্রৌঢ়ত্বে এসে অক্ষয় চৌধুরীর সাহিত্যবোধে রবীন্দ্রনাথ উদ্ভাসের রঙধারার খেলা দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু নতুন সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টিতে সে সময়ে উদ্ভাস ও উত্তেজনার কিছুটা প্রয়োজন ছিল। অক্ষয়চন্দ্র যেমন বহু ইংরিজি কবিতার ব্যাখ্যা করতেন, তর্ক-বিতর্ক তুলতেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে, তেমনি বাঙলা সাহিত্যের বৈষ্ণব কবিতা, মঙ্গলকাব্য, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, হরুঠাকুর, রামবসু, নিধুবাবু, ঈশ্বর গুপ্ত প্রভৃতির ভক্ত-অনুরাগী পাঠক ও গায়ক ছিলেন বলে অক্ষয়চন্দ্র 'সাহিত্যভোগের অকৃত্রিম উৎসাহে' রবীন্দ্রনাথকে উৎসাহিত করেন। 'জীবনস্মৃতি'র 'ভরহৃদয়' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: 'আমাদের বাল্যবয়সে সাহিত্যসমালোচনা অক্ষয় চৌধুরী মহাশয় যখন বিস্তার করিয়া ইংরিজি কাব্য আওড়াইতেন তখন সেই আবৃত্তির মধ্যে একটা তীব্র নেশার ভাব ছিল। রোমিও জুলিয়েটের প্রেমোন্মাদ, লিয়রের অক্ষয় পরিতাপের বিক্ষোভ, ওথেলোর ঈর্ষানলের প্রলয় দাবদাহ, এই সমস্তেরই মধ্যে যে একটা প্রবল অতিশয়তা আছে তাহাই তাঁহাদের মনের মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার করিত।'

বিহারীলালের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপের পর তাঁর গান চর্চা ও পত্রালোচনায় মুগ্ধ হয়েছিলেন কবি। এবং তখন থেকেই বিহারীলালের কাব্যের বিশেষ চরিত্রকে আয়ত্ত করতে চেষ্টা করলেন: 'বিহারীবাবুর মতো কাব্য লিখিব, আমার মনের আকাঙ্ক্ষাটা তখন ওই পর্যন্ত দৌড়িত।' আরও বলেছেন রবীন্দ্রনাথ 'বাল্মীকি ও কালিদাসের কবিত্বে তিনি মুগ্ধ ছিলেন।'[৮] এই দুই কবি রবীন্দ্রনাথকেও আকৃষ্ট করেছিল, বিশেষ করে কালিদাস।

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন চোদ্দ ( ১৮৭৫ ) সেই সময় হিন্দুমেলার বার্ষিক উৎসবে তিনি 'হিন্দুমেলার উপহার' নামে একটি কবিতা পড়েন। আর একটি কবিতাও ( 'প্রকৃতির খেদ' নামে ) প্রথমে 'প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় পরে 'তত্ত্ব-বোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১২৮২ সালের অগ্রহায়ণ থেকে রবীন্দ্রনাথের 'বনফুল' নামে এক কাব্য ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে থাকে 'জ্ঞানাঙ্কুরে'। এই 'জ্ঞানাঙ্কুরে' রবীন্দ্রনাথের প্রথম 'গদ্য প্রবন্ধ' বেরোয় ( ১২৮০ কার্তিক )। তা হচ্ছে সমালোচনা। তার নাম 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী'। তিনটি কবিতার বইএর সমালোচনা। এই সমালোচনার মধ্যে মনের বয়সের বিশেষ রবীন্দ্রনাথের পড়াশোনা ও অন্তর্দৃষ্টির প্রমাণ হয়ে গেছে। এই বয়সেই মহাকাব্য ও গীতিকাব্য সম্পর্কে তাঁর ধারণা অত্যন্ত স্পষ্ট। মহাকাব্য ও গীতিকবিতার অনুকূল পরিবেশ কোনটি তা তিনি বুঝেছেন এবং তাঁর ধারণা যে ঠিক তা পরবর্তী কালের বাঙলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসই তার প্রমাণ। সংস্কৃত সাহিত্য, বিশেষ করে কালিদাসের সাহিত্য, ইংরিজি সাহিত্য — শেক্সপিয়র ও ইংরিজি রোমান্টিক কাব্য, গুপ্ত-সনেট প্রভৃতি কাব্যরূপ এবং ইতিহাসের যে সব ঘটনা সাহিত্যের দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ—সে সব সম্পর্কে তিনি সচেতন। মোটকথা, যে সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের ওপর পরবর্তী রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতিষ্ঠা তার পূর্ব-সূচনা এই সমালোচনাটির মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সবচেয়ে বড় কথা সমালোচকের অন্তর্দৃষ্টিতে তৎকালীন বাঙলা কাব্যের কৃত্রিমতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। এই বয়সে এই অন্তর্দৃষ্টি সত্যিই বিস্ময়কর। যে সমস্ত কবি ও কাব্যের সঙ্গে মোটামুটি তিনি পরিচিত এবং যেগুলি আলোচনাসূত্রে এই প্রবন্ধে উল্লিখিত সেগুলির নাম করছি : বাল্মীকি, ব্যাস, হোমর, ভার্জিল, শেক্সপিয়র, মিল্টন, বায়রন, আইরিশ মেলডিজ, লালা রুখ, জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, ভারতচন্দ্র, অক্ষয়সংহার এবং তাঁর সমসাময়িক কালে প্রচলিত বাঙলা কাব্য বা 'মহাকাব্য' ( বিশেষ ক'রে হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের কাব্য )। এ ছাড়া উনিশ শতকের বাঙালী মন ও স্বভাবের মূল্য ও প্রয়োজন সম্পর্কে তিনি সচেতন।

কবির বয়স যখন ষোলো (১৮৭৭) তখনও দেখছি তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'স্বপ্নময়ী' নাটকের কবিতা ও গান লিখে দিচ্ছেন। আগে 'নবনাটক' ও 'সরোজিনী' নাটকের কথা বলেছি। কাজেই ছোটবেলা থেকেই অনেক

নাটকের সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার প্রত্যক্ষদর্শী তিনি। অনেক সময়ে নিজের সৃষ্টিও তাতে যুক্ত হয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'এমন কর্ম কর্মবো না' বা 'অলীকবাবু' নাটকে অভিনয়ও করেছেন এই সময়ে।

এই বছরই দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় 'ভারতী' প্রকাশিত হলো (জুলাই, ১৮৭৭)। অক্ষয় চৌধুরীর কাছে রবীন্দ্রনাথ টমাস চ্যাটার্টনের নাম শুনেছিলেন। তখন চ্যাটার্টনের কবিতা পড়েন নি। কিন্তু অক্ষয় চৌধুরীর কাছে শুনেছিলেন যে প্রাচীন কবিদের নকল করে ছদ্মনামে তিনি এমন কবিতা (Rowley Poems) লিখেছিলেন যে অনেকে ধরতেই পারেননি সেই নকল প্রাচীনদের। এই গল্পটি তাঁকে ভানুসিংহ ছদ্মনামে বৈষ্ণব কবিদের ঢঙে কবিতা লিখতে উদ্বুদ্ধ করে। 'ভারতী'তে তা প্রকাশিত হতে থাকে।**

ইতিমধ্যেই ঠাকুরবাড়িতে স্বাদেশিকতার হাওয়া বইছিল। এই স্বাদেশিকতার সূত্রে রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। ডি. এল. রিচার্ডসনের প্রিয় ছাত্র রাজনারায়ণের সাহচর্য ও বাঙলা সাহিত্যের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ রবীন্দ্রনাথের এই সময়ে সাহিত্যচর্চায় প্রেরণা জুগিয়েছিল।

এর পরে 'ভারতী'তে 'মেঘনাদবধ কাব্য' নাম দিয়ে মেঘনাদবধের ধারাবাহিক সমালোচনা প্রকাশ করতে থাকেন রবীন্দ্রনাথ (ভারতী, ১২৮৪, শ্রাবণ-কার্তিক, পৌষ, ফাল্গুন)। বালক বয়সে কবির পড়াশোনার দিক থেকে এই লেখাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আলোচনার ক্ষেত্রে তুলনার সূত্র ধরে হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদকে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন। বেশ বোঝা যায় মেঘনাদবধ কাব্যের সঙ্গে সঙ্গে এই অনুবাদ তিনি খুঁটিয়ে পড়েছেন। এ ছাড়া বিশ্বনাথের 'সাহিত্যদর্পণ' পড়েছেন ('এই উদাহরণটি অতিশয় সংকীর্ণ হইয়াছে; যদি সাহিত্যদর্পণকার জীবিত থাকিতেন তবে 'সোম' পরিচ্ছেদে যেখানে সর্বের সহিত কুণিতকপি-কপোলের তুলনা উদ্ধৃত হইয়াছে সেখানে এইটি প্রযুক্ত হইতে পারিত')। মিল্টন থেকে শোক সমরসের দৃশ্য তুলে মেঘনাদবধের শোকদৃশ্যের তুলনা করেছেন। এই সূত্রেই ম্যাকবেথের সামান্য অংশ অনুবাদ করেছেন, জোসেফ অ্যাডিসনের জনপ্রিয় ট্র্যাজেডি কেটো-র (Cato: 1713) সঙ্গে তুলনা করেছেন, স্টোইকদের কথা বলেছেন। মহাকাব্যের সরল প্রত্যক্ষ প্রকাশভঙ্গি— যা মেঘনাদবধে নেই বলে তিনি মনে করেছিলেন— তার প্রমাণ দিতে গিয়ে রঙ্গলালের একটি

কবিতা এবং রামায়ণ ও ইলিয়াডের কথা বলেছেন। ব্যাসের বিলাপ গ্রন্থে ইলিয়াড থেকে একিলিসের বিলাপের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের বয়স, আবার স্মরণ করা যেতে পারে, ষোলো।

এর কিছু পরেই বা এই সমালোচনা লিখবার শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথ দান্তের মহাকাব্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। সম্প্রতি বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারের প্রমথ চৌধুরী সংগ্রহ থেকে রবীন্দ্রনাথের সই করা একখানি দান্তের 'The Vision' খুঁজে পেয়েছি।[১১] প্রথম পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের সই করা আছে: শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কলিকাতা। ১৮৭৮। মনে হয়, বাংলা ১২৮৪-র শেষের দিকে অর্থাৎ ইংরিজি ১৮৭৮-এর প্রথম দিকে কলকাতায় এই বইটি রবীন্দ্রনাথ কিনেছিলেন বা সংগ্রহ করেছিলেন। এই বইএর Hell-এর বর্ণনার একপাশে মাইকেলের অষ্টম সর্গের নরক-বর্ণনা থেকে দান্তের অনুবাদ মুকেই দুটি লাইন তুলে রেখেছেন এবং দান্তের ওই লাইনগুলির নিচে পেন্সিলের তোরালো দাগ দিয়ে রেখেছেন (ছবি দ্রষ্টব্য)।

কাজেই বোঝা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ দান্তের মহাকাব্যের সঙ্গে যেমনভাবে কাব্য মিলিয়ে পড়েছেন এবং এই সময় থেকেই দান্তের কাব্যসাহিত্যের সঙ্গে গভীরতর ও ব্যাপকতর পরিচয় আরম্ভ হয়ে গেছে। এর কয়েক মাসের মধ্যে ভারতীতে (ভাদ্র, ১২৮১) 'বিদ্যাপতি, দান্তে ও তাঁহার কাব্য' নামে তাঁর প্রবন্ধ বেরিয়েছে এবং জীবন তাঁর প্রেমসম্পর্কিত 'ধারণাকে দান্তে খুব গভীর-ভাবে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন।

যাই হোক এই সময় থেকে ভারতীতে তাঁর গল্প-উপন্যাস প্রকাশিত হতে আরম্ভ করেছে এবং 'কবি কাহিনী' নামে একটি কাব্যও প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। এই সময়ে 'ভারতী'তে 'সম্পাদকীয় বৈঠক' নামে একটি বিভাগীয় রচনায় রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি ইংরিজি কবিতার অনুবাদ করেন। এই অনুবাদগুলি একদিকে যেমন তাঁর বিভিন্ন কবিদের সঙ্গে পরিচয় প্রমাণ করে, অন্যদিকে এও প্রমাণ করে যে ইংরিজি কবিতাকে বাংলায় অনুবাদ করে বাংলা কবিতার ভাষা তৈরি করছিলেন এবং সে ভাষা বিশেষভাবেই বাংলা রোমান্টিক কাব্যভাষা। ভারতীর ১২৮৪ মাঘ (১৮৭৮) সংখ্যার সম্পাদকীয় বৈঠকে বার্নসের দুটি কবিতা, মুরের দুটি কবিতা, এবং মিলের অলিক, বায়রন ও শেক্সপিয়রের একটি করে কবিতা অনুবাদ করেন। এ ছাড়া শকুন্তলা ও মুদ্রারাক্ষসের যে অংশের অনুবাদের কথা আগে

বলেছি তাও এই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ভারতীর ১২৮৪ আষাঢ় সংখ্যায় (১৮৭৮) বায়রনের দুটি ও মুরের একটি অনুবাদ পাওয়া যায়।

সত্যের বয়স যখন ছয়ই সেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে বিলাতে নিয়ে যেতে মনস্থ করলেন। এই বিদেশযাত্রার প্রস্তুতিপর্বে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে আহমেদাবাদে (আমেদাবাদ) কর্মস্থলে নিয়ে গেলেন। সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা তখন ইংলণ্ডে। নির্জন বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী হলো সত্যেন্দ্রনাথের লাইব্রেরী। ইংরিজিতে কাঁচা ছিলেন বলে 'সমস্ত দিন ডিক্‌শ্‌নারি লইয়া নানা ইংরেজি বই' পড়তে লাগলেন। জীবনস্মৃতিতে বলছেন: 'অল্পস্বল্প যাহা বুঝিতাম তাহা লইয়া আপনার মনে একটা কিছু খাড়া করিয়া আমার বেশ একরকম চলিয়া যাইত।'[১১] এই সময়কার পড়াশোনার খবর দিতে গিয়ে জীবনস্মৃতিতে দুটি বইয়ের উল্লেখ করেছেন।[১২] একটি টেনিসনের কাব্যগ্রন্থ। জীবনস্মৃতিতে বলছেন: 'সেই গ্রন্থটি আমার পক্ষে তখন এই রাজপ্রাসাদের মতোই নীরব ছিল। আমি কেবল তাহার ছবিগুলির মধ্যে বারবার করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতাম। কাব্যগুলি যে একেবারেই বুঝিতাম না তাহা নহে, কিন্তু তাহা বাক্যের অপেক্ষা আমার পক্ষে অনেকটা কুসুমের মতোই ছিল।' আর একটি বই হেবলিন-সংকলিত শ্রীরামপুরে ছাপা সংস্কৃত 'কাব্যসংগ্রহঃ' (১৮৪১)। এই বইটি রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে।[১৩] এই বইএর 'কাব্যসংগ্রহস্যানুক্রমণিকা'তে সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন কাব্য থেকে নির্বাচিত অংশ সংকলন করা হয়েছে। নবরত্নম্, শৃঙ্গারতিলকম্, মেঘদূতম্, ঋতুসংহারঃ, গীতগোবিন্দম্, বিদগ্ধমুখমণ্ডনম্, চাণক্যশতকম্, উদ্ধবদূতঃ, হংসদূতঃ, পদাঙ্কদূতঃ বৃত্তরত্নমালা ইত্যাদি থেকে সংকলন করা হয়েছে।

জীবনস্মৃতির পাণ্ডুলিপিতে এই সময়কার পড়াশোনার আরও কিছু তথ্য পাওয়া যায়। ডিক্‌শ্‌নারি নিয়ে যে নানা বই পড়তেন বলে জীবনস্মৃতিতে উল্লেখ করেছেন সেই সূত্রেই পাণ্ডুলিপিতে লিখেছেন:[১৪]

'ইংরাজিতে আমি যে নিতান্তই কাঁচা ছিলাম বিলাত যাইবার পূর্বে সেটা আমার একটা বিশেষ ভাবনার বিষয় হইল। সেজদাদাকে বলিলাম, 'আমি ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাস বাংলায় লিখিব, আমাকে বই আনিয়া দিন।' তিনি আমার সম্মুখে টেন প্রভৃতি গ্রন্থকার রচিত ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস সংক্রান্ত রাশি রাশি গ্রন্থ উপস্থিত করিলেন। আমি তাহার দুরূহতা বিচার না করিয়া অভিমান খুলিয়া পড়িতে বসিয়া গেলাম। সেই সঙ্গে আমার

লেখাও চলিতে লাগিল। এমন কি আংলো-স্যাকসন ও আংলো-বর্মান সাহিত্য-সম্বন্ধীয় আমার সেই প্রবন্ধগুলাও ভারতীতে বাহির হইয়াছিল। এইরূপ লেখার উপলক্ষ্যে আদি সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মেজদাদার কাছারি হইতে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত একার চেষ্টায় ইংরাজি গ্রন্থের অর্থসংগ্রহ করিয়াছি।'

এই পড়াশোনার ফলস্বরূপই সেই বয়সে ও পরের বয়সে (১২৮৫-১২৮৬) ভারতীতে প্রকাশিত হয় নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি। প্রবন্ধগুলির বিষয় দেখলে বোঝা যাবে বিদেশী সমাজ, সাহিত্য ও সাহিত্যিকের জীবন তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে:

ইংরেজদিগের আদবকায়দা (ভারতী বৈশাখ ১২৮৫)
স্যাকসন জাতি ও আংলো স্যাকসন সাহিত্য (ভারতী শ্রাবণ ১২৮৫)
বিদ্যাপতি, গীতে ও তাঁহার কাব্য (ভারতী ভাদ্র ১২৮৫)
শিক্ষার্থী ও লয়া (ভারতী আশ্বিন ১২৮৫)
সেক্সপিয়র ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ (ভারতী কার্তিক ১২৮৫)
বর্মান জাতি ও আংলো বর্মান সাহিত্য (ভারতী ফাল্গুন ১২৮৫, বৈশাখ ১২৮৬)।

বিদেশী সাহিত্য ছাড়া সত্যেন্দ্রনাথের কাছে থাকতে ফুকারামের অনেক মারাঠী ভাষা থেকে অনুবাদ করেন রবীন্দ্রনাথ। হয় এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছিলেন, না হলে কোন ইংরিজি অনুবাদ থেকে তিনি এগুলি বাঙলায় অনুবাদ করেন।[৩৪] সত্যেন্দ্রনাথ মারাঠী সাধু ও কবি ফুকারামের জীবনী আলোচনা করেন ভারতীতে (১২৮৫)। তাতে তাঁর নিজের অনুবাদও কিছু ছিল। পরে ১৩১৩ সালে 'নবরত্নমালা' গ্রন্থে এগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়। খাতাটি অনেক ছাড়া আরও আটটি অভঙ্গের অনুবাদ রবীন্দ্রনাথের নিজের হস্তাক্ষরে পাওয়া গেছে।

এইখানে অর্থাৎ প্রথম বিলাত যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত (১৮৭৮) পড়াশোনার মোটা-মুটি বিবরণ শেষ হলো। এই বিবরণে রবীন্দ্রনাথের কিশোর বয়সের প্রস্তুতি-পর্বের যে পরিচয় আমরা পাই তার থেকে এইটুকু বুঝতে পারি যে, সাধারণ ছাত্রদের তুলনায় তাঁর পড়াশোনা শাসনে বা স্বাধীনভাবে কিছু কম হয় নি। বরং বৈচিত্র্যে ও ব্যাপকতায় কিছুটা অসাধারণই বলবো। অসাধারণ আরও এই জন্যে যে, বই পড়ে বা অভিজ্ঞতা থেকে বা পরিবেশ থেকে আমরা যে ভাবে শিখে উঠি রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও এই তিনটি সুযোগই ছিল, কিন্তু এত প্রচুর ও

বিচিত্র বই, এত রকম মানুষের আনাগোনা এবং এত প্রতিভাধর ও দ্রষ্টাদের সঙ্গ সাধারণত পাওয়া যায় না। ছোটবেলা থেকেই অনেক কিছু তাঁকে পড়া শোনা করে নেতে হয় নি, পেয়েছেন দেখে শুনে। আবহাওয়াটি তাঁকে অনেকখানি করে দিয়েছিল অভিজ্ঞ ও পরিণত।

টীকা

(১) 'শিক্ষারম্ভ' অধ্যায় : জীবনস্মৃতি।

(২) অধ্যায় ৮, ছেলেবেলা।

(৩) 'শিক্ষারম্ভ' অধ্যায় : জীবনস্মৃতি।

(৪) " "

(৫) 'ছাত্রসভকতা' অধ্যায় " ।

(৬) 'বর্ষামঙ্গল' অধ্যায় " ।

(৭) 'কবিতা-রচনারম্ভ' অধ্যায় " ।

(৮) 'নানা বিদ্যার আয়োজন' অধ্যায় " ।

(৯) " "

(১০) " "

(১১) " "

(১২) 'পিতৃদেব' অধ্যায় " ।

(১৩) বোলপুরে থাকতে নীল খাতা ও পেন্সিল ভায়ারি যেমন কবিতার জন্যে উঁচুতো অন্যদিকে পিতৃদেবের ভগবদ্‌ভক্তিতায় ধারণা অনুযায়ী সংস্কৃত নির্বাচিত কয়েকটি শ্লোক কপি করতে হতো। 'হিমালয় যাত্রা' অধ্যায় : জীবনস্মৃতি দ্রষ্টব্য।

(১৪) বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে Peter Parley's Tales শিরোনামের বহু পুরোনো বাঁধানো এবং জীর্ণ বইগুলি আছে। কোনো সন্দেহ নেই এইগুলিই মহর্ষির ব্যবহার করা। বইগুলির নাম ও প্রকাশকাল ( উল্লেখ সব জায়গায় নেই, প্রথম দিকের কয়েক পাতা অনেকগুলি বইএর নেই ) দিয়ে দিচ্ছি :

(ক) Tales About England, Scotland, Ireland and Wales, Illustrated : London, William Tegg

(খ) Tales About Plants, Printed for Thomas Tegg, Cheapside, 1839

(গ) Tales about the United States of America, London : William Tegg, 1868

(ঘ) Universal History on the basis of Geography. London. William Tegg

(ঙ) Tales About the Sea : London. W.T. 1863

(চ) A Grammar of Modern Geography : London. W. T. 1865

(ছ) Tales About Christmas—প্রথম পাতা নেই। তারিখ ?

(১৪) দ্বিতীয়বারের প্রবাসকালে Richard A. Proctor-এর Familiar Science Studies : London ( Chatto & Windus, Piccadilly, 1881 ) বইটি। এটিও রবীন্দ্রনাথেরই বই বলে মনে হয়। এই বইয়ের আখ্যাপত্রের বাঁদিকের পৃষ্ঠায় Proctor-এর অন্যান্য বইগুলির নাম দেওয়া আছে। তার মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বই হচ্ছে এইগুলি : (ক) Flowers of the Sky (খ) Easy Star Lessons (গ) Myths and Marvels of Astronomy (ঘ) Our Place Among Infinities (ঙ) The Expanse of Heaven (চ) The Poetry of Astronomy ইত্যাদি। শেষ বইটির নাম বা পৃষ্ঠায় নেই। লেখকের নামের তলায় 'author of—' বলে দেওয়া আছে। মনে হয় এই বইগুলির মধ্যে কোনটি রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'সরলপাঠ্য' কোনো ইংরিজি গ্রন্থ। Easy Star Lessons বইটির সূচিপত্রেই কি 'সরল পাঠ্য' লিখেছেন ?

(১৫) 'হিমালয় যাত্রা' অধ্যায় : জীবনস্মৃতি। ১২ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

(১৬) " " "

(১৭) ছেলেবেলা ( প্রথম সংস্করণ, ১৩৪৭ ) পৃ ৪৪। ৮ সংখ্যক অধ্যায়।

(১৮) 'প্রত্যাবর্তন' অধ্যায় : জীবনস্মৃতি : ১ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

(১৯) " " " " "

(২০) 'ঘরের পড়া' অধ্যায় : জীবনস্মৃতি।

(২১) এ ব্যাপারে রবীন্দ্রজিজ্ঞাসা ( ১৩৬৪ ) প্রথম খণ্ডের মধ্যে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা : কালানুক্রমিক সূচী' দ্রষ্টব্য।

(২২) 'ঘরের পড়া' অধ্যায়ের পাণ্ডুলিপি থেকে উদ্ধৃত। প্রথমপরিচয় : জীবনস্মৃতি।

(২৩) ঐ ।

(২৪) 'সাহিত্যের সঙ্গী' অধ্যায় : জীবনস্মৃতি।

(২৫) খাসিয়া-পুঁথি : পাণ্ডুলিপি পরিচয় : শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন : রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা, প্রথম খণ্ড, পৃ ১০৮-১০৯।

29-1087

(২৭) রবীন্দ্রনাথের ব্যবহার-করা একটি বহির Irish Melodies রবীন্দ্র-সদনে রক্ষিত আছে। Irish Melodies | Illustrated by D. Macline, R. A. | London | Printed for Longman, Brown, Green and Longmans | Paternoster Row | 1847. প্রথম পাতায় এক সাহেবের নাম সই করা আছে: James Wiser। মনে হয় তিনি ঠাকুরবাড়ীর কাউকে বইটি দিয়েছিলেন।

(২৮) 'স্বদেশ পড়া' অধ্যায়: জীবনস্মৃতি।

(২৯) " " : পাণ্ডুলিপি। প্রথমপরিচয়: জীবনস্মৃতি।

(৩০) 'বাড়ীর আবহাওয়া' অধ্যায়: জীবনস্মৃতি।

(৩১) " "।

(৩২) 'সাহিত্যের সঙ্গী' অধ্যায় "।

(৩৩) ভারতীর প্রথম বর্ষ থেকেই (১২৮৪) প্রায় বারোমাসিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে ভানুসিংহের কবিতাগুলি 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' নামে।

(৩৪) বইটির নামপত্র এই রকম:

The Chandos Classics/The Vision/or/Hell, Purgatory and Paradise/of/Dante Alighieri/Translated by/Rev. H. F. Cary A. M./London: /Fredrick Warne and Co./Bedford street, Strand/ New York: Scribner, Welford and Armstrong.

বইটির প্রকাশের তারিখ দেওয়া নেই। অনুবাদকের ভূমিকা রচনার তারিখ 'January, 1814।' বইটি প্রথম চৌধুরীকে দিয়ে দিয়েছিলেন বলেই তাঁর সংগ্রহে রক্ষিত হয়েছে।

(৩৫) 'আমেদাবাদ' অধ্যায়: জীবনস্মৃতি।

(৩৬) " "

(৩৭) এই বইটি বাঁধানো পাওয়া গেছে। পাতাগুলি জীর্ণ। নামপত্রে আছে: কাব্যসংগ্রহঃ। অর্থাৎ কালিদাসাদিমহাকবিরচিতশ্লোকাঃ। বিরচিতশ্লোকাশ্চ। উপমাসম্পূর্ণকাব্যানি। শ্রী ভাকুভয় যোহন হেবর লিন কর্তৃক। সমাহৃতমুদ্রাঙ্কিতানি। শ্রীরামপুরীয় চন্দ্রোদয়যন্ত্রে। ১৮৩১।

(৩৮) প্রথমপরিচয়: জীবনস্মৃতি: 'আমেদাবাদ' অধ্যায়ের পাণ্ডুলিপি।

(৩৯) 'ভাণ্ডার' ২৯ বৈশাখ, ১৩১২) অনুবাদ সংকলনে এগুলি স্থান পেয়েছে।

[এই প্রবন্ধ রচনায় রবীন্দ্রসদনের শ্রী শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীচিত্তরঞ্জন দেবের সাহায্য পেয়েছি। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।]

# মাত্রাবৃত্তের বিবর্তন

নীলরতন সেন

[ ভূমিকা : প্রবীণ ছান্দসিক শ্রীঅমোঘচন্দ্র সেনের নবীনমতিক পরিভাষার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় আছে তাঁদের এ-প্রবন্ধ পাঠে অসুবিধা হবে না। তাঁরা সে পরিভাষার সঙ্গে পরিচিত নন তাঁদের অস্তি নিবেদন, এ-প্রবন্ধে syllable বোঝাতে ছন্দ, closed-syllable = বন্ধছন্দ এবং open syllable = মুক্তছন্দ নামে বোঝানো হয়েছে। যেমন 'দুখ' শব্দে 'দ' এবং 'খ' দুটি বন্ধ আছে।— প্রথমটি বন্ধছন্দ, দ্বিতীয়টি মুক্তছন্দ। মাত্রাবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত এবং স্বরবৃত্ত নাম তিনটির পরিবর্তে যথাক্রমে কলাবৃত্ত, মিশ্র কলাবৃত্ত এবং কলাবৃত্ত নাম তিনটির ব্যবহারই শ্রেয়। তবু পাঠকের সুবিধার্থে পূর্বনামগুলিই এ-প্রবন্ধে রাখা হল। ]

মাত্রাবৃত্ত বা সরল কলামাত্রিক রীতির ছন্দ আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথের হাতেই উচ্চারণগত সুনির্দিষ্টতা লাভ করেছে। এ ছন্দের আধুনিক উচ্চারণ-রীতি হল : **প্রত্যেকটি মুক্তদল** ( open syllable ) **এক কলামাত্রা** ( time unit ), **এবং প্রত্যেকটি বন্ধদল** (closed syllable) **দুই কলামাত্রা** হিসাবে উচ্চারিত হয়। এই উচ্চারণরীতি যে দীর্ঘ বিবর্তনধারায় আধুনিক রূপ লাভ করেছে এখানে সংক্ষেপে তারই পরিচয় নেওয়া যেতে পারে।

**চারমাত্রার ছন্দ :** জয়দেবের গীতগোবিন্দে একটি সুপরিচিত ছন্দবন্ধ রয়েছে, আট আট-বারো মাত্রার ত্রিপদী। —

পততি পতত্রে । বিচলিত পত্রে । শঙ্কিত ভবদুপযানং । I

রচয়তি শয়নং । সচকিত নয়নং । পশ্যতি তব পন্থানং । I

মুখরমধীরং । ত্যজ মঞ্জীরং । রিপুরিব কেলিষু লোলং । I

চলসি যদি কান্তং । সৃজ অভিসারং । মমিব কুরু নিচোলং । I[১]

[ গীতগোবিন্দ : গীত ১১ ]

---

১। গীতগোবিন্দের গানগুলির যা প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা পদগুলির যে ছন্দের কথা আমরা এখানে উল্লেখ করছি তাকে সংগীতের সুরারোপিত তাল মাত্রা থেকে পৃথক পঠিত পদের ছন্দস্পন্দ ও যতিভাগ হিসাবে গণ্য করতে হবে।

[ পদের পাশে । এবং ।। চিহ্নদ্বারা যথাক্রমে পদযতি বা অর্ধযতি (medial pause) এবং পূর্ণযতি (full pause) বোঝানো গেল। পদের উপরে — চিহ্ন দিয়ে বিকলমাত্রিক গুরুদল বোঝানো হল। কোনও চিহ্নবিহীন দলগুলিকে লঘু এক কলামাত্রিক রূপে গণ্য করতে হবে। তাহলেই ৮-৮-১২ মাত্রাভাগের ত্রিপদীর উচ্চারণ পরিস্ফুট হবে। ]

সংস্কৃত মাত্রাবৃত্ত বা বৃত্তছন্দ থেকে জয়দেবী মাত্রাবৃত্তের পার্থক্য রয়েছে। বৃত্তছন্দে লঘুগুরু দলবিন্যাসের ক্রম সুনির্দিষ্ট থাকে। মাত্রাছন্দে এতটা বাঁধাবাঁধি না থাকলেও কোন গণ নির্দিষ্ট বা কোথায় পদভাগে একটি গুরুদল সুনির্দিষ্ট স্থানে বসবে,— এমন সব দলবিন্যাসগত বিধিনিষেধ রয়েছে। যেমন ধরা যাক, ৮-৭-১৪ মাত্রার যতিভাগে লিখিত বৃত্তিমূলক মন্দাক্রান্তা ছন্দের লঘুগুরু দল-বিন্যাসক্রম :—

কশ্চিৎ কান্তা । বিরহগুরুণা । স্বাধিকারপ্রমত্তঃ ।
শাপেনাস্তং । গমিতমহিমা । বর্ষভোগ্যেণ ভর্তুঃ ।। (মেঘদূত : ১শ্লোক)

এখানে দলবিন্যাসের ক্রম হল : প্রথম পরপর চারটি গুরুদলে আট মাত্রার যতি, তারপর যথাক্রমে পাঁচটি লঘু ও একটি গুরুদলে সাত মাত্রার যতি, তারপর যথাক্রমে গুরু-লঘু-গুরু-গুরু-লঘু-গুরু-গুরু দলবিন্যাসে বারোমাত্রার পূর্ণযতি। সমস্ত মন্দাক্রান্তা শ্লোকই এই লঘুগুরু দলবিন্যাসক্রমে লিখিত হবে।

আর্যার সংস্কৃত মাত্রাছন্দ আর্যার ( এও অনেকটা ত্রিপদী ভাগের ছন্দ ) নিয়ম হল : ত্রিশমাত্রা করে দুই পংক্তিতে শ্লোক পূর্ণ হবে। পংক্তিতে চতুর্মাত্রার সাতটি গণে আঠাশ মাত্রা, তারপর শুরু একটি দলে দুমাত্রা,— মোট ত্রিশমাত্রা। কিন্তু সেখানেও নিয়ম বাঁধা : প্রথম পংক্তিতে জ-গণ অর্থাৎ লঘু-গুরু-লঘু যা ন এবং ল-গণ অর্থাৎ লঘু-লঘু-লঘু লঘু এমন দলবিন্যাসের গণ থাকবে না। দ্বিতীয় পংক্তিতে আবার ষষ্ঠ গণটি জ-গণ বা নল-গণেই রচিত হওয়া চাই। পথ্যা, বিপুলা, চপলা ইত্যাদি সংস্কৃত মাত্রাবৃত্ত ছন্দেও এমন সব বিধিনিষেধ আছে। জয়দেব সংস্কৃত ভাষায় কাব্য লিখতে গিয়ে গুরু উচ্চারণকে দুইমাত্রা এবং লঘু উচ্চারণকে একমাত্রা ঠিকই গণ্য করেছেন। তবে লঘু-গুরু দলবিন্যাসের নির্দিষ্ট ক্রম তুলে দিয়ে নতুন মাত্রাবৃত্তের সার্থক পরীক্ষা করেছেন। গীতগোবিন্দের চব্বিশটি গীতের মধ্যে বাইশটি গীতেই লঘুগুরু দলবিন্যাসক্রম রাখেন নি, মাত্র দুটি গীতে ( ১, ১০ নং ) মেনেছেন। সংস্কৃত, এমন কি প্রাকৃত ছন্দেরও দলবিন্যাসগত সুনির্দিষ্ট বাঁধাবাঁধির শৃঙ্খল ভেঙে এখানেই জয়দেবের হাতে পরবর্তী

বাংলা পদ্যে মাত্রাবৃত্তের প্রথম আদর্শ দেখা দিল বলা যেতে পারে। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার জয়দেবের ভাষাকে 'সংস্কৃতায়িত বাংলা' বলে অভিহিত করেছেন, —বাইশটি গীতের ছন্দ সম্পর্কেও এই বিশেষণ প্রযুক্ত হতে পারে।

আট আট-বারো মাত্রার তালে এমন ত্রিপদী জয়দেব দশটি গীতে ব্যবহার করেছেন। তাছাড়া একটি গীতে শেষে একমাত্রা কমিয়ে ৮-৮-১১ মাত্রা রেখেছেন, অপর একটি গীতে শেষে একমাত্রা বাড়িয়ে ৮-৮-১৩ মাত্রা রেখেছেন। এই পদতালের মধ্যেও চারমাত্রার যতিস্পন্দন রয়েছে। জয়দেব যথাসম্ভব প্রতি চতুর্মাত্রা তালের সূচনায় শুরু দল দিয়ে এই স্পন্দন স্পষ্টতর করেছেন। এখানেও সংস্কৃত ছন্দ থেকে তাঁর স্বাতন্ত্র্য এবং পরবর্তী পদাবলী গানের চতুর্মাত্রা স্পন্দনের মাত্রাবৃত্তের সঙ্গে তার মিল দেখি।

সর্বপ্রাচীন বাংলা পদ্যের নিদর্শন চর্যাপদে এই ৮-৮-১২ মাত্রার ত্রিপদীবন্ধের আভাস লক্ষিত হয়।—

তিন ভাঙ্গ পাণী। পড়িলা সবরো। মহাসুহে সেজি ছাইলী।।

সবরো ভুজঙ্গ। নইরামণি দারী। পেম্ম রাতি পোহাইলী। ।। [চর্যাপদ ২৮নং]

ভাষাবিদদের মতে এসব জয়দেবের অন্তত শতাব্দীকাল পূর্বেই রচিত হয়েছে। কিন্তু লক্ষ করবার বিষয়, সংস্কৃত শুরু মুক্তদল (long open syllable) অর্থাৎ আ, ঈ, ঊ, এ, ও— বর্ণগুলি সর্বত্র দ্বিমাত্রিক হিসাবে উচ্চারিত হয়নি। শুরু উচ্চারণের ক্ষেত্রে এখানেও দলের উপরে '—' চিহ্ন দেওয়া গেল। বাকী অচিহ্নিত দলগুলি লঘু একমাত্রিক। এ ছন্দে সংস্কৃত বা প্রাকৃত উচ্চারণ থেকে পৃথক বাংলা উচ্চারণ প্রভাবিত মাত্রাবৃত্তেরই প্রাথমিক রূপ পাওয়া যাচ্ছে।

বিদ্যাপতির পদেও এই চতুর্মাত্রা স্পন্দনের ৮-৮-১২ মাত্রাতালের ত্রিপদীই প্রাধান্য। একটি উদাহরণ তুলছি।—

সখি অবলম্বনে। চলবি নিতাম্বিনি। পহুমি পহুপতীপে। ।

জব হরি কর ধরি। কোরবই সাওব। আছয়ে তোহারবি পীপে। ।

[বিদ্যাপতি : বিশ্বভারতী সং : ৬৬৭ নং পদ]

সংস্কৃত বৃত্তজাতীয় একাধিক ছন্দে বা মাত্রাবীতির আর্যাছন্দে ত্রিপদীবন্ধের আদর্শ রয়েছে। প্রাকৃত 'চউপাইআ' ছন্দও ১০-৮-১২ মাত্রাতালের ত্রিপদী।

চর্যাপদের কবিরা এইসব আদর্শ থেকেই বাংলা ত্রিপদীর উদ্ভাবন করেছিলেন মনে হয়। বিদ্যাপতি অবশ্য জয়দেবকেই অনুসরণ করেছেন, চতুর্মাত্রা পর্বন ভাগের সূচনায় গুরুধ্বনি প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য থেকেই তা বলা যায়। তবে জয়দেব যেখানে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করেছেন, বিদ্যাপতি সেখানে দেশভাষা ব্যবহার করেছেন এবং সেই কারণেই দেশভাষার লঘু উচ্চারণ আদর্শে গুরু স্বর (আ, ঈ, ঊ, ও, এ) প্রয়োজনমতো লঘু এককলাবাচক রূপে প্রয়োগ করেছেন।

মধ্যযুগে এই ৮-৮-১২ মাত্রাভাগের ত্রিপদীরূপ যে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তার নিদর্শন রয়েছে। তবে উচ্চারণভঙ্গিতে অক্ষরবৃত্তের সংশ্লিষ্টতা এসেছে। চৈতন্য-পরবর্তী পদাবলী গানে জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রমুখ কবিরা অক্ষরবৃত্ত (সম্ভবত চৈতন্য-পূর্ব যুগে চণ্ডীদাস কবির প্রভাবে) এবং মাত্রাবৃত্ত (জয়দেব ও বিদ্যাপতির প্রভাবে) উভয় রীতিতেই এই ছন্দোরূপের ব্যবহার করেছেন। চৈতন্য-পরবর্তী কবির রচিত মাত্রাবৃত্ত ত্রিপদীর (৮-৮-১২) একটি নিদর্শন এখানে উদ্ধৃত করি।—

অঞ্জন গঞ্জন  জগজন রঞ্জন
জলদপুঞ্জ জিনি বরণা।
তড়পারুণ খল  কমলদলারুণ
যজ্ঞিয় রঞ্জিত চরণা।

[ বৈ. প. সংকল সং : গোবিন্দদাস ১১৪নং পদ ]

পদাবলীতে এবং এই যুগের অন্যান্য আখ্যানধর্মী কাব্যে এই ৮-৮-১২ মাত্রার ত্রিপদীর দুটক মাত্রা কমবেশী করে ৮ ৮ ১০ মাত্রার ত্রিপদী বা ৮-৮-৮-৬ মাত্রার চৌপদীরূপও রচিত হয়েছে। কমবেশী আরও নানা রূপভেদের পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। তবে সেটা অক্ষরবৃত্ত রীতিতেই বেশী। ধরতে পদাবলী গান বাদীত সমগ্র ষোড়শ-সপ্তদশ-অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকে মাত্রাবৃত্ত উচ্চারণরীতি বাংলাপদ্যে এক রকম অচলিত হয়ে পড়েছিল। কবিরা ছন্দের কোমলধ্বনি প্রকাশের উদ্দেশ্যে তখন ধ্বনিগুরু যুক্তাক্ষরহীন শব্দ ব্যবহার করতেন। আর যাঁরা লঘুগুরু উচ্চারণের পক্ষপাতি ছিলেন তাঁরা সংস্কৃত বৃত্ত বা মাত্রাছন্দের বিভিন্ন রূপাদর্শ (pattern) বাংলায় আমদানীর পরীক্ষা করতেন। রবীন্দ্রনাথ কৈশোর জীবনে

ব্রজবুলির কৃত্রিম আদর্শে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী লিখলেন। সেখানে পদাবলীর লঘুগুরু উচ্চারণ আদর্শে ৮-৮-১২/১০ মাত্রাভাগের ত্রিপদীই বেশী ব্যবহার করেছেন। একটি উদাহরণ তুলছি।—

সতিমির রজনী সচকিত সজনী
শুতনিকুঞ্জে অরণা।
কলয়িত মলয়ে সুবিজন হিলয়ে
বালা বিরহ বিষণ্ণ।

[ ভা. ঠা. প. ৯নং পদ ]

এখানে জয়দেবের আদর্শই কবি অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন মনে হয়। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট বুঝতে পারলেন যে মাত্রাবৃত্তের আধুনিক রূপ দিতে হলে অ, ই, উ, এ, ও— এই সংস্কৃত গুরুস্বরগুলি বাংলা উচ্চারণে আর গুরু নেই। সুতরাং এগুলিকে অন্যান্য লঘুস্বরের মতো বাংলাতে লঘু একমাত্রিক বলেই গণ্য করতে হবে। কেবলমাত্র যুক্তবর্ণকে ( সংস্কৃত ছান্দসিকদের ভাষায় যুক্তাক্ষরের পূর্বস্বরকে ) দ্বিমাত্রিক গণ্য করতে হবে। তবেই আধুনিক বাংলা উচ্চারণের মাত্রাবৃত্তের আদর্শ পাওয়া যাবে। এবারে জয়দেবের ও বৈষ্ণব পদকারদের আদর্শে বিভিন্ন ছন্দবদ্ধ রচনায় এই নতুন মাত্রাবৃত্ত উচ্চারণরীতি প্রয়োগ করলেন তিনি। তবে ৮-৮ ১২ বা ৮-৮-১০/১১ মাত্রাভাগের মাত্রাবৃত্ত ত্রিপদী রচনায়,— বিশেষ করে এমন ছন্দবদ্ধে যুক্তাক্ষর ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য বাঙালী কবিরা আদৌ উৎসাহ দেখাননি। তার প্রধান কারণ মনে হয়, এত দীর্ঘ ঐতিহ্যে মাত্রাবৃত্তের বিশিষ্ট উচ্চারণ বাংলাভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণবিরোধী। আর চতুর্মাত্রিক লঘু ঐতিহ্যে ছন্দ যে চটুল নৃত্যভঙ্গি লাভ করে তাতে হাল্কা কবিতা নেয়া যায়, ভাবগভীর কবিতার বাহন হবার পক্ষে সে অনুপযুক্ত। তবু দু-একটি প্রখ্যাত ভাবগভীর কবিতায় কবি এ ছন্দের কেমন ব্যবহার করেছেন দেখা যেতে পারে।—

শ্রাবণ গগন ঘিরে
ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে.

শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি—
যা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।

( সোনার তরী : সোনার তরী )

সমগ্র কবিতাটিতে একমাত্র এই 'পূর্ণ' কথাটিতে যুক্তাক্ষর ব্যবহৃত হয়েছে। 'চিত্রা'কাব্যে 'বিশ্বদেব' নামে ৮-৮-১১ মাত্রাভাগের যে কবিতাটি রয়েছে সেখানে একটিও এমন যুক্তাক্ষর রাখেননি। এ যুগের অন্যান্য কবিদের সম্পর্কেও এই একই কথা বলতে হয়।

উপরের উদাহরণটিতে কবি ৮-৮-১৩ (বা ৮-৮-৮-৫) মাত্রার পংক্তির সঙ্গে ৮-৫ মাত্রাভাগের একটি বিপদী পংক্তি মিশিয়েছেন। এই বিপদীবন্ধের প্রাথমিক রূপ জয়দেবের গীতগোবিন্দে রয়েছে।—

মঞ্জুতরকুঞ্জগতি । বিরচিত শয়নং ।

সঞ্চরদধরসুধরসি । মুখরিত মদনং । [ গীতগোবিন্দ : গীত ৯ ]

এর পর্বভাগ ৪, ৪ । ৪, ৪ I, অর্থাৎ ৮ । ৮ । মাত্রাভাগের বিপদী। ৮ । ৬ I মাত্রাভাগের ছন্দও জয়দেব ব্যবহার করেছেন। যেমন,—

অনিল তরল কুবলয় নয়নেন ।

তনুতি ন তা কিল । নয় নয়নেন । [ গীতগোবিন্দ : গীত ১৬ ]

এই ছন্দবন্ধ অত্যন্ত প্রাচীন মনে হয়। সংস্কৃত শ্লোকের ( লঘু লঘু-গুরু গণবিন্যাসের চার গণ, ষোল মাত্রার ছন্দ), বা প্রাকৃত 'পাদাকুলকে'র ( লঘু-গুরু ক্রমবিহীন ষোলমাত্রা পংক্তির ছন্দ ) সঙ্গে এ ছন্দের অনেকটা মিল রয়েছে। সংস্কৃত 'মোটক', প্রাকৃত 'পজ্ঝটিকা', অভিন্না' প্রভৃতি ছন্দবন্ধের কথাও মনে আসে। চর্যাপদে এই চতুর্মাত্রা পর্বের বিপদীভাগের ছন্দই প্রধানতম ছন্দবন্ধ বলা চলে। প্রায় সাতে ছেচল্লিশটি পদের মধ্যে চল্লিশটি পদেই বিপদীবন্ধ ব্যবহৃত হয়েছে। সেখানে ষোল- পর্বের এবং চোদ্দ মাত্রার বিপদী নিদর্শন হয়েছে।

ষোলমাত্রা : আপণে রচি রচি । ভবনির্বাণা I

মিছে লোঅ ব । ভা ম ও অপনা । I [ চর্যাপদ : ২২ নং ]

পনের মাত্রা : আলি এঁ কালি এঁ । বাট জহোলা I

তা মেখি কাহ্ন । বিমন ভইলা । I [ চর্যাপদ : ৭নং ]

চৌদ্দ মাত্রা : ভইসে হেরুক। ণ পাবি অই।

সাস্তি ভণই কিণ। ণ ভাবি অই। ।  [ চর্যাপদ : ২৬ সং ]

চর্যাপদে মুখ্যত ৮, ৬। ৪, ৬ ।  মাত্রাভাগের দ্বিপদীরই প্রাধান্য। কদাচিত মাঝে মাঝে পংক্তির দ্বিতীয় পদে এক বা দুইমাত্রা কম রেখে কবি পরবর্তী কালের চতুর্দশমাত্রিক পয়ার ছন্দের আভাস এনেছেন।

বিদ্যাপতিও ষোলমাত্রার দ্বিপদীবন্ধের ব্যবহার বেশী করেছেন। তবে পনের বা চোদ্দ মাত্রার দ্বিপদী আদর্শও তাঁর পদে অপেক্ষাকৃত স্পষ্টরূপে পাওয়া যায়।—

ষোলমাত্রা :  বিমল কমলমুখি। ন করিয় মানে। ।

পাওত যদন দুর ॥ চাদ সমানে ॥ ।

[ বিদ্যাপতি : ন. গু. সং : ৪১৫ নং পদ ]

পনের মাত্রা :  কিছু কিছু উগপতি। অঙ্কুর ভেল। ।

চরণ চপল গতি। লোচন লেল। ।

[ বিদ্যাপতি : ন. গু. সং : ৬নং পদ ]

চোদ্দ মাত্রা :  দুহকর দুহমতি। কহলদ তোয়। ।

বিদ্ধ হুবে সুখক। হহ নহি যোয়। ।

[ ঐ : ১৩৭ নং পদ ]

আরও পরবর্তী কবিদের পদাবলীতে চোদ্দ মাত্রার পংক্তির দৃষ্টান্ত অপেক্ষাকৃত বেশী পাওয়া যায়। চণ্ডীদাসের পদাবলীতে বা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এবং মধ্যযুগের কাহিনীধর্মী আখ্যায়িকা কাব্যগুলিতে ( রামায়ণ, ভাগবত, মঙ্গলকাব্য, চৈতন্যজীবনী কাব্য ইত্যাদি ) এই চতুর্দশমাত্রিক পংক্তিযুগের দ্বিপদী অপেক্ষাকৃত সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে অক্ষুণ্ণভাবে রীতিতে ব্যবহৃত হয়েছে। মাত্রাবৃত্তে এই দ্বিপদীবন্ধের ব্যবহার সে তুলনায় অনেক কম হয়েছে। আধুনিক যুগে নতুন উচ্চারণের মাত্রাবৃত্তের প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ষোল, পনের এবং চোদ্দ মাত্রা— তিন মাপেরই দ্বিপদী পংক্তির ব্যবহার

হয়েছে। তবে অপেক্ষাকৃত কম,— এবং অধিকাংশ লঘুতালের কবিতায়। তিনটি উদাহরণ দিচ্ছি।—

ষোল মাত্রা : কাঁচকাপাড়াতে এক । ছিল রাজপুত্তুর,
রাজকন্যারে লিখে । পাঠায় সে উত্তর।
[ খাপছাড়া : ৯নং ]

পনের মাত্রা : পাঠশালে যাই তোলে । মতিলাল নন্দী ।
বলে, 'পাঠ এগোয়না । বত্ত কেন বলদি।' [ ঐ : ৩নং ]

চোদ্দ মাত্রা : নিয়ে যমুনা বহে । কলকলোল,
উর্ধ্বে পাষাণ তট । শ্যাম শৈলাচল।
[ বাসরী : নিষ্ফল উপহার : পরিশিষ্ট ক. ]

চোদ্দ মাত্রার পংক্তির আলোচ্য উদাহরণটি পরে কবি পরিবর্তিত করে অক্ষরবৃত্ত পয়ারবন্ধে লিখেছিলেন। ছয়, আট বা দশ মাত্রার যতিভাগে পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী ইত্যাদি ছন্দবন্ধে অক্ষরবৃত্তের সংশ্লিষ্ট (compact) উচ্চারণভঙ্গিই বাংলা পদ্যে স্বভাবতঃ প্রাধান্য পেয়েছে। বস্তুত মধ্যযুগে এক বৈষ্ণব পদাবলীর কয়েকজন কবি ব্যতীত অন্য সমস্ত কাব্যের কবিরাই ( পদাবলীরও এক বৃহৎ অংশসহ ) অক্ষরবৃত্ত রীতির ব্যবহার করেছেন। আঠারো-উনবিংশ শতকে পাঞ্চালীতে এবং কিছু লোকসংগীতে দলবাচ্যিকের বা স্বরবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার হলেও সেখানেও অধিকাংশ কবি অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক বাংলা বাক্‌ধর্মী উচ্চারণের অক্ষরবৃত্তের প্রতিই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কি মাত্রাবৃত্ত, কি অক্ষরবৃত্ত, কি স্বরবৃত্ত— সর্ব রীতিতেই বোধহয় সবচেয়ে সুপরিচিত ছন্দবন্ধ হল আট-ছয় মাত্রাভাগের পয়ার। সংস্কৃত তোটক, ভুজঙ্গপ্রয়াত বা প্রাকৃত পাদাকুলক, পজ্ঝটিকা, অডিল্ল, চউপোলা ইত্যাদি ছন্দবন্ধগুলিকেই পয়ারের পূর্বরূপ ( অর্থাৎ ষোলমাত্রার দ্বিপদীরূপ ) হিসাবে গণ্য করতে হয়। মাত্রাবৃত্ত উচ্চারণরীতিতে এই দ্বিপদীর ব্যবহার অনবদ্য, বিদ্যাপতির পদাঙ্ক অনুসরণেই পরবর্তী পদাবলী গানে এবং সেই ধারায় একুলে রবীন্দ্রকাব্যে উচ্চারণ পরিবর্তনের কয়েকটি সুস্পষ্ট বিবর্তন রেখায় সার্থকতা লাভ করেছে।

প্রসঙ্গত এখানে পয়ারের গঠনভঙ্গির উল্লেখ করা যেতে পারে। বাংলা পদ্যের মুখ্য তিনটি ছন্দরীতি মাত্রাবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত এবং স্বরবৃত্তে সেই প্রাচীন ও মধ্যযুগ থেকে পয়ারই প্রধানতম ছন্দবন্ধ। আবার রীতিগত দিক থেকে অক্ষরবৃত্তেরই

প্রাধান্য। বস্তুত উনবিংশ শতকে অক্ষরবৃত্তই একমাত্র ছন্দরীতি হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তপ্রমুখ কবিগণ অক্ষরবৃত্ত পয়ারেই বেশীরভাগ কাব্য রচনা করেছেন। উনবিংশ শতকের রবীন্দ্রকাব্য-নাটকেও অক্ষরবৃত্ত পয়ারেরই প্রাধান্য। সম্ভবত এই কারণেই ছন্দপরিভাষায় 'পয়ার' কথাটি নির্বিশেষভাবে অক্ষরবৃত্ত রীতির যে কোনও ছন্দবন্ধের (পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী ইত্যাদি) কবিতা বোঝাতেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ অক্ষরবৃত্ত রীতির ছন্দকে বলেছেন পয়ারজাতের ছন্দ। পরবর্তী একাধিক ছন্দজিজ্ঞাসু পয়ার পরিভাষাটিকে এমন নির্বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু সেটি ঠিক নয়। ছন্দের গঠনপ্রকৃতি এবং ছন্দের উচ্চারণপ্রকৃতি বোঝাতে পৃথক পরিভাষা না রাখলে বৈজ্ঞানিক-ভাবে ছন্দের আলোচনা চলতে পারে না। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ছন্দ আলোচনায় পয়ারের সংজ্ঞা দিয়েছেন: 'আট হয়, আট হয়...পয়ারের ছাঁদ কয়।' পয়ার ত্রিপদীর গঠনে শব্দগ্রন্থি কিভাবে দিতে হবে তারও চমৎকার নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন,—

বিজোড়ে বিজোড় গাঁথ, জোড়ে গাঁথ জোড়।
আটে হয়ে হাত ফেলে ঘুরে এস মোড়॥

এই নিয়ম মেনে চললে আর ছন্দপতনের আশঙ্কা নেই। মাত্রাবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত বা স্বরবৃত্ত তিন রীতিতেই এই ছন্দ পয়ারবন্ধ রচনার পদ্ধতি। যদি লেখা যায়, —

(ক) ছিলাম নিশিদিন। আশাহীন প্রবাসী
বিরহ তপোবনে। আনমনে উদাসী।

অথবা—

(খ) গভীরতম বাসনাসম। কোথা-আছে
আমার গান আমার প্রাণ। কার কাছে?

কোনটিতেই পয়ারবন্ধ রচিত হয়নি, যদিও চোদ্দ মাত্রার পংক্তি রচিত হয়েছে। তার কারণ 'বিজোড়ে বিজোড়' জোড়ে-জোড়' শব্দগ্রন্থি দেওয়া হয়নি এখানে। পয়ার যেমন অক্ষরবৃত্তরীতির ত্রিপদী বা চৌপদী বন্ধ নয়, পয়ার তেমনি যে কোনও শব্দগ্রন্থির চোদ্দমাত্রার ত্রিপদীও নয়। সত্যেন্দ্রনাথের সুচিন্তিত সংজ্ঞাটিতেই পয়ারের মূল গঠনতত্ত্বটি বিধৃত হয়েছে। তাছাড়া উক্ত

বিপদী শ্লোকটি পয়ারের সার্থক উদাহরণও বটে। আট ছয় মাত্রাভাগের চোদ্দমাত্রা পংক্তিবন্ধই পয়ার ;— মাত্রাবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত এবং স্বরবৃত্ত তিন রীতিতেই এই পয়ার রচিত হতে পারে। যে কোনও রীতির পয়ারই মূলত চারমাত্রা পদনভাগের ছন্দবিশেষ।

**পাঁচমাত্রার ছন্দ :** মাত্রাবৃত্তে অন্যান্য পর্বভাগের মধ্যে ছয় পাঁচমাত্র। পর্বভাগের ছন্দও এযুগে নতুন করে আবদানী করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এর প্রাথমিক রূপ ধরেছে গীতগোবিন্দে। হয়তো প্রাকৃত 'নিশিপাল' বা 'ঝুলনা' জাতীয় ছন্দ থেকে তাঁদের এই আদর্শ পেয়েছিলেন। পাঁচমাত্রার পদন এবং ছয়মাত্রার পদযতি ভাগে জয়দেব ১৩, ১৯, এবং ২১ সংখ্যক প্রথ্যাত তিনটি গীত রচনা করেছেন। এর মধ্যে ২১ সংখ্যক গীতের যতিভাগ ও পদনবৈচিত্র্য দেখে বিস্মিত হতে হয়। এখানে গীত ১৩ এবং ১৯ থেকে উদাহরণ তুলছি।—

(ক) অহহ কলয়ামি বল। বাসি বসি ভূষণং। I
মমিবিরহদহনরহ। নেন বন্ধ দূষণং। I
[ গীতগোবিন্দ : গীত ১৩ ]

এখানে যতিভাগ হল ১০ ॥ ১০ I ১০ ॥ ১০ I। এই ছয়মাত্রার পর্বভাগে আবার পাঁচ মাত্রার পদনভাগ রয়েছে। এই পঞ্চমাত্রিক পদন স্পষ্ট করে তুলতে কবি যথাসম্ভব পঞ্চমাত্রিক তালের সূচনায় গুরু দ্বিমাত্রিক পদ প্রয়োগ করেছেন। এই ছন্দকে ১০ ॥ ১০ I মাত্রাভাগের প্রাকৃত 'নিশিপাল'[১] ছন্দের পরিবর্তিত রূপ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

---

১। হারবন্ধ তিন্নিসন্ধ ইন্দিসরি তিন্ন গণা,
পংচগুরু দুন্নিসর অন্তহুরু এক গণা।
এথসহি চংদমুহি বীসসর আণআ,
কন্নবর সন্নিভণ ছংদনিসিপালআ।
[ প্রাকৃতপৈঙ্গল : বর্ণবৃত্ত : ১৬০ নং শ্লোক ]

প্রত্যেক চরণে ক্রমশ এক ছয় ( অর্থাৎ গুরু দ্বিমাত্রিক পদ ) ও তিনশর ( লঘু একমাত্রিক পদ ) দিয়ে এরূপ তিনটি গণ রচনা করা, অন্তে য-গণ

(খ) যমলি যমি কিঙ্কিণি । মঞ্জুরুচি কৌমুদী ।
হরতিমির তিমিরযতি । মোহং । ]
স্ফুরদধর সাধুরে । তবরমন চন্দ্রমা ।
রোচয়তি লোচন চ । কোরং । [ ]

গীতগোবিন্দ : গীত ১৯ ]

এর যতিভাগ হল ১০ । ১০ । ১০ । ৪ [ অথবা ১০ । ১০ । ১৪ । ]। প্রতি পাঁচ মাত্রায় পর্বযতির স্পন্দন রয়েছে। এ ছন্দের সঙ্গে অনেকটা মিল পাওয়া যাবে ১০ । ১০ । ১০ । ৭ I মাত্রাভাগের প্রাকৃত 'ঝুলনা'[৭], ছন্দের : আট মাত্রার যতিভাগে যেমন ৩, ৩, ২ মাত্রায় বা ৪, ৪ মাত্রায় পদপ্রন্থি দেখা যায়, পাঁচমাত্রার পর্বে তেমনি ৩, ২, মাত্রায় পদপ্রন্থি এর স্বাভাবিক রূপ।

একটু অবাক হতে হয় দেখে যে, পদাবলী গানের দুজন ছন্দনিপুণ কবি বিদ্যাপতি এবং তাঁর শিষ্য গোবিন্দদাস এই পঞ্চমাত্রিক স্পন্দনভাগের ছন্দ ব্যবহারে একেবারেই আগ্রহী হননি। সহস্রাধিক বিদ্যাপতি-নামাঙ্কিত পদের মধ্যে পঞ্চমাত্রিক স্পন্দনের একটি মাত্র পদ মিলছে। সে পদেরও যতিভাগ ১০ । ১০ । ১০ । ৭ I মাত্রাভাগে প্রাকৃত 'ঝুলনা' ছন্দের আদর্শে। জয়দেবের আদর্শ সেখানে গৃহীত হয় নি। পদটি আধো বিদ্যাপতির ছায় একজন ( গুরু-লঘু গুরু ) যাও। এইভাবে পাঁচগুরু ও তার বিগুণ ( দশ ) লঘু— এই বিশমাত্রায় যে সখি চতুরমুখি। নিম্নিপাদ ছন্দ রচনা করে ;— সর্পরাজ ( পিঙ্গলাচার্য ) এইরূপ নির্দেশ দিচ্ছেন।

২। পঢ়মবহ দিজ্জিঅ। পুণবিতহ কিজ্জিঅ,
পুণবিবহ পঢ়মহ বিরহ আণা।
এমপরি বিবিহবল, মত্ত সত্তভীপল,
এহ কহ ঝুলনা পাঅরাআ।

[ প্রাকৃতপৈঙ্গল : মাত্রাবৃত্ত : ১১৩ শ্লোক ]

প্রথম দশমাত্রা যাও, পুনরায় তাইরূপ ( দশমাত্রা ) যাও, তারপর দশ ও সাতে যতি যাও। এইরূপ দুই পংক্তিতে সাঁইত্রিশ মাত্রা হয়। নাগরাজ ( পিঙ্গলাচার্য ) একে ঝুলনা বলেন।

ছন্দোনিবন্ধের প্রতিভাবান কবির রচনা কিন্তু সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। দুটি পংক্তি উদ্ধৃত করি।—

বনবিহরন মহবি ভট্ট  কিছু অরুণ নয়ন কট

কপটে ধরি মান সন্ধান লেহী

করক তয় পেম কসি  পুন্থু পলটী যায় হসি

আধিনয় অধরমধু-পান লেহী

[ বিদ্যাপতি : মিত্র মজুমদার সং : ১১১ নং পদ ]

পঙ্‌ক্তিমাত্রিক স্পন্দনভাগের মাত্রাবৃত্তে ৩, ২ মাত্রার পর্বপ্রতিষ্ঠা অক্ষরবৃত্তের দিক থেকে অভিপ্রেত। প্রাকৃত ছন্দে, অবহট্‌ঠের ছন্দে সেই রীতিটি অনুসৃত হয়েছে। এখানে 'কিছু অরুণ' এবং 'পুন্থু পলটী' দুটি পর্বে ২, ৩ পর্বপ্রতিষ্ঠা বেকায়দাতে ছন্দ দুর্বল হয়েছে। বিদ্যাপতির রচনায় এমন দুর্বলতা প্রশ্রয়প্রাপ্ত নয়। বিদ্যাপতি-শিষ্য গোবিন্দদাস পঙ্‌ক্তিমাত্রিক স্পন্দনভাগে কোনও পদই লেখেননি। অবহট্‌ঠকে সচেতনভাবে এ বিষয়ে প্রথম অনুসরণ করলেন অষ্টাদশ শতকের কবি শশিশেখর। তিনি কয়েকটি পদে ঠিক অবহট্‌ঠী (১৯ নং গীত) ছন্দবন্ধটি ব্যবহার করেছেন। সুপরিচিত একটি পদ থেকে উদাহরণ তুলছি।—

তুঅমণি মন্দিরে  যনবিথুরি নগরে

যেযচটি যতন পরিযারা।

দহদুবতী মণ্ডলী  পহমাহে পেখলি

কোটি নহ রাইক সমানা।

[ বৈষ্ণব পদাবলী : সংসদ সং : শশিশেখর ৪ নং পদ ]

উনবিংশ শতকে পৌঁছে প্রথম পাঁচমাত্রা স্পন্দনভাগের ছন্দ ব্যবহারের চেষ্টা করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। যেমন,—

হে নটবর নয় হে সয়।

তুমি কি কয় যমনয়।

আমি অবলা দোষের বালা।
হলো কি আলা ছুঁয়ো না কালা।

[ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রস্থাবলী : বঙ্গমহিলা সং : কৃষ্ণের প্রতি রাধিকা ]

এবে যেখানেই যুক্তাক্ষর এসেছে কবি ছন্দপতনকে এক মাত্রা রূপে গণ্য করে ছন্দপতন ঘটিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যে (১৮৭৪) পাঁচমাত্রার অভিজ্ঞান এমন কি যুক্তাক্ষর সমন্বিত ছন্দপতনের দ্বিমাত্রিক প্রয়োগেরও পরীক্ষা করেছেন। যেমন,—

সাধার চক্কি
লাগায় ছক্কি
অদ্ভুত-রস কিম্ভূত।
দুটি অধরে
হাসি না ধরে
লম্ব উদর বেটে মানুষ।

[ স্বপ্নপ্রয়াণ ৪ সর্গ : বিবাদপুর প্রয়াণ ]

এখানে ৫।৫।৬।২ মাত্রার অভিপ্রয়াণ এসেছে। কবি সম্ভবত সংস্কৃত মালিনীর ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ আনতে চেয়েছিলেন, উচ্চারণে সেটি বাংলা মাত্রাবৃত্তের পঞ্চমাত্রিক পর্বনের রূপ পেয়েছে। তবে ছন্দের কান ঠিক থাকলেও, পাঁচমাত্রার পর্বনভাগ সম্পর্কে তেমন সচেতন ছিলেন না মনে হয়; নইলে এই কবিতারই শেষদিকে লিখতেন না—

আতঙ্ক-ভরে
অঙ্গ শিহরে
কাটা দিয়া উঠে মাথার চুল। [ ঐ : ঐ ]

এখানে ছন্দপতন না হলেও ৫।৫।৬।৫ তালের পরিবর্তে ৬।৬।৬।৫ তাল এসেছে। ১৮৭০-৯৪ তে প্রকাশিত ভিনখণ্ড শিশুপাঠ্য পদ্য-মালাতে মনোমোহন বসু দু-একটি কবিতায় পাঁচমাত্রার পর্বভাগ এনেছেন। যেমন,—

সবাই যায় নদীর ঢেউ ;
রাখিতে তায় পারেনা কেউ ;
সময় যায় তাহারি প্রায় ;
কাহারো মুখে চাহেনা হায় !

[ সাহিত্যসাধক চরিতমালা : মনোমোহন বসু (৪১) : নদী ও সময় : পৃ ৬২ ]

স্বাভাবিক মাত্রাতত্ত্বেই আবদ্ধ ছুটে উঠছিল, কিন্তু যুক্তাক্ষর ব্যবহারেই গোল বাধল। কবি লিখলেন,—

ধরিতে তায় সে পারে তাই ;
আলস্য যার শরীরে নাই।

[ ঐ : ঐ ]

এখানে যুক্তাক্ষরের অন্তরালে লুকানো কণ্ঠদলের দ্বিমাত্রিক উচ্চারণের রহস্যাবরণ আর কবি উন্মোচন করতে পারলেন না।

এই যুগে বালক কবি রবীন্দ্রনাথেরও এই একই অসুবিধা ঘটছিল দেখা যায়। মাত্রাতত্ত্বে যুক্তাক্ষর সমন্বিত কণ্ঠদলের মাত্রানির্ধারণে তাঁর সংশয় ছিল। তবে ছন্দের কান তীক্ষ্ণ ছিল বলেই যুক্তাক্ষর যথাসম্ভব বর্জন করে শব্দখণ্ডন পরিহার করতেন। তাছাড়া প্রয়োজনমতো একদল শব্দের (mono syllabic word) দ্বিমাত্রিক প্রয়োগবৈচিত্র্যও কিশোরকবি চমৎকার ধরতে পেরেছিলেন। ১৮৮৮ কার্তিক সংখ্যা ভারতীতে প্রকাশিত 'ফুলবালা' গাথা কাব্যে মাত্রাতত্ত্বের পাঁচ, ছয় এবং সাত মাত্রার যতিভাগের তিনি পরীক্ষা করেছেন। পাঁচ মাত্রার স্বপন-ভঙ্গে লিখছেন,—

গোলাপ ফুল ফুটিয়ে আছে মধুর লোভা যাহাতে—
ফুলের মধু লুটিতে গিয়ে কাঁটার ঘা খাস্‌নে।

[ অচলিত রচনাবলী ১খণ্ড, পৃ ৪৫১ ]

এখানে 'কাঁটার ঘা' অর্থের 'ঘা' একদল শব্দের দ্বিমাত্রিক ব্যবহার লক্ষণীয়। একই আদর্শে আবার 'প্রভাত সংগীতে' ( ১৮৮৩ ) লিখেছেন,—

জগৎ মাঝে খেলিতে যা
চরণ যেন উঠিছে না,
নয়নে যেন হাসিছে মৃদু হাস।
হাসিটি যেন নাথিল ছুঁয়ে,
আমারে দিল ফুলেরে ছুঁয়ে,
মালতী মধু ঢালিয়া তারে করিল পরিহাস।

[ প্রভাত সংগীত : হাস ]

এই ১০।১০।১০।৭ I মাত্রাতন্ত্রের আদর্শ 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীতে'ও ( ১৮৮৪ ) লঘু-গুরু উচ্চারণ-আদর্শে মিলছে। যেমন,—

আঙুলগুলি মুহুমুহু
গায়ে দিচ্ছ সুড়সুড়
কুঞ্জবনে ঘুঁঘু ঘুঁঘু মোহার গানে চায়।
[আ. ঠা. প. ১১নং পদ]

এ পদটি সম্ভবত পূর্বোক্ত 'হাস' কবিতাটির আগেই লেখা হয়েছিল।

'কড়ি ও কোমলে'র (১৮৮৬) অন্তর্গত মাত্রাবৃত্ত রীতির একাধিক কবিতায় কবি যুক্তাক্ষর ব্যবহারের রহস্য ধরতে পেরেছিলেন। তবে সেখানে পাঁচমাত্রা যতিভাগের ছন্দ নেই। আমরা এ ছন্দের ব্যবহার দেখতে পাই 'মানসী' কাব্যের 'অপেক্ষা' কবিতাটিতে ১৮৮৮, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে। স্বাধীনভাবে প্রথম যে কবিতায় যুক্তাক্ষরের ব্যবহার করলেন এবং যুক্তাক্ষরের আড়ালে লুকানো ধ্বনিদলের স্বাভাবিক ব্যবহার-রহস্য পুরোপুরি ধরতে পারলেন সে এই পঞ্চমাত্রিক পর্বভাগের 'অপেক্ষা' কবিতাটি। সেদিক থেকে বাংলা কাব্যের ছন্দবিবর্তনের ইতিহাসে এই কবিতার রচনা-তারিখটি স্মরণীয়। এখানে একটি স্তবক উদ্ধৃত করি।—

যমুনা বেয়ো আইল ঘাটে
এলনা হায়া তবু।
কলসখানে ঊর্মি ফুটে,
রশ্মিরাশি চুমি উঠে,
শ্রান্ত বায়ু শ্রান্ত নীর
চুমি যায় কভু।
[ মানসী : অপেক্ষা ]

এ যেন পূর্ববর্তী 'হাস' কবিতারই ছন্দস্তরের রূপান্তর। এর ঠিক চারদিন পরে ১৮ই জ্যৈষ্ঠ 'সুদূর আশা' কবিতাটিও একই আদর্শে যুক্তাক্ষরবহুল শব্দ-প্রয়োগে লিখিত হল। এই যে আধুনিক উচ্চারণে মাত্রাবৃত্তের প্রবাহ উন্মুক্ত হল, তারপর থেকে সেই ধারা অব্যাহত রয়েছে।

রবীন্দ্র-সমকালীন অন্যতম প্রতিভাবান কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এই পাঁচমাত্রার পর্বভাগেই যে লাইন-ভিত্তিক প্রবহমানতার পরীক্ষা করেছেন এখানে তার একটি নিদর্শন তুলছি।—

কহেন পিতা—'এত কি বেশী হয়েছে বড় মেয়ে ?'
কহেন মাতা—'তুমি কি জানো ? তুমি কি দেখ চেয়ে ?
সারাটি দিন বাহিরে থাকো, খেলিছ নিয়ে সাথী।—
আমিই ঘরে পাহারা দেই,' কহেন ক্রুদ্ধ মাতা—
'কেমন গৃহিণি ? মেয়ে ত মোটে পাঁচেতে এই পড়ে ;
কাহার ক্ষতি করিছে ? হেসে খেলেই বেড়ায় সে ;
থাক না কেন বছর দুই।' জননী ক্রোধে তবে
শয্যা ত্যজি, পাত্র ত্যজি, কহেন ঘোর রবে
ঝঙ্কারিয়া, 'তোমার মেয়ে— আচ্ছা, বেশ থাকো ;
কাটিতে হয় কাটো, কিম্বা রাখিতে হয় রাখো ;'

[ মন্ত্র : নবধূ ]

পাঁচমাত্রা পর্বনের মাত্রাক্রমে আধুনিক কবিরা কখনো কখনো আকৃতিগত কিছু কিছু পরীক্ষা চালাচ্ছেন। শক্তিমান দুজন কবির দুটি উদাহরণ তুলছি।—

ইহার মনে কখন প্রিয়তম—
উষাও ; লোকলোচন উঁকি মারে—
সবার মাঝে একলা ছিটি আমি
লেকের কোলে স্বপন যেন ভালো।

ঝুকেছি কাঁদা ধোয়ার ছুতা ; তাই
কাছেই পথে জলের কলে, সখা
কলসি কাঁখে চলছি মৃদু চালে
পলির ঘোড়ে বেলা যে পড়ে এলো।

[ প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের কবিতা : বধূ ]

এখানে যতিভাগ ৩।৩।২ ], কিন্তু রবীন্দ্রনাথের থেকে পার্থক্য হল : লাইন-শেষে মিলবিহীনতা এবং প্রয়োজনমতো লাইন-ভিতরে মিলের প্রয়োগমানতা। কবি অবশ্য যুক্তাক্ষর পরিহার করেছেন ; সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের 'বধূ' কবিতার (বেলা যে পড়ে এল জলকে চল) ধ্বনি-আবেশের সচেতন অনুসৃতির জন্যে।

অপর উদাহরণটি আরও তরুণ কবি নীরেন্দ্র চক্রবর্তীর রচনা।—

এখানে কেউ আসে না, ভালো বাসে না কেউ, শ্রাবণে
কী যায় আসে রাত্রিদিন, মরুকঠিন হাওয়া

কী ব্যথা হানে জানেনা কেউ, জানে না, কাছে পাওয়া
ঘটে না। এরা কোথায় যায় জটিল অন্ধকারে।
পোষাক মুখ লুকিয়ে, ভাখো কত না সাবধানে
আঁচলে কাঁচ বাঁধে সবাই, চেনেনা কেউ সোনা ;
এখানে ধন বড় কৃপণ, এখানে নেই আলো
স্বপ্নে না, জেগে পড়েনা ঢেউ— এখানে থাকবো না।

যে মাঠে সোনা ফলানো যায় আপাতা জমে ওঠে
সেখানে এরা জানে না কেউ কী রয়ে ঝিলিমিলি
জীবন,— তাই যা চেনা কেউ ; দুয়ারে এটে খিল
নিজেকে ঘুরে পরায়, দিন গণায়। সেই সোনা
স্বপ্নে না, জেগে পড়ে না ঢেউ— দুয়ারে মাথা কোটে,
এখানে ধন যতো কৃপণ— এখানে থাকবো না।

[ নীলনির্জন : ঢেউ ]

কবি এখানে ১০।৭। মাত্রাভাগের বিপলী পংক্তি ব্যবহার করেছেন। ছন্দের পাঁচমাত্রার পর্বন অক্ষুণ্ণ রেখে ভাবের যথাসম্ভব স্বচ্ছন্দ প্রবাহ আনতে চেয়েছেন। ভাবের প্রবাহ প্রয়োজনমতো পর্ববৃত্তি, পদবৃত্তি এমন কি পংক্তি-বৃত্তির অতিক্রম করে গেছে। মধুসূদন অমিত্রাক্ষরে যে প্রবহমানতার পরীক্ষা করেছেন,— এ যেন মাত্রাবৃত্তে কবির সেই পরীক্ষা প্রয়াস। তবে আশঙ্কা হয়, এমন পাঁচমাত্রার পর্বন ঠিক রেখে ভাবের স্বাচ্ছন্দ্যের প্রবাহ সৃষ্টিতে কবিকে কতটা মানসিক বিষয়ে সচেতন থাকতে হয়,— তাতে কবিদের ভাবতন্ময়তার কিছুটা অন্তরায় সৃষ্টি করে কিনা। কবি এখানে কিছুটা স্বাধীন মিলে সনেট গড়বার প্রয়াস করেছেন।

ছয়মাত্রা ভাগের ছন্দ : ছয়মাত্রা পর্বনের মাত্রাবৃত্ত বিদ্যাপতির পদে এবং চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণব কবিদের পদে একটি প্রধান ছন্দোবন্ধ বলা যেতে পারে। কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করি, জয়দেব গীতগোবিন্দে এ ছন্দকে আদৌ গুরুত্ব দেন নি। একমাত্র দশম গীতটিতে মূল ঘন্মাত্রিক পর্বের সঙ্গে তিন, চার বা পাঁচ মাত্রার সংযোগে নয়, দশ বা এগার মাত্রার পর্ব গঠন করেছেন। তবে অন্যান্য গীত থেকে এর গঠনরীতি পৃথক। ইতিপূর্বে

দেখেছি চার বা পাঁচ মাত্রার পর্ব-সমন্বয়ের গীতগুলিতে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ যতির পর্যায়ক্রম সুনির্দিষ্ট থাকেন নি। এখানেই বিশুদ্ধ সংস্কৃত ছন্দবন্ধ থেকে জয়দেবের ছন্দের নূতনত্ব দেখা দিয়েছিল। বস্তুত এই পথেই বাংলা মাত্রাবৃত্তের নূতন ধারা প্রবর্তিত হয়েছিল। দশম গীতটি এই ধারার বাহিকম। সেখানে জয়দেব লঘু-গুরু ধ্বনিবিন্যাস সুনির্দিষ্ট রেখে সংস্কৃত 'প্রমাণিকা' ( লঘু-গুরু-লঘু গুরু লঘু গুরু-লঘু গুরু : প্রতি ছয় মাত্রার পর যতি ), 'পঞ্চচামর' ( প্রমাণিকার দুই পদ : প্রতি ছয় মাত্রার পর যতি ) বা প্রাকৃত প্রবংগম ( ৩। ৩। ৩ ), হীর ( ৩। ৩। ৩। ৪ ) প্রভৃতি ছন্দবন্ধের আদর্শে আর একটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দবন্ধ সৃষ্টি করেছেন মাত্র। যেমন,—

মমতি শিশির মধুরে । মধুপমধুরুরোতি । I
পততি মদন বিশিখে । বিলপতি বিকলতরোধতি । I
রচয়তি মধুশয়নম্ । সরসমপিবধাতি । I
মনসি বলিতবিরহে । নিশিনিশিরুজউপজাতি । I

[ গীতগোবিন্দ : ১০ গীত ]

এর মাত্রাভাগ হল ৩। ৩। ৩। ০ I ৩। ৩। ৩। ৫ I। পদপূরণে একটু বৈচিত্র্য এনেছেন কবি : তবে ঠিক এই পদভাগ পরবর্তী কোনও বাংলা পদে অনুসৃত হয়নি।

চর্যাপদে ছয়মাত্রার পর্বভাগের উদাহরণ বিরল। ৩+৩ মাত্রাভাগের একাবলীর পূর্বাভাস দু-একটি পদে লক্ষিত হয়। যেমন,—

সুনে সুন ঘি । সিআ জবে
সসহরবাস । উইআ তবে।

[ চর্যাপদ : ৪৪ নং পদ ]

তবে এই পদেই পরবর্তী পংক্তিগুলিতে আবার ৮।৬ I মাত্রাভাগের পয়ার-আদর্শ ফুটে উঠেছে। বিদ্যাপতির পদে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বা চৈতন্য-পূর্ব চণ্ডীদাস পদাবলীতেই ছয়মাত্রা-যতিভাগের ছন্দের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। তবে বিদ্যাপতি যেমন মাত্রাবৃত্তের বিশিষ্ট উচ্চারণ-আদর্শ রক্ষা করেছেন, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে বা চণ্ডীদাস-পদে তেমনটি নয়।—সেখানে অক্ষরবৃত্তের সংশ্লিষ্ট

উচ্চারণের প্রাধান্য। এখানে বিদ্যাপতি-পদের এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দুটি উদাহরণ দিচ্ছি।—

(১) কাঠ কঠিন | করল মোহক।
উপরে রাখল | পুর।।
কনক কলস | বিথে পূরল।
উপর দুধক | পুর।।
[ বিদ্যাপতি : নগেন্দ্র গুপ্ত সং : ১০৭ নং পদ ]

(২) তোএঁ মা জাআসি | মোএঁ মাহাদানী।
এ ঘাট সব | আহারে।।
আহ্মে গোপগণ | কিঙ্কর মাহাদান।
চল মথুরা | নগরে।।
[ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন : দানখণ্ড : ৪ নং পদ ]

উভয় পদেরই মাত্রাভাগ হল ৬।৬।৬।৩। বিদ্যাপতির পদটিতে ছন্দপদ সর্বত্রই দ্বিমাত্রিক, প্রয়োজনে যুক্তধ্বনিও সংকুচিত উচ্চারণবশে শুদ্ধ দ্বিমাত্রিক। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যেমন মাঝে মাঝে যুক্তধ্বনির শুদ্ধ দ্বিমাত্রিক উচ্চারণ আছে, তেমনি মাঝে মাঝে অক্ষরযুক্তের উচ্চারণবশে শব্দমধ্য ছন্দপদের একমাত্রিক উচ্চারণও রয়েছে। চণ্ডীদাস পদাবলীতেও এই সংশ্লিষ্ট উচ্চারণরীতির ফলে মাত্রিক পর্বভাগের পদ প্রাধান্য পেয়েছে। চৈতন্য পরবর্তী পদাবলী গানে অক্ষরযুক্ত ও মাত্রাযুক্তের উচ্চারণ পার্থক্য আরও স্পষ্ট হয়েছে। সেখানে উভয় রীতিরই ছয়মাত্রা পর্বভাগের ছন্দ যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়েছে। একটি উদাহরণ তুলি।—

মধুবিকচ | কুসুমপুঞ্জ।
মধুলম্পট | গঞ্জি গুঞ্জ।
মৃদুমলয়ানিল | গঞ্জিগমন।

বকুল ফুল | নারী। [

বনগজন | চিকুরগুচ্ছ।

মালতী ফুল | ভাল হস্ত।

অঞ্জনযুক্ত | কৃষ্ণ নয়ন।

বঞ্জনগতি | হারী। [

[ বৈ. প. সংসদ সং : জয়দানন্দ ৩৬ নং পদ ]

প্রায় একই পর্যায়ের আদর্শে ( ৬।৬।৬।৬।৬।৬।৬।৫ ) রবীন্দ্রনাথ ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীতে লিখলেন,—

ডালে ফুলময় সুরভ ভার,
ডালে বিহগ সুরবসার,
ডালে ইন্দু অমৃতধার
বিমল রজত ভাতি রে।
মন্দ মন্দ ক্ষুব্ধ গুঞ্জে
অযুত কুসুম কুঞ্জে কুঞ্জে
ফুটল রজনি পুঞ্জে পুঞ্জে
বকুল যুথি জাতিরে।

[ ভা. ঠা. প. ৮ নং পদ ]

আরও পরে আধুনিক মাত্রাবৃত্ত রীতিতে লিখলেন,—

ফুলুবাবু বসি পাশের ঘরেতে
নাবতা পড়েন উচ্চস্বরেতে—
হিষ্টি কেতাব লইয়া করেতে
কেদারা হেলান দিয়ে।
দুই ভাই মোরা শুধে সমাসীন,
মেজের উপরে জ্বলে কেরোসিন,
পড়িয়া ফেলেছি চ্যাপটার তিন
যারা এসে, আমি বিএ। [ যানসী : বঙ্গবীণ ]

রবীন্দ্রনাথ এবং আধুনিক কবিদের মাত্রাবৃত্ত রীতির কবিতায় ছয়মাত্রা পর্বভাগই সর্বাধিক ব্যবহার লক্ষিত হয়। 'মানসী' কাব্যেই প্রথম মাত্রাবৃত্তের মুক্ত ব্যবহার শুরু হয়েছে। সেখানে এই রীতির ত্রিশটি কবিতার মধ্যে আঠারটিতেই ছয়মাত্রার পর্বভাগ রয়েছে। সোনার তরী, চিত্রা, কথা ও কাহিনী, কল্পনা প্রভৃতি কাব্য— যেখানে মাত্রাবৃত্তের প্রাধান্য— সর্বত্রই ছয়মাত্রা পর্বভাগের ছন্দই বেশী ব্যবহৃত হয়েছে। ছয়মাত্রা পর্বভাগের ছন্দ আলোচনা প্রসঙ্গে কবির 'কথা ও কাহিনী'র অন্তর্গত 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' নামক নাটিকাটি উল্লেখযোগ্য। ৮+৫ বা ৮+৬—পংক্তিবিন্যাসে কবি এ নাটকের সংলাপ রচনা করেছেন। পংক্তিশেষে মিল আছে, লাইন-ডিঙানো প্রবহমানতা আছে। কিছু অংশ উদ্ধৃত করি।—

মালতী : যে নবাববাড়ি এনু আমি তোজি
সেথা বেগমের ছিল পোষা বেজি,
তারারি একটা ছোট বাচ্চার
শিয়রেতে ছিল বাদী চার চার.
তা ছাড়া সেপাই।

ক্ষীরো : শুনলি তো কাশী ?

কাশী : শুনেছি।

ক্ষীরো : তাহলে ভাব্ তোর বাদী।
কিনি পোড়ারমুখী।

কিনি : কেন বাদীমুড়ি ?

ক্ষীরো : হাই ভুললেম, দিলি যে যে তুড়ি ?
মালতী !

মালতী : আজ্ঞে

ক্ষীরো : শেখাও কায়দা।

মালতী : এত বলি তবু হয় না কায়দা।
বেগম সাহেব যখন হাঁচেন
তুড়ি তুল রবে কেহ না বাঁচেন।
তখনি শূলেতে চড়িয়ে তারে
নাকে কাঠি দিয়ে হাঁচিয়ে মারে। [ কাহিনী : লক্ষ্মীর পরীক্ষা ]

প্রবহমান ছন্দে বাক্‌ভঙ্গী আদর্শে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার কতটা সার্থক

হতে পারে এখানে তার পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ নিজেও বস্তুগত তালের মাত্রাবৃত্তের এতটা স্বাভাবিক বাক্‌ভঙ্গী উচ্চারণের প্রয়োগ অন্য কোথাও করেন নি। রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিদেরও রচনায় কদাচিৎ দু একটি দৃষ্টান্ত মিলতে পারে। একটি এখানে উদ্ধৃত করি।—

এক কবি।
তিনি পরতেন চুলি চুলি
লম্বা মেঘের পাঞ্জাবি।
অত ভয়ার ভুঁড়িয়ে
যখন ইচ্ছে ঘরে
বাজাতেন তিনি
প্রকাণ্ড এক সানাই—
পৃথিবীকে তিনি ভালবাসতেন খুবই
মাটিতেই তাঁর
ছিল পা।

[ সুকান্ত মুখোপাধ্যায়ের কবিতা : ছিটমহল ]

এই ছয়মাত্রা পর্বতাগের মাত্রাবৃত্তের আদর্শ রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিদের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন সংশয় নেই। তবে বৈষ্ণব কবিরা এই আদর্শ জয়দেবের কাছ থেকে পেয়েছেন মনে হয় না। হয়তো প্রাকৃত আদর্শ থেকেই তাঁরা এ ছন্দ নিয়ে থাকবেন।

**সাতমাত্রা তালের ছন্দ :** বাংলার সাতমাত্রা পর্ব তালের মাত্রাবৃত্ত ছন্দ মূলত চারমাত্রার মূলপর্বের সঙ্গে একটি অপূর্ণ তিন মাত্রার উপপর্ব সহযোগে রচিত হয়। বিদ্যাপতি এই রীতির প্রবর্তক। জয়দেবের গীতগোবিন্দে একটি মাত্র সাতমাত্রা লঘুতালের গীত রয়েছে। সেটি সংস্কৃত ছন্দের আদর্শে সুনির্দিষ্ট লঘুগুরু বর্ণবিন্যাস রীতিতে রচিত। যেমন,—

যামিয়ং চলি | তা বিলোক্য রহসি বর্তসে চ | যেন। ।
সাপরাধতয়া | ত্বয়াপি নানুযায়িতাস্মি তত | যেন। ।

[ গীতগোবিন্দ : ১ নং গীত ]

১।১।২।১।৩। মাত্রাভাগে পংক্তি বিন্যাস করা হয়েছে; তবে প্রত্যেক পংক্তির লঘু-গুরু বর্ণবিন্যাসের ক্রম সুনির্দিষ্ট। এ ছন্দ অনেকটা যেন সংস্কৃত

'হরনর্তনের'[১]. আদর্শে রচিত। যতিভাগে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। বিদ্যাপতি জয়দেবের ৭।৭।৭।৩ মাত্রার যতিভাগে নিজস্ব স্বাধীন উচ্চারণরীতিতে দুটি চমৎকার পদ লিখেছেন। একটি থেকে উদাহরণ তুলছি।—

সেলিকামিনি | গজর গামিনি।
বিহসি পলটি মি | হারি। ।
ইন্দ্রজালক | কুসুম শায়ক।
কুহকি ভেলি বর | নারি। ।

[ বিদ্যাপতি : মিত্র মজুমদার সং : ৬১২ নং পদ ]

বিদ্যাপতি ৩. ৪ মাত্রাভাগে পদগ্রন্থি দিয়ে পদমাত্রিক এই যে নতুন ছন্দপ্রকরণ সৃষ্টি করলেন পদাবলীর একাধিক কবি সেই ধারা অনুসরণ করেছেন। গোবিন্দদাসের একটি উদাহরণ দিচ্ছি।—

কুটিল কুন্তল কুসুম কাচনি কাহ্নি কুবলয় আঁখ
কুকি তাহর কুসুম কৌমুদি কুন্দ কৈরব হাস।

[ বৈ. প. সংকল সং : গোবিন্দদাস ১২১ নং পদ ]

উক্ত কবিই ছন্দপ্রকরণের লৌকর্যার্থে শুধু দল মুখ্যত পদসূচনায় ব্যবহার করেছেন। এই আদর্শ জয়দেবের পদ্যাক অনুসরণেই বাংলা পদাবলীতে দেখা দিয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের পূর্বে ঊনবিংশ শতকের কবিরা এই ছন্দবন্ধের ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন হননি। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'স্বপ্নপ্রয়াণ' ১(৮৭১) এবং 'কাব্যমালা' ( রচনা ১৮৭০-৮৯, প্রকাশ ১৯২০ )-তে সংস্কৃত ছন্দের আদর্শে বাংলা পদ্য লিখতে গিয়ে কিছুটা সাত, পাঁচ ও চার মাত্রার পর্বস্পন্দনের পরীক্ষা করেছেন। যেমন,—

(ক) হেথায় স্বরগের সরসর খসখস ঝরে।
পাদপ মরমর মরমর পবন করে।

১। সংস্কৃত আটাশমাত্রিক 'হরনর্তনে'র পর্ববিন্যাসক্রম হল : র ( গুরু-লঘু-গুরু ), স ( লঘু-লঘু-গুরু ), জ ( লঘু গুরু লঘু ), ত ( গুরু-লঘু-লঘু ), র ( গুরু-লঘু-গুরু )। যতিভাগ হল ৭।৫।৭।৫।

কি জানি কোথা হতে বাহিরে আসিছে গীত ;
বীণার তন্ত্রীর মত আর আচম্বিত।

[ স্বপ্নপ্রয়াণ : নবপুষ্প প্রয়াণ ]

কবি মুক্তাক্ষর এড়াতে চেয়েছেন, তবে যখন এসে পড়েছে, যেমন 'অমার' শব্দটিতে,— সেখানে ছন্দপতনের দ্বিমাত্রিক উচ্চারণ মেনেছেন। সাইস এই ছন্দঃপতনের আদর্শেই 'মানসী'তে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, —

ছিলাম নিশিদিন আশাহীন প্রবাসী
বিরহ উপোবনে আনমনে উদাসী।

[ মানসী : বিরহানন্দ ]

রবীন্দ্রনাথ আট পংক্তির দীর্ঘ কবিতাটিতে কোথাও মুক্তাক্ষর-ছন্দপতন ব্যবহার করেন নি।

দ্বিজেন্দ্রনাথের কাব্যমালার আর একটি কবিতার চরণে,—

কুমার যেন বয়ে বালক অতি
জননী তার রাজরানী —
স্বর্গে গেল চলি ধরাপতি
শূন্য দেখে রাজধানী। [ কাব্যমালা : কুমারসেন ]

এখানেও কবি মুক্তাক্ষর-ছন্দপতনের দ্বিমাত্রিক মর্যাদা দিয়েছেন। ঠিক এই ছন্দপতনই রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে ব্যবহার করেছেন,—

গাহিছে কাশীনাথ নবীন যুবা শুনিতে সভাস্থ সবাই।
কণ্ঠে খেলিতেছে সাতটি সুর সাতটি বেন গোথা পাখি।

[ কথা ও কাহিনী : গানভঙ্গ ]

রবীন্দ্রনাথ প্রথম সাতমাত্রার ছন্দপতনের ব্যবহার করেন 'ভুলভাঙা' কবিতায়, ১২৮৪ কার্তিক মাসের ভারতী পত্রিকায়। এই কবিতাতেই বিশেষ করে পাঁচ, ছয় এবং সাতমাত্রার পর্বভাগের মাত্রাবৃত্তের প্রাথমিক পরীক্ষা করেছিলেন। তখনো মুক্তাক্ষর-ছন্দপতনের দ্বিমাত্রিক ব্যবহারনীতি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারেন নি। তাই কবিতা থেকে একটি স্তবক উদ্ধৃত করি।—

কোন ভুল মালিকা পাখি ভুল মালিকা
ভুলবালকের কথা একমনে শুনিছে,

বিস্তৃত সরসে হরষিত মনে
আনন্দ আননে বালা ফুলদল তুলিছে।

[ র. র. অচ. ১খণ্ড পৃ ৪৩৬]

এ ছন্দের প্রতি ৪, ৩ মাত্রাভাগে। আসলে এটি ৮।৪।৮।৮ I মাত্রাভাগের চৌপদীর পরিবর্তিত রূপ : ৭।১।৮।৭ I মাত্রাভাগ। ৩, ৪ মাত্রার প্রতিষেধ ছন্দের স্পন্দন এ ছন্দ থেকে স্বভাবতই কিছুটা পৃথক।

সাতমাত্রার ষষ্ঠিভাগে রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিদের দু-একটি বৈচিত্র্যের দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

(ক) ঝরছে ঝর ঝর, ঝরছে ঝর্‌ঝর্
বজ্র গর্জায়, ঝঞ্ঝা গর্‌জায়
লিখছে বিদ্যুৎ বজ্র অদ্ভুত,
বলছে তিন লোক 'ঘর্‌ঘর ঘর্‌ ঘর্‌'।

[ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত : কাব্যসঞ্চয়ন : ঝর্‌ঝরিয়োল ]

প্রত্যেক পদে কবি ছন্দ-যুক্ত শব্দবিন্যাসের ক্রম ঠিক রেখে এই 'ঝিয়োল' সৃষ্টি করেছেন।

(খ) সে তরু এ ছবির, তুমি যে তরুমূলে
বসেছো ফুলসাজে, ছায়ায় যাও বালা
দিনের পাপ্‌ড়িতে রাতের রাঙা ফুলে
জোছনা কথা তাই সোনালী নদীকূলে।

[ বিষ্ণুদে'র শ্রেষ্ঠ কবিতা : ভিলানেল ]

এখানে ফরাসী 'ভিলানেল'[১], কবিতার আদর্শে ৭।৭ I মাত্রাভাগের পংক্তি সাজিয়েছেন কবি।

তাহলে দেখা গেল, ক্রমবিবর্তনের উল্লেখযোগ্য চারটি পদক্ষেপে আধুনিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দের জন্ম সম্ভবপর হয়েছে। প্রথম, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দের

১। 'ভিলানেল' প্রথম ফ্রান্সে ১৮৯০তে রচনা শুরু হয়। প্রত্যেক ত্রিপংক্তিক স্তবকে পরপর পংক্তিমিল হল : কখক, কখক···এই পর্যায়ে ; সর্বশেষ স্তবকে চারপংক্তি, মিল কখকক। অপর বৈশিষ্ট্য হল, প্রথম স্তবকের প্রথম বা তৃতীয় পংক্তির যে কোনও একটি প্রত্যেক স্তবকে ফিরে ফিরে আসবে। সর্বশেষ চতুষ্পংক্তিক স্তবকে দুটি পংক্তিই ফিরে আসবে।

সুনির্দিষ্ট লঘু-গুরু ধ্বনিবিন্যাসক্রম। এ যুগে সমস্ত হ্রস্বধ্বনিগুলি ছাড়াও কোন কোন যুক্তধ্বনি গুরু বিধায়িক ভাবে উচ্চারিত হবে তা সুনির্দিষ্ট ছিল। এই ধ্বনিবিন্যাসের ভিন্ন ভিন্ন ক্রম অনুযায়ী তখন এক একটি ছন্দবন্ধের নামকরণ হত। দ্বিতীয় পদক্ষেপে জয়দেব তাঁর শ্রীগীতগোবিন্দের গীতগুলিতে এমন ধ্বনিবিন্যাসের সুনির্দিষ্ট ক্রম তুলে দিয়ে এবং সেই সঙ্গে পর্বযতিস্পন্দনের পুনরাবর্তনকেই ( repetition ) প্রাধান্য দিয়ে বাংলা মাত্রাবৃত্ত উদ্ভাবনের পরিবেশ সৃষ্টি করলেন। তবে তিনি দেবভাষায় কাব্য লিখতে গিয়ে সংস্কৃত গুরু যুক্তধ্বনির উচ্চারণ অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। এই যুক্তধ্বনির গুরু উচ্চারণ যে ইতিমধ্যেই দেশভাষায় লঘু হয়ে আসছিল চর্যাপদে তার সাক্ষ্য মিলছে। তৃতীয় পদক্ষেপে, বিদ্যাপতি এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণকারী পদাবলীর কবিরা গুরু যুক্তধ্বনিকে প্রয়োজনমতো লঘু উচ্চারণে ব্যবহার করে এবং মুখ্যত জয়দেবের পর্বাদর্শ অনুসরণ করে বাংলা মাত্রাবৃত্তের প্রাথমিক রূপ দিলেন। চতুর্থ পদক্ষেপে রবীন্দ্রনাথ ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে নির্দ্বিধায় একমাত্র হ্রস্বধ্বনিকে গুরু বিধায়িকরূপে গণ্য করে এবং দেশভাষার উচ্চারণাদর্শ মেনে নিয়ে সমস্ত যুক্তধ্বনিকেই একমাত্রা রূপে গণ্য করে, জয়দেব, বিদ্যাপতির যতিভাগের আদর্শ অনুসরণে আধুনিক মাত্রাবৃত্তের জন্ম দিলেন। আজ ঊনপাদ শতাব্দীকাল পার হতে চলল সেই উচ্চারণরীতিই এখন পর্যন্ত বাংলা মাত্রাবৃত্ত রীতির ছন্দে প্রচলিত রয়েছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কবিরা কখনো বা আকৃতি নিয়ে মাঝে মাঝে নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছেন, তবে উচ্চারণ-প্রকৃতিতে,— অর্থাৎ মাত্রাপরিমাপে আর উল্লেখযোগ্য কোনও পরিবর্তন আজও দেখা দেয়নি।

# উইলিয়ম বটলর ইয়েট্‌স ও পার্গেটরি

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইয়েট্‌স-এর জন্মশতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে। এই বিশেষ উপলক্ষে এদেশেও তাঁর নাম স্মরণ ও কীর্তন করে তৃপ্ত হয়েছেন এমন অনুরাগীর সংখ্যা কম নয়। আমাদের বাঙালিদের ইয়েট্‌স-প্রীতির একটু স্থূল কারণও রয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে তিনি প্রতীচ্য জগতে পরিচিত করেছিলেন বলে নয়, রবীন্দ্রসাহিত্যে একদিন তিনি মাতাল হয়ে বেড়িয়েছেন, একদিন রবীন্দ্রসাহিত্যে তিনি তাঁর বহুদিনের স্বপ্নের পৃথিবীকে খুঁজে পেয়েছেন— এই স্বীকৃতিতে তাঁর প্রতি আমরা বিশেষ এক ধরনের কৃতজ্ঞতা অনুভব করেছি। তার পরের কারণ হিসেবে তাঁর নিজের রচনাকেই দায়ী করা যায়। তাঁর অনেক কবিতার নিসর্গে বাংলাদেশের কোন প্রকৃতির সাদৃশ্য রয়েছে, যাঁরা জীবনানন্দ দাশের ইন্দ্রিয়ার্দ্র নিসর্গচিত্রে ইয়েট্‌স-এর সমাজার লক্ষ্য করেছেন তাঁদের সন্ধানের সূত্র সম্ভবত এখানে।

অনুরাগের আরো কারণ, পশ্চিমী দুনিয়ায় তাঁর অন্য অনেক সতীর্থের মতো তিনিও অল্পবয়সেই ভারতীয় আর্ষ সংস্কৃতির অনুরক্ত হয়েছিলেন। মনে পড়ে প্রথম জীবনে তিনি লোকধর্মের পরিবর্তে কাব্যধর্মানুযোদিত যে নিজের উপাসনার গির্জা গড়ে নেওয়ার পক্ষপাতী হয়েছিলেন সেখানে বাহ্যিকচারী ক্রীশ্চানিটির তেমন দাবী ছিল না, আর সেখানে খ্রোচাইনাসের পাশে উপনিষদ্ ঋচরিতাদেরও সম্রদ্ধ আমন্ত্রণ ছিল। তাঁর অনুষ্ঠান সেখানে মোহিনী চাটার্জী নামে জনৈক বিতর্কিত ব্রাহ্মসমাজীর নির্দেশ কম কার্যকর ছিল না। পরলোক, অতীন্দ্রিয়তা, অতিপ্রাকৃত, জাদু, যোগক্রিয়া, স্বপ্ন, সমাধি, জ্যোতিষ ইত্যাদিতে তাঁর আকর্ষণ, এবং সর্বোপরি 'এ ভিশন' নামে তাঁর 'দৈব-তত্ত্ব'-এর সৃষ্টি সংস্করণে বেদসম্মত ও বেদবাহ্য নানা উপকরণের ব্যবহার হিন্দু-সংস্কৃতির প্রতি তাঁর নানা সময়ের আনুগত্যকে ঘনে রেখেছে। মনে পড়ে, স্বর্ণযুগের বনস্থলীবর্তী এক ভারতীয় মন্দিরের পটভূমিকায় 'অনসূয়া ও বিজয়া' নামে তাঁর প্রথম কবিতার বইয়ের একটি সংলাপিকা লিখিত হয়েছিল। আর একেবারে শেষজীবনেও একদিকে পতঞ্জলির ভূমিকা অন্যদিকে শ্রীপুরোহিত স্বামীর সহযোগে দশখানি প্রধান উপনিষদ অনুবাদে তিনি সক্রিয় হয়েছিলেন।

এই প্রত্যক্ষগোচর তথ্যের তলায় অন্তঃসলিলা কয়েকটি সূত্রও মনে আসে।

যেকোন মানদণ্ডের মতনমাপের সাদা-বৈঠক থেকে নিকল কবিতা এবং শিল্পের প্রতীকধর্মের প্রসঙ্গ আহরণ করে নিয়ে গিয়ে ইয়েট্‌সকে উৎসর্গ করেছিলেন আর্থার সাইমন্স, আর লণ্ডন শহরের চেসায়ারচিজের হাইমার্কেট ক্লাব-এর সদস্য সেই রম্যাবেষ কবি-কথক অচিরকালের মধ্যে ঐ ফরাসী প্রসঙ্গকে ইঙ্গিতময়তো গন্ধে সিটে কাজে লাগিয়েছিলেন : তিনি প্রায় নিঃসঙ্গ প্রেরণায় গভীর জটিল অতল ও উন্নত অর্থের খোঁজে চালিত করেছিলেন কবিতাকে, আর তার পিছনে পরোক্ষভাবে অন্তত বেদান্তপ্রস্থাননির্দেশ নন্দনতত্ত্বের গূঢ় সাদৃশ্য আছে। যে সাজেসটিভনেসকে শিল্পের পরমার্থ বলে তিনি চিনেছিলেন, তার সঙ্গে আমাদের ধ্বনিবাদীদের উপস্থাপিত ব্যঞ্জকত্বগুণের তফাৎ অল্প। এই মিল খুব একটা আকস্মিক নয়। আপন অন্তরাত্মার নির্দেশে একেবারে নিজের জন্য এক ধর্ম ও বীক্ষা গড়ে তুলেছিলেন, তারই প্রভাবে তাঁর চেনা গোপন কথার মতো সংবৃত আর রহস্যাচ্ছন্ন সূক্তের মতো বহুব্যাপ্তিমান হয়ে উঠেছিল। তাঁর প্রায় সব প্রধান কবিতাই তত্ত্বনিষ্ঠ, সেই তত্ত্ব তাঁর পরিচিত সন্ধ্যাস্বভাবনার নির্যাস। তার মধ্যে জীবনের অধ্যাত্ম প্রসঙ্গের নৈর্ব্যক্তিকতা আছে কিনা সন্দেহ, কিন্তু প্রীকদর্শন কিংবা এক ধরনের প্রাচ্য সহজিয়া তত্ত্বের উপস্থিতি অতিস্পষ্ট। রূপবান পৃথিবীকে নিরঞ্জন চরম তত্ত্বের সপ্রশংস প্রকাশ বলে কোনসময়ে তিনিও অভিহিত করেছিলেন। ধ্যানমগ্ন মৃত্যুঞ্জয় সমাধির মধ্যে পরমানন্দময়ী বাইজানটিয়ামের অমর রূপটিকে তিনি মনশ্চোখের করতে চেয়েছিলেন,সেই অংশ ঘোষার সময় যাদুকর কবির তুরীয়াবস্থার কথা মনে হয়।

আমাদের লাহক-শিল্পীরা অন্তরাকাশে অধিষ্ঠিত সত্যকে তাঁদের দেবতাকে প্রতিষ্ঠাপিত করার সাধনা করতেন। তার জন্য নিরুদ্ধ যোগ-ধ্যানের প্রয়োজন তাঁরা অনুভব করেছিলেন। পর-লোকের এবং প্রজ্ঞাবস্থার বাস্তিকে প্রত্যক্ষ করার জন্য যোগ-তন্ত্র এবং ক্রিয়া-তন্ত্রের দিকে সযত্নভাবে ইয়েট্‌স ঝুঁকেছিলেন। একসময়ে শ্রীমতী ইয়েট্‌স নিয়মিত মিডিয়ম হিসেবেও কাজে লেগেছিলেন। আর তাঁর আচরণীয় অহং-মার্গের জন্য যে চীনা-জাপানী শিল্পতত্ত্বকে তিনি সালিশী মেনেছিলেন সেই 'ঝাঁন' বা 'জেন'-শব্দ দুটি যে মূলত আর্যভাষীয় 'ধ্যান' এই শব্দ থেকে পালি 'ঝান' হয়ে ঐ ভাষায় পরিগৃহীত হয়েছে, আর নিষ্ক্রিয়ার্থ-সংবেদ, এই কথা জানার পরে নিজেদের বিষয়ে না হোক ইয়েট্‌স-এর সম্পর্কে অন্তত আরো সচেতন হয়ে পড়া ছাড়া উপায় থাকে না।

আমাদের ইয়েট্‌স-চর্চায় সবটা কারণই অবশ্য অনুরাগ নয়, কিন্তু যেহু

অবশ্যই অনুযোগ। পরবর্তী জীবনে ইয়েট্স রবীন্দ্রবীক্ষায় বিরাগ প্রকাশ করেছিলেন এবং ভারতীয়তায় অনুত্তর করেছিলেন নির্বাক শীতলতা। তার ফলে আমাদের কারও চোখে ইয়েট্স-এর এবং কারও চোখে রবীন্দ্রনাথ ও ভারতীয়তার অন্যায়গুলি প্রকটিত হয়েছে।

২

আত্মসর্বস্ব শুদ্ধতাবনা দিয়ে নিজের চারিদিকে যতদূর দুষ্প্রবেশ্য দুর্গপ্রাকারই গড়ে তুলুন না কেন, ইয়েট্স-এর কবিতার পরিদৃশ্যমান উপরিতল অধিকাংশতই এমন আশ্চর্য সুলিখিত যে তাঁর রচনার উৎকর্ষ কখনোই দৃষ্টি এড়ায় না। তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ডাবলিন অ্যাবি থিয়েটারে আইরিশ আকাডেমির বন্ধুসমাগমে বার্ষিক ইয়েট্স-বক্তৃতায় এলিয়ট বলেছিলেন ইয়েট্স তাঁর স্ব-কালের স্ব-ভাষার এবং তাঁর বিবেচনায় যে কোন ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। ঐ প্রশস্তি-বাক্যটি পরে তাঁর নিবন্ধ থেকে এলিয়ট পরিহার করেছিলেন। কিন্তু ইয়েট্স ও এলিয়ট-এর আজীবন শীতল সম্পর্কের কথা মনে ভাবলে ঐ বর্জিত বাক্যটিকেই আমাদের আরো স্পষ্ট করে জানা হয়।

নিজেকে একসময় ইয়েট্স নিজেই শেষ-রোমান্টিকদের দলভুক্ত করেছিলেন। বিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে, পশ্চিম আধুনিকতার আবর্তে দাঁড়িয়ে সমস্ত পুরোনো স্বপ্ননিঃশ্বাসকে পুনর্বিচারে যখন তিনি পরীক্ষিত করে নিতে শুরু করলেন তখন বোধ করি তাঁর কবিতার অন্তঃশীল অবিনশ্বরতাই প্রমাণ হলো। তাঁর কবিতায় যে স্রোতল রূপপরিণাম নেই, তাঁর কাব্যবিন্যাসে যে রূপাগত আত্ম-খণ্ডন আর পালাবদল, এবং তাঁর নিজের মধ্যে যে বেরূপ্রমাণ অসঙ্গতি—তাতেই তাঁর কবিতা আমাদের জন্য চিরকালীন সম্পদ আহরণ করে রেখেছে। কেউ বলেছেন, তিনি ভিক্ত মুহূর্তের থেকেও সৌন্দর্য জিনে নিয়েছেন। অপর কেউ বিশ্লেষণ করেছেন, নিজেকে নিঃশেষে প্রতিপাদন করার পরে নিজের সফলতাগুলিকে অনুবর্তন বা অনুকরণ না করে নিজের সত্তার বিপরীত একটি সত্তা, বি-সত্তা, তিনি তৈরি করে নিলেন। প্রত্যয়ক ও প্রজ্ঞাদক তাঁর মুখোশের রহস্যও রয়েছে এরই মধ্যে। তাঁর শুদ্ধায়নতন্ত্র তাঁর কবিতার রক্ত ও মাংসের সম্ভবতার মধ্যে অর্ধস্ফুট আরেক রকম মহিমায় অধিষ্ঠিত হলো। তাঁর কবিতায় বারংবার আত্মপরীক্ষার মধ্যে সমস্ত আধুনিক কবিতারই অগ্নিপরীক্ষা ঘটেছে।

গতানুগতিকতার হাত থেকে কবিতাকে বাঁচাতে বরাবর তিনি নাটকবিতা ও নাটকের অনুগত থেকেছেন, বলেছেন রিচার্ড এলবান। ইয়েট্‌স নিজেও নিঃসঙ্গতার হাত থেকে বাঁচবার জন্য, সমাজজীবনের জনতরঙ্গে উদ্ভাসিত হবার জন্য নাটকের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য সেই বহুশ্রুতি নাটককে কলিত শিল্প বলে পরিচয় দিতে গিয়ে তার মধ্যে তিনি ভাবনারই গুরুত্ব দিয়ে ফেলেছেন। আর সেই কথাই স্পষ্ট হয়েছে যখন আইরিশ নাট্য-আন্দোলনের মুখপাত্র হিসেবেও 'আমাদের নাটক সাহিত্য রচনা আর সাহিত্যেরই আদর্শে রচনা হবে'— বলে ঘোষণা করেছেন।

আসলে তাঁর অন্তর্ধারাই প্রবাহিত হয়ে এসেছে তাঁর নাটকেও। বহিঃপৃথিবীকে বহিঃপৃথিবী বলে নয় নিজের হৃদ্‌মণ্ডলের রূপায়িত প্রকাশ বলে গ্রহণ করার ফলে অ্যারিস্টটলীয় লোকরঞ্জকত্বের কষমূলায় নাটককেও তিনি ফেলতে পারেননি। বহিঃপৃথিবীকে মাঝে মাঝে ডেকে এনে ছুঁইয়ে ভাবনার পারে আসন মেলে দেওয়ার কথা তাঁর মনে হতো, নাটকের প্রাণ খুঁজেছিলেন ব্যঞ্জনাকে। চূড়ান্তভাবে implicit তাঁর নাটক, সমালোচকেরাও অনেক দিন পর্যন্ত নাটক বলে নয় তাঁর কবিচরিত্রের অন্তরতম পর্যায় বলেই সম্মানিত করেছেন তাঁর নাটককে। তবু বুঝতে দেরি হয় না অনন্য প্রতিপাদ্য তাঁর আদর্শ কাব্যনাটক। আর ১৯১৩র এলিয়ট 'অ্যাট দি হক্‌স ওয়েল'এর অভিনয় দেখে যে কারণে সর্বপ্রথম ইয়েট্‌স-এর প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেছিলেন তা ঐ নাটকের রচনারীতি। 'মঞ্চে কবিতা' থেকে 'মঞ্চের কবিতা'র কল্পতো-কবিত বিপদমুক্তি নিশ্চয় ইয়েট্‌স-এরও সাধনীয় ছিল। অথচ প্রতীকী উপস্থাপনার দুর্গম পথ পেরিয়ে উত্তরোত্তর তাঁর নাটক আইরিশ জাতীয় মঞ্চ থেকে শেষ পর্যন্ত বৈঠকখানার অনুষ্ঠানে এসে আশ্রিত হলো। কিন্তু কাব্যনাটককে সংলাপ-সমস্যার শরণীয় সমাধান করে দেওয়ার জন্য উত্তরসূরিরা যে তাঁর শেষদিকের 'পার্গেটরি'র কাছে নিঃশেষে ঋণী হয়ে গেলেন, একথা স্বয়ং এলিয়ট অকুণ্ঠভাবে জানিয়ে গেছেন।

'পার্গেটরি' জাপানী নো-নাটকের আদর্শে লেখা সব চাইতে কৃতার্থ নাটক। ১৯০৮ সালের মার্চ মাসে রচনা শুরু হয়, আগস্ট-এ অ্যাবি থিয়েটারে অভিনীত হয়। ইহলোক এবং পরলোক সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যয় এখানে লিখিত হয়েছে বলে ইয়েট্‌স স্বয়ং জানিয়েছেন। সমস্ত বক্তব্যটি এখানে তীব্র তীক্ষ্ণ সব রকম বাহুল্যবর্জিত একটিমাত্র সরল কাহিনীর সূচীমুখে বিধৃত হয়েছে। ঘটনাবাহুল্য

নেই, অন্তর্বাহুল্য নেই, কাব্যবিবিক্ত দুর্বলিত গদ্যাংশও পদ্যবন্ধে লেখা একাঙ্কিকা। গর্তন জোগ ইত্যাদির প্রভাবে যে অভিনব নকশাদার আদর্শ ও উপকারিতা জেনেছিলেন— যাতে মঞ্চ বক্তব্যের চেয়ে আকর্ষণীয় হয়ে না উঠে বরং বক্তব্যকে তলে তলে সাহায্য করে, রবীন্দ্রনাথের 'রঙ্গমঞ্চ' পড়লে বিষয়টি আরো সহজে বোঝা যায়, এই নাটকে তারও উত্তম প্রকাশ ঘটেছে। জাপানী ছবির মতো নিরাভরণ একটিমাত্র দৃশ্যপট। আর সব ছিলে ভয়ানক সংহত সাদৃশ্য ও অবোধ নাটক। অনেকেই একবাক্যে কেন যে 'পার্গেটরি'কে ইয়েট্স-এর শ্রেষ্ঠ নাটক বলে চিহ্নিত করেছেন তার যুক্তি সহজেই বোঝা যায়।

## পার্গেটরি

নাটকের পাত্রপাত্রী :

একটি ছেলে

এক বৃদ্ধ

দৃশ্যপট : পটভূমিকায় একটি পোড়ো বাড়ি আর এক ডাঙা গাছ

ছেলে। খিড়কি দরোজা, সিং দরোজা,
এধার-সেধার সারাদিনভোর সারারাতভোর
পাহাড়ে-পাহাড়ে, এই বোঝা কাঁধে ঘুরে মরছি, আরো
তোমার অবিশ্রান্ত বাকি শুনছি।

বৃদ্ধ। ভালো করে দেখ্ বাড়িটাকে।
আহা ওকে ঘিরে কত রঙ্গকথা কত কিংবদন্তী ভাবি মনে।
মনে আনতে চেষ্টা করি সেই যে সেই মাতাল মন-মাধা
তাকে কী শুনিয়েছিল মনের ভাঁড়ামী
কাস্তিকের মাঝামাঝি কালে, কিন্তু কিছুই মনে পড়ে না।
আমারই না পড়ে যদি, তাহলে জীবন্ত আর কার মনে আছে।
একটি বাড়ির যত রঙ্গকথা যত কিংবদন্তী সব কোথায় এখন,
চৌকাঠগুলো কি তার পুরোনের খোঁয়াড় তৈরির কাজে লেগে গেছে?

ছেলে। তাহলে এ রাস্তায় তুমি আগে এসে গেছ?

বৃদ্ধ। দেখ, ঐ চাঁদের আলো রাস্তায় ছড়ানো,
একটা ছেঁড়া ছাতা বাড়িটার ওপরে পড়েছে,
আর এগুলোর খুব ভেতরে ভেতরে অর্থ আছে ; ঐ গাছটাকে
দেখ, ভালো করে,
বলতো কার মতো ওকে দেখতে ?

ছেলে। ঠিক বোকা এক বুড়োর মতন।

বৃদ্ধ। কার মতো— যারই মতো হোক কিছু আসে যায় না।
আমি ওকে এক বছর আগেও দেখেছি অমনি ভাঙা,
অতএব আমি অন্য আরেক দেশায় চলে গেছি।
আমি ওকে পঞ্চাশ বছর আগে দেখেছি, তখনো
বাজ পড়ে ও এমন চৌচির কঙ্কাল হয়ে ওঠেনি, তখনো
সবুজ পাতায় ঢাকা পুরুষ পাতার ঘাস, মানুষের মতো ঘন পাতা,
যেমন চকচকে আশা। দাঁড়া ঐখানে, আর দেখ,
কেননা ও-বাড়ির ভেতরে কেউ নিশ্চয় জানিস হয়ে গেছে।

[ ছেলেটা বোঝা নামিয়ে রাখলো আর ঘরোকার
কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। ]

ছেলে। কই কেউ নেই তো এখানে।

বৃদ্ধ। কেউ একজন ঠিক আছে— ঠিক।

ছেলে। মেঝে উঠে গেছে, কোনো জানলায় কপাট নেই, চাঁদ
যেখানে থাকার কথা দরাদরি আকাশ সেখানে।
এক টুকরো ডিমের খোলা পড়ে আছে, বোধ হয় দাঁড়কাকটার
বাসা থেকে
হাওয়ায় উড়ে এসেছে।

বৃদ্ধ। তা সত্ত্বেও ঠিক কেউ আছে
যাদের খোঁজাই ভাবনা যা গেছে, যা আছে— তার জন্যে :
শোষনবাদের সব আত্মা যারা ঘিরে ঘিরে আসে
চেনা পথে পথে আর মানুষের বলতে নেই তারা।

ছেলে। আমার পাগলামি পেয়ে বসেছে তোমায়।

বৃদ্ধ। তারা কেন বলো
তাদের সমস্ত পাপ, আর শুধু একবার নয়

বার বার করে, অবশেষে জানতে পারে
তাদের সমস্ত সেই স্বকৃত পাপের পরিণাম
তাদেরই ওপরে কিংবা অন্যদের ওপরে পড়েছে ;
অন্যদের ওপরে পড়লে সেই অন্যেরা সহায় হতে পারে,
কেননা যখন সেই পরিণাম সন্তানদের দিকে
স্বপ্নেরও তখনই ইতি ; যদি নিজেদেরই পরে পরিণাম বাজে
কোথাও সহায় কেউ থাকে না কেবল নিজেদের
ভরসা শুধু আর ঈশ্বরের কৃপা ছাড়া।

ছেলে। থাক থাক যথেষ্ট হয়েছে।
বাঁচকাকেদের সঙ্গে কথা বলো, কথা যদি না বললেই নয়।

বৃদ্ধ। চুপ কর্। যোস্ ঐ পাথরের ওপরে গিয়ে যোস্।
ঐ সেই বাড়ি আমি একদিন জন্মেছি যেখানে।

ছেলে। ঐ যজ্ঞ পুরোনো বাড়িটা যেটা পুড়েছিল আগুনে, তাই না?

বৃদ্ধ। আমার মা— মানে তোর ঠাকুমা— ও বাড়ি তাঁরই ছিল,
এই সব সুন্দর দৃশ্য, এই গ্রামাঞ্চল — সব তাঁর,
এই কুকুরের খর, আস্তাবল, সুন্দর সুন্দর ঘোড়া, সম্রান্ত কুকুর
মৃগয়া-র ঘোড়দৌড়ের জন্যে তাঁর যে ঘোড়াটি ছিল, সেখানে বাবার সঙ্গে
দেখা তাঁর, প্রতিযোগিতার জন্যে সবে তোলা ঘোড়ায় সহিস,
তার দিকে তাকালেন আর তাকে বিবাহ করলেন।
মা-র মা অবশ্য আর কোনোদিন মেয়ের সম্পর্ক
রাখেন নি, ঠিকই করেছিলেন নিশ্চয়।

ছেলে। কার জানা আছে কী ঠিক কী ভুল?
ঠাকুর্দা অন্তত জিতলেন মেয়েটিকে সম্পত্তিসমেত।

বৃদ্ধ। তিনি দেখলেন তাকে আর তাকে বিবাহ করলেন,
আর আমার বাবা— সব দু-হাতে উড়িয়ে দিল তাঁর।
চুলোয় যাক কুকীর্তিগুলো কানে তাঁর আসে নি অবশ্য,
কেননা আমার জন্ম দিতে তাঁকে মরতে হয়েছে।
বহু লোকেরা সব এ বাড়িতে জন্মেছে মরেছে,
ম্যাজিস্ট্রেট, সেনাপতি, বিধানসভার সদস্যেরা,
অধিপতি, রাজপাল, আর তারও আগে

সেই সব মানুষ যারা যুদ্ধেছিল আজিম-এ বরেন-এ।
কেউ কেউ রাষ্ট্রের কর্তব্য ধারা এ বাড়ি থেকেই গিয়েছিল
লণ্ডনে, ভারতবর্ষে, কেউ বাড়ি ফিরেছে মরতে।
অথবা লণ্ডন থেকে প্রত্যেক বসন্তে ফিরে এসেছে প্রবাসী
মুলভ বাদিচা ভরা মরশুমী ফুলের শোভা দুটি চোখ ভরে দেখতে।
সেই সব বিশাল গাছ তারা ভালোবেসেছিল যেগুলো
কাটিয়েছিল নিজে
তোর ঠাকুর্দারা তার ছেলে যাওয়া ফুরোয় যেন মেটাতে,
ঘোড়ণৌড়ের
বাজীর ওপরে, মদে, আর মেয়েছেলের ওপরে।
তারা ভালোবেসেছিল বাড়িটাকে, ভালোবেসেছিল বাড়িটার
উঠোন— আঙিনা— চলাকেরার জটিল সব গলি,
আর আমার বাপ সেই বাড়িটাকে খুন করলো, অমন এক বাড়িকে
খুন করা
যেখানে নাবজাত সব মানুষ কাটিয়ে গেছে, বিবাহিত হয়েছে, মরেছে,
আমি আজ প্রাণদণ্ডযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করছি।

ছেলে। হায় ভগবান! কিন্তু তোমারও তো জোর বয়াত ছিল!
দিব্যি সব বেশ-বাস, হয়তো চমৎকার এক ঘোড়াও ছিল বা।

বৃদ্ধ। যাতে তার কুল-শীল-শিক্ষা দীক্ষা আমি না কাটিয়ে উঠতে পারি
তার জন্যে সে আমায় ইস্কুলে পাঠায়নি কোনোদিন,
বাড়ির কিছু আমারও মধ্যে আছে বলে শুধু কেউ কেউ আমায়
একটু ভালোও বাসতো
এক বন-রাখার বই পড়তে শিখিয়েছিল আমাকে,
আর এক গির্জার পাদ্রী আমায় লাতিন পড়তে শিক্ষা দিয়েছিল,
বাড়িতে পুরোনো বই ছিল ঢের, আঠারো শতকী
করাসী কায়দায় অতি সুন্দর বাঁধানো, ঘর ভরা
নতুন পুরোনো মিলে কয়েক টন বইয়ের সংগ্রহ ছিল।

ছেলে। আর তুমি, তুমি যা আমায় কোন শিক্ষাটা দিয়েছ?

বৃদ্ধ। এক উঁচু কিরিঅলা কাদারীর মেয়ের পেটে যে মেজদাকে
খানায় আমার গর্ভে জন্ম দেয়

তার উপযুক্ত শিক্ষা নিশ্চয় দিয়েছি।
যখন ষোল বছর সবেমাত্র বয়েস আমার
মদে চুর হয়ে বাবা বাড়িটায় আগুন ধরিয়ে দিল এসে।

ছেলে। কিন্তু আমারও তো আজ ঐ বয়স, ঠিক ষোল বছর বয়স
ভূতের মেলায় এসে।

বৃদ্ধ। সব কিছু পুড়ে গিয়েছিল ;
বইগুলো, প্রকাণ্ড লাইব্রেরী, সব আগুনে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল।

ছেলে। রাস্তায় যা-সব বলাবলি হয় তা কি সত্যি সমস্ত তাহলে,
তুমি সেই জলন্ত বাড়ির মধ্যে নিজে হাতে বাপকে মেরেছ ?

বৃদ্ধ। আমরা দু-জনে ছাড়া এখানে আর তো কেউ নেই ?

ছেলে। না বাবা, আর কেউ নেই।

বৃদ্ধ। তবে শোন্, আমি তাকে ছুরি বসিয়েছি,
সেই ছুরি — যা দিয়ে রোজ থালার খাবার কেটে খাই,
তার পরে আগুনের মধ্যে তাকে ফেলে রেখে গেছি।
ওরা তাকে ছিঁচড়ে বের করেছিল, কেউ কেউ দেখেছে
হয়তো ছুরির ক্ষত, কিন্তু সুনিশ্চিত হতে পারেনি নিশ্চয়—
আগুনে সারাটা দেহ কালি মেরে গিয়েছিল ঝলসে গিয়েছিল।
তারপর কেউ কেউ তার ঘরের টবার কাঠগড়ায়
আমায় ফাঁক করবে বলে শাসিয়েছিল শুনেছি,
ঝগড়াঝাঁটি, আমার ওর দেখানো—ইত্যাদি পাঁচকান হতে দেখে
মন-রাখা লোকটি কিছু পুরাতন কাপড়-চোপড় দিল ছুঁড়িয়ে, এবং
আমি পালালাম, জল-খাটলাম এখানে সেখানে,
শেষে হয়ে উঠলাম রাস্তায় রাস্তায় ফিরিঅলা.
খুব একটা সুখের কিছু যাবেনা নয়, তবু বেশ ভালো
কেননা আমি-তো সেই বাপের বেটা-ই,
যা আমি করেছি আর এখনো যা করতে পারি তাতে তারই প্রমাণ
রয়েছে।

ঐ শোন্ ঘোড়ার খুরের শব্দ। কান পাত্, শোন্।

ছেলে। কই আমি কিছু তো শুনছি না।

বৃদ্ধ। ঐ তো ঘোড়ার কদম খটাখট্।

আজকের রাত হলো আমার বাসর
বিবাহরাত্রের শুভ বাসরিকী-রাত সম্ভবত,
হয়তো আজকের রাত আমারও জন্মের বাসরিকী।
ঘোড়ার ঘুলো উড়িয়ে বাবা ফিরছে গুঁড়িখানা থেকে,
বগলদাবায় আনো পুরো এক হুইস্‌কি-বোতল।

[ একটি জানলা আলোকিত হয়ে এক তরুণীকে দেখা গেল ]

চেয়ে দেখ্‌ জানলাটার দিকে; এখনো ঐখানে সেই মেয়ে
দাঁড়িয়ে উৎকর্ণ হয়ে আছে, দাস-দাসী সব অঘোরে ঘুমিয়ে
ও একা দাঁড়িয়ে আছে, আর পতিদেবতাটি ওর
অনেক রাত্রিতক গুঁড়িখানা সরগরম করে ফিরলো।

ছেলে। সমস্ত মেয়েলভোগ্য বস্তু এক শূন্য ছাড়া কিছুই দেখছি না।
সমস্তই তোমার মনগড়া। না কি তুমি একদম পাগল হয়ে গেলে!
তোমার পাগলামী দেখছি দিন দিন বেড়েই চলেছে।

বৃদ্ধ। ঐ শোন্‌ কত তোর আওয়াজ এখন, কেননা সে
ছুটিয়ে চলেছে ঘোড়া পাথর বাঁধানো রাস্তা ধরে—
এখন অবশ্য জংলা পেরিয়ে গিয়েছে। শোন্‌, থেমে গেল ঘুরের আওয়াজ,
বাড়ির পেছন দিকে সে বোধ হয় এখন গিয়েছে,
অর্থাৎ ঘোড়াটা রাখতে আস্তাবলে গেছে।
আর সেই ফাঁকে সে নেমে এসেছে দরজা খুলে দিতে।
আজ রাতে সেও তার স্বামীর চাইতে বেশি ঘুম নয়,
সে-যে আধা মাতাল তাতেও তার আসে যায় না কিছু,
সে তার স্বামীর জন্যে উন্মাদ আজকে। ঐ দু-জনে উঠলো সিঁড়ি বেয়ে।
মেয়ে তার নিজের আপন ঘরে তাকে নিয়ে এলো।
আর সেই ঘর এখন বিবাহবাসর।
জানলায় আবার সেই আবছা আলো।

ঐ ঘুমন্ত তোমার যেন না ছোঁয়। একথা ঠিক নয়—
মত অবস্থায় কেউ কষ্ট দিতে কে বলে পারে না।
ও যদি তোমায় ছোঁয় ও তোমায় পোয়াতি করবে—
আর তুমি উদরে ধরবে ওরই হত্যাকারীকে স্বয়ং।

কালা ! দু-জনেই কালা ! যদি টিল ছুঁড়ি,
যদি পাটি ছুঁড়ি তাহলেও কেউ শুনতে পাবে না ;
আর আমার পাগলামীর সেও একটা অলন্ত প্রমাণ।
একটা সমস্যা তবু হয়ে যায় : ঐ মেয়েটিকে বাঁচতে হবে
সব কিছুর মধ্যে দিয়ে নিখুঁত বিশ্বস্তভাবে ওকে বাঁচতে হবে,
ভীষণ অনুতাপের তাড়নায় ওকে বেঁচে থাকতে হবে, আর তা সত্ত্বেও
ও কি সেই স্মৃতিচিহ্ন আমার জীবন্ত করে তুলতে পারবে, আর
তার মধ্যে এক তিল সুখ খুঁজে পাবে না, আর যদি তাই না পায়—
যদি মনস্তাপ আর আনন্দ দু-টিই থাকে একত্রে সেখানে,
তার মধ্যে কোন্‌টা বড় ?

আমার তো শিক্ষা-দীক্ষা নেই।

নিয়ার তাতু লিয়ানকে ; তাতে আর আমাতে
ঐ সমস্যার জট খুলবে বসে, আর ততক্ষণে
তোমাদের ওপরে ওরা দু-জনে উধাও হয়ে গেছে
আমাকে বিয়েতে।

ফিরে আয় ! ফিরে আয় !

ভেবেছিলি তুই আমার চোখে ধুলো দিয়ে সরকে যাবি,
আমারই টাকায় খলি তোর দু-হাতের মধ্যে ধরা,
তুই ভেবেছিলি আমি বকছি বলে কিছুই দেখছি না।
এতক্ষণ ওরই জন্যে তুই ঐ বোকা হাতড়াচ্ছিলি।

[ জানলার আলো আবছা হয়ে নিবে গেল।

ছেলে। আমাকে আমার ছাড়া আপনা তুমি কখনো পাওনি।

বৃদ্ধ। যদি তা দিতাম, তবে তোর এই কাঁচা বয়েসে তা কি
রাখতে পারতি ? সব মদের সেরুনে ওড়াতি না ?

ছেলে। যদি ওড়াতাম তাই তাতেই বা কী হতো ? আমার
পাওনা বুঝে নেবার— তা ইচ্ছেমতো খরচের অধিকার আছে।

বৃদ্ধ। দেখি ঐ খলি, আর একটাও কথা না, ব্যাস, চুপ।

ছেলে। না দেবো না।

বৃদ্ধ। সমস্ত আঙুল গুলো ভেঙে দেবো তোর।

[ থলিটা নিয়ে ওরা ছটাপটি করতে লাগলো। যারা-
যারির মধ্যে থলিটা হাত থেকে খসে গিয়ে মাটিতে সব
টাকা ছড়িয়ে পড়লো। বৃদ্ধ টলমলিয়ে কিন্তু বসে পড়লো
না। ওরা দু-জনে দু-জনের দিকে কটাক্ষ করতে লাগলো।
জানলাটা আবার আলোকিত হয়ে উঠলো। দেখা গেল
একজন লোক গোলাপে হুইস্‌কি ঢালছে বোতল থেকে। ]

ছেলে। যদি তোমাকেও আজ খুন করি? তুমি ঠাকুর্দাকে মেরেছিলে,
কেননা সে ছিল বুড়ো আর তুমি বেশ বুড়ো ছিলে।
দেখ আজ আমি বুড়ো আর তুমি বুড়ো ও অথর্ব।

বৃদ্ধ। (জানলার দিকে তাকিয়ে) কত ভালো দেখতে, সেই ষোল বছরের—

ছেলে। কী বলছো বিড়বিড় করে?

বৃদ্ধ। মেয়াৎ কিশোরী— কিন্তু তবু
জানাটা উচিত ছিল স্বামী তার সগোত্র হয়নি।

ছেলে। কী বলছো? আমাও ওই বদ্‌বুদ্ধি তোমার?
[ বৃদ্ধ জানলার দিকে আঙুল দিয়ে দেখালো। ]
হেই ভগবান! একি? জানলাতে সত্যিই দেখছি আলো,
আর কেউ যেন ঠিক জানলায় দাঁড়িয়ে, কিন্তু আমি
সবই তো-পোল-মেলে আগুনে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তা তো জানি।

বৃদ্ধ। জানলায় আলো জ্বলেছে কেননা এখন আমার বাবা
হুইস্‌কির গেলাস খুঁজতে এসেছে ও-ঘরে।
দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঐ ক্লান্ত একটা ঝাড়ুর মতন।

ছেলে। একটা বৃদ্ধ, ক্লান্ত, খুন হয়ে যাওয়া মানুষ।

বৃদ্ধ। 'রোসরেড খুনে আদম পড়িলো ঢলিয়া':
কোথায় পড়েছি যেন কথাগুলো?
আর শুধু জানি
জানলায় হেলান দিয়ে সত্যি সত্যি কেনো কিছু নেই
শুধু সেই আমার বাবার মনে রাখা ধারণাটি ছাড়া;
মরে গিয়ে যা আমার মনস্তাপে আজ বড় একা।

ছেলে। আমার জন্মের আগেই যে দেহ গলিত একতাল
হাড় হয়ে গিয়েছিল। ভয়ঙ্কর! বড় ভয়ঙ্কর!
[ ছেলেটা দু-হাতে তার চোখ ঢেকে ফেললো। ]

বৃদ্ধ। জানলায় দাঁড়াবো ঐ ভয়টা ও কিছুই জানবে না, কেননা ও
আসলে কিছু না, আমি জানলার নীচে দাঁড়িয়ে যদি খুন করি
কারোকে, ও এমনকি বাবা ফিরিয়ে তাকাবেনা পর্যন্ত এদিকে।
[ ছেলেকে সে ছুরি বসালো। ]
আমার বাপ আর আমার ছেলে এই এক যুগে ছুরিতে!
ঐ শেষ হয়ে এলো – শেষ হয়ে এলো — শেষ হয়ে এলো —
শেষ হয়ে এলো —
[ বারবার সে এলোপাথাড়ি ছুরি চালাতে লাগলো।
অন্ধকার হয়ে এলো জানলা। ]
'ঘুমোয়ে খোকা ঘুমোয়ে, তোর বাপ হলো রাজকুমার
তোর মা হলো রূপকুমারী রাজকন্যে, খোকা আমার।'
না-না, এই সব আমি সন্তবত বইতে পড়েছি,
আর যদি গাই আজ তবে আমি যা-কেই শোনাবো,
আমার গলায় কিন্তু সুর নেই।
[ শুধু সাদা আলোয় উজ্জ্বল গাছটা ছাড়া সমস্ত ঘর
অন্ধকার হয়ে গেল। ]
ভালো করে দেখ গাছটাকে।
প্রায়শ্চিত্ত-করা শুভ আমার মতন ঐ দাঁড়িয়ে রয়েছে,
আপাদমস্তক দিব্য, মিষ্টি, আর ঝলমলানো আলো।
ওগো মা আমার, ঐ জানলা কেন অন্ধ হয়ে এলো,
কিন্তু তবুও আলোর মধ্যে রয়েছ কেননা
সব পরিণাম আমি নিকেশ করেছি নিজে হাতে।
আমি ঐ ছেলেকে খুন করেছি কেননা ও যদি বড় হতো
ও কোনো মেয়ের মনে নাড়া দিত নিশ্চয় একদিন,
ও কারোকে জন্ম দিত, আর পাপ বইয়ে দিত সামনে ভবিষ্যতে।
আমি তো অমর্ত্য সোড়াকপাল নই ও দীর্ঘ কায়ও
কতি করি আমার সামর্থ্য নেই। যখন কের এই
পুরোনো ছুরিটা নিয়ে এক ধাবলা সবুজ ঘাসে গিয়ে
তুলে নেব, ঘষে ঘষে আবার চকচকে করে নেব।
তারপর ওর হাত থেকে ছিটকে-পড়া টাকাগুলো কের তুলে নেব,

আর চলে যাবো এক অনেক দূরের দেশে, আমার সেখানে
নতুন মানুষের আমার পুরোনো সব ভাষারা শোনাবো।
[ ছুরিটা মুছে পরিষ্কার করে নিল আর টাকাগুলো
কুড়িয়ে নিল। ]
আমার ঘুমের শব্দ। হয়ে ভগবান,
কী ভীষণ তাড়াতাড়ি ফিরে আসছে— কী ভীষণ ক্রুত— ঐ বুঝি—।

মেয়েটার মন আর সেই স্বপ্ন ধারণ করতে পারে না কিছুতে।
দু'চ-বার খুনী আর সব একেবারে অকারণে,
আর সেই অন্ধ কালরাত্রি তাকে নিত্য ভীষণ করে তুলতে হবে সেই
শুধু একবার নয়, বারংবার।
হায় ভগবান,
মায়ের আত্মাকে তার ফিরে যাবা থেকে মুক্ত করো।
এর বেশি মানুষ পারে না। দাও হে ঈশ্বর দাও সব ভুলিয়ে
জীবিতের আলা আর মৃতের সন্তাপ।

সমাপ্ত

অনুক্রম

ইয়েট্‌স-এর জীবনীকার জে. এম. হোন ইয়েট্‌স-এর নিজের বলা একটি ভূতের গল্প থেকে এই নাটকের কাহিনী গ্রহণ করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। সেই গল্পে একটি পরিবার মধ্যে নিঃসেষ, বাড়িঘর ভস্মীভূত, আর এক বৃদ্ধ রমণীকে তার বংশধরেরা বারংবার আত্মহত্যা করতে দেখেছিল।

'পার্সেচরি'র আপাতদৃষ্ট কাহিনীর তলায় বলা যায়না আরো অনেক কথা প্রচ্ছন্ন আছে। অনেকে বলেছেন, বৃদ্ধ ও ছেলেটির মধ্যে পুরোনো ও নতুন আইর্ল্যাণ্ডের এবং পুরোনো ও নতুন সভ্যতার স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ দেখা হয়েছে। ছেলেটিকে হত্যা করে বৃদ্ধ পাপস্রোতকে রোধ করার চেষ্টা করেছে, তা নতুন অস্ত্রের মূল্যায়নের বিরুদ্ধে ইয়েট্‌স-এরও নিজের ইচ্ছা।

কিন্তু নাটকটি যেহেতু রূপক নয়, সাঙ্কেতিক, তাই এখানেই থামা যায় না। ইয়েটস যতই হিন্দু দর্শনে স্নাত হোন না আনন্দস্বরূপের কথা বলুন, মানুষের অপরিপূর্ণতা পাপ ও কলুষের কথা ভুলতে পারেননি। খ্রীষ্টীয় 'পারগেটরি'র বিধি অস্বীকার করেননি। এই নাটকের বিষয় প্রাক্তন-সম্পৃক্ত সন্তান, আর তার ক্লেশ-প্রশমন। এক প্রেতাত্মা রমণীকে তার শোষন-অনল থেকে মুক্ত করা— ক্রিয়াকাণ্ডে, তা না হলে প্রার্থনায়, এই হলো নাটকের প্রতিপাদ্য। অবশ্য মানে যেভাবে ঐতিহ্যসম্মত শোধনবিধি নিরবশেষে গ্রহণ করেছিলেন, ইয়েটস এর বেলায় তেমন হয়নি। সমালোচকেরা; অতএব এই নাটককে তাঁর 'ভিশন'-এর পাশে রেখে পড়তে পরামর্শ দিয়েছেন

'ভিশন'-এ যেহেতীত আত্মার মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য পরপর দুটি পর্যায় পরিকল্পিত হয়েছে। প্রথমটি প্রায়শ্চিত্ত পর্যায়, দ্বিতীয়টি পরিশোধিত অবস্থা। প্রায়শ্চিত্ত পর্যায়ের প্রথমে আত্মা তার পুরোনো জীবন অনুসরণ করে যায়, স্বকৃত ঘটনার হেতু ও পরিণাম নির্ণয় করে, সুখদুঃখের অতীত অচঞ্চলতা লাভ করে এবং প্রজ্ঞাবান হয়। ইয়েটস এর ভাষায় এই অধ্যায়টির নাম Dreaming Back, এটি আবেগ-ক্ষয়ের অধ্যায়। এর পর প্রজ্ঞাবান আত্মা তার পুরোনো জীবনপথে মৃত্যু থেকে জন্মের দিকে অগ্রসর হয়, সেটি Return, এবং অতঃপর যেমন ছিল তার ঠিক উল্টোটি অর্থাৎ বিপরীত বুনন করে, যার নাম Shiftings.

এর পর দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে থাকায় পরিশোধিত আত্মা, মোক্ষের সম্মুখে, ক্ষণিক মিলন ঘটে তার ঈশ্বরের সঙ্গে, Marriage সেই অবস্থার নাম। ক্ষণিক মিলনের পরে আবার সে ভবচক্রে প্রবাহিত হয়ে পড়ে।

এই পর্যায়গুলির সঙ্গে আমাদের মাণ্ডুক্য উপনিষদে বর্ণিত জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি— চৈতন্যেই এই তিন অবস্থার সাদৃশ্য অনেকে দেখিয়েছেন, এবং ইয়েটস-এর শোধন-ভাবনার সঙ্গে প্রাচ্য ভাবনাদির সম্পর্ক অনেকেই সুস্পষ্টভাবে নির্ণয় করেছেন। আমাদের সেই প্রসঙ্গে প্রয়োজন নেই। অনুসরণের চক্রে বন্দী এই নাটকের প্রেতার্ত রমণীটিকে মুক্ত করার জন্য তার প্রাক্তন সন্তানের ক্রিয়া ও প্রার্থনার প্রযত্নের মধ্যে এবং পটভূমিকার নিস্পন্দ গাছটির মৃত্যুশীতলতা ও চকিতদীপ্ত রোমাঞ্চের মধ্যেই আমরা অধিকৃত হয়েছি।

# এ যুগের একটি নাটক

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

হালে জর্মান লেখক রল্ফ হখ্‌হুথ-এর 'ডোয়্ টেল্‌ফেক্ট্রেটের' বা 'প্রতিনিধি'* নাটকটি সম্প্রতি অসাধারণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। একালের আর কোনও নাটক এতখানি তর্কবিতর্ক বিক্ষোভ ও প্রশংসার অধিকার অর্জন করতে পেরেছে কিনা সন্দেহ। ১৯৬৩ তে রচনা এবং প্রকাশিত হবার পর এরীন্ শোলা-র থেদু ইস্তাহারের সঙ্গে একে তুলনা করা হয়েছে, স্বর্গত আল্‌বের্ট শোয়াইৎসের একে 'অমানবতার বিরুদ্ধে সত্যধ্বনি' ব'লে অভিনন্দিত ক'রে গেছেন এবং কোন কোন নাট্যসমালোচক বলেছেন এ নাটক নাকি সমগ্র নাট্যশিল্পের ইতিহাসে প্রবলতম ঝড় তুলেছে। এমন কি বের্টোল্ট ব্রেখট্-এর সৃষ্টির চেয়েও হখ্‌হুথ-এর নাটক জনমনকে বেশি দোলা দিয়েছে এমন কথাও শোনা গিয়েছে।

এ আলোড়নের একটা কারণ বোধহয় এই, যে এ নাটক অভিনয় না হয়েও শুরুতরভাবে সমসাময়িক। সাম্প্রতিক নাট্যজগতের প্রচলিত ইডিয়মকে একরকম উপেক্ষা ক'রেও হখ্‌হুথ তাঁর বিষয়কে এমন শুরুগম্ভীরভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, যে অভিভূত আমাদের হতেই হবে। তার মধ্যে কোথাও কোনও ফাঁকি নেই, সস্তাগতানুগতিকতার স্থান নেই। যুক্তি ও বিবেকের যে আদর্শ এবং অনমনীয় সমন্বয়ে নাটকটি গ্রথিত হয়েছে, তার সামনে আধুনিকতার প্রশ্ন অনর্থক। অবশ্য নাট্যবস্তুই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে, নাট্যকার নন। এ হিসেবে হখ্‌হুথ অন্তত আঙ্গিকের দিক থেকে অনাধুনিক। কিন্তু যে জিজ্ঞাসা নিয়ে তিনি নিজে অস্থির হয়েছেন এবং আমাদের অস্থির ক'রে তুলেছেন, তা একই সঙ্গে এতই অমোঘ এবং এতই ঐতিহাসিক, আমাদের অস্তিত্বের তা এতই মূলগত প্রশ্ন, যে তাকে আজকের না ব'লে উপায় নেই। সেদিক থেকে হখ্‌হুথ সুস্পষ্টভাবে আধুনিক। এবং চিরকালের।

নাটকটির আখ্যানবস্তু নীতি এবং রাজনীতির মূল টানাপোড়েনে বাঁধা।

* জার্মান অনুবাদ 'দের ষ্টেলভের্ট্রেটের', অনুবাদক রিচার্ড্ ও ক্লারা উইন্‌স্টন্। গ্রোভ্ প্রেস্, নিউইয়র্ক।

একদিকে তার নাৎসিবাদের বাস্তবায়ক মূলতত্ত্ব, অন্যদিকে ভক্তার্থী মানুষের অসহায় বিবেক। এ দুয়ের প্রতিঘাতেই নাটকটির সংগঠনে সহায়তা করেছে। সবাই জানেন কী ভাবে হিটলারের তৃতীয় রাইখ্ যুরোপের বাট লক্ষাধিক ইহুদিকে বাষ্পযন্ত্রে আহুতি দিয়েছে এবং কীভাবে জর্মানির ক্রুপ্, বা আই. জি. ফার্বেন্-এর মতো খ্যাতনামা শিল্পপতিরা এ ব্যাপারে তাকে যন্ত্র, অর্থ, প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি জুগিয়েছে। যাঁরা নুরেমবের্গ-এর বিচারের ইতিহাস অথবা আন্দ্রুক আইখ মান্-এর জীবনী অনুধাবন করেছেন তাঁদের কাছে এর কিছুই অজানা নয়। যাঁরা আরে ফ্রাংক্-এর ডায়েরি পড়েছেন তাঁদের কাছে এর ব্যক্তিগত যন্ত্রণার দিকটিও অনায়াসে প্রতিভাত হবে। তাঁরা নিশ্চিত ব্যথিত হয়েছেন, আতঙ্কিত হয়েছেন, কিন্তু বোধকরি তাঁরা সবচেয়ে বেশি বিস্মিত হয়েছেন এর নির্বিকার যান্ত্রিকতার রূপটির কথা ভেবে। যারা মরেছে তারা অপমিত এবং তাদের যন্ত্রণা অসীম। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হ'ল এই, যে যারা মেরেছে তারা কেউই প্রচলিত অর্থে খুনী নয়, তারা আর সব দিক থেকেই সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ। তাদের সংসার ছিল, পরিবার ছিল, মানবিক সম্পর্কের বন্ধন ছিল। টেবিল চেয়ার নথিপত্রের সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং দৈনন্দিন পরিবেশে তারা যে অকল্পনীয় নৃশংসতার দায়িত্ব নিয়েছিল তার মধ্যে মত্ততা কিছুই ছিল না, পাপপুণ্যের সমস্যার কোনও আক্ষেপ ছিল না, এমন কি প্রতিদিনের পানাহারের নিয়মানুবর্তিতার মধ্যেও কোনও ত্রুটি ছিল না। অপাতত্তে তারা প্রায় সবাই ছিল বিশুদ্ধ আমলাতন্ত্রের একনিষ্ঠ কর্মচারী। এবং সেই কর্মচারিত্বের যে জড়তা, একদিক থেকে এ পরিপ্রেক্ষিতে বোধহয় সেটাই সবচেয়ে ভয়াবহ, এমন কি নির্যাতিতের যন্ত্রণার চেয়েও। কারণ দেহের মৃত্যু ভয়ঙ্কর হ'লেও তাকে বোঝা যায়, কল্পনা করা যায়। কিন্তু আত্মার মৃত্যু? তার রহস্য অপরিসীম। হিটলারের এই অনুচরগুলি সবাই কি তবে ছিল মৃত-আত্মা, যান্ত্রিক দেহবিশিষ্ট যুদ্ধোত্তোট যাত্র? কোলরিজ্-এর কবিতার সেই মৃত নাবিকদের মতো? এই প্রশ্নটিই সবচেয়ে দুর্বোধ্য এবং সবচেয়ে শিউরে ওঠার মতো। দেহের নীরবতা নয়, আত্মার নৈঃশব্দ্যই প্রকৃত ভয়ঙ্কর।

এই আত্মার নীরবতাই রথ্‌হফ-এর প্রকৃত বিষয়বস্তু, এবং এ নাটকের ভিত্তিস্বরূপ। কিন্তু তিনি সাধারণ নাৎসি কর্মচারীদের সম্পর্কে এ সমস্যা ততটা প্রযোজ্য ব'লে মনে করেননি, তাদের খুব দুর্বোধ্য ব'লেও তাঁর মনে হয়নি। তাঁর নাটকের কেন্দ্রতাঁর এখানে নয়, অন্যত্র। নাৎসিদের যে ছবি তিনি

এঁকেছেন, তাতে তাদের মূলসংগতি তাদের অজ্ঞাতসারেই নাটকের হ'য়ে দেখা দিয়েছে। হুগ্‌হুগ সম্ভবত এই কথাটাই বোঝাতে চান, এবং ইতিহাস অনেক জায়গাতেই তাঁর সপক্ষে সাক্ষ্য দেবে, যে এই নির্বোধ কর্মীদের অনেকেই সমগ্র কর্মপদ্ধতিটির সঙ্গে ছিল অপরিচিত। তারা এই নির্মম যাদুপত্রের শুধু আঁচড়, কিন্তু সম্পূর্ণ পরিণামটুকু জানত না। দু-একজন ছাড়া। হয়তো আলফ্রেড আইখ্‌মান্ সেই দুয়েকজনের অন্যতম। হুগ্‌হুগ নাটকে আউশ্‌ভিৎস্-এর যবনিকার যে ছবি এঁকেছেন, আইখ্‌মান্ তার পটভূমিতে দুয়েকবার দেখা দিয়েছে বটে, কিন্তু তাকে ভালোভাবে জানবার অবকাশ সেখানে আমাদের মেলে না। কিন্তু আইখ্‌মান্-এরও তলবওয়ালা ছিলেন, সমগ্র আউশ্‌ভিৎস্-এর মূল পুরোহিত হিসেবে যে চরিত্রটিকে নাটাকার দেওয়া হয়েছে, সে নিঃসংশয়ে আমাদের কৌতূহল জাগায়। তার ব্যক্তিগত রূপটি একান্তই রহস্যময়। এমন কি তার কোনও ব্যক্তিগত নামও নেই। নাটকের পাত্র হিসেবে তার পরিচয়, সে ডাক্তার। সবাই তাকে ডাক্তার ব'লেই জানে, সবাই তাকে ভয় পায়। তার নেতৃত্ব অসাধারণ, ব্যক্তিত্ব অনন্য। কিন্তু তার এই বাইরের রহস্যকে হুগ্‌হুগ দারুণভাবে দিয়েছেন তার অন্তরকে অপেক্ষাকৃত অর্থময় ক'রে তুলে। সে বৈজ্ঞানিক। তার যাদুমন্ত্র ঈশ্বরেরই বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক অভিযান। যন্ত্রপাতি দিয়ে সে ঈশ্বরকে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছে, লক্ষ লোকের সর্বনাশের মধ্য দিয়ে সে বিবেকের দৃঢ়ভিত্তিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হ'তে চেয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ঈশ্বরের কাছ থেকে সে কোনও সাড়াই পায়নি। এই তার চরম বিস্ময়। নাটকের পঞ্চমাঙ্কে রিকার্দো কন্ডানা তাকে সভয়ে যখন প্রশ্ন করে: 'কেন...কেন? কেন তুমি এ সব করছ?' ডাক্তার তাকে জবাব দেয়: 'কারণ আমি যে কোনও একটা উত্তর চেয়েছিলাম। তাই আমি এমন দুঃসাহস করেছি যা সৃষ্টির সুরু থেকে আর কেউ করে নি।'

'আমি ঐ বুড়ো ভদ্রলোকটিকে চ্যালেঞ্জ করবার শপথ নিয়েছি, তাকে এমন খোঁচান খুঁচিয়েছি যাতে উত্তর না দিয়ে তার আর উপায় থাকে না।'

'শোনো তবে সে উত্তর: একটি ছুঁচও আসেনি স্বর্গ থেকে, এই পনেরো মাসের মধ্যে একটি সাধারণ লঙ্কও নয়, অথচ এই পনেরো মাস ধরে আমি কত টুরিস্টকে স্বর্গে যাবার টিকিট দিয়েছি···অতএব সত্যি কথাটা হ'ল, যে আউশ্‌ভিৎস্ ঈশ্বরকে, সয়তানকে, পাপকে সব বাতিল ক'রে দিয়েছে। প্রাণ ব'লে আর কোনও ধারণা নেই, তার সম্পূর্ণ মৃত্যু ঘটেছে।'

এক হিসেবে এই ভাষ্যকারকে আমরা বুঝতে পারি, কারণ তাঁর প্রশ্ন আজ আমাদের প্রশ্নেরই কাছাকাছি। ঈশ্বরের এই নিষ্ক্রিয়তার নিরিকরতার কি কোনোই অর্থ হয় না? হুখ্‌হুস-এর সমস্ত নাটকটি অবশেষে এই প্রশ্নেই এসে পর্যবসিত হয়েছে, এই প্রশ্নেই তার মূল্য এবং তাৎপর্য। কিন্তু মনে রাখতে হবে হুখ্‌হুস অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্বের সমস্যা নিয়ে তত্ত্বকথা লিখতে বসেননি, তিনি মুখ্যত ধর্মযাজক নন, তিনি নাট্যকার। তাই এই তাত্ত্বিক সমস্যাকে রক্তমাংসের রূপ দিতে গিয়ে তাঁকে উপযুক্ত প্রতীক উদ্ধার করতে হয়েছে ইতিহাসের উপকরণের মধ্য থেকে। স্যানিশ নাট্যকার লোপে দে ভেগা-র মতন তিনিও জানেন, যে ইতিহাসের মুক্তির মাধ্যমেই ট্র্যাজেডি আপনাকে শিল্পরূপে বিন্যস্ত ক'রে তোলে, নইলে তো সে ধর্মগ্রন্থের অব্যক্ত আকৃতি হ'য়েই থাকত। হুখ্‌হুস তাই ইতিহাসের চতুর অলিন্দের মধ্য দিয়ে সমস্ত খুঁজে বেড়াতে চেয়েছেন ধর্মের সত্যকে নাটকের মতো অনুভবে করবার প্রয়াসে। এবং তার উপযুক্ত প্রতীক-আধার তিনি আবিষ্কার করেছেন তদানীন্তন পোপ পাচেল্লি, যাঁকে পিউস্-এর চরিত্রে। তিনিই এ নাটকের কেন্দ্র, তাঁরই নামে এ নাটকের নাম। তিনিই মানুষের প্রতিনিধি ঈশ্বরের কাছে, তাঁর সম্প্রদায় তথা বিশ্বমানবের বিবেককে ব্যক্ত ক'রে তোলার অবিসংবাদিত অধিকার তাঁরই। তবে মনুষ্যত্বের এই চরম দুর্দিনে পোপ কেন নীরব রইলেন? অস্তিত্বের অধিকারে যারা এত বড় আঘাত হেনেছে, তাদের বিরুদ্ধে একবারও কেন তাঁর কণ্ঠ শব্দিত হ'য়ে ওঠেনি? ঈশ্বরের নীরবতার মর্ম আমাদের অগম্য, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতিনিধির? এই দ্বিতীয় প্রশ্ন নিয়েই নাটকের মূল তর্ক।

এ নাটকে পোপ একবার মাত্র দেখা দেন, চতুর্থ অঙ্কে। সমগ্র নাটকটির ভারসাম্য তাঁরই হাতে, তাই তাঁর আবির্ভাবও যেন তার গতিপথের ঠিক কেন্দ্রস্থলে। তাঁর অরুণ নিস্পৃহতা আমাদের মুহূর্তে সচকিত ক'রে তোলে। তিনি যেন যেন যুদ্ধ রাজনীতির ওপরের ওপর একটি সুতীক্ষ্ণ চন্দ্রকলার মতো, অনাহত, অক্ষুণ্ণ, অমানবীয়। তাঁর দূরদর্শিতা যেন এ পৃথিবীর নয়, সাধারণ মানুষের আবেদন যেন কিছুতেই তাঁর অভিনিবেশ ভঙ্গ করতে পারে না। ঠিক সেই মুহূর্তে আমরা দেখি, ভরুণ পাদ্রি রিকার্দো কস্তানা নাৎসি নৃশংসতার সংবাদে অধির হ'য়ে পোপের সাক্ষাৎপ্রার্থী, তাঁর একমাত্র অনুনয় পোপ অত্যাচারিত মানুষের হ'য়ে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অন্তত একবার দাঁড়ান। কস্তানার বিশ্বাস, যেমন অনেকেরই সেদিন বিশ্বাস ছিল, যে

পোপের সমালোচনা হিটলারকে অন্তত কূটনীতির দিক থেকেও বিব্রত করতে সক্ষম হবে। হিটলার যতই বলদর্পী হন, সমস্ত ক্যাথলিক পৃথিবীর বিরুদ্ধে স্পষ্টভাবে দাঁড়াতে তিনি দ্বিধান্বিত বোধ করবেন, অন্তত এ আশাতেও অনেকে সেদিন পোপের মুখ চেয়েছিলেন। কিন্তু পোপ পাচেল্লি তাঁদের সে আশা পূরণ করেন নি। তাঁর এ নীরবতার নিগূঢ়তা ঈশ্বরের অন্তরাত্মার মতোই রহস্যময়, কিন্তু তাঁর মতো তর্কাতীত নয়।

এই নাটকের পোপ প্রায় ঈশ্বরের মতোই সুদূর, কিন্তু তাঁর বিচক্ষণতা প্রায় মানবিক। মার্কিন ক্যাথলিকরা তাঁকে বিরাট অঙ্কের চেক্ পাঠান, তা দেখে তিনি খুশি, ক্যাথলিক সঙ্ঘের মূলধন সম্পর্কে তিনি আগ্রহবান্, রাজনীতির প্রতিটি গতিবিধি তাঁর নখদর্পণে। কিন্তু কন্তানা যখন তাঁকে প্রতিবাদের স্পষ্ট ভাষা উচ্চারণ করতে অনুনয় জানান, তিনি শুধু বলেন, 'ইহুদিনিধন নিশ্চয় জঘন্য ব্যাপার, কিন্তু আমরা তাই ব'লে কেন বিচলিত হব, কেন আমাদের কর্তব্য ভুলে যাব, ভুলে যাব যে জর্মানরা আজ য়ুরোপের ভারসাম্য সংরক্ষণে অপরিহার্য?' তাঁর কাছে য়ুরোপের সংহতির চেয়ে এই শক্তির ভারসাম্যের দাম বেশি, এবং তাঁর ভয় যে হিটলারকে রুখতে গেলে সাম্যবাদের বিস্তারণের তলায় খ্রীস্টধর্মকে সমূলে বিনষ্ট হ'তে হবে। তাই সকলের সম্মিলিত অনুরোধের ফলে তিনি অবশেষে বেতারযোগে যে শান্তিবাণী উচ্চারণ করেন, তাতে হিটলার বা নাৎসিবাদ বা ইহুদিদের নামগন্ধও থাকে না, তা সমস্ত স্থানকালপাত্র বিরহিত নৈর্ব্যক্তিক একটি আশীর্বচন। এবং তার মধ্যে কোন্ জায়গাটি বিশেষভাবে বাঁকা হয়কে ন্যাপা হবে তা নিজেই ক'রে নিয়ে তিনি যখন ঘোষণা করেন: 'পোপের সর্বমানবিক এবং পিতৃপ্রতিম করুণা আরও বর্ষিত হ'চ্ছে— সেমিকোলন। বর্ষিত হ'চ্ছে: তা জানে না কোনও সীমা, কর্ম, কোনও দেশ, কথা, কোনও ধর্ম অথবা সম্প্রদায়।' আর তাঁর অনুচরেরা সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে স্মরণ করিয়ে দেন: 'সম্প্রদায়, আহা প্রভু, এটি সত্যিই অতীব প্রাসঙ্গিক হয়েছে।' তখন নবীন ইতালিয়ান পাদ্রি রিকার্দো কন্তানার নিজের বিবেকের দায়িত্ব নিজেরই হাতে তুলে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। তিনি পোপের অভিত্ত দৃষ্টির সামনে নিজের কৌপীনে ইহুদিদের তারকাচিহ্ন ধারণ ক'রে আউশ্‌ভিৎস্ চ'লে যান এবং স্বেচ্ছায় সেখানে শহীদের জ্বালা বরণ করেন।

নাটকের ট্র্যাজিক রূপটিকে সম্পূর্ণতা দেবার জন্যে হয়ত এই দুটি শহীদের

চরিত্রকে উপস্থাপিত করেছেন— রিকার্দো কস্তানা এবং কুর্ট গের্স্টাইন্। এর মধ্যে কস্তানার চরিত্রটি কাল্পনিক, কিন্তু গের্স্টাইন প্রায়শঃ ঐতিহাসিক চরিত্র। তিনি আমেরিকা শান্তিবাদি ছিলেন এবং শান্তির জন্য নানা সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার নেতৃত্বভার নিয়েছিলেন। নাৎসিদের হাতে তাঁর কোনও আত্মীয়ের মৃত্যু ঘটলে পরে তিনি তাঁর ছদ্মাছদ্মিক কর্মব্রত অবলম্বন করেন— অর্থাৎ নাৎসি গুপ্তচরদের দলে যোগ দিয়ে অল্পদিনেই তাদের বিশ্বাসভাজন হন, এবং আউশ্‌ভিৎস্-এর ছয়ক্ষেত্রের মধ্যে থেকে বন্দী ইহুদিদের ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করেন, দু-একজনকে উদ্ধার করতেও সমর্থ হন। যুদ্ধের শেষে অবশ্য তাঁর কোনও সন্ধানই আর পাওয়া যায়নি, এবং অনেকেই মনে করেন তাঁকে হত্যা করা হয়েছে, যদিও তিনি আত্মহত্যা করেছেন এ যেন সন্দেহেরও অবকাশ আছে। সে যাই হোক গের্স্টাইন্ যে অতি বীর্যবান্ এবং অসাধারণ একটি চরিত্র ছিলেন, তাতে কোনও সংশয় নেই। নিজেকে বিপন্নবিকার দ্বারায় আহুতি দিয়ে তিনি মানবতার একটি স্থায়ী আদর্শ আমাদের জন্যে এঁকে রেখে গেছেন কোনও প্রাচীন গ্রীসের মতো। এ নাটকে অবশ্যই তিনি অতন্দ্রর মঙ্গলশক্তির প্রাণস্বরূপ।

এই চরিত্রগুলিকে ঐতিহাসিক মূর্তি দেবার জন্য নাট্যকারকে অকাতর শ্রম করতে হয়েছে। হখ্‌হুথ এ নাটক লেখবার সঙ্কল্প নিয়ে রোমে গিয়েছেন, সম্ভব মতো যাবতীয় তথ্যাদি পর্যালোচনা করেছেন, ঘটনাস্থলগুলি দেখেছেন এবং বহুজনের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করেছেন। এই পরিশ্রমের ফল পরিস্ফুট তাঁর 'ঐতিহাসিক আলোকপাত' নামক রচনাটিতে— নাটকের শেষে যা সংযোজিত। কিন্তু আগেই শুনেছি ইতিহাসের অনিশ্চয়গুলি চতুর, তাই দুর্ভাগ্যবশত এই ইতিহাসকে পুনরাবিষ্কারের প্রয়াসেই তাঁকে সবচেয়ে বেশি সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে, সম্প্রদায় বিশেষের তিরস্কার সহ্য করতে হয়েছে এবং নানাবিধ জবাবদিহি করতে হয়েছে। পোপ পাচেল্লির ভক্তেরা তাঁকে কটূক্তি শুনিয়েছেন। তাঁদের মনে হয়েছে হখ্‌হুথ-এর নাটক প্রকৃতপক্ষে পাচেল্লির বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণ, এবং যেহেতু পাচেল্লি আজ মৃত, সুতরাং তীব্রভাবে গর্হনীয়। কিন্তু হখ্‌হুথ-এর লক্ষ্য কি সত্যিই ব্যক্তিগত? ইতিহাসকে কি তিনি তাঁর বক্তব্যের রূপকমাত্র হিসেবে ব্যবহার করেননি? তিনি একাধিকবার আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, যে তাঁর পোপ ব্যক্তি নয়, প্রতীক। পোপের আবির্ভাবমুহূর্তেও নাটকে যে রঙনির্দেশনা ব্যবহার করা হয়েছে তাতেও এ

কথা স্পষ্ট। সেখানে হুবহু বলেছেন, 'যে অভিনেতা এই ভূমিকায় অভিনয় করবেন, তাঁকে মনে রাখতে হবে, যে এখানে 'হিজ হোলিনেস' ব্যক্তি হিসেবে ততটা নয়, যতটা প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমাদের সামনে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর তন্ত্রীগুলি হবে উদাত্ত, অতীব আভিজাত্যমণ্ডিত, এবং বাকিটা তাঁর উচ্চাঙ্গের ভাবালুতাবর্জিত আমাদের কাছে বাহিত হবে।' পরবর্তীকালে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনা উপলক্ষেও তিনি এ কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন। সান্ফ্রান্সিস্কো ক্রনিক্‌ল পত্রের ডুডি স্টোন্-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'আমার কাছে পোপ পিউস্ একটি প্রতীক, শুধু নেতৃত্বদের নয়, সমস্ত মানুষেরই প্রতীক —খ্রীস্টান, অনীশ্বর, ইহুদি, সবার। আপন ভাইকে রক্তের মুখে বাহিত হ'তে দেখেও যারা নিশ্চেষ্ট থাকে তাদের সবার।'

নাটকটিকে সম্পূর্ণ বুঝতে হ'লে তাই তার এই প্রতীকস্বরূপের কথা মনে রাখতে হবে। আজকের মানুষের অস্তিত্বের মূলে যে গভীর সমস্যাগুলি আলোড়িত হ'চ্ছে তাদেরই তিনি নাটকীয় সংঘাতের মাধ্যমে মূর্ত ক'রে তুলতে চেয়েছেন। সেদিক থেকে ইতিহাস তাঁর মুখ্য লক্ষ্য নয়, ইতিহাস তাঁর বাহন। ইতিহাসকে অতিক্রম ক'রে তিনি পৌঁছোতে চেয়েছেন আমাদের বিশ্ববোধের অন্তস্তলে। তাই ইতিহাসের ব্যবহার এখানে পৌরাণিক বলা চলে। এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতেই এ নাটকের চূড়ান্ত বিচার। সে দৃষ্টিতে পোপ পিউস্-এর স্তব্ধতা কেবল কূটনৈতিক তাৎপর্যেই নিঃশেষ নয়। যে গভীরতর স্তব্ধতার ক্ষেত্রে আমরা বিরাজমান, ঈশ্বরের সেই পাঁচ মুহূর্তস্তব্ধতার আভাস এখানে আমরা পাই। মানবাত্মার সঙ্কটময় মুহূর্তে পোপের মৌন তাই বিধাতার অন্তঃস্পর্শ নীরবতারই পরিচায়ক।

# 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের' বিচার

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

The Trial Begins... : Abram Tertz ; tr. by Max Hayward : New York, Pantheon Books.

On Socialist Realism : Abram Tertz : tr. by George Dennis : New York, Pantheon Books.

ছয় বৎসর পূর্বে কোন একটি বিদেশী সাহিত্যপত্রে এভান টার্টজ্ ছদ্মনামে রচিত এক রুশ গল্প লেখকের 'বিচারের উদ্যোগ···' বা The Trial Begins... উপাখ্যানটি যখন প্রথম পড়ি, তখন কল্পনা করতে পারিনি যে কাহিনীটির উপসংহারে বিবৃত্তিত তদন্তপদ্ধতি, বিচারানুষ্ঠান ও শাস্তিবিধান হুবহু স্বয়ং লেখকের ভাগ্যেই কিছুকাল পরে জুটবে। জানি না, এটাকে লেখকের পূর্বাপত্তা বলব না গল্পটিকে বাস্তব রূপায়নের জন্য সোবিয়েৎ বিচারকদের এক উদ্ভট খেয়াল বলব। সম্প্রতি সোবিয়েৎ ইউনিয়নে আন্দ্রে সিনিয়াভ্স্কি ও য়ুরি দানিয়েল নামক দুইজন সাহিত্যিক 'মাতৃভূমি বিরোধী দুষ্কর্মঘটনার' অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে যথাক্রমে সাত ও পাঁচ বৎসরের জন্য 'সংশোধনকারী শ্রমশিবিরে' নির্বাসিত হয়েছেন। বিচারে প্রকাশিত হয়েছে যে The Trial Begins···এর রচয়িতা প্রথমোক্ত অপরাধী।

শাসকগোষ্ঠীর কাছে অবাঞ্ছিত সাহিত্যরচনার অপরাধে লেখককে কারাগারে নিক্ষেপ, স্বদেশ থেকে বিতাড়ন বা হত্যার নজির ইতিহাসে নতুন নয়। বেশ কিছুকাল পূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অ-মার্কিনী কার্যকলাপ তদন্ত সংস্থার সম্মুখে যে দেশের কয়েকজন সম্মানিত নাট্যকার ও অভিনেতাদের কমিউনিস্ট বলে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। সোবিয়েৎ কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসের পর প্রকাশিত হয়েছে কি ভাবে Boris Pilnyak, Isaak Babel ও Meyerhold-এর মত কবি-সাহিত্যিক ও নাট্য প্রযোজকেরা স্তালিনের আমলে একে একে 'অদৃশ্য' হয়ে গেছেন। সম্প্রতি চীন থেকে যে সব খবর চুঁইয়ে আসছে, তা থেকে সন্দেহ হচ্ছে অনুরূপ ব্যবস্থার সূত্রপাত সে দেশের বিদগ্ধজনের ভাগ্যে। শুনছি, চৈনিক সৈন্যবাহিনীর মুখপত্র Liberation Army Daily-র সম্পাদকীয় স্তম্ভে অভিযোগ করা হয়েছে যে এই সব লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গীতে হাজেরীতে ১৯৫৬ সালে বিদ্রোহাবলম্বী

কমিউনিস্ট শিল্পী-সাহিত্যিকদের প্রতিষ্ঠিত 'পেতোফি সার্কল'-এর প্রচারিত মতের প্রভাব পড়েছে। পেতোফি ছিলেন জনপ্রিয় হাঙ্গেরীয় কবি : ১৮৪৯ সালের বিদ্রোহে শহীদ হন। তাঁর নামাঙ্কিত প্রতিষ্ঠানের সভ্যরা স্বদেশের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় ব্যাপকতর গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবি জানিয়েছিলেন।

সুতরাং 'পাশ্চাত্য গণতন্ত্র'ই হোক, 'দক্ষিণপন্থী' বা 'বামপন্থী' সমাজতন্ত্র-ই হোক, প্রতিষ্ঠিত মতবহির্ভূত সাহিত্য রচিত হলেই, তার বিরুদ্ধে শাসকগোষ্ঠীর ভ্রূকুটি প্রতিহিংসাপরায়ণী হয়ে ওঠে। হাঙ্গেরীয়ানদের মধ্যে কেউ কেউ 'ভুল স্বীকার' করে আমলাতান্ত্রিক বিচারকমণ্ডলীর কাছ থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছেন। যুক্তিগ্রাহ্যির এই সহজ পথ পরিহার করে সিনিয়াভ্স্কি ও দানিয়েল বিচারককে স্বমতে স্থিরসংকল্প থেকে ঘোষণা করেছেন যে তাঁরা স্বদেশের প্রতি অনুগত এবং কোন অন্যায় করেছেন বলে বিশ্বাস করেন না। সাহিত্যের প্রকৃত বিচারক পাঠকসমাজ, ফৌজদারি আদালত নয় বলেই, সিনিয়াভ্স্কির রচনাকে সোবিয়েৎ ইউনিয়নের সরকারী সমালোচনার আলোকে না দেখে, নিরপেক্ষভাবে সাহিত্য-রসবিচারের মাপকাঠিতে বিবেচনা করা উচিত।

**'বিচারের উদ্বোধন'···** : একদা লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও জনপ্রিয় সাহিত্য-সমালোচক সিনিয়াভ্স্কি-রচিত কাহিনীটি কিছুটা উদ্ভট-রসাত্মক বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। প্রস্তাবনায় বর্ণিত হয়েছে গভীর রাত্রে কোন এক লেখকের ( যিনি উত্তম পুরুষে এ কাহিনী বিবৃত করছেন ) প্রেতাত্মের ইতিহাস। দামী পোষাক পরিহিত সেপাইদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ লেখক দেখতে পেলেন তাঁর ঘরের দেওয়াল স্বচ্ছ কাঁচ হয়ে যাচ্ছে, আর সহরের উপরে আকাশে একটা বিরাট রক্তাপ্লুত মুঠো। তার বিশাল ছায়া যেন রাস্তাঘাট, বাড়ি-ঘরগুলোকে কালি কালি করে কেটে দিল— তাদের অজান্তে ঘুমন্ত মানুষগুলোকে প্রত্যক্ষ করা গেল। শুধু একজন মানুষই এই নিদ্রিত সহরে জেগে আছে। নিজের ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে সহরটার দিকে সে তাকিয়ে রয়েছে। আকাশ থেকে প্রভুর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো—'এই লোকটি-ই তোমার গল্পের নায়ক— ভ্রাদিমির— আমার প্রিয় ধর্মযাজক দাস। ওকে অনুসরণ কর, রক্ষা কর জীবন দিয়ে, মহিমান্বিত করে তোল।'

তারপর গল্পের শুরু। ভ্রাদিমির প্রোবোস্ত সরকারী অভিনন্দক।

য়্যাবিনোভিচ্ নামে এক শ্রীযোগবিশেষজ্ঞের বিরুদ্ধে ভ্রূণ হত্যার অভিযোগ প্রস্তুত করলে যখন প্রোযোরভ ব্যস্ত, ঠিক তখনই প্রোযোরভের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, মারীনা গোপনে গর্ভপাত ঘটায়। মারীনা যৌবন পুত্তল বিশেষ; দেহ-সৌষ্ঠব বজায় রাখবার জন্য সে সতে অনিচ্ছুক। নিজের সংসারে এই অদৃষ্টের পরিহাসে নিষ্ঠাবান ও আত্মতৃপ্ত প্রোযোরভ প্রায় হতবুদ্ধি। আবার অন্যদিকে তার প্রথম পক্ষের পুত্র সেরিওজার কৈশোরের স্বভাবসঙ্গত বৈপ্লবিক কথাবার্তা ক্রমশই প্রোযোরভের পক্ষে অস্বস্তিকর হয়ে উঠছে। ছাত্র ও অধ্যাপক যুদ্ধ সংক্রান্ত প্রশ্ন তুলে সেরিওজা তার বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অপ্রতিভ করে তোলে। তার টাটকা কিশোর বুদ্ধিতে সোবিয়েৎ সমাজব্যবস্থাতেও ধনবৈষম্য ও অন্যায় অপরাধের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। সহপাঠিনীর সঙ্গে বসে সে রঙীন কল্পনার জালে বোনে ভবিষ্যতের আসল সাম্যবাদী সমাজ, যে সমাজে বন্দীশালা থাকবে না; রাস্তায় শ্লোগান থাকবে মায়াকভস্কির কবিতা থেকে। একটা গোপন যন্ত্রযন্ত্রের আবহাওয়া নিজের চতুর্দিকে তৈরী করে সেরিওজা চিন্তা করে বিশ্ববিপ্লব কি ভাবে সংঘটিত করা যায় এবং এই ভাবে স্বপ্নের মধ্য দিয়ে তার কিশোরকল্পনার সুধা মেটায়। শেষে এই কিশোরের একটি রচনা গিয়ে পড়ে মারীনার প্রেমিক কালিনুস্কীর হাতে। অকৃতকার্য বুদ্ধিবিদ্ কালিনুস্কীর ছিদ্রান্বেষী মানসিকতা সেরিওজার রচনায় 'ট্রট্স্কিবাদের' প্রভাব আবিষ্কার করে। সেরিওজা ধরা পড়ে ও তার বিচার হয়। আইননিষ্ঠ দেশপ্রেমিক প্রোযোরভ তার 'দেশদ্রোহী, প্রতিবিপ্লবী' পুত্রকে ত্যাগ করে।

উপসংহারে রয়েছে এক শ্রমশিবিরের বর্ণনা। তিনটি বন্দী কার্যরত— শ্রীযোগবিশেষজ্ঞ য়্যাবিনোভিচ্, সেরিওজা ও লেখক স্বয়ং। লেখকের বন্দীশিবিরে আগমনের হেতু বিচিত্র। যে প্রভুর আদেশে তিনি শ্রমশিবির প্রোযোরভের গল্প লিখেছিলেন, তাঁর ইতিমধ্যে মৃত্যু হয়েছে। সাম্যবাদী তাঁর জীবনের পুর্নমূল্যায়ণ চলছে। লেখকের বিরুদ্ধে অভিযোগ— কুৎসারটনা, অশ্লীলতা এবং রাষ্ট্রের গোপনীয়তা ফাঁস করা।

যাই হোক, য়্যাবিনোভিচ্ মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে একটা পুরাতন ঘরোয়া ছোরা আবিষ্কার করে ফেলে। তার হাতলটা ক্রুশবিদ্ধ যিশুমূর্তির আকারে খোদাই করা। ছোরাটা তুলে ধরে য়্যাবিনোভিচ্ বলে— 'ওরা ভগবানের বদলে আমাদের জন্য কেমন একটা আয়না রেখেছে, দেখেছ? মারাত্মক অস্ত্রের হাতলে।···এক সময় ভগবান-ই ছিল লক্ষ্য, এখন কিন্তু ওরা তাকে উপলক্ষ্য

বানিয়েছে। সে একটা হাতল ধরে। বোমাটা ছিল উপলক্ষ্য, এখন সেটাই লক্ষ্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। দুজনে আড়া পেয়েছে।'

তার অসংলগ্ন কথাগুলো শুনতে শুনতে লেখক অস্বস্তি অনুভব করেন; বলেন—'তোমার ঐ সব ধর্মকথা ঢের শুনেছি। কে না জানে, ভগবান বলে কিছুই নেই? আমরা ভগবানে বিশ্বাস করি না। আমরা বাস্তিকতায় আস্থাবান।'

র‍্যাবিনোভিচ্ পাগলের মত বোমাটা আকাশের দিকে তুলে বলে—'আরে, আমি কি তোমার সঙ্গে তর্ক করছি নাকি? মোটেই না। আগে ছিল ভগবানের নামে। তারপর, ভগবানের নামেও! তারপর শুনলাম, ভগবানের পরিবর্তে! ভগবানের বিরুদ্ধে! এখন শুনছি, ভগবান-ও নেই, আছে শুধু বাস্তিকতা। বেশ! তবে, নতুন বোমা তালাই কর এই নতুন উদ্দেশ্যে।' এ কথাগুলো লেখকের কাছে এবার সত্যই উন্মাদের প্রলাপ বলে মনে হল।

এই সংক্ষিপ্তসার থেকে প্রতীয়মান হওয়া উচিত যে The Trial Begins··· একটি বিস্ফোরক গল্প নয়। এ গল্প সোবিয়েৎ ইউনিয়নে প্রকাশিত হলে সেদেশে প্রতিবিপ্লবের আশংকা দেখা দিলে বলতে হোত যে সোবিয়েৎ সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তিটা নেহাৎই দুর্বল। তাছাড়া বিচারে, সিনিয়াভ্স্কি বলেছিলেন যে গল্পটা রচিত ১৯৫৮ সালে এবং বর্ণিত ঘটনার সময়কাল ১৯৫২ সালের শেষাংশ থেকে ১৯৫৩ সালের শুরু পর্যন্ত—অর্থাৎ 'স্তালিন যুগের' অন্তিম কয়েক মাস। এর ইঙ্গিত গল্পের মধ্যেও রয়েছে, যেমন 'চিকিৎসকদের ষড়যন্ত্রের' উল্লেখ এবং স্তালিনের সংবাদপ্রেরণ বিভিন্নের বর্ণনা। এই যুগের সোবিয়েৎ সমাজব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতির সমালোচনাকে যদি 'মাতৃভূমি বিরোধী কুৎসারটনা' বলে অভিহিত করা হয়, তাহলে ক্রুশ্চভের বক্তৃতা ও রচনাগুলিকেও সোবিয়েৎ ইউনিয়নে বে-আইনী বলে ঘোষিত করা উচিত।

যাই হোক, ইংরেজী অনুবাদে The Trial Begins···পড়ে গল্পটিকে খুব উচ্চস্তরের ধর্মস্পর্শী শিল্পকর্ম বলেও আমার মনে হয় নি। একে কেন্দ্র করে বিচারের প্রহসন, অস্বাভাবিক ধরনের দীর্ঘমেয়াদী দণ্ডাদেশ এবং গল্পে বর্ণিত লেখকের আত্মবিড়ম্বনার সঙ্গে স্বয়ং লেখক সিনিয়াভ্স্কির দুর্দশাভোগের এমন অদ্ভুত সাদৃশ্য না ঘটলে, গল্পটির এই পুনরীক্ষণের হয়তো কোন প্রয়োজনই হোত না।

সকলের মনে পড়ে, Solzhenytsin-এর One Day in the life of

Ivan Denisovitch-এর প্রকাশের পর, বিদেশী ভাষায় তার অনুবাদ ও প্রচারের দায়িত্ব স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিয়েছিলেন সোবিয়েৎ ইউনিয়নের সাহিত্যিকদের সরকারী প্রতিষ্ঠান। কিন্তু সিনিয়াভস্কিকে গোপনে ছদ্মনামে তাঁর রচনা বিদেশে পাঠাতে হয়েছিল এবং বিদেশী পত্র-পত্রিকাতেই তার প্রথম প্রকাশ। তাঁর বিরুদ্ধে এটাও একটা অভিযোগ। দুজনের লেখাই স্তালিন-বিরোধী মনোভাবে আকর; অথচ দুজনের প্রতি দুরকমের ব্যবহার দেখছি। তার কারণ নিহিত রয়েছে Solzheytsin-এর উপন্যাসের থেকে সিনিয়াভস্কির গল্পের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র চরিত্রের মধ্যে। এবং এইখানেই The Trial Begins···এর বৈশিষ্ট্য।

সিনিয়াভস্কির গল্পে বিদ্রূপবাণ কেবলমাত্র স্তালিন-মুগীয় শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধেই বর্ষিত হয় নি. সাধারণ নাগরিক জীবনে যাবে মূলকচি. আত্মসন্তুষ্টি, সন্দেহপ্রবণতা ও সুবিধাবাদের বিরুদ্ধেও সরব। সমস্ত উপাখ্যান জুড়ে রয়েছে একটা আত্মাপুত্ত উপহাসের ভাব। এ উপহাসের লক্ষ্য গল্পে বর্ণিত লেখক-ও। সিনিয়াভস্কির ভাষায়—( বিচারে জেরার উত্তরে প্রকাশিত ) এই লেখকটি আসলে 'তীক্ষ্ণ ও মাঝারা-কর্তব্যবিলাসী।' তাই উপসংহারে, রোবোভের পদোন্নতির সংবাদ পেয়ে সে উল্লসিত হয়ে ওঠে। রোবোভের নিরুদ্যমপ্রকৃতা এবং নিজের সংসারে তার স্ত্রীর কাছে পরাজয় এবং শেষে তার সুবিধাবাদী মনোভাবের প্রকট প্রকাশ—এ সমস্তই স্তিমিতলে নিন্দিত হয়েছে। একই সুরে বর্ষিত হয়েছে রোবোভের স্ত্রী মারীনার প্রতি কালিনস্কীর প্রণয়াসক্তি। বহুদিনের সাধ্য-সাধনার পর সে যখন একদিন রাত্রে মারীনাকে অবশেষে স্বগৃহে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়, চরম মুহূর্তে উপলব্ধি করে যে সে শক্তিহীন। মারীনার শীতল দেহ ও ওষ্ঠহীন মাড়ির সম্মুখে কালিনস্কীর নিজেকে উত্তেজিত করার চেষ্টা, পাঠকের কাছে হাস্যকর মনে হয়। সারা উপাখ্যান জুড়ে সে তার কাপটা ও পুঁথিগত পাণ্ডিত্য দ্বারা পাঠক সমাজকে ভুলে রেখে দিয়েছে। তাই তার অন্তিম পরাজয়ে সে কারুরই সমবেদনা পায় না।

কখনও প্রত্যক্ষ প্রকাশ বা কখনও ব্যঙ্গ প্রদর্শনের ছদ্মবেশে সর্বস্তরের মানুষের প্রতি সিনিয়াভস্কির এই জাতীয় পরিহাস নিঃসন্দেহে জনসাধারণবিরোধী মনোভাবের পরিচায়ক। কিন্তু The Trial Begins···পড়তে পড়তে যে সত্যটা বারংবার অস্বস্তিকরভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে তা হল— মূলবুদ্ধি জনসাধারণ ও তাদের নেতাদের স্বার্থপরতা, আত্মসন্তুষ্টি ও গুরুভক্তিই স্তালিন-

যাদের আধিপত্যকে সম্ভব করে তুলেছিল। দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর ধরে সাধারণ নাগরিকের স্বাধীন বিচারক্ষমতার উন্মেষে উৎসাহদান না করে, ঊর্ধ্বতন নেতার অভ্রান্ততায় ভক্তি উৎপাদনে তাকে নিয়োজিত করার ফলে জনসাধারণের জীবনে যে বিকৃতি এসেছিল তার উল্লেখ সোবিয়েতে সরকারী স্তালিনবিরোধী বক্তৃতা বা Solzhenytsin-এর উপন্যাসেও দেখতে পাইনি।

সিনিয়াভ্স্কির গল্পে একমাত্র সুস্থ চরিত্র সেরিওজা, হয়তো অপাপবিদ্ধ কৈশোরের প্রতিনিধি বলে। বয়স্কদের ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির সঙ্গে তার তাজা দৃষ্টিভঙ্গী, স্বপ্ন দেখার সাহস, মারখোর খাওয়া খায়। তার একটা সাধারণ শিশুসুলভ পরিকল্পনা, যেটা কল্পনার স্তরেই হয়তো থেকে যেত, যেভাবে স্বভাবতঃ উদাসীন হয়ত সমাজকে হঠাৎ উত্তেজিত করে তোলে, তার বর্ণনায় সিনিয়াভ্স্কির সেই উপন্যাসের সুরের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চাবচতারও পরিচয় মেলে। এর ফাঁকে বেরিয়ে এসেছে এই কিশোরের প্রতি লেখকের মমত্ববোধ— যার প্রকাশ গল্পটিতে প্রাণের উত্তাপ এনেছে। সুতরাং The Trial Begins...এ সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদী উপন্যাসের রচনার নিয়মানুযায়ী সাধারণ সোবিয়েৎ নাগরিকের প্রতি যেরকম অতিরঞ্জিত প্রশংসার উচ্ছ্বাস নেই, তেমনি আবার অপ্রশস্তিত উপন্যাসের তিক্ততাও নেই।

**সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ :** সিনিয়াভ্স্কির বিচার শুধু The Trial Beigns...এর পুনর্বিবেচনার সুযোগ দেয় নি, লেখকের আরও গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রবন্ধের অস্তিত্বের সন্ধান দিয়েছে। বস্তুতঃ, সিনিয়াভ্স্কির On Socialist Realism (এ প্রবন্ধটির রচনাও তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ হিসেবে গণ্য হয়েছে) এই গল্পটির সম্পূরক। তাঁর চিন্তাশীলতার ছাপ গল্প থেকেও এই প্রবন্ধে অনেক বেশী পরিস্ফুট এবং সমালোচকরূপে তাঁর খ্যাতি প্রধানতঃ এর ওপরই প্রতিষ্ঠিত। The Trial Begins... এর মত গল্পের কেন প্রয়োজন, তার উত্তর মিলবে On Socialist Realism এ।

উল্লিখিত প্রবন্ধের প্রথমাংশে আলোচিত হয়েছে সোবিয়েৎ সমাজের পরম-উদ্দেশ্যমূলক (telcological) চরিত্র। সাম্যবাদই একমাত্র পরমউদ্দেশ্য যাতে সোবিয়েৎ নাগরিক বিশ্বাসী। এর ফলে, লেখকের মতে, অতীতের প্রতি সহনশীলতা বা ঐতিহাসিক ঘটনার পক্ষপাতশূন্য বিচারের চেষ্টা ব্যাহত হয়। সমগ্র অতীতকে, সাম্যবাদের অগ্রযাত্রায় বিভিন্ন স্তর বলে বিশ্লেষণের প্রবণতা

দেখা যায় ; সব কিছুকেই সাম্যবাদের সীমাবদ্ধ পরিভাষায় ব্যাখ্যা করা হয় ; অন্য ব্যাখ্যার সম্ভাবনা বা কোন ঘটনার ভিন্ন কারণ প্রদর্শনের চেষ্টা অবহেলিত হয়।

এই জাতীয় চরম উদ্দেশ্যে অটল ও উদ্ধত বিশ্বাসের ফলে মহৎ আদর্শের নামে অতি নিকৃষ্ট নিদর্শন ব্যবহৃত হয়েছে। লেখকের ভাষায় : 'চিরকালের জন্য যাতে কারাগার অবলুপ্ত হয়, তাই আমরা নতুন কারাগার তৈরী করলাম। সমস্ত সীমান্ত যাতে বিলীন হয়ে যায়, তার জন্য নিজেদের চতুর্দিকে একটা চৈনিক প্রাচীর নির্মাণ করলাম। পরিশ্রম যাতে আনন্দদায়ক হয়, তাই বাধ্যতা-মূলক শ্রম প্রবর্তন করলাম। ভবিষ্যতে যাতে একবিন্দুও রক্তপাত আর না হয়, তার জন্য আমরা আরও হত্যা এবং আরও হত্যা করলাম।' 'অর্জিত সাফল্যের সঙ্গে মূল লক্ষ্যের কখনই মিল থাকে না। লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য যে সব উপায় অবলম্বিত হয় তা রূপ পালটে ফেলে হয়ে যায়।'

এ কথাগুলো ইয়ানিং অনেকেই অনেকভাবে বলেছেন। এ বক্তব্যের অনেক কিছু সম্বন্ধে আপত্তিও থাকতে পারে। কিন্তু সিনিয়াভস্কির বিশেষত্ব যে তিনি এ থেকে তাঁর দেশের সাহিত্য এবং বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ সম্বন্ধে একটা নতুন সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন। সাম্যবাদের পরম আদর্শে অচলা ভক্তির ফলে সাহিত্যে প্রবর্তিত হল এক জাতীয় সদর্থক বা positive নায়ক, যার হৃদয়ে কোন অন্তর্দ্বন্দ্ব বা দ্বিধা নেই, যে কখনও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে না, যার চরিত্রাঙ্কনে ধার এক ধরনের ব্যবহার।

এই জাতীয় নায়ক সৃষ্টির কঠিন নিয়মের গণ্ডীতে আবদ্ধ থেকেও, সোভিয়েৎ সাহিত্য, সিনিয়াভস্কির মতে, হয়তো শিল্পকর্ম হয়ে উঠতে পারত। প্রাচীন যুগে ধর্মীয় সংকীর্ণতা দ্বারা নির্দেশিত হয়েও মহৎ শিল্পকর্ম রচনার নজির আছে। 'সাহিত্য একনায়কত্বের নিদারুণ নিয়মতান্ত্রিকতা সহ্য করতে পারে, কিন্তু ভিন্ন রচনাশৈলীর সারদ্রিভ বা eclecticism সাহিত্যে অচল।'

সোভিয়েৎ সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ এই eclecticism-এর পরিচায়ক। সিনিয়াভস্কির ভাষায় : 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের নিয়মানুসারে সদর্থক নায়ক সৃষ্টি করা এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে একটি psychological চরিত্র রূপেও দেখানো প্রায় অসম্ভব...আমাদের লেখকেরা এই অসাধ্য সাধন করতে যান ; সদর্থক নায়ক ও তার চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, মন-চমকানো রচনাশৈলী ও অলঙ্কারপূর্ণ ভাষায় বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ জীবনের বাস্তবধর্মী বর্ণনা—এই

জাতীয় পরস্পরবিরোধী প্রবণতায় সমন্বয় স্থাপন করতে গিয়ে একটা বিরক্তিকর সাহিত্যিক খিচুড়ি বেরিয়ে আসে।...মনে হয়, 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ'—এই কথাটার মধ্যেই একটা অসঙ্গতি আছে। সমাজতান্ত্রিক শিল্পকর্ম— অর্থাৎ একটা উদ্দেশ্যমূলক শিল্প— কখনই উনবিংশ শতাব্দীর বাস্তববাদের বিশেষ রীতিতে সৃষ্টি হতে পারে না। বাস্তব জীবনের প্রকৃত সত্যানুসারী বর্ণনা কখনই পরম উদ্দেশ্যমূলক ভাষায় কথা বেতে পারে না। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ যদি বাস্তবিকই পৃথিবীর মহত্তর শিল্পরীতির পর্যায়ে উন্নীত হতে চায় এবং তার শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম সৃষ্টি করতে চায়, তবে তার একমাত্র উপায়, 'বাস্তববাদ'কে বর্জন করতে হবে। একটা সমাজতান্ত্রিক 'অ্যানা কারেনিনা' বা একটা সমাজতান্ত্রিক 'চেরি অর্চার্ড' লিখবার বেদনাদায়ক ও ব্যর্থ চেষ্টা পরিহার করতে হবে।'

স্তালিন পুরস্কারপ্রাপ্ত অধিকাংশ সোবিয়েৎ উপন্যাস যদি কেউ পড়ে থাকেন, তাহলে বুঝতে পারবেন সিনিয়াভ্স্কির উপরোক্ত বক্তব্য কতখানি যুক্তিসঙ্গত। স্তালিনোত্তর যুগে বা নিঃস্তালিনীকরণের সময়কালে, সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদী সাহিত্যে সুর-চড়ানো বা অলঙ্কারাধিক্য অনেকটা কমে যেতে বাধ্য হয়েছে। সিনিয়াভ্স্কির মতে : 'স্তালিনের মৃত্যুর পর, আমাদের শিল্প, আদর্শ ও জীবনের ভরসান আর উঁচু সুরে বাঁধতে পারে না, যা হওয়া উচিত, তাই বাস্তবে হয়েছে বলে দাবি করতে পারে না। যে সব সাহিত্য জীবনকে হীন করে দেখাতে চেষ্টা করে, তার মধ্যে কাপচোর সুরটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সবচেয়ে সার্থক সাহিত্যিক তাঁরাই, যাঁরা আমাদের সাফল্যগুলোকে নিখুঁত ভাবে বর্ণনা করেন এবং আমাদের অসঙ্গতিগুলোকে যতদূর সম্ভব কৌশলে কোমল উপায়ে করে তোলেন। যে সাহিত্যকর্ম অতিমাত্রায় খুঁটিনাটি বর্ণনা, অর্থাৎ বাস্তববাদের লক্ষণাক্রান্ত হয়, তার বিপদ। যেমন ঘটেছিল ফুর্মানভ্-সেভ্কের 'নট বাই ব্রেড অ্যালোন'-এর ভাগ্যে।'

সেই কারণে, সিনিয়াভ্স্কির মতে বর্তমানে সোবিয়েৎ ইউনিয়নে যে সাহিত্য রচিত হওয়া উচিত তার চরিত্র হবে উল্লম্বসমান্তরাল। এ শিল্পকর্মে থাকবে 'বহৎ উদ্দেশ্য প্রচারের পরিবর্তে প্রকল্প বা অনুমানাত্মক ঘটনার বিবরণ, সাধারণ জীবনযাত্রার বাস্তববাদী বর্ণনার পরিবর্তে অদ্ভুত অবাস্তবের প্রবর্তন। এই শিল্পই মূলধারার সবচেয়ে যথোপযুক্ত প্রতিনিধি হতে পারে। হফ্মান ও ডস্টয়েভ্স্কি, গোগল, পলাদ ও মায়াকভ্স্কি, এবং আরও অন্যান্য বাস্তববাদী ও অবাস্তববাদী শিল্পী-সাহিত্যিকদের উল্লম্ব প্রকল্প আমাদের দীক্ষিত করুক,

অদ্ভুত ও অসঙ্গতের সাহায্যে সত্যনিষ্ঠ হবার কর্তব্য।' এই নিবন্ধে On Socialist Realism-এর উপসংহার।

**ঊনষ্ট সাহিত্য :** কিন্তুতকিমাকার এই হাস্যকর জগৎ রচনার প্রয়োজন কেন? এ সমস্যার গভীরে সিনিয়াভ্‌স্কি প্রবেশ করেন নি। অথচ শিল্প-সাহিত্যে absurdity অথবা অদ্ভুত রসের ঐতিহ্য দীর্ঘকালব্যাপী এবং সারা পৃথিবী জুড়ে। আধুনিক কালে ইউরোপীয় নাট্যজগতে এটা একটা বিশেষ প্রবণতা রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। মনে হয় এর সূত্র রয়েছে একালের যুগধর্মে।

আসলে এ যুগটা একদিকে যেমন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের তীব্রতের যুগ, অন্যদিকে ব্যক্তির অবলুপ্তির যুগও বটে। আত্মবিরোধী শোনালেও এ উক্তি সত্যবিরোধী নয়। কারণ, ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশের অর্থই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের তীব্রতাবৃদ্ধি, বুদ্ধির চর্চায় যারা প্রতিটি মানুষের নিজস্ব স্বতন্ত্র জীবনধারণার সম্প্রসারণ এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ তার প্রতিবেশী থেকে ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গ আত্মরতা। অন্যদিকে ব্যক্তি-মানুষের বীরত্বপ্রদর্শন বা এক-ক কর্মের দ্বারা সমাজকে প্রভাবান্বিত করার সুযোগ বর্তমানে ক্রমশই সীমাবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। গোষ্ঠিসৃষ্ট ব্যাপক শাসনব্যবস্থায় সে একটা সামান্য বস্তু বিশেষ। একদা যে যুদ্ধ, ব্যক্তিবীরের সাহসপ্রদর্শনের মূলভূমি ছিল, আজ তা কয়েকটি বোতাম টেপার পরিণত হয়েছে। সমাজের সর্বগ্রাসী শক্তির কাছে সাধারণ মানুষের অক্ষমতা ও অসহায়তা ক্রমশই প্রকট হয়ে উঠছে।

বিচ্ছিন্নতার ফলে, আধুনিক বুদ্ধিজীবী প্রয়োজনীয় দূরত্ব থেকে তার নিজের প্রতিবেশীদের অবস্থাটা অত্যন্ত মোহমুক্ত হয়ে নির্মমভাবে বিচার করতে সক্ষম। প্রাচীন গ্রীক নাটকে অতি সাহসী বীরও সর্বশক্তিমান ভাগ্যবিধাতার হাতে ক্রীড়নকতুল্য ছিল; তার সংগ্রাম ও পরাজয়ের পরিণতির মধ্যে নাট্যকারেরা মহাকাব্যীয় বেদনা আবিষ্কার করতে পারতেন। আধুনিক নাট্যকার অনুরূপ অনুপস্থিত কোন অতিপ্রাকৃতে আস্থাহীন। গোষ্ঠী-মানবের নিজেদেরই সৃষ্ট সমাজ ও শাসনব্যবস্থার সর্বগ্রাসী শক্তির কাছে ব্যক্তি-মানুষের অক্ষমতা ও অসহায়তাবোধ আধুনিক আস্থাহীনতার জন্মদাতা। সদা পলায়মান এক উদ্দেশ্যের পিছনে অর্থহীন ছুটোছুটিকে দূর থেকে দেখলে হাসি পাবে। আধুনিক সাহিত্যিকের চোখে তাই এ যুগের মানুষের আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব ঠাট্টার

উপাখ্যান। এই সর্বব্যাপী উপন্যাসের আলিঙ্গন থেকে—নির্যাতক ও নির্যাতিত—কেউই বাদ যায় না। এবং যেহেতু মানুষের এই অভিজ্ঞতা দেশ ও কালের সীমা নিরপেক্ষ, উইটের সাহিত্যিকেরা তাঁদের চরিত্রদের নিয়ে যান এক অবাস্তব আবহাওয়ায়, যেখানে বাস্তব জীবনের দৈনন্দিন আইন কানুন অচল। আসলে এটা এক ধরনের বিমূর্ততা। অবাস্তব জগতের পরিকল্পনায় বর্তমান সমাজের অস্বাভাবিক আবহাওয়াটাকে অতিগুরুত্বিত করা যায় এবং সাধারণ মানুষের অক্ষমতাটাকে তার অন্য সমস্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখানো যায়। কাফ্কার The Trial-এর কথা মনে পড়ে যায়।

অথবা, ধরা যাক, মানুষের চিরকালীন ধর্ম—'প্রতীক্ষা'র কথা। সারা জীবনব্যাপী এ প্রতীক্ষা হয়তো ভগবানের জন্য, বা কোন আদর্শের সাফল্যের জন্য বা কোন ব্যক্তিবিশেষের আবির্ভাবের আশায় কিংবা সব যন্ত্রণার শেষ—মৃত্যুর জন্য হতে পারে। দেশ ও কাল থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে এই প্রতীক্ষার যন্ত্রণা, বৈচিত্র্যহীনতার বিরক্তি, ও হাস্যকর অর্থহীন পরিণতিকে যদি বিমূর্ত করে দেখাতে হয়, তাহলে হয়তো বেকেটের 'ওয়েটিং ফর গোডোট্'-এর মত নাটকের জন্ম হয়।

কিংবা, আধুনিক সমাজের বিভিন্ন প্রবণতাকে পরিহাসের জন্য উইট জগৎ সৃষ্টির মাধ্যমে হয়তো লেখকদের ছদ্মবেশ ধারণের অভিপ্রায় থাকতে পারে। সুকুমার রায়ের 'শিব ঠাকুরের আপন দেশে' বা 'রাম গরুড়ের ছানা'র মত আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ ছড়ার অন্তরালে যে ব্যঙ্গের অব্যর্থ লক্ষ্য রয়েছে, অনুরূপ বিদ্রূপ আবিষ্কার করা যায় উইটের বিমূর্ত ছদ্মবেশে যে জগৎ তৈরী হচ্ছে আধুনিক সাহিত্যিকদের রচনায়। Ionesco-র 'রাইনোসেরাস'-এ আবহাওয়াটা অবাস্তব হলেও এত স্বচ্ছ যে তার আড়ালে আধুনিক সমাজব্যবস্থায় মূলচর্যা প্রবৃত্তির ক্রমবর্ধমানতা এবং ব্যক্তি-মানুষের মানসিক সংকটের প্রতিচ্ছবি খুঁজে নিতে সংবেদনশীল পাঠকের অসুবিধা হয় না।

যাই হোক, উইট সাহিত্য বিষয়ে এতগুলো কথা বলার দরকার হল এই জন্যই যেহেতু সিনিয়াভস্কির প্রবন্ধে এই সাহিত্যরীতির প্রয়োজনীয়তা উল্লিখিত হয়েছে, এবং তার প্রকাশের চেষ্টা তাঁর গল্প The Trial Begins···। এ চেষ্টা সম্পূর্ণ রূপে সফল হয়েছে বলা চলে না; কারণ, যে eclecticism-এর বিরুদ্ধে সিনিয়াভস্কি প্রতিবাদমুখর, সে দোষে তাঁর নিজের এই গল্পও কিছু পরিমাণে দুষ্ট। অর্থাৎ, উইটের সুর The Trial Begins···এ ধারাবাহিক নয়।

যে অবাস্তব আবহাওয়ার প্রত্যাবর্তনের শুরু হয়েছিল, তা মাঝপথে এসে হারিয়ে গেছে। পরবর্তী ঘটনাগুলির যে বর্ণনা রয়েছে তা অতিমাত্রায় বাস্তবানুগ। তারপর অবশ্য, সেরিওজার বড়দাদুকে কেন্দ্র করে শাসকমহলের উত্তেজনার আতিশয্যে কিছুটা অদ্ভুতের আভাস মেলে এবং উদ্ভটের সাড়া পাওয়া যায় দুটি পুলিশ কর্তার গোপন খবর জোগাড়ের আজগুবি পরিকল্পনার বর্ণনায় এবং শেষে উপসংহারে। কাফ্কা বা Ionesco-র তুলনায় সিনিয়াভ্স্কির জগৎ কিছুটা অসঙ্গতিপূর্ণ ও বাস্তব জগতের প্রভাবে অপবিদ্ধিত; সম্পূর্ণরূপে বিমূর্ত হতে পারে নি।

সিনিয়াভ্স্কির উপাখ্যানের দুর্বলতা এবং রচনাশৈলীর অনির্দেশ হয়তো কিছুটা তাঁর চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের ও দ্বিধার সঙ্গেও জড়িত থাকতে পারে। তাঁর প্রবন্ধটি, The Trial Begins···এবং অপর একটি গল্প সোবিয়েৎ ইউনিয়নের বাইরে প্রথম প্রকাশিত হয় বিদেশী বন্ধুদের সাহায্যে। স্বদেশে স্বনামে এগুলি প্রকাশ না করে কেন ছদ্মনামে দেশের বাইরে পাঠালেন, তার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে সিনিয়াভ্স্কি বিচারকক্ষে বলেন: 'আমাদের সাহিত্যজগতে প্রচলিত রুচি ও শিল্পকর্ম বিচারের ধারণা কি, সে বিষয়ে নিজে সাহিত্যসমালোচক হবার ফলে, আমার একটা স্পষ্ট অভিজ্ঞতা হয়েছিল। অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমার মনোভাব প্রচলিত ধারা থেকে স্বতন্ত্র ছিল। এ দেশে যা গ্রহণীয়, আমার শিল্পকর্ম তা থেকে সম্পূর্ণ অন্য চরিত্রের। রাজনৈতিক অর্থে নয়, সাহিত্যিক অর্থেই এ স্বাতন্ত্র্য।···আমি এ দেশের প্রকাশনা ব্যবসাটাকে ভালোভাবেই জানি বলে আমার লেখা আমি সেখানে দিই নি। সাহিত্য সমালোচক আন্দ্রে সিনিয়াভ্স্কি, যার লেখা এ দেশে ছাপা হোত এবং গল্প লেখক এন্দ্রাদ টার্টজ্, যার রচনা বিদেশে প্রকাশিত হচ্ছিল—এ দুজনের পার্থক্যটা সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আমি সচেতন ছিলাম। কিন্তু পার্থক্যটা খুব মৌলিক বা আমার মানসিকতাটা দ্বিধাবিভক্ত ছিল বলে আমার মনে হয় নি। এই কারণেই আমি নিজেকে প্রতারক ও ভণ্ড বলে মনে করি না।'

এ যুক্তিটা কতখানি গ্রহণীয় সে তর্কের স্থান এ প্রবন্ধ নয়। কিন্তু নিঃসন্দেহে সিনিয়াভ্স্কি তাঁর রচনায়, সোবিয়েৎ সাহিত্যসমাজের এতদিনের অলঙ্ঘনীয় সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের রীতি থেকে স্বতন্ত্র রচনারীতির সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছেন। ভিন্ন সমাজব্যবস্থা হলেও, সোবিয়েৎ ইউনিয়ন এ পৃথিবীরই অংশ এবং ধনতান্ত্রিক দেশের সাধারণ মানুষের মত সোবিয়েৎ নাগরিকের মধ্যেও

ক্ষুদ্রতা ও মহত্ব, অবসাদ ও আশাবাদ, নিঃসঙ্গতা ও গোষ্ঠীপ্রিয়তা— এই জাতীয় পরস্পরবিরোধী প্রবণতার অস্তিত্ব স্বাভাবিক। যে আদর্শ সমাজব্যবস্থা সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি নিয়ে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল, অর্ধশতাব্দীব্যাপী আত্মত্যাগের পর সেদেশের মানুষ যদি দেখে যে বিকৃতির রাহুগ্রাসে সে আদর্শ প্রায় লুপ্ত, মানুষকে মহৎ করে তুলবার একটা শুভ পরীক্ষায় অগ্নিস্নান ঘটেছে, তাহলে সোবিয়েৎ বুদ্ধিজীবীর মনে এ সন্দেহ উঁকি মারতে পারে যে হয়তো মানুষ এখনও দেবতা হবার উপযুক্ত হয় নি, বামনের চাঁদে হাত দেবার চেষ্টার মত তার সমস্ত পরিকল্পনাই হাস্যকর। তাই বিবেকবর্জিত রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চাকাঙ্ক্ষী অলঙ্কারপূর্ণ প্রতিশ্রুতিতে ধনতান্ত্রিক সমাজের সচেতন চিন্তাশীলদের মত কোন সোবিয়েৎ সাহিত্যিকও আস্থাহীন হতে পারেন, ভাবতে পারেন যে, সমস্ত পরিকল্পনা থেকেও অনেক জটিল, যার জন্য এ পরিকল্পনা— অর্থাৎ মানুষ, তার মনটা এবং অতি বড় দৈবজ্ঞের ভবিষ্যদ্বাণীকেও সে ফাঁকি দেয়। এই কারণেই বোধহয় আজ সোবিয়েৎ ইউনিয়নে দীর্ঘকালব্যাপী প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যনীতির একনায়কত্বের অবসান সম্ভব। এবং যেহেতু, সোবিয়েৎ ইউনিয়নে, অন্যান্য দেশের মতনই, আজও আধিপত্য ও রক্ষণশীলতা সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয় নি, প্রতিষ্ঠিত রীতিবহির্ভূত সাহিত্য হয়তোবা, অর্থাৎ, ব্যাজস্তুতি এবং ছদ্ম-গার্হীর্যের আড়ালে বিদ্রূপাত্মক হতে বাধ্য।

# আমি হাঁটছি

অসীম রায়

আমি হাঁটছি অন্ধকারে
ট্রাম বাস রিক্সা সাইকেল
জন্ম মৃত্যুর পাশ দিয়ে
উৎসব শোক আর শোক উৎসবে
কলকাতার রাস্তায় রাস্তায়
শ্যামবাজার বাগবাজারে
বালিগঞ্জ টালিগঞ্জ বেলিয়াঘাটায়
গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে
সেদিন কি যাও সে তুং গারফিল্ড সোবার্স
কলি থেকে আপরে ত্রেতায়
এ যৌবন পার হয়ে আর এক যৌবনে
অন্ধকারে কুয়াশা ধোঁয়ায়
আমি হাঁটছি কলকাতায়
মাঝে মাঝে অস্থির হাওয়ায় কোলাহলে
কখনো কখনো
অন্যমনস্কতায়।

বিশ বছর আগের সূর্যোদয়
খাতা প্রতীক্ষায় ট্রামস্টপে
ঐ আসে ঐ আসে বিপ্লবের ট্রাম
আলোর মালায়
তারপর কত সূর্য ধসে গেল মধুমেহ থেকে
কত সূর্যোদয়ে রাঙা হাওড়ার ব্রীজ
কত আদি আকবর বড়ে সোলাম আলি
জন্ম মৃত্যু ব্যাধি আর আরোগ্য আরাম।

তুমি যদি বলো কেন বাঁচা
কেন এই বাসবাজার স্নায়ুবাজার
বালিগঞ্জ টালিগঞ্জ টালা
কেন এই পথ চলা গ্রহ থেকে গ্রহান্তর
মিত অন্, মিত অন্ কিংবা ভবিষ্যৎ থেকে বর্তমান
বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে
ফুটপাথ থেকে পার্কে পার্ক থেকে পথে
বিশ্রমে শোধনবাসে কল্প থেকে কল্পান্তরে
বড়ে সোলায় আলি থেকে বীরাবাই ঘরোয়ানায়
এক থেকে দুইয়ে কেন দুই থেকে তিনে
তিন থেকে চারে পাঁচে উল্লাসে বেজারে
কেন পর্বে পর্বে উত্তরণ—
কারণ কলকাতাই বাঁচছে সারাক্ষণ সাথে সাথে
সমস্ত শহর হাসছে কাঁদছে নাচছে ঘুরছে
অতর্কিত আনন্দে ও ক্ষোভে
আশার চাবুকে অলসে নিরাশায় ঠাণ্ডায় সিঁটিয়ে
উচ্ছ্বাসে পরম হয়ে বাঁচছে মূঢ় পারে—
আমি বাঁচছি অন্ধকারে
বস্তির পাঁকে কিংবা স্বল্পল নিওন আলোয়
'হরি বোল' 'বোল হরা বোলে'
কখনও কখনও
নিস্তরঙ্গ ভোরে।

হে সমুদ্র যৌবন আমার
তোমার শঙ্খের ডাক কলকাতায় বাড়িতে বাড়িতে
ট্রামে বাসে রাস্তায় রাস্তায়
ঘরবার যাই
জলের আঘাতে জাগি
বেলায় প্রহারে চন্দন

বালি ঝাঁকড়া লাদা ঘোড়া লাভিনের জাল
শঙ্খের নিঃশ্বাস আর পঙ্খের প্রাণময় রতি
সর্বক্ষণ উপস্থিতি
আবহমান কালের কোরাস
মানুষের স্বর আর গুরুজ নিঃশ্বাস
তার সঙ্গে নক্তচক্ষে দূর কাটুমেরান
বালিতে জেলেনি খোঁপা বাঁধে।

যে সমুদ্র যৌবন আমার
সতত্বার সামনে দাঁড়াই
কলকাত্তার পথ ঘাট এক সঙ্গে কথা বলে ওঠে
যে যে পার্কে খেলেছে যৌবন
যে পথে কৈশোর আজও হাঁটে
যে জানলায় হাত গেল যে জানলায় কখনও যাব না
সেই সব মুখ বাড়ি আঁসটে হাওয়ায় কের ওড়ে
বালি জলে রোদে।

হীরেন, তোমার স্বর্গ বার বার শুনেও শুনিনি
তোমার সে ব্যাপ্ত ব্যথা বাৎসল্যে মুখ
ঘাড় পঙ্খনের নীচে ইস্পাতের রেখায় ভঙ্গিমা
আকর্ণ আঁখির টান বিস্ফারিত নাকের ব্যাপ্তর
বাঁকুড়ার ফাটা মাঠে অশথের শিউ ছায়া প্রোথিত ভৈরব
গড়বেতার জঙ্গলে টেরাকোটা
হীরেন তুমিও জানো সে অতীত সেই তীব্র গাঢ় উপস্থিতি
আলমারিতে সাজানো চলে না
পিলসুজ আজ ছাইদানি
যা চলে যা বলে যাই নড়ে কাঁপে আলোড়িত হয়
তাই ঘরে আমাদের
স্বর্গ যা ধারণ করে।

শব্দকে বড়ই ভয়
শব্দের খাঁচায় বন্দী মানুষের জানা জানটানো
অভিনব আওয়াজেই মনীষার অস্তিম আস্ফালন
তার চেয়ে হাঁটা ভাল তার চেয়ে সযত্নে দাঁতার
তার চেয়ে দেখা ভাল স্থির দৃষ্টি দিয়ে
পর্বে পর্বে উত্তরণ
বাড়িগুলো যত হয় ছোট হয় মানুষের মত অনে নেতে
জলের ধারায় কোন্ বাড়ি প্রজাপতি
কোন্ মুখ ঋতুমতেও মহীয়ান
সর্বদা যে বাস্তব পালায়
আমি তার পিছে পিছে
কথার পোছনে কথা শব্দের ওপারেই নৈঃশব্দ্যের ধ্বনি নিরবধি
হে নবীন কবি তাই 'বোনি দাও বোনি দাও' তোমার যন্ত্রণা
কেমন কবিক লাগে
যেমন কবিক লাগে সাংবাদিক শব্দের বিলাস
শব্দের পোছনে সেই নৈঃশব্দ্যের ধ্বনি কই কথার পোছনে সেই কথা
সব কি অনড় প্রতিমা ?

আমি তাই হাঁটি হাঁটছি সবসময় সমূল
শহরের রাজপথে অলিতে গলিতে
ট্রাম বাস রিক্সা সাইকেল
জন্ম মৃত্যুর পাশ দিয়ে
শ্যামবাজার বাগবাজার খালিপঞ্চ বেলিয়াঘাটায়
কল্প থেকে কল্পান্তরে
এ যৌবন পার হয়ে আর এক যৌবনে
অন্ধকারে
কখনো কখনো
নিস্তরঙ্গ তোয়ে।

# মহিম

## কার্তিক লাহিড়ী

শীতকালে বুক-খোলা কালো কোট, নীচে পুলওভার, কদাচিৎ ধুতির বদলে প্যাণ্ট, গরমের দিনে তাঁতের ধুতিপাঞ্জাবী, খুলকি ও কানের কাছে চুলের রঙে ঈষৎ রকমফের, মনে মনে নিদারুণ উত্তেজিত অথচ হাব-ভাবে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বিনয়ী তরুণ ত্রিশবছর বয়স্ক মূর্তিটির বন্ধুবান্ধব সংখ্যায় স্বল্প। সংসার সম্বন্ধে না-আগ্রহী না-উদাসীন সে অন্য সকল মধ্যবিত্তের মতই প্রায় সাধারণ অন্যান্য ব্যাপারে, যদিও তার মন একটি জীবন্ত আগ্নেয়গিরি বিশেষ, বিস্ফোরণের জন্য সর্বদা প্রস্তুত। এ-বিস্ফোরণ সৃষ্টির তাগিদে, মূর্তিটির ধারণা— প্রতিভার স্ফুরণ সময়সাপেক্ষ, তা স্বতোস্ফূর্ত বর্ষার মত এবং প্রতিভা একটি অলোকসৃষ্টি, অকস্মাৎ লোকান্তিকের মেঘ উদ্গারণের মতই সেই সৃষ্টি লভ্য, সেজন্য ধৈর্য ও তিতিক্ষার প্রয়োজন। যদিও প্রচলিত অর্থে সে সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক কিংবা দার্শনিক নয়, তবু তাঁদের মত সে এমন কিছুর প্রত্যাশী যা সাধারণ ভাষায় অলৌকিক নামে চিহ্নিত। সেই শৈশবে পাঠ্যপুস্তকে মহাজনদের আকস্মিক ফল-প্রাপ্তির কাহিনী পড়ে বা লোকমুখে শুনে অদ্যাপি মানে এই ত্রিশবছর বয়েসেও সে সেই ধারণার দ্বারা তাড়িত, বিচলিত। নিরন্তর চিন্তা করতে করতে, বা গ্রন্থপাঠের ফলে মনে মনে গল্প কবিতা রচনা করলেও সে সেই সব নীরব গল্প কবিতা লিপিবদ্ধ করার বিপক্ষে, তার মতে এগুলি শিশুপাঠ্য নেহাত মামুলি, তাৎপর্যহীন। অথচ 'আদৌ কি শিল্পী সাহিত্যিক হতে চাই' এ প্রশ্নের সম্মুখে সে শিশুর মত অসহায়, কারণ এর উত্তর তার অজানা; এবং এরপর 'আসলে আমি কি হতে চাই' প্রশ্নটি তার সমস্ত অস্তিত্ব, এতাবৎ লালিত সমস্ত আশার ভিৎ নাড়িয়ে দিতে দিতে ঊষাও হলে সে বহুর পর অন্যান্য মত সমূহ বিসর্জন, যদিও এ রকম অবস্থা ক্ষণস্থায়ী, কারণ তারপরই অভ্যাসবশে বা চিন্তা ছাড়া গত্যন্তর নেই এমন অবস্থায় সেই ক্ষণটির জন্য অপেক্ষার অধীর, তার দৃঢ় প্রত্যয় সে-মুহূর্ত সমাগত প্রায়। তাই 'আমি প্রতিভাবান্' আবৃত্তি করা তার আত্মপ্রসাদ, আশ্রয়ও বটে। অবশ্য এ জন্য দায়ী বিশেষত আদি ও মধ্যকাল।

'বাবা প্রসঙ্গে অভিশাপ আছে'— এই আর্ষবাক্যটি অপ্রমাণিত করে আজও এরা ধূর্জটির পরমবন্ধু এবং ধূর্জটির প্রতিভা সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ। মজার বিষয় এদের মন্তব্য ধূর্জটির কাছে প্রশস্তি রূপে বিবেচিত, কারণ এদের সিদ্ধান্ত বা বাক্যের সত্যতা ধূর্জটির ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে বার। তাই সে অমিত ও সুপ্রকাশ সম্পর্কে অন্ধ। বিশেষ কোনও প্রতিবন্ধক না থাকলে, যেমন জন্ম মৃত্যু বিবাহ জাতীয় ঘটনা, এদের সাক্ষাৎ নিত্যনৈমিত্তিক ; সন্ধ্যার পর নিঃশব্দে নগরপরিক্রমণ শেষে চায়ের দোকান, অথবা ভিক্টোরিয়ার ধারে বালির উপর বসে বসে অতি সন্তর্পণে নৈঃশব্দ্যের বন্ধক ভাঙা। প্রতিদিনে ঘুরেফিরে সেই এক কথা, চতুর্থ জনের উপস্থিতিতে এর ব্যতিক্রম নেই।

। অমিত — ঘোটেই মানিনা। প্রতিভা নাইনটি-নাইন পারসেন্ট পার-সিস্টিয়ারেন্স, ওয়ান পারসেন্ট ট্যালেন্ট—হতেই পারে না। সুপ্রকাশ — আমিও বিশ্বাস করি না। (একটু থেমে) আরে তাই যদি হতো তবে দোকানে যারা খাতা লেখে তারা সবাই আইনস্টাইন হতো। ( সকলের হাসি )। অমিত— দেখ্, বাল্মীকির কবিত্বের উন্মেষ, রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতা লেখা, নীউটনের সূত্রাবয়বানতত্ত্ব পাওয়ার ঘটনা— সবই সেই আকস্মিকতার মালা। বিমল—( উপস্থিত থাকলে ) বিজ্ঞানীরাই বা কম কি। আর্কিমিডিস, নিউটন সবার আবিষ্কার যাকে বলে কবির ভাষায় হঠাৎ পাওয়া ধন। ( ধূর্জটি স্বল্পভাষী, তাই নিশ্চুপ )। সুপ্রকাশ—তোর মত কি ধূর্জটি ? ( ধূর্জটিকে নিশ্চুপ দেখে ) আর প্রতিভা যে সর্বদাই প্রকাশিতই থাকবে এমন কোনও কথা নেই। ( একটু থেমে ) আমি বাবা, এ সব বিষয়ে অলৌকিকত্ব মানি। অমিত ·(প্রায় লাফিয়ে উঠে ) কে না মানে রে ? যারা মানে না, আসলে তারা ভণ্ড।।

বহুক্ষণ স্তব্ধতার পর আলোচনার ধারা প্রায় এমন—

। ধূর্জটি—( খানিক আকাশের দিকে চেয়ে, তারপর ধূয়ে দৃষ্টি প্রসারিত করে অন্যমনস্ক কণ্ঠে ) এই পৃথিবীর জন্মও তো আকস্মিক, এমনকি জীবের জন্ম কোন তড়কোটের অভিঘাতে, তা কেউ বলতে পারে না। আমার বক্তব্য প্রতিটি জন্মের ইতিহাস রহস্যময়, কিন্তু আকস্মিক। প্রতিভা মানে সৃষ্টি, জন্ম। সেজন্য··· অমিত—( কথা কেড়ে নিয়ে ) ঠিক, সেজন্য আমরা সবাই সেই অপ্রত্যাশিতের প্রত্যাশা করি। ভাবি, হঠাৎ এক সময় সেই দিব্যদৃষ্টি লাভ করবো—। সুপ্রকাশ—( হেসে ) কি যা-তা বলছিস। আমরা আশা করি ঠিকই, কিন্তু ক-জন পায় ? অমিত—( বিরক্ত হয়ে ) কথাটা শেষ করতেই দিলি না।

আমি বলছিলাম সবাই আমরা প্রত্যাশী, কিন্তু ক-জন পায়? হয় আমাদের মধ্যে, (একটু থেমে) শুধু আমাদের মধ্যে কেন এই শহরের মধ্যে ক-জন সেই দৃষ্টি লাভ করবে? ধূর্জটির মত মানুষ যে কিনা—(ধূর্জটি ঈষৎ হাসাতে যায়) না, না— তোর লজ্জা পাবার কিছু নেই। আমাদের স্বামীজির কথা কখনো ভুল হয় না। সুপ্রকাশ—(বিশেষ গম্ভীর হয়ে) তোর গুরুদেবের কথায় আমার বিশ্বাস আছে। আমি আগে এ-সব বিশ্বাস করতাম না, কিন্তু তোর গুরুদেব আমার সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তা বর্ণে বর্ণে ফলে গেছে। বিমল চরম হাসছে, কিন্তু—। বিমল—হাসবো নিশ্চয়। কারণ এ-সব আমি বিশ্বাস করি না। তবে মানুষের মধ্যে যে অসীম শক্তি লুকিয়ে আছে একথা আমি মানি। এ-ও আমি মানি যে আমাদের মধ্যে ধূর্জটির—(ধূর্জটির দিকে তাকাতে থেমে যায়, কারণ তখন ধূর্জটির দৃষ্টি সুদূরে প্রসারিত)। ধূর্জটি—তোরা বলিস বটে, আমিও অনেক সময় অনুভব করি, তবু মাঝে মাঝে ভয় হয়, বুঝিবা—। অমিত—তোর মত ভেলেমানুষী!।

এরপর সংলাপাদি অতি সাধারণ, 'কাল কোথায় খেলা হবে, অমিতের মেয়ের জ্বর ছেড়েছে কিনা, বিমলের পরীক্ষার রিপোর্টেশন, মেসোমশাইর বাতের ব্যথা কমলো কিনা, জিমিষের দাম যেমন বাড়ছে তাতে বাঁচাই দায়, সংসার আর ভালো লাগে না তার চেয়ে সন্ন্যাসী হওয়াই ভালো' ইত্যাদি ইত্যাদি তুচ্ছ সাংসারিক সামাজিক কথায় বাড়ি ফিরতে ফিরতে সকলের মন কিন্তু অলক্ষে অচেতনে সেই প্রতিভা-ভরে ভরপুর, ধূর্জটি অবশ্য এর মধ্যে সবচেয়ে আক্রান্ত তাই তত্ত্বের ধারা, নেতৃত্ব স্বপ্ন, দিবাস্বপ্ন, জাগরস্বপ্ন তার নিত্যসহচর ও প্রাণাধিক প্রিয়। বাড়ি ফেরার সময় দীর্ঘপথে একা একা স্বপ্ন দেখতে দেখতে চিন্তা করতে করতে স্বপ্ন ও চিন্তা গুলিয়ে ফেলে তা যে সত্যি এবং বাস্তব এমন ধারণা সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রায় নিশ্চিন্ত হতে গিয়ে বাড়ির মুখে দরজার সামনে এসে কিংকর্তব্যবিমূঢ়, কারণ তখন তার সামনে দাঁড়িয়ে নগ্ন বাস্তব—সমাজ, সংসার পরিবার ইত্যাদি।

রাত অনেক বলে নির্জন রাস্তায়, রাস্তার দুপাশে গাছ, গাছের মাথায় চাঁদ এবং গাছ ও চাঁদের সহযোগে সৃষ্ট রাস্তার উপর আলো-ছায়ার ঝিলমিলে চলতে চলতে, মাথা নীচু করে হাঁটার জন্য, একাকী সে একটি স্বপ্নের দ্বারা আক্রান্ত প্রায়ই: আকস্মি হঠাৎ স্থির হয়ে বারান্দা স্পষ্ট দৃশ্যমান, তারপর অন্ধকার, অন্ধকারে সিঁড়ির ধাপ নিমজ্জিত, চারধারে থ্যাপ্ত তমিস্র, সমস্ত

পথ অলিগলি একাকার, অকস্মাৎ মহিষের চোখের মত টকটকে লাল একটি আলো প্রথমে দূর তারপর উজ্জ্বল রূপে দীয়মান, সেই প্রায় না-থাকা আলোর মধ্যে একটি শরীরের অস্পষ্ট রেখা, ক্রমে নারীমূর্তি মোনালিসার হাসির মত রহস্যময়, তারপর বিদ্যুতিত-জ্যোতিসমন্বিত মহিলার আহ্বান এবং আমি এগিয়ে এগিয়ে তার আহ্বানে সাড়া দিতে দিতে তাকে ধরার জন্য ব্যাপৃত। তারপর হাতের মুঠোর ঠিক কাছে পেতেই তীব্র আলোর ঝলসানি— : স্বপ্নের ঠিক এ-সময় অথবা এর কিছু আগে, কোন কোন দিন স্বপ্নের আক্রমণ শুরু হবার কিছু পরেই হয় ট্রাক-লরির হেডলাইট, না হয় রিকশার ক্রিং ক্রিং, না হয় পথচারীদের সংলাপ দুঃস্বপ্নের হত্যারক হওয়ায় দুর্বৃত্তটি বিরক্ত ও ক্লান্ত। এ স্বপ্ন বা কাল্পনিকতাটি তার সর্বাধিক প্রিয়। তার বিশ্বাস, স্বপ্নের ওই মহিলাটি আসলে প্রতিভা, তিনি সহজলভ্য নন, বহু অন্বেষণ-অপেক্ষার শেষে তাঁকে অকস্মাৎ পাওয়া সম্ভব। দুর্বৃত্তটির বিশ্বাস তার রক্তমাংসের মতই, সেজন্য এই স্বপ্নের মত আরও কয়েকটি স্বপ্নের আনা-গোনায় সে মোটেই বিস্মিত নয়। : একটা চিঠি, খামে ভরা, খুলতেই চোখের দিকে দিকে বিদ্যুৎ। দৃশ্য পরিবর্তন—বিরাট সভা, একের পর এক প্রশংসা-পত্র পাঠ, হাততালি, সংবর্ধনার শেষে মালা— লাল, নীল, হলুদ, সবুজ রঙের বস্ত্রের সাতস্তরের সম্মারোহ, পুনরায় হাততালি, মানপত্র পাঠ, অতঃপর সম্মানিত ব্যক্তির ভাষণ এবং আমি সেই সম্মানিত ব্যক্তি। : এ-স্বপ্নটি তার আত্ম-প্রসাদ দাতা। স্বপ্নগুলির মধ্যে দ্বিতীয়শ্রেণির এটি। এ-ছাড়া, বহু স্বপ্নদ্রষ্টা দুর্বৃত্ত অন্যান্য স্বপ্নগুলিকে বিশেষ আমল না দিলেও সেগুলি দুর্বলচিত্তকে উদ্ভ্রান্ত করার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু সে, আপন বুদ্ধির সাহায্যে স্বপ্নগুলি বিশ্লেষণ করে আজগুবি সন্দেহ করায় সেইসব স্বপ্নদ্বারা আক্রান্ত হলেও অটল ও স্থির, যেন এ-সব বুদ্ধদেবের সাধনার পথে মায়ের উৎপাত বিশেষ। 'কিন্তু কিজন্যে আমি স্বপ্ন দেখি, আমি তো কিছুর জন্য চেষ্টা করি না' ইত্যাদি সন্দেহ উঁকি মারলেই সে দিশেহারা। এ-রকম চিন্তা তার অনাকাঙ্ক্ষিত, সে তক্ষ পরমুহূর্তে পুনরায় অলোকবৃষ্টি দাতের চিন্তায় প্রায় জোর করে মন ভরে 'আমি প্রতিভাধর' ভেবে সচেতন ও দৃঢ়সংকল্পিত। 'মা, আমি এই জন্যে জন্মেছি। বাবার সামনে যেতে সবাই ভয় পায়, কিন্তু বাবাই আমায় সমীহ করেন। অপিসেও সবাই আমায় শ্রদ্ধা করে। জানে, আমি সবার মত নই। অমিত, সুপ্রকাশ না হয় আমার সঙ্গে পড়েছে, কিন্তু বিমল অরুণ

এরাও তো আমার উপযুক্ত মর্যাদা দেয়। নিশ্চয়ই আমার মধ্যে ওরা কিছু আবিষ্কার করেছে, কিছু দেখেছে বলেই আমায় সম্মান করে। আর অমিতের গুরুদেব কোষ্ঠীবিচার করে হাত দেখে যা বলেছেন তা কি মিথ্যে হবার? আরও একজন জ্যোতিষ-সম্রাট বলেছেন ত্রিশ বছর পরেই আমার যশ বিশ্ব-জোড়া হবে। অমিতের গুরুদেব অঙ্ক কষে কষে বলেছেন, যেদিন ত্রিশ বছর পূর্ণ হবে, সেদিনই আমার সুদিন, সেইদিনই আমি ঈপ্সিত লক্ষে পৌঁছে যাবো। না, সন্দেহ করবো না; করার কোনও কারণ নেই। আমি প্রতিজ্ঞা নিয়ে জন্মেছি, আমাকে সেদিনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।' সন্দেহ বা ভয় আসলে সে বর্তমানে এই প্রকার চিন্তায় অভ্যস্ত, ফলে সে নিশ্চিন্ত প্রায় ঈশ্বরের মত। সেজন্য সে বিবাহ ব্যাপারের বিরোধী, কারণ বিবাহ এই পথের প্রতিবন্ধক। শোপেনহাওয়ারের মত তার অভিমত যে একমাত্র দার্শনিকগণই বিবাহের উপযুক্ত পাত্র এবং দার্শনিকরা বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে সর্বদা নারাজ।

'আমি কি সাধারণ? অপিস যাওয়া, বাড়ি ফিরে যাওয়া, সন্ধ্যায় ভ্রমণ, স্নান দ্বারা আক্রান্ত হওয়া, রাত্রে ফিরে কিঞ্চিৎ বই পড়ে ঘুম, তারপর সকালে ওঠা— এ সব সবার জন্য। আমি ব্যতিক্রম কিসে?' এমন সংশয়ের পর 'আমি প্রতিভাধর, অসাধারণ। আমার কাজে জগৎ স্তম্ভিত হবে' ইত্যাদি আত্মপ্রত্যয়ে পুনরায় সুদৃঢ়, কিন্তু কোন কোন সময় এ-সব উক্তি হাস্যকর অনেকের কাছে সন্দেহ নেই, এবং তা ঘূর্ণটির জানার মধ্যেই, তাই সাধারণত আঘাত পাবার আশঙ্কায় তেমন লোকদের আসলে না এনে নিরিকার হবার চেষ্টায় সংগ্রামরত, এবং এ-সব সময় কয়েকটি প্রশংসাসূচক বাক্য তার প্রধান আশ্রয়ভূমি। এর কোন কোনটি নিজ কানে শোনা, কোন কোনটি তৃতীয় ব্যক্তির মারফৎ জানা, কয়েকটি হয়ত আড়ালে আবডালে শোনা।

॥ বাবার কথা: (ভাইবোনদের কাছে) তোদের ঠাকুরদাদা সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, যেমন চেহারা তেমনি দূরদৃষ্টি। মৃত্যুর কিছু আগে ডেকে বললেন, নারায়ণ তোমার জীবনে তো কিছুই হলো না, তুমি শুধু কর্তব্য করেই গেলে। তবে আমার আশা তোমার বড়ছেলের মধ্যে পূর্ণতা পাবে। ওকে খুব যত্ন করে মানুষ করো, কখনো তার উপর রাগ করবে না। সে কণ্ঠস্বর পুরুষ, আমাদের বংশের আশা যে তেমন পুত্রের পিতা তুমি-ই হবে। তোদের মাকে ডেকে বলেছিলেন, যা তুমি সৌভাগ্যবতী, পুত্রের পরিচয়ে তুমি চিরজীবী হবে।

যাবার কথা কোনদিন ভিবলে যায় না, দেখিস তোদের দাদা একজনের একজন হবে।:

: প্রিয়াংশুর কথা— ওকে কিছু বলবেন না। ও কাজ না করলে কি হলো? ওর মত আগে হতে চেষ্টা করুন। ও যে আমাদের অফিসে আছে এই আমাদের ভাগ্য। দেখেন না ও সর্বদা একটা চিন্তার মধ্যে, একটা গভীর কিছুর মধ্যে বাস করে। সবাইকে এক মানদণ্ডে বিচার করলে শেষে পস্তাবেন।:

: অসীমের কথা— দুর্বৃটির কথা বলবেন না দাদাই। ও চিরকাল-ই আমার শত্রু। চান্সে শুধু ফার্স্ট হতো তাই নয়, ওর চেয়ে আমি অনেক অনেক খারাপ নম্বর পেয়ে সেকেণ্ড হতাম। ওকে দেখতে পারি না। কিন্তু তাই বলে ওর প্রতিভা অস্বীকার করার মত আমার ক্ষমতা নেই। ও তো ম্যাট্রিক পড়ার সময় আই-এস-সির অঙ্ক করে দিতো। আর ম্যাট্রিকের অঙ্কের উত্তর ছিল মুখে মুখে।

: অমিত ও সুপ্রকাশের কথা— দুর্বৃটির মত ছেলে দেখিনি। একমাত্র শ্রেষ্ঠ প্রতিভার সঙ্গে তুলনা চলে। হাসবেন না, যারা ওকে ঘনিষ্ঠভাবে চেনে তারাই বলবে ও কথা।।

এমন কি শহরের অনেকের ধারণা, দুর্বৃটি একটা জিনিয়াস। হয়ত ম্যাট্রিক ও ইণ্টারমিডিয়েট-এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম হওয়া তাদের এ-ধারণার সৃষ্টা। কিন্তু কলেজের চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করে দুর্বৃটি স্বপ্রতিভা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেওয়া প্রতিভাধরের পক্ষে অপমানকর বিবেচনা করায় পরীক্ষা না দিয়ে আণ্ডার গ্রাজুয়েট হওয়ায় শুধু স্থানীয় সরকারী অফিসে পোস্টার ডিভিশন কেরানীর চাকরি নিতে বাধ্য হলেও বিস্মিত নয়। ওর মতে 'প্রতিভাধরদের চাকরি সম্পর্কে বাছ-বিচার নেই। রামপ্রসাদ হিসাব লিখতে লিখতে কবিতা লিখতেন, অতএব ওটা কিছু নয়।' কিন্তু এর পরেই সে মনে মনে ভাবল, অদ্ভুত—'সবাই আমার দিকে চেয়ে আছে, অথচ আমি···?' তারপর নিশ্চিন্ত হলে ভাবল এ-রকম, 'আর কয়েকদিন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ত্রিশ বছর পূর্ণ হয়ে যেদিন একত্রিশে পা দেবো, সেদিন সেই মুহূর্ত থেকে আমি অনন্যসাধারণ। কেউ ঠেকাতে পারবে না। পৃথিবীর কেউ সেদিন আমার উপেক্ষা করতে পারবে না, কারণ সেদিন আমি একজনের মধ্যে একজন।'

অতএব দূর্বটি সেই ক্ষণটির জন্য অপেক্ষায় অধীর, এবং তার দৃঢ়প্রত্যয় সে মুহূর্তটি সমাগত প্রায়। বাবা, মা, ভাইবোন, অমিত, সুপ্রকাশ, অরুণ, বিমল— সকলে অপেক্ষায় অধীর। তার বিশ্বাস, এবার-ই, অর্থাৎ আগামী ৭ই ফেব্রুয়ারী সেই মুহূর্তটি আসছে, অবধারিত, অনিবার্য।

১২১

দিন যায়ে সেই একই উত্তেজনা, প্রতীক্ষা। স্বপ্ন, চিন্তা, ঘুম, খাওয়া ইত্যাদিরও কোন ব্যতিক্রম নেই। দূর্বটি অথচ ভেতরে চঞ্চল এবং অধীর। মধ্যে মধ্যে সংশয়, 'তবে কি বাবা, অমিত, সুপ্রকাশ সবাই হাল ছেড়ে দিয়েছে? আমাকে অপদার্থ ভাবছে?' এই-হতাশার ফলে মধ্যে মধ্যে অভিমান, 'না, আমি কারুর সঙ্গে মিশবো না, একা থাকবো।' এবং এর পর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, 'আমাকেই প্রমাণ করতেই হবে যে, আমি প্রতিশ্রুতিময়।' অথচ এতে জোর কতটুকু। দূর্বটির পায়ের তলায় মাটি সরে সরে যায়, সে আবার উত্তাল, 'আমাকে শক্ত হতে হবে, আমি জয়ী হবো।'

এবং এমনি করেই আহ্নিক গতির সঙ্গে সঙ্গে কখনো হতাশায় কখনো অভিমানে কখনো বেদনার প্রতিজ্ঞায় সে ক্রমশ অভিজ্ঞ দূর্বটি। তার জীবনের সঙ্গে অন্য জীবনের তফাৎ নেই জানলেই তার সবচেয়ে অপমান ও অভিমান। 'তবু আমি ধৈর্য ধরবো, সেই ৭ই ফেব্রুয়ারী হবে আমার বিজয় দিন।'

অনেকদিন পর ঠিক ভোর রাতে ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে দূর্বটি একটা স্বপ্ন দেখল। : তরতর চকচকে একটা জলের পাত, ফণে ফণে ঢেউ খাঁখানো। চিকমিকি, সে এসে দাঁড়ালো তিস্তার ধারে। চারধারে ভয়ঙ্করতা, আকাশে চাঁদ, নীচে তিস্তার সুবিস্তৃত চর জ্যোৎস্নায় ঝকঝকে। দূর্বটির হাতে কে হাত রাখল, চমকে ফিরে দেখতে গিয়ে অবাক। বাবা হাসলেন এবং ইঙ্গিতে তাঁকে অনুসরণ করতে বললেন। বাবার হাত ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে, দূর্বটি পিছিয়ে পড়ছে, বালিতে পা আটকে যাচ্ছে। করুণ ভাবে বাবার দিকে তাকালে দেখল, বাবা হাত নেড়ে নীচে কি দেখাচ্ছেন। নীচে চাইতে দেখল বাতাসে বালিগুলো সিঁড়ির ধাপের মত ঘরে ঘরে সাজানো। বাবা হাসতে হাসতে ধাপ করে তোজবাজির মত মুহূর্তে সিঁড়ি হয়ে চাঁদের মধ্যে ঢুকে গেল। আর তখন চাঁদ নেই, চারধারে অসীম অন্ধকার, অন্ধকার পাথারের মত, অন্ধকার জলের তলদেশের মত নিস্তব্ধ। ভয় পেয়ে পিছিয়ে আসতে

দেখল সামনে বারান্দা। বারান্দায় অমিত ও সুপ্রকাশ। মূর্তটি এগিয়ে গিয়ে কিছু বলার আগে অমিত সুপ্রকাশ উধাও। অবাক হয়ে আমার তাকাতে হঠাৎ আলো জ্বলে উঠল, এবং সেই মুহূর্তে দেখা গেল সিঁড়ি, মুলন্ত সিঁড়ি কখনও ঘুরে ঘুরে নেমে গেছে। অধীর আগ্রহে প্রায় ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নামতে যাবার মুহূর্তে আবার অন্ধকার চতুর্দিকে। সেই ব্যাপ্ত অন্ধকারে চরাচর অদৃশ্য, মূর্তটি একটা মালা গলায় পরে স্ট্যাচুর মত দাঁড়িয়ে। হঠাৎ মহিষের চোখের মত লাল আলো, জলে তীব্র, অতঃপর ম্লান মিলিয়ে। সেই আলোয় দেখা নারী, নারীর চোখে আহ্বান, সে এগিয়ে দেয় একটা খামে ভর্তি চিঠি, চিঠি খুলতে নারীর আহ্বান, বাবার মুখে আনন্দ, অমিত সুপ্রকাশ এসেই দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, চিঠি উড়ে যাচ্ছে, মূর্তটি উধাও হয়ে চিঠির পিছু পিছু ছুটতে রাশি রাশি মালা এসে পড়তে থাকল গলায়। শঙ্খ বেজে উঠল, জয়ধ্বনি উঠল। মানপত্র পাঠ করা হলো, নারী আহ্বান জানালো, মহিষের চোখ রাগে জ্বলে উঠলো, রাশি রাশি ফুল ফুটে উঠে কেটে পড়ল, হাততালি আগুন জ্বালিয়ে দিলো ; মালা, প্রংসলা, ভক্তি, মালার ভারে ন্যুব্জ দেহে মূর্তটি এগিয়ে আসছে. সবাই চিৎকার করে বলে 'কনগ্রাচুলেশন', 'জানি এ হতোই,' 'তুই আমাদের মুখ রক্ষা করলি,' আরও অজস্র ছোকরাকা শুনতে শুনতে সে এগিয়ে পড়ল, চারধার থেকে অনেকে ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটে এলো। মূর্তটি পাশ ফিরে শুয়ে হেসে বলল, আমাকে একটু বিশ্রাম করতে দিন, বড্ড ক্লান্ত। তারপর অখণ্ড শান্তি, নির্জনতা ; সে হাসতে হাসতে বাবার কাছে গেল। বাবা আশীর্বাদ করার মুহূর্তে শঙ্খ বেজে উঠল, এবং আকাশ বাতাস জলস্থল অন্তরীক্ষ—চতুর্দিক থেকে ফুল উড়ে উড়ে এসে বিরাট বেদী তৈরী করে ফেলল, এবং মূর্তটি বক্তৃতা দেবার জন্য উঠে দাঁড়াতেই লক্ষ লক্ষ হাত হাজার হাজার করতালি দিয়ে অভ্যর্থনা জানাল। মূর্তটি আরম্ভ করল, আমি জানতাম আমার সাফল্য আসবেই। ঠাকুরমার মানসপুত্র, অমিতের গুরুদেবের ভবিষ্যদ্বাণী এবং নিজের অহরহ প্রচেষ্টা,—সেই সময় ঝপাং করে সিঁড়িটা নেমে এলো, সে স্প্রিং-এর পুতুলের মত টক্ করে লাফিয়ে ধরতে গিয়ে দেখল অধীর তাকে আদর করছে, অবাক হয়ে চাইতে দেখল, স্কুলে নীচের ক্লাশে যিনি বিজ্ঞান পড়াতেন সেই মাষ্টার মশাই হাসছেন, যেন বলছেন, অকস্মাৎ-ই লোকে প্রতিভাদেবীকে কবায়ত্ত করে, কেমন বুঝলে তো? তখন ব্ল্যাকবোর্ডে ফুটে উঠল এ বি সি একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ যাহার—,

সাবিবদ্ধ ভাবে আবার সবাই দুর্জটিকে ঘিরে ধরল। সবাই কিছু-না-কিছু বলতে উদগ্রীব, আর সে, রাজকন্যের ভঙ্গীতে বরাভয়ের মুদ্রায় হাত তুলে সকলকে শান্ত করে বেরে জানালো, আমি কৃতার্থ। তারপর সভা ভঙ্গ, তারপর একটা কালো রঙের মোটর এসে দাঁড়ালো, সে তারমধ্যে গলে যেতেই মোটর ছুটলো। সকলকে ভালো করে দেখার আগেই মোটর বাড়ি এসে পৌঁছুতে, অপেক্ষমান জনতাকে জানালো, আমি ক্লান্ত, কাল দেখা করবো। এবং নিজের ঘরে ঢুকে বিছানায় গা এলিয়ে দিতে দিতে ভাবল, এবার স্বপ্ন দেখার পালা চুকলো।

পরদিন ভোর রাতে এবংবিধ স্বপ্নদেখা দুর্জটির কাছে বিশেষ অর্থময়, কারণ আজ ৭ই ফেব্রুয়ারী, আজ সেই যজ্ঞ ঔলিস্ত অনেক প্রতিক্ষিত দিন। 'ভোরের স্বপ্ন সকল হয়'— এমন প্রবচন শুধু সত্য নয়, অকাট্য। অতএব দুর্জটির পুলক আনন্দ শিহরন আকাশচুম্বী, উঠে টেবিলে দৃষ্টি মেলে টেবিলের উপর একরাশ ফুলের দিকে হঠাৎ শরীরের লোম কদম ফুলের রেণুর মত খাড়া হয়ে যেন প্রাণটাকে টুঁটি করে বের করে নেবার ঝিকিয়ে প্রস্তুত। দুর্জটি খানিকটা নাগলে, 'আজই সেই দিন', নিশ্চিন্ত হয়ে ধীরে ধীরে শয্যাত্যাগ করে টেবিলের ধারে ফুলগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে ফুলগুলো মালার মত রূপ রচনা করে চোখের সামনে দোদুল্যমান, দুর্জটি প্রথমে অস্থির, পরে স্থির হয়ে অত্যধিক আলোড়িত না হয়ে 'এখন বাবামন যাওয়া, মুখ ধোয়া, স্নান সেরে ধোয়া জামা-কাপড় পরা, তারপর ঠিক সাতটার সময় বাবাকে প্রণাম করা' ইত্যাদি চিন্তা করে একের পর এক নির্ধারিত কর্মে তৎপর।

মাত্রাতিরিক্ত সুখ অনুভবের ফলেই হয়ত স্নান সেরে কাপড় জামা পরার সময় গুনগুনানিতে নিজেই অবাক হয়ে ঘড়ির দিকে তাকাতে সাতটা বাজতে এক মিনিট দেরী দেখে সটান বাবার ঘরে। বাবা তখন শায়িত, তাঁর চোখ মুদিত, ফলে দুর্জটি 'চলে যাবো, না, প্রণাম করবো' ভেবে বিমূঢ়। শায়িত অবস্থায় প্রণাম করা উচিত নয়— সেজন্য সে ইতস্তত, তাই চলে যাবার জন্য ঘুরতে মন স্থির, কারণ এ-সময় বাবার আশীর্বাদই দুর্জটির সর্বপ্রথম এ-মুহূর্তে কাম্য। কাম্য। কিন্তু তা বিফল হতে দেখে তারাক্রান্ত মনে পা বাড়াতে 'আশীর্বাদ করছি তোমার কামনা সফল হবে' বাবার এমন বাক্য শুনে সে প্রায় ছেলেমানুষের মত বাবার পায়ে উপুড়, তখন কোনও জবাব না দিয়ে শঙ্খ বেজে উঠতে দুর্জটি পাথরের মত স্থির নিষ্কম্প।

'কাল এই স্বপ্ন দেখেছিলাম, যখন যারা আশীর্বাদ করবেন, তখন—' মুহূর্তে লজ্জারুণ আলোকিত হয়ে যাবার মুখে স্মিত হাসি লক্ষ করে 'যা, আমার ত্রিশ বছর পূর্ণ হয়েছে, এবার আমি অলোকদৃষ্টি লাভ করবো' এমন সিদ্ধান্তে সুনিশ্চিত হয়ে ধীরে ধীরে নিজের ঘরে এসে এরপর কী কর্তব্য ভাবার চেষ্টায় 'আজ অপিস যাবো না। বাড়িতে শুভচিন্তে অপেক্ষা করবো। ভোরবেলার স্বপ্ন সত্যি হয়, এবং তা হবেই' ইত্যাদি আবৃত্তি করে পুনরায় খুশীতে ডগমগ। তাই খাবার এবং চা ঠাণ্ডা হলেও সে বেখেয়াল। 'এ সময় যদি অমিতরা আসতো। নাকি আমি-ই যাবো একবার?' উঁকি দিয়ে আজ বাড়িতে থাকা উচিত ভেবে ঘনশ্যামীতি বিছানায় কুপোকাৎ। অথচ বিছানায় গা এলিয়েও স্বস্তি নেই। 'এত দেরী হচ্ছে কেন?' এমন চিন্তায় মূর্খটি উদ্বিগ্ন, কারণ সময়ের স্রোত নদীর স্রোতের মত নির্বিকার, উদাসীন। তাই যতই বেলা যাচ্ছে, মূর্খটির অস্থিরতা ততো তীব্র, ভয়ঙ্কর। 'এত দেরী হচ্ছে কেন? আসবেই যদি তবে—' ভেবে উত্তেজিত ও অবাক হয়ে খানিকা উঠে বসে টেবিল থেকে একটা বই টেনে নিয়ে আবার বিছানায় লটান। শুয়েই বইটার যে কোনও পাতা খুলে পড়তে লাগে, অথচ মন উধাও, 'আচ্ছা যদি এমন হয়! লোকে জানতেই পারল না যে আমি দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছি, তখন যদি—,' এমন সংশয় জাগতে মূর্খটি তৎক্ষণাৎ উঠে টেবিল থেকে একটা বই টেনে পড়ায় মন বসাতে কয়েকটা হলুদ বৃত্ত বেচে বেচে উঠল। সেই হলুদ বৃত্তগুলি বড় হতে হতে চোখের সামনে চোখের উপরই বেড়ে চৌচির।

। কে বা কারা যেন ফিসফিস করে কথা বলছে, মূর্খটি খুব কাছে তবু তাদের ভ্রুক্ষেপ নেই। প্রথমে অবহেলা করতে চাইল, কিন্তু অনেকটা লক্ষ কানে যেতেই কান খাড়া। 'করতেই হবে নইলে অপমান করা হয়।' 'সত্যি,' অন্য একজন, 'এই সভার জন্য দলমত নির্বিশেষে অভ্যর্থনা জানানো উচিত।' তৃতীয় জন—'কিন্তু উনি কি রাজী হবেন?' আরেকজন—'রাজি না হলে করাতে হবে।' প্রথমজন—'আলবৎ করাতে হবে।' ধ্বনি উঠিল, 'আলবৎ করাতে হবে।'।

মূর্খটি চমকে ডানদিকে চাইতে সবিতাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক এবং সবিতার বলার আগে এখন থাকার সময় বুঝতে পেরে ভ্রু কুঁচকে বিরক্তি প্রকাশ করল। 'আমাকে ডিস্টার্ব করার মানে কি। সবিতা কি জানে না যে আমি—' কিন্তু কোন কথা বলে শুধু একবার জানাতে চাইল, 'যা, আমি পরে যাচ্ছি।' তবু সবিতা অনড়, ফলে মূর্খটির বিরক্তি এবার সপ্তম মুখাবয়বে স্পষ্ট।

তবু কোনমতে হাল সামলে নিয়ে সবিতাকে উপেক্ষা করে আর একটা বই টানতে যাবা বললেন 'আজ অপিস যেও না' শুনে প্রথমে অবাক বিস্মিত, তারপর আনন্দে অস্থির। 'বাবা তাহলে জানেন যে আজকেই আমার সেইদিন, তার মানে—।' সবিতা চলে যেতে আবার বিছানায় বসল। কিন্তু শুয়ে আরাম নেই, একটা শোকা, সময়ের শোকা কিরকির করে ঘুরে ঘুরে টিকটিক শব্দ করতে করতে হৃৎপিণ্ডের রক্তচলাচল দ্রুততর করায় কি করবে ভেবে না পেয়ে সটান রান্নাঘরে।

অথচ, 'রান্নাঘরে যেয়ে কি লাভ' ভেবে চলে আসার জন্য মনস্থির করার আগেই বালার উফ ভাতের বাষ্পে চোখমুখ আচ্ছন্ন, 'সবিতা নিশ্চয়ই জানে, আমি প্রতিভাবান। সেজন্যই আমাকে সব চেয়ে বেশী খাটিয়ে করে, না হলে—' চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে গোগ্রাসে ভাত ঘুরে পুরে কোনমতে খাওয়া শেষ করে আবার নিজের ঘরে। 'একবার বাবার সঙ্গে দেখা করলে কেমন হয়?' কিন্তু তৎক্ষণাৎ কোষ্ঠীর কথা মনে পড়ায় এলোপাথারি নানাদিকে খুঁজে সুটকেস ট্রাঙ্ক টেবিল ইত্যাদি অনুসন্ধান করে অবশেষে ড্রয়ার থেকে কোষ্ঠী উদ্ধার করে কাগজপেন্সিল নিয়ে কোষ্ঠী বিচারে তৎক্ষণাৎ নিমগ্ন। একটা অঙ্ক না পারলে যেমন কারো কারো ঘেম ছেড়ে যায়, দুর্ভটিরও তেমন অবস্থা। অথচ প্রায় সাত-আটটা কাগজ আঁকিবুকি কাটাকুটিতে ভরিয়েও কোনও কিনারা করতে না পেরে হতোদ্যম। 'না, এ আমার কাজ নয়। অমিতের গুরুদেবই পারবেন।' ভেবে আর চেষ্টা না করে 'এবার সেই সময় আসবে' এমন চিন্তায় একটা খাতা পেন্সিল টেনে নিয়ে বিছানায় কুণ্ডোকাৎ। তখন চোখের পাতা ভারি, চোখের মধ্যে আলা। 'ঘুমবো না, ঘুমবো না' মন্ত্রটি হাজার বার জপলেও চোখের পাতা তখন ভারি, চোখের আলা তখন বাড়ার পথেই। তাই ঘুমের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ। প্রথমে নানাবিধ চিন্তা— এলোমেলো, বিক্ষিপ্ত, বিশৃঙ্খল। তারপর আঁকিবুকি, কাটাকুটি। তারপর নিদ্রা-জাগরণের দ্বন্দ্ব, হাতাহাতি এবং সেই যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত দুর্ভটি না ঘুম না-জাগরণের এক অদ্ভুত পরিমণ্ডলে অবশেষে নিমজ্জিত।

। একটা বিরাট লম্বা লোক একটা কালো লোহার বল ঠেলতে ঠেলতে সামনে নিয়ে এলো। সেই বলের উপর অমিতের গুরুদেব। সবাই উঠে দাঁড়াল। গুরুদেবের মুখে গর্বের হাসি, আমার গণনা কোনদিন ভুল হয় না, বুঝলে। এবং বলেই তিনি হঠাৎ উধাও। দুর্ভটি তখন পর্দার আড়ালে সরে গিয়ে আলোচনা শুনতে চাইল। তথা, এখানেও কয়েকজন তন্ময় হয়ে কি যেন দেখছে। দুর্ভটি

ওদের মনোযোগের সুযোগ নিয়ে উঁকি মেরে দেখল, একটা নকশা। কৌতূহল বোধ করে সে খোলা দরজার একটা পাল্লার আড়ালে লুকিয়ে গেল। অনেকক্ষণ চুপ সবাই। হঠাৎ একজন বলে উঠল, এগজ্যাক্টলি। মোতায়েন এখান থেকেই যাবে। তারপর আবার স্তব্ধতা। আর একজন বলে উঠল, উনি কি রাজি হবেন। পাঁচ ও জন একসঙ্গে গর্জে উঠল, অবশ্যই!

তখন বাবার ঘরে আলোচনা চলছে। বাবার ঘর সিঁড়ি দিয়ে উঠে কোতলার প্রথম, দুর্ঘটি থাকে শেষ প্রান্তে। বাবার ঘরে কথা হচ্ছে জেনে কৌতূহল বোধ করল না, জানে বাবা মানুষটি কেমন। হঠাৎ অধিত সুপ্রকাশ এসে বলল, চ,— তিস্তার ধারে। তিস্তার চর বিশাল, বিরাট। সেখানে অগণিত মানুষ, সে পৌঁছুতে শুরু হয়ে গেল উন্মাদ। দুর্ঘটি পালাতে পারলে বাঁচে, জনপ্রিয়তার ঠেলায় অস্থির। দুর্ঘটির হাত অবশ, পা অচল, অথচ এখানে থাকলে বাঁচতে পারবো না ভাবতে অক্ষম পা নিয়ে ছুটতে শুরু করল। হাজার হাজার লোক ছুটছে। সে-ও পালাচ্ছে। হঠাৎ একটা বাঘের মতো গর্জে গেল ভীষণ শব্দে, তারপর সাড়া নেই শব্দ নেই।।

দুর্ঘটি পাশ ফিরতে খাতা পেলিল সশব্দে মেঝের চিতপটাং। তৎক্ষণাৎ আলস্য মোচন করে খাতা তুলে নিয়ে দেখতে 'আমি কি ঘুমিয়েছিলাম' ভেবে অবাক, কারণ খাতায় অনেক কিছু লেখা কাটাকুটি। এবং ঘুমন্ত অবস্থায় তা সম্ভব নয় জেনে খাতাটা পড়তে গিয়ে আলোর স্বল্পতা লক্ষ করে এখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধে মনে হতে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে জোরে জোরে লিখিত শব্দগুলি উচ্চারণ করে তন্ময়তে পড়ার নিমগ্ন—

আলোকিত উদ্যান প্রতিভা প্রতিভার বিস্ফোরণ একরাশ ধারা ফুলের পাপড়ি বাগীশ্রির কবির ভরল জলে তিস্তার চর বহুমুখী প্রতিভা বিকাশ দিনের বিলাস আবাসের মধ্যে পাশ নদী হয়ে যায় গায় লতা ফুল লতাগৃহ আমি হাজার হাজার অধিত সুপ্রকাশ আমার মধ্যে কত ঘরের মধ্যে প্রতিভার স্ফুরণ আকস্মিক অলৌকিক আলোকবৃষ্টি অসীম অপার আকাশ প্রতিভা আলোকিত আলোচিত আরোহণির সিঁড়ি অন্ধকার যন্ত্রির আলো লাল আমি আমি—

এতদূর পর্যন্ত পড়ে পুনরায় পাঠ। দ্বিতীয় বার পাঠে পরীক্ষার উত্তর, তৃতীয় বার পাঠে ছন্দসূত্রের কীর্তি, চতুর্থ বার পাঠে শেষ বিস্ফুরণ, পঞ্চম পাঠে অধিরতা, ষষ্ঠ সপ্তম এবং বারংবার পাঠে যন্ত্রণা, কীর্তি, বিস্ফুরণ, অধিরতা

প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে 'সময় এগিয়ে আসছে, এবার বিস্ফোরণ ঘটবে, আমি প্রতিবাদের' আওয়াজ, এবং সেই সময় নীচে রাস্তায়—

শোভাযাত্রার বিদারক কোলাহল, সরস্বতী প্রতিমা নিরঞ্জনের জয়ধ্বনি, শঙ্খের নিনাদ, ঢাকের বাদ্য, করতালের ঝম্ ঝম্, মাইকের গান, বাজি ও পটকার ঠাস ঠাস শব্দ— বিরাট বিরাট শব্দ তরঙ্গ তুলতে তুলতে শব্দের মহাসাগর সৃষ্টি করতে করতে মূর্তিটির দেয়াল ভেঙে ঘুষড়ে ঘুষড়ে তছনছ করে দিতে মূর্তিটি মাথা ছুঁকে ফেলে দিয়ে কাপড় সামলাতে সামলাতে ছুটে এলো বারান্দায়।

তখন ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় প্রতিমার মুখ অদৃশ্য, তবুও সেই অবয়ব মুখের সৌগন্ধ ও জ্বালে আবৃত। মূর্তিটি কিছুই দেখতে পেলনা, শুধু শব্দতরঙ্গের ছুটোছুটি ঘটোপুটি শুনতে শুনতে এবং হঠাৎ তুবড়ি বাজির মত ছুটে ঘরে যেতে বারান্দায় মুখে পড়তে থাকল, তখন করতাল, ঢাক, শঙ্খ, জয়ধ্বনি, কাঁসি, ব্যাগপাইপ, লাইভ-ব্যান্ড, বিউগিল, মাইকের গান—সব মিলে মূর্তিটির কানে কোরাসের অনুরণন তুলল, লয় এবার, লয় এবার। মূর্তিটির চোখ বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগল। শোভাযাত্রার লক্ষ লক্ষ মানুষের ভেদাভেদ লুপ্ত হয়ে ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন সমস্ত আয়গাটা জুড়ে একটা বিরাট অবয়ব ধারণ করতে লাগল। মূর্তিটি দেখল, অন্ধকার। মূর্তিটি দেখল, আলো। তারপর দেখল বারান্দা। তারপর দেখল, সিঁড়ি। মূর্তিটির বুকে তখন হাজার হাজার কাড়া-নাকাড়ার গুরু গুরু ধ্বনি। মূর্তিটি চোখ বন্ধ করে শুনতে পেলো বুকের অতল-তলে যন্ত্র— জাগো, জাগো, লয় এবার। সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুলে দেখল তীব্র অন্ধকার— বারান্দা নেই, সিঁড়ি নেই। তারপর হঠাৎ মহিষের চোখের মত লাল আলো জ্বলে উঠল, টকটকে লাল। মূর্তিটি আসন্ন ভয়ের অস্থিরতা থামানোর জন্যে বুকে হাত দিল, তখন নীচে বিরাট জয়ধ্বনি উঠল। আর মূর্তিটি দেখল, সিঁড়ির মধ্যে সেই লাল আলো ত্রিমিত, একটি অবয়ব। মূর্তিটি দেখল, সেই নারী তাকে ডাকছে, নীচে আবার জয়ধ্বনি উঠল। মূর্তিটি সেই জয়ধ্বনির পর্দায় চেঁচিয়ে উঠল, পেয়েছি—আমি পে—য়ে—ছি। তারপর ছুটে আলোর মধ্যে সেই নারীকে ধরতে গেল। ততক্ষণে তার পা শূন্যে এবং মূর্তিটি নিজের শরীরের ভার সামলাতে না পেরে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। 'না, যে—ও না— মরে যেও— না, চীৎকার করে নিজের শরীরের ভারসাম্য রাখতে গেল

থাকতে বলতে চাইল, কিন্তু ততক্ষণে জল যেমন স্বাভাবিক নিয়মে নীচের দিকে প্রবাহিত হয়, তেমনি মূর্তটি। দেহ গড়াতে গড়াতে গড়াতে গড়াতে নীচে নামতে নামতে ভূমি স্পর্শ করে কিছুক্ষণ। গিয়ে সে কোনও জড় পদার্থের মত স্থির হয়ে গেল।

ঝড়ের সময় বাতাস যেমন চতুর্দিক থেকে হাহা করে ছুটে আসে, তেমনি দশদিক থেকে লোক হাহা করে ছুটে এলো, তখন সব শেষ। মূর্তটি এমনভাবে শুয়েছিল, যেন মনে হলো সে বলছে, আমাকে একটু বিশ্রাম করতে দিন, বড় ক্লান্ত।

## নিখিল বিশ্বাস

শিল্পী নিখিল বিশ্বাস আমাদের মধ্যে আর নেই। মৃত্যুর এই আকস্মিক অনিবার্যতা তিনি জানতেন। মৃত্যু ও ধ্বংসচেতনায় তাঁর শিল্পচেতনার সম্পূর্ণ সত্তা আবিষ্ট করে ছিল। জীবন ও মৃত্যুর দ্বন্দ্ব-রহস্য তাঁর জানা ছিল। তাই তাঁর সমস্ত শিল্পকর্ম এই চলমান জীবনের অন্তবর্তীকালীন সময়ের প্রাণস্পন্দনের এক মানবিক ঘোষণা।

মাত্র ছত্রিশ বছরে সমাপ্তি নিখিলের জীবনের। খুবই সামান্য সময়, কিন্তু অভিজ্ঞতায় অনেক। কারণ আধুনিক সমাজজীবনে পরিবর্তনের ভূমিকা অত্যন্ত দ্রুত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশবিভাগ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, পৃথিবীব্যাপী রাজনৈতিক ঠাণ্ডা লড়াই— ইতিহাসের এই দ্রুত পটপরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর শিল্পী-মানস সত্যানুসন্ধানে ব্যস্ত ছিল। 'শিল্পের ইতিহাসই মানুষের ইতিহাস'— এই উক্তিতে শিল্পীর স্থির বিশ্বাস ছিল। নিখিল বিশ্বাস মনে করতেন শুধু মাত্র রং আর রেখার চমকটাই ছবির সব নয়। শিল্পীকে প্রধানত তার সমকালীন সমাজের সচিক হতে হবে। শুধু মাত্র রং আর রেখার যে নন্দনতত্ত্বসম্মত আবেদন তা আজ আর মানুষের চৈতন্যলোকে সাড়া তুলতে সক্ষম নয়। তাই তাঁর ছবির বিষয়গত দিক হল সেই সব অগণিত মানুষ যারা প্রতিনিয়ত অন্তক পরিপার্শ্বিকের নিষিদ্ধ এক কারুনিক স্তরের জগৎ থেকে, পাশবিক শক্তির হাত থেকে শারীরিক ও আত্মিক মুক্তির সন্ধানী।

নিখিলের শিল্পী-ব্যক্তিত্ব তাঁর সমস্ত ছবিতে এই 'সংঘর্ষের' ইতিহাসকে গৌরবময় করে তুলেছে। কারণ মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও সেই সব মানুষেরা নিয়ত সংগ্রাম করে চলেছে। তাঁর সাদা কালোয় সংগ্রামশীল অবয়বগুলির বলিষ্ঠ গতিময় রেখায় প্রচণ্ড ভাবসংঘাতের শরীরী উপস্থিতি আমাদের মহাকাব্যের বিয়োগ-দুঃখের বিষণ্ণতাকে স্মরণে আনে। তাঁর আঁকা অবয়বগুলির শরীরী অভিব্যক্তির দহিষ্ণুতা যেন সারা পৃথিবীর মানবত্রাতাকামী মানুষের প্রতীক-রূপ। এ যেন কোন ক্রিমিটিভের আঁকা অগণিত মানুষের পবিত্র

ধর্মাচার উৎসব ( rituals ) —যা সভ্যতার সুরু থেকে আজ পর্যন্ত মানব-ইতিহাসের 'আলোকের উদ্দেশে' আকাঙ্ক্ষিতাত্মাকে বিধৃত করেছে।

এ যুগের শিল্পের নানা সমস্যার কথা নিখিল মিত্রমিত্রভাবে 'সমকালীন' পত্রিকায় আলোচনা করতেন। নিখিল ও তাঁর শিল্পী বন্ধুরাই বাংলাদেশে প্রথম শিল্পীদের সাথে কবি-লেখক নাট্যকারদের ভাবগত আদানপ্রদানের সক্রিয় প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। কারণ তাঁরা জানতেন কোন শিল্প-মাধ্যমই বিচ্ছিন্নভাবে চরম উৎকর্ষলাভ করতে পারে না।

বিশ্ব ইনস্টিট্যুশনের কলা-শিক্ষক নিখিল ইদানিং চাকরী ছেড়ে দিয়ে সম্পূর্ণভাবে ছবি আঁকায় আত্মনিয়োগ করবেন ভাবছিলেন। তাঁর শিল্পী-ব্যক্তিত্ব দেশের সীমা ছাড়িয়ে বিদেশে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছিল। বিদেশে ছবি বিক্রী হচ্ছিল প্রচুর। এই অল্প কয়েক বছরে বেশ কয়েক হাজার ছবি এঁকেছিলেন তিনি। তাঁর এই অকালমৃত্যুকে স্মরণ করে আমরা শিল্পানুরাগীরা যেন অন্যান্য শিল্পীর প্রতি আমাদের দায়িত্ব যথাযথ পালন করতে আরো যত্নবান হই। আমরা যেন স্মরণ রাখি: '.....the art of all civilisations has this in common that it expresses a defence against fatality.'

রথীন্দ্র রায়

•

## কালিদাস নাগ

তরুণ বয়সে কালিদাস নাগ "যৌবনের" ধর্মভাবে 'অগ্নিগ' পত্রে গদ্য রচনা করতেন ; পরবর্তী জীবনে সমগ্র বৌদ্ধ শাস্ত্রের সম্যক চর্চা তাঁর জীবন ও চরিত্রকে প্রভাবিত করেছে। যৌবনের প্রীতিভাবের মতই কালিদাস নাগের শুরু বয়সেও বিদেশে ভারত-সংস্কৃতির প্রচারকর্মে উৎসাহ ছিল,বিচিত্র বিষয়ে তাঁর আগ্রহ এবং উদ্যম ছিল সজীব। অল্প বয়সেই দা-বাবাকে হারিয়েছিলেন, অর্থের সংস্থান করেই তাঁকে বড় হতে হয়েছে— তবু জীবনের প্রতি বা সংসারের উপর কোনো অভিযোগ ছিল না, মানুষের উপর কালিদাস নাগের গভীর বিশ্বাস ছিল অটল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র-সম্বন্ধীয় গবেষণায় বেশীর ভাগ সময় দিয়েছেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও অন্যত্র সারা জীবন অধ্যাপনা করেছেন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক

প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সংযুক্ত ছিলেন; রথীন্দ্রনাথের এই 'অকৃত্রিম ভারতীয় বন্ধু' তাঁকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কৌতূহলী করেছেন, রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-বীক্ষার প্রত্যক্ষ আদর্শে তাঁর মানসভূমি গঠিত হয়েছিল। ইত্যাকার ঘটনায় কালিদাস নাগের খ্যাতির পৃষ্ঠা উজ্জ্বল, কিন্তু তাঁর স্মৃতি উজ্জ্বলতর হয়ে থাকবে তাঁর স্বভাবলোকন সৌজন্যে। কালিদাস নাগের পাণ্ডিত্য হয়ত বিচারসাপেক্ষ, তৎরচিত একাধিক বৃহৎ গ্রন্থের মূল্যও আলোচনাসাপেক্ষ— কিন্তু, তাঁর রুচি, সারল্য এবং প্রীতিস্নিগ্ধ চরিত্র তর্কাতীত। যাঁরা বা যাঁহারা কিংবা মনস্বী-মূর্খ নির্বিশেষে তাঁর নিকটতম যাঁরা ছিলেন, চারদিকের নিরেট পাণ্ডিত্য অথবা বিরস উদাসীনতার মধ্যে কালিদাস নাগের রসস্নিগ্ধ মননের অনায়াস প্রকাশ তাঁদের বার বার মনে পড়বে।

পার্থ বসু

•

## নীরেন্দ্রনাথ রায়

কয়েক মাস আগে নীরেন্দ্রনাথের আকস্মিক মৃত্যুর সংক্ষিপ্ত খবরটি সংবাদ পত্রের মারফৎ আমাদের চোখে পড়ে। এই অত্যন্ত শোকাবহ ঘটনায় আমরা গভীর বেদনা অনুভব করেছি। তাঁর মৃত্যুর ফলে একজন আদর্শ শিক্ষাব্রতী ও বিদ্যোৎসাহী সাহিত্যপ্রেমিককে আমরা হারিয়েছি। নীরেন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর অগণিত ছাত্র তাঁর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে যেমন মুগ্ধ ছিল তেমনি তাঁর হৃদ্যতাপূর্ণ আন্তরিক ব্যবহারে ছিল অশেষ বশ। কলকাতার প্রায় সব কলেজ থেকে উৎসাহী ছাত্ররা তাঁর শেক্সপীয়র-পড়ানো শুনতে যেত। শেক্সপীয়র বিশেষজ্ঞরূপে তাঁর খ্যাতি ছিল। ম্যাকবেথ অনুবাদ এবং শেক্সপীয়র সম্পর্কে বিবিধ আলোচনা তাঁর গভীর মনীষার পরিচয় বহন করছে। এক সময়ে তাঁর উদ্যোগে কলকাতায় শেক্সপীয়র-পরিষদ গড়ে উঠেছিল। 'সাহিত্যবীক্ষা' নামে তাঁর গ্রন্থের কয়েকটি প্রবন্ধে শেক্সপীয়র ছাড়া মাইকেল মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে সাহিত্যসমালোচনার একটি বিশেষ ধারা বাংলাদেশে তিনিই, প্রবর্তন করেছিলেন বলা যায়। যে কোন নূতন ও নতুন চিন্তা বা উদ্যমের প্রতি তাঁর

একটা দায়িত্ব কৌতূহল লক্ষ্য করেছি। তিনি ছিলেন একজন সত্যিকার দেশপ্রেমিক ও প্রগতিশীল চিন্তার ধারক। অল্প বয়স থেকেই রাজনীতির পরিবেশে তিনি বর্ধিত। এবং নানা মতবাদের বিবর্তনে পরিশেষে মার্ক্স বাদে বিশ্বাস রেখেছিলেন। 'পরিচয়' পত্রিকায় তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এই পত্রিকাতেই তাঁর কয়েকটি গল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। নারেন্দ্রনাথ কয়েকটি বিদেশী ভাষা জানতেন। রুশ ভাষায় তাঁর অধিকার ছিল প্রায় অবাধ। রুশ ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদের কাজ ও বাংলা ভাষার শিক্ষকতা নিয়ে তিনি কয়েক বছর মস্কোয় ছিলেন। গত বছর জুলাই মাসে নয়া দিল্লীতে ইনস্টিটিউট অব ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ-এ অধ্যাপনার কাজে যোগদান করেন। ৩০ অক্টোবর নয়া দিল্লীতেই তাঁর মৃত্যু।

•

একণ কার্যালয় : ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা ৯
প্রবীর ঘোষ কর্তৃক সাধনা ও বাণিজ্য প্রেস, ১/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ৩ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা ১২ হইতে প্রকাশিত।

পঞ্চম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা

# কৃত্তি

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
ও
নির্মাল্য আচার্য

সম্পাদিত

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক

# আমাদের শান্তিনিকেতন

আমাদের সব হতে আপন...
মোরা বারে বারে দেখি
তারে নিত্যই নূতন।'

**শান্তিনিকেতনে একটি নতুন টুরিস্ট লজ খোলা হয়েছে।**

(জনপ্রতি) ডিলাক্স ঘর – ভাড়া ৮৲ টাকা, খাওয়া ৭৲/৮৲ টাকা।
এয়ারকন্ডিশনড ঘরের – ভাড়া ১২৲ টাকা, খাওয়া ১৮৲ টাকা।

লজের টুরিস্ট ট্যাক্সিতে বক্রেশ্বর, মশাঞ্জোর, জয়দেব-কেন্দুলি, বীরভূম বা তারাপীঠেও ঘুরে আসতে পারেন।

যোগাযোগ করুন : ম্যানেজার, টুরিস্ট লজ,
ফোন : বোলপুর, তার : বোলপুর ১৯৯

অথবা **টুরিস্ট ব্যুরো**
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
৩/২ ডালহৌসি স্কোয়ার ইস্ট
কলিকাতা-১। ফোন : ২৩-৮২৭১
তার : "TRAVELTIPS"

দেশভ্রমণ
বিশ্বশান্তির সহায়।

# বিশ্বভারতী গবেষণা গ্রন্থমালা

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

**নাত্রমূলক ভারতীয় শক্তি সাধনা** পনের টাকা

শ্রীসুচিত্রা দেবী ও শ্রীবাসুদেব মাইতি সম্পাদিত

**রবীন্দ্র রচনা কোষ :** প্রথম খণ্ড, প্রথম পর্ব সাড়ে ছয় টাকা

**রবীন্দ্র রচনা কোষ :** প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় পর্ব সাত টাকা

**রবীন্দ্র রচনা কোষ :** প্রথম খণ্ড, তৃতীয় পর্ব আট টাকা

শ্রীপুলিন মণ্ডল সম্পাদিত

**সাহিত্য-প্রকাশিকা :** পঞ্চম খণ্ড বার টাকা

শ্রীসুধাংশুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

**সাহিত্য-প্রকাশিকা :** ষষ্ঠ খণ্ড দুই টাকা

শ্রীমতিলাল চৌধুরী

**মাধব সংগীত** পনের টাকা

শ্রীসুধাকর ভট্টাচার্য সরস্বতীথশাস্ত্রী

**মহাভারতের সমাজ :** দ্বিতীয় সংস্করণ বার টাকা

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

**রাজশেখর ও কাব্যমীমাংসা।** বার টাকা


বিশ্বভারতী

শান্তিনিকেতন

---

এক্ষণ

কার্যালয়ের নতুন ঠিকানা

৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড

কলকাতা ৯

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক **এক্ষণ** দ্বিমাসিক পত্রিকা

পঞ্চম বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা

## সূচীপত্র

প্রবন্ধ

এলিঅটের কবিতার প্রাণে — সুশীল গঙ্গোপাধ্যায় — ১

পুনর্মুদ্রণ

অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী — গিরিশচন্দ্র ঘোষ — ১১

অনুবাদ কবিতা

দুটি কবিতা [ পোল এলুয়ার ] — অরুণকুমার সান্যাল — ৭০

শান্তির বেদীতলে [ রমাঁ রলাঁ ] — বেলা দত্তগুপ্ত — ৭১

গল্প

পাশাপাশি — প্রণব সেন — ৭৭

গ্রন্থসমীক্ষা

বাংলার 'আত্মিগোনে' — প্রভাস ভট্টাচার্য — ৯০

সংযোজন

অর্দ্ধেন্দুশেখরের নট-জীবন — অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় — ১০৪

সম্পাদকীয়

পত্রিকার কথা — ১১৩

## চিত্রসূচী

সন্ন্যাসী : কমলকুমার মজুমদার-অঙ্কিত

অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী : আলোকচিত্র

**প্রচ্ছদপট**

সত্যজিৎ রায়

**সম্পাদক**

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নির্মাল্য আচার্য

কার্যালয় : ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা ৯

সন্ন্যাসী

কমল কুমার মজুমদার অঙ্কিত

পঞ্চম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা ১৩৮৩

# এলিঅটের কবিতায় দান্তে

সলিল গঙ্গোপাধ্যায়

এলিঅট থেকে মহাকবি দান্তের কালগত দূরত্ব সাতশো বছরের। তাঁর চিত্তাইন কর্মেচ্ছির তীর্থযাত্রা ইহলোকের পথ ধরেই যখন পৌঁছে যায় পরলোকে; যাত্রার সঙ্গী থাকেন মহাকবি তাসিস, থাকেন দিব্যধামবাসী বেআত্রিচে, সন্ত বার্নার্ড। মহাপ্রস্থানের পথে চলতে চলতে এক সময়ে পরিবর্তিত কবি নিজেই, যাবলেন এসে যখন সেই আলোকিত প্রেমে যে বিভায় অনুভাত আকাশতরা সূর্যতারা। দান্তের কবিতা ঈশ্বরদর্শনের কবিতা। আমাদের কালে এলিঅটের পরিচয় তিনি আমাদেরই লোক। দেখেছেন একালের হতাশা বিষাদ লালসা, লিখেছেন পোয়েম অব হোয়েন্; শেষ পর্যন্ত যদিও থাকে ক্ষীণ আশা All manner of thing shall be well, তবু তার পরেও এলিঅটের কবিতায় বড় হয়ে থাকে অন্ধকার; ঠাণ্ডা, বিবর্ণ, নিঃসঙ্গ। কাল, প্রসঙ্গবিভায় ও পরিণতির এত দূরত্ব, এলিঅটের কবিতায় দান্তের কথা তবু ভাবিয়ে তোলেন এলিঅট নিজেই। উল্লেখে অনুষঙ্গে উদ্ধৃতি আবহে চিন্তায় এলিঅটের কবিতায় প্রত্যক্ষে পরোক্ষে ফিরে ফিরেই আসেন দান্তে। আসেন হয়তো আরো অনেকেই, কিন্তু দান্তের প্রসঙ্গ তাঁদের সকলকেই অতিক্রম করে গেছে অনেক দূর। জীবনের প্রান্তিক কাব্যে এলিঅট লিখেছিলেন:

> We must be still and still moving
> Into another intensity
> For a further union, a deeper communion
> Through the dark cold and the empty desolation.

তাঁর প্রত্যাত্মসন্ধীতেও, হয়তো-বা যথেষ্টই আচ্ছন্ন অস্পষ্ট, সে কথা নিশ্চয়ই ছিল এবং অবচেতনেই সেদিন অনুভব করে থাকবেন যে সারাজীবনে বারবারই তাঁকে হাত বাড়াতে হবে মহাকবির দিকে; জেনেছিলেন ভোরের আলোয় যেমন পাখি, তাঁর কবিতায় দান্তেই পথের প্রদীপ।

প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা দি লাভ সঙ্ অফ জে. আলফ্রেড প্রুফ্রকের আরম্ভে ছ'লাইনের উদ্ধৃতিটি দান্তের। কথাগুলো বলেছেন কাউণ্ট গুইডো। অন্যায় করেছেন জেনেও প্রভু পোপের পাপ উদ্ধৃত শিখিতে তিনি বল পরামর্শ দিয়েছিলেন। মোহরের কাল আসন্ন দেখে গুইডো সন্ন্যাস ব্রত নিয়েছিলেন। মৃত্যুর পর সন্ত ফ্রান্সিস এসে দাঁড়ালেন, কিন্তু নরকের কৃষ্ণবর্ণ দূত তাঁকে সরিয়ে গুইডোর কেশ আকর্ষণ করলো। খেলো প্রত্যাশিত স্বর্গ, আরম্ভ হলো নরকবাস। এখন চারদিকে নরকারি। দান্তে দেখলেন, শুনলেন তাঁর কথা— ভেসে আসে সিসিলীয় পেতলের ষাঁড়ের মধ্যে জীবন্ত দগ্ধ করা অপরাধীর বিকৃত বিশাল চীৎকার। গুইডো এখন একটি চলমান অগ্নিশিখা, অগ্রভাগ ছেলে উঠলো ইতস্তত, শোনা গেল গুইডো বলছেন :

যদি মনে হতো আমি উত্তর দিচ্ছি
এমন কাউকে যার সম্ভাবনা আছে পুনর্বার পৃথিবীদর্শনের
এ শিখা চিরদিনের জন্যই সংহত করতো কম্পন।
কিন্তু যেহেতু এই গভীরার অন্ধকার থেকে— যা শুনেছি যদি সত্য। হয়—
কখনো কেউ ফেরেনি জীবিত, অপবাদের ভয় নেই
অতএব আপনার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি যথাযোগ্য।

—ইনফের্নো ২৭ : ৪৮-৬১

এই কথাগুলোই মূলভাবাতে প্রুফ্রক কবিতাটির এপিগ্রাফ।

প্রুফ্রকের দৈনন্দিনে আছে চায়ের কাপ, কফির চামচ, বন্ডের পাঠ, সালোঁতে বসে থাকা অলস উদাসে, আছে মেয়েরা, মেজেতে লুটিয়ে চলে স্কার্ট, কাটায় কাটায় অবিরাম আলোচনা তাদের মাইকেল আঞ্জেলো বা ঐ রকমই আরো দুরূহ শিল্প ও জীবনতত্ত্ব। ঐসব মেয়েদের অলংকৃত বা নিরাভরণ বাহু, হাত, চোখ, কণ্ঠস্বর সব জানা হয়ে গেছে প্রুফ্রকের, অথচ সে বলতে পারে না কাউকেই :

Let us go then, you and I,
When the evening is spread out against the sky...
Let us go, through certain half-deserted streets,...
Let us go and make our visit.

সে কেবলই ভাবে :

Do I dare
Disturb the Universe ?

ভাবে :

So how should I presume ?...
And how should I presume ?...
And should I then presume ?
And how should I begin ?

দ্বিধা ও সংশয় তার অন্তহীন। সতর্ক বিশ্লেষণ খুঁতখুঁতে প্রফ্রক অতঃপর তুচ্ছতার কটিনেই গলা বাড়িয়ে দিয়েছে। তবু আরো কিছু তার মনে হয়, চোখে পড়ে। চোখে পড়ে সন্ধ্যা টেবিলে শোয়ানো যেন অ্যানাস্থেসিয়ার আচ্ছন্ন রোগী। গোধূলিতে নিঃসঙ্গ গলিপথের জানালায় নির্জন মানুষ, ধোঁয়া ওঠে তাদের পাইপ থেকে। হাস্কিকর মোড় ফেরা পথের শেষে জেগে আছে বিভ্রান্তিকর প্রশ্ন, তার সমাধান নেই। চোখে পড়ে চলুই কুয়াশা নির্জন বেড়ালের মত পথে ঘুরে ঘুরে জানালা ভাঁকে, ঢেউয়ের ধারে থমকে চিমনির কালি পায়ে মেখে কালিল টপ্‌কে ঘরে ঢোকে ; মেঝেতে শুয়ে থাকে পরিত্যক্ত, অলক্ষ্য। এবং প্রফ্রকের চোখে পড়ে বারেবারেই। সম্ভবত সে ভাবে সে এবং তারা সবাই এই কুয়াশাতেই খানিকক্ষ ক্রমে ক্রমে, জোর নেই তাদের, কেবলই দ্বিধা কেবলই সংশয় অথচ জানা হয়ে গেছে তো সবই। অনেক কিছু চোখে পড়েও তাই চেতনা পীড়িত তার। বৃদ্ধ সে যৌবনেই। উদ্‌ভ্রান্তিতে যদিও ভাবে কখনো এ তাদের সংসার বিচূর্ণ করে জানাবে সে সবাইকে, বলবে ; বলতে কি পারবে :

...'I am Lazarus, come from the dead.
Come back to tell you all. I shall tell you all'—

পারবে না এবং প্রফ্রক পারেওনি সত্যিই। শুধু দুঃস্বপ্ন দেখেছে। বেরিয়ে পড়তে চেয়েছে পথে অথচ তাকে আনমনা করে পোষাক থেকে ভেসে আসা মুরভিবাস। কোথায় যাবে সে এই চা-চক্রের সহজ অভ্যাস ছেড়ে। দোলায়িত চিত্তের জীবনে পুরুষার্থ থাকে অনায়ত্ত। আত্মহ্যা হৈবাই তাঁর ভূমিকা।

No ! I am not Prince Hamlet, nor was meant to be ;
Am an attendant lord, one that will do
To swell a progress, start a scene or two,
Advise the prince ; no doubt, an easy tool,
Deferential, glad to be of use,
Politic, cautious, and meticulous ;

Full of high sentence, but a bit obtuse;
At times, indeed, almost ridiculous—
Almost, at times, the Fool.

যেন অত্যন্ত ঠাট্টা মাথার এই আত্মমূল্যায়ন হলা করেছে নৈর্ব্যক্তিক চাপোল্য অস্তিত্বের সঙ্গে। মুহূর্তের মুখের নায়কত্বের টীকা কপালে নিয়ে সে আসেনি। নিতান্তই সাধারণ, দায়ী নয় যা, বুদ্ধিমান সতর্ক বিবেচনাসম্পন্ন বাবু, কখনো-বা কি আশ্চর্য 'ভারী মজা ভাঁড় হয় বাবু' Almost at times, the Fool. আর এইখানেই এতক্ষণের প্রায় নির্বিকার আত্মবিশ্লেষণ অস্তিত্বের জমাট মূঢ়তার পরিহাসের তরলতা পেরিয়ে পৌঁছোয় যেন হৃদ্ আঙিনাতে। হাসি এখানে কাপানো অট্টহাসি প্রায় কান্নাই বীভৎস করুণ যেন-বা ক্লেদের সেই 'তিনটি ও ড়ি'।

এই স্বীকারোক্তিতেই সমান্তরাল মনে পড়বে গাইদোর আত্মোক্তি: যদি মনে হতো আমি উত্তর দিচ্ছি / এমন কাউকে যার সম্ভাবনা আছে পুনর্বার পৃথিবী দর্শনের / এ শিখা চিরদিনের জন্যই সংহত করতো কম্পন ···অপবাদের ভয় নেই···। প্রকৃত ইচ্ছার প্রতিবাদে সাহস পায়নি গাইদো, রাজপুরুষ সন্ন্যাসী। তাঁর জীবন সহজ স্বর্গের দুর্লভ অমৃতে আত্মবিক্রয়ের কাহিনী। জীবিত মানুষকে কি করে বলবেন এ গভীর লজ্জার কথা। প্রফ্রকেরও সেই ক্রন্দন। Politic, cautious and meticulous প্রফ্রকেরও ইচ্ছার জোর নেই, লক্ষ্যহীন জীবনপ্রবাহে মজ্জমান ক্লান্তও সে লজ্জায় মুখ ঢাকতে চেয়েছে জনশূন্যতায় সমুদ্রতীরে এবং এ সমুদ্রতীরে সমুদ্রকন্যারা তাকে গান শোনাবে না— বুঝি-বা সে সমুদ্রসৈকত গাইদোরই মত কোন অকল্পিত শিখার বিকল্প, যেখানে অপবাদের ভয় নেই। প্রফ্রকের নৈঃসঙ্গের বেদনা এমনি করে চলে যাওয়ার কাব্যাভাসের পথ বেয়ে। আপন কালের ব্যক্তিগত বেদনাবোধ প্রফ্রক নামক একটি লোকের কাহিনীতে প্রথম মুহূর্তে উক্ত হয়ে নাটকীয় নৈর্ব্যক্তিকতা অর্জন করে। ঘাসের ধারবাহে সে নৈর্ব্যক্তিকতার পরিধি ও পরিমণ্ডল আরো বাড়ে, বেদনা হয়ে ওঠে আরো সম্পৃক্ত ও তীব্র। ঘাসের সূত্রে তখন শুধু প্রফ্রক নয় এ কাব্যের সমস্ত পাত্রপাত্রীর আলেখ্যই মনে হয় এক জটিল অন্ধকার অরণ্যেরই অনুবর্তী, সর্বদাই কুয়াশাচ্ছন্ন, অস্পষ্ট, মৃতকল্প। একমাত্র ব্যতিক্রম শুধু Mr. Apollinax যার হাসিতে ফোটে সেই ঊর্ধ্বজীবনের শস্য দেবতা Priapus-এর ছবি, ফেরে সমুদ্রবাস, গভীর প্রশান্তি:

His laughter was submarine and profound
Like the old man of the sea's
Hidden under coral islands

আর বাতিক্রম শেষ কবিতাটি যা কিরিয়া কে লিখেছে, একটি প্রেমের অনুভব : সোনালী রোদ ভরানো ভাব ফুল, তার দর্শনে জীবনের অবসান অপগত বিষোদ—

Sometimes these cogitations still amaze
The troubled midnight and the noon's repose.

এছাড়া ভেতরে বাইরে ওপরে নীচে সর্বত্র, ওপরে যা বাইরে বলিয়া না-ও ভোগে পরে ভেতরে নীচে সর্বব্যাপী ক্ষয়, তিলে তিলে নিঃশেষ যাওয়া, ইঁদুরেরা বাসা করছে তলে তলে। পোর্ট্রেট অব লেডি-র মহিলার জীবন তো বেঁচে থাকার মধ্যেই শুয়ে আছে কবরের তলায়। এ কাব্যে পৃথিবীর ছন্নযৌবনের কাহিনী। বুড়ী সে পুরুতায় সংগ্রহ করছে আলানী কাঠ। কিন্তু জীবনরসে ইন্ধন হবার যোগ্যতা নেই কারোরই ; কি প্রফ্রক, কি কাউন্ট গ্রালি আর্ক হেলেন কিংবা সেই লেডি কারোরই। সকালের জানালায় এখানে সচেতন চক্ষে হয়—

...of the damp souls of housemaids
Sprouting despondently at area gates.

এবং শুধু হাউজমেড্‌ই নয় এলিয়ট সম্ভবত বলতে চেয়েছিলেন পূর্বোক্ত সকলেই, যে কটি মানুষের পোর্ট্রেট বা স্কেচ আছে এ কাব্যে সবাই এক একটি নিভে যাওয়া জিজে সলতে। জ্বলে উঠবেনা কখনোই, কারণ ফুরাশার জিজেছে সবই, আবছাওয়া ন্যাতসেতে। এ বিশের জীবন আছে হয়তো সেই সব মহিলাদের, যারা কথা বলে মাইকেল আঞ্জেলোর, তাদের নিরালস তত্ত্বালোচনায়, অথবা ঘরের দেয়ালে টাঙানো ছবিতে, তাদের ওপর রাখা মূর্তিতে, টেবিলে ফুলদানিতে, লাইব্রেরীতে। কিন্তু জীবন নেই জীবনের মধ্যে। নেই প্রতিদিনের বেঁচে থাকার উষ্ণ নিঃশ্বাসে। এমন করে সামনে এসে এলিয়ট বলেননি কথাগুলো, ব্যাখ্যাতা বা প্রচারকের মতো ; তাঁর ভঙ্গীই তা নয়। তিনি আছেন নেপথ্যে প্রযোজক বা নাট্যকার, সামনে রঙ্গমঞ্চে প্রফ্রকেরা, আমরা দর্শক দেখে চলি এই ছায়ার বিচ্ছিন্ন আর যবে শেষ হলে সব ছবিতে ছায়া ঘন হয়ে সব স্মৃতি জুড়ে ধ্বনিত হয় এ-কাব্যের-আরম্ভে সাজিয়ে দেওয়া দান্তের লাইন ক'টি :

তাহলে বুঝেছেন আপনি আমার সেই প্রেমের পরিমাণ
যেই প্রেম আপনাকে জানায় অমের উষ্ণতায়

যেই প্রেমে ভুলে থাকি এই ধূসরের নিষ্ফল জীবন
এবং ছায়ারাই সহচর আমার কায়ার যেন প্রকৃত সত্তা—

পুরগাতোরিও ২১ : ১৩৩-৩৬

যে অনুভব জাগছিল প্রথম কবিতা থেকেই, যুক্ত হচ্ছিল একটির সঙ্গে আরেকটিতে সেই অনুভব এইবার দান্তের পংক্তিগুলির পর পেলো প্রার্থিততম তীব্রতা, জীবনে ছড়ানো ছায়ার অস্তহীনতা,— এই কথা হয়ে উঠলো সচীমুখ। খণ্ড জীবনের সমস্ত খুঁটিনাটি যথাযথতা রক্ষা করেই এবং অবলম্বন করেই অনুভব থেকে প্রায় প্রত্যয়ের সীমায় পৌঁছোনোর যে অস্পষ্ট আকুল আকাঙ্ক্ষা ক্রমে সমস্ত কবিতা একসঙ্গে ছুঁয়ে রাখলে মনে হতে থাকে এলিয়টের সন্ধান, দান্তের আলোকসম্পাতে তাতেই এলো এক সম্ভবপর অখণ্ডতা ও সমগ্রতার কিছু-বা নির্দিষ্ট সীমারেখা। এলিয়টের ভাষায় বললে বাড়লো নৈর্ব্যক্তিকতা, দেখা দিল ব্যক্তিগত বেদনাবোধ থেকে ঐতিহ্যবোধে অনুপ্রাণিত হবার কাব্যোচিত এবং কাব্যময় ব্যাকুলতা। দান্তের অভিজ্ঞতাসমূহ এলিয়ট লিখেছিলেন এজন্যই মূল্যবান নয় যে তারা দান্তে অ্যালিগিয়েরি নামক প্রতিষ্ঠিত একজন চিন্তাশীল ব্যক্তির অভিজ্ঞতা, তাদের মূল্য তাদের অন্তর্লীন দার্শনিকতায় ও নৈর্ব্যক্তিকতায়।[১] এলিয়টকেও কবিতায় এই দার্শনিকতা ও নৈর্ব্যক্তিকতার গন্তব্যে— যার অর্থ ঐতিহ্যবোধ, একই সঙ্গে কাল ও কালাতীতের এক অনায়াস চেতনা,[২] — কাব্য রচনার পর্বে পর্বেই শরণ নিতে হয়েছে বহুকালের এবং বহুধারার কবি ও মনীষীর। পাঠ নিতে হয়েছে সফোক্লের মেটাফিজিক্যালে, এলিজাবেথীয় নাটকে, ফরাসী সিম্বলিস্ট কাব্যে, গভীর শ্রদ্ধায় অনুধাবন করতে হয়েছে প্যাস্কাল, ব্র্যাডলে; কবিতারই সূত্রে আসতে হয়েছে প্রবীণতর বোধে রাজনীতি ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চায় এবং বারেবারেই সম্ভবত সর্বাধিক দীক্ষাতে হয়েছে দান্তের কাছে, যে দান্তে অন্যতম সেই দুই জনের মধ্যেই অধিকৃত সমগ্র আধুনিক বিশ্ব, যেখানে আর কেউ নেই তৃতীয়।[৩] প্রথম কাব্যে দান্তের ব্যবহারে এলিয়টের যখন যদিদ দেখা গেল প্রধানতই প্রসঙ্গের সম্পৃক্তি ও তীব্রতা তবু অস্পষ্টভাবে অনুভূত এখানেই এক আয়তন বিস্তার, পরিপ্রেক্ষিত ও পরিমণ্ডলের সন্ধান। সমগ্র কাব্যের আরম্ভে পুরগাতোরিও-র লাইন কটি ধরে বিচ্ছিন্ন বিচিত্র অন্তঃসার-

১ Dante : পৃ ২৭৭

২ Tradition and the Individual Talent : পৃ ৮১

৩ Dante : পৃ ২৭৭

মূলতার অনুভব কাব্যের সব প্রায় ছায়াসত্তার শরীর ছুঁয়ে ক্রমে যেন স্পর্শ করতে চাইছে এক বিরাট ছায়াশরীর যা বুঝি-বা জীবনেরই মূলে। কারণ কবিতারাই তো ছিল, ছিল এলিয়টের তবু আবার কাব্যারম্ভেই কেন থাকেন দান্তে? কোন সে অতিরিক্ত যার জন্য এ ছিল অনিবার্যই? শুধু অলংকৃতি, পাণ্ডিত্যবিলাস যৌবনের? হয়তো অবশ্যই স্পষ্ট নয়, তবু দান্তের তব স্বীকারে এইসব প্রশ্ন উঠে মনে হতে থাকে এলিয়ট প্রথম কাব্য থেকেই জীবনযাত্রার প্রায় মুখোমুখি হবার কথা ভাবছিলেন এবং তার ইঙ্গিত বারেবারেই তিনি রেখেছিলেন দান্তেতে।

কি সেই তাৎপর্য, কোন অর্থ জীবনের, এ জিজ্ঞাসার সরাসরি উত্তরে তরুণ ও বুদ্ধি যখন অনির্দিষ্ট পরবর্তী কাব্যগ্রন্থে দান্তের কবিতা চোখে পড়বে নামকরণেই: **Ara Vos Prec**, এবং পরের বছরই সে নাম পরিত্যক্ত হলো, এবারে নাম **Poems 1920**। লালসা ও হিংসা, ব্যভিচার, হত্যা, পাপ, বড়যন্ত্র এইসবই এ কাব্যের উপকরণ। যার্বক উইথ এ ফাক্টেকের, ফুইনী ইরেই, ফুইনী আবক্ দি নাইটিঙ্গেল বা ফরাসী কবিতা **Dans le Restaurant** প্রকৃতিতে সরাসরিই সর্বগ্রাসী লালসার আগুন।

**Burbank crossed a little bridge**
**Descending at a small hotel;**
**Princess Volupine arrived**
**They were together, and he fell....**
**...Her shuttered barge**
**Burned on the water all the day.**

যেন-বা এই কাব্যের ক্ষেত্রের প্রতীক। এখানে এইসব কবিতার মানুষগুলির শরীরসর্বস্ব জীবনযাত্রায়, পঙ্কিল ক্ষয়বর্ধমানতাই যেখানে ইতিহাস এবং তা-ও নয়, ইতিহাস প্রাণময় আবেগ অপহৃত দাবদগ্ধতায়, সেখানে লালসারই জন্য লালসা। এলিয়ট তাই কবিতার মধ্যে পাশাপাশি বৈপরীত্যে রেখেছেন কখনো অতীতের ক্লিওপেট্রার প্রেমের লাগে আবেগময় বিশ্বাসের ছবি, যে বিশ্বাসের কাছে ইন্দ্রিয় তার মহত্ত্বপন্থী, তার সাম্রাজ্যবাসনা, তার সমগ্র সত্তাই যেমন বাধাহে: কখনো-বা উজ্জ্বল হাওয়ার দেবতা **Aeolus** ও বিশ্বস্তকেশ **Ariadne**-র পৌরাণিক প্রেমের স্মৃতি ফুইনী ইরেই, কিংবা পটভূমিতে গণিকালয়ের আকাশে বিষণ্ণ অন্ধকারে লুপ্ত কালপুরুষ, ঘুচে গেছে সুরুচি, লুপ্ত উর্বরতা পঙ্ক সম্ভাবনা, থেমে গেল মধুর রজনীগন্ধ, জলরাশি সঙ্কুচিত; রম্যদেহে

হুইনীরাই শয্যাসঙ্গিনী ( বুঝি-বা প্রাচীন ভিনাসের আসনে ) ; নাটকের শেষে নাইটিঙ্গেলের গানে স্মৃতি থাকে অ্যাগামেমননের হত্যা, প্রেমে বিশ্বাসঘাতকতা— হুইনী অ্যাবড্ দি নাইটিঙ্গেলে। কোথাও নেই উজ্জীবনের আশা, রূপান্তরে বিশ্বাস ; পরিণতি : অন্তহীন দাহে লালসার এ বিশ্বগ্রাসী আগুন যেন গ্রাস করছে নিজেকেই। এ দাহ নয় পুরুষাত্তোত্তিরও উত্তরণ সম্ভাবনায় স্বেচ্ছাকৃত বৈশ্বানরের, আবহমান বিকৃত প্রবৃত্তির এ অগ্নির আভাস বরং ইন্দ্রজালের। প্রজকেরা পারেনি কোন জোর বিশ্বাসে জীবনকে ধরতে, পারেনি এই পার্থিব আপাতশক্তির ভীষণ ভয়াবহ murderous paw-ও। কবিতার মাত্রাই এ সব প্রজকদের ধূসর দুরাশাচ্ছন্ন অস্পষ্টতার থেকে আরেক দিকে। সারাদিন জলের ওপর দাউদাউ করে জ্বলা এলিঅটের এ মধুরলক্ষ্মীর অভিত চোখে সেখানে কোন অজয় মায়া নেই।

কবিতার বিন্যাসে এ গ্রন্থে দূরকালের ঐতিহাসিক পৌরাণিক সব ছবির বৈপরীত্যে ও সাদৃশ্যে বিরহলার বিস্তৃতা অর্থহীনতা এবং বীভৎসতা তীব্র হয়েছে। অন্যদিকে মিঃ এলিঅট'স সানডে মর্নিং সার্ভিস বা দি হিপোপটেমাস জাতীয় কিছু কবিতায় ধর্মের প্রসঙ্গ দেখা দিয়েছে প্রায় কোন ভূমিকা না করেই। কবিতাগুলোয় চোখে পড়ে যে শুধু হুইনীর মত ধর্মহীনেরাই নয়, ধর্মচর্চাও একালে প্রাণহীন মৃত। নেই বিশ্বাসের আবেগ। নিষ্প্রাণ, গূঢ় অধ্যাত্মবিশ্বাস-বর্জিত বিস্তৃত ধর্মের অনুষ্ঠানে দেবালয়ও যেন নিতান্তই পার্থিব। যৌনতার প্রসঙ্গে হুইনী ও তার পারিষদদের ছবিতে এলিঅটের সামূহ নির্বাচন যেমন ক্লেদাক্ত বা ওয়াংগটাং-এ নির্জার উপমানও এ কাব্যে মূল পার্থিব চওড়া-পিঠ হিপোপটেমাস। বিরহলার পাশাপাশি এই ধর্মপ্রসঙ্গ, বৈপরীত্য ও বৈচিত্র্য যেমন সমাহারের প্রত্যাশায় স্বীকার করেছে একটি কাব্যগ্রন্থের বন্ধনের ঐক্য তেমনি স্বতন্ত্র এক একটি কবিতাতেই এখন স্পষ্টতর এলিঅটের এই পদ্ধতি। প্রজকেও তা ছিল। পংক্তি থেকে পংক্তিতে, স্তবক থেকে স্তবকে উত্তরণের সূত্রগুলি চোখে পড়েনা যেন প্রথমে অথচ তারা এক মূল সমগ্রতারই উৎসার এবং কবিতা শেষ হয়ে নানা টুকরো থেকে সূত্র ছড়িয়ে পড়ে ওঠে সেই মানসিক অখণ্ডতা। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থে সূত্র বিচ্ছিন্নতার বিস্তারে এলো শুধু নয় প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তর যৌনতা থেকে ধর্ম ; বিস্তার এলো নানা সূত্রেই, একাল থেকে দূরতম কাল, ইতিহাস থেকে পুরাণ, চিন্তা থেকে অনুভব ; এলো সঙ্গে সঙ্গেই এ সবের কিছুকে একসঙ্গে অধিকারের ঐক্য ও সংহতি চেতনা। হুইনী ও

ধর্মপ্রসঙ্গের কবিতাকে যেন একটি কবিতাতেই মিলিয়ে দেয়নপনে দেখা দিল প্রত্যক্ষের বাঁকা বিদ্রূপ থেকে দূরে এক অন্তরের ছিন্ন তার প্রায় চিরাচরিত বন্ধবাক্ পর্যায়।

এই মানুষটি দেখেছে অনেক। জানে সে জানালার ধারে বসে আছে যে ইহুদীটা, 'জল তার বানারসে ঘাটের কাছার কোন্। জানপুরে ভেতেছে সে, ভেতেছে সে কলকাতায়।' দেখেছে উৎসব juvescence of the year, যে উৎসবে Came Christ the tiger. কিন্তু সবাই মাতলো চরচোক্ত পেয়ে, গোপন কিলকালে ( বুঝি কোন ষড়যন্ত্র, সর্বনাশ কারও ) সেইখানে জুটেছিল অনেকে। তারা আশা করেছিল হঠযোগ কিছু, আশ্চর্য ঘটনা। বুদ্ধিমান সচেতন প্রজ্ঞাবান সবাই। 'তার জন্য আসে যবে আমরা অমনোযোগে হাত পাতি থাকো / অমতার অন্ধকারে চাকরির মেলায়। 'অবিশ্বাসের তাৎপর্যে মাথা ঘামাবে কে! I have no ghosts. বুদ্ধির জন্ম, পারম্পর্যে, যুক্তিতে, কার্যকারণে— ইতিহাসজ্ঞানে। কিন্তু মাংসের নীচে আমাদের হাড়ের মধ্যে তাকালে চোখে পড়ে 'বীরত্বে অন্যায় অন্ধ পাপের গ্লানি। ধর্মনীতি / আমাদের ঘাড়ে ওঠে আমাদেরই দুষ্কৃতির চাপে।' বৃথা গেল উৎসব যৌবনের, জীবনের। অনেকে না কেউ পাকড়ল কেশরী হয়ার— 'শব্দের মাঝারে শব্দ, বন্ধবাক্, অপারগ শব্দ উচ্চারিতে··· । / কাল অন্ধকারে কাঁথায় জড়ানো ···'

**The word within a word, unable to speak a word,**
**Swaddled with darkness. In the juvescence of the year**
**Came Christ the tiger.**

এবং জীবনের প্রান্তে পৌঁছে বৃদ্ধ এইবার যেন দেখতে পাচ্ছে নিজেকেও : জরায় ভেঙেছে শরীর মন I stiffen in a rented house. নিবাসভূমি নয় তার আপন, অস্তিত্বহীন, এ বিপুল বিশ্বের উৎসবে সে প্রবাসী, বহিরাগত, অপরিচিত। তার কাহিনীর শেষে আবেগসম্পর্কহীন কথাহীন বক্তব্যানুভাব দাঁড়ায় :

**I that was near your heart was removed therefrom**
**To lose beauty in terror, terror in inquisition.**
**I have lost my passion : why should I need to keep it**
**Since what is kept must be adulterated ?**
**I have lost my sight, smell, hearing, taste, and touch :**
**How should I use them for your closer contact ?**

**These with a thousand small deliberations**

Protract the profit of their chilled delirium,
Excite the membrane, when the sense has cooled,
With pungent sauces, multiply variety
In a wilderness of mirrors.

নিজেকে চেনার, একমাত্র নিজেকেই বিশ্বাস করার ফলে আজ সে হারিয়ে বসেছে প্রেম, সৌন্দর্য, ভয়, সমস্ত চিরায়ত মূল্যগুলি। তাড়িত সে বুঝি স্বর্গোদ্যান থেকে, বহুদূর শূন্যতায়, ঈশ্বরের হৃদয় থেকে। তার সব গেছে। চোখ কান ঘ্রাণ আর স্পর্শ, ইন্দ্রিয় মৃত। শূন্যতার আয়নায় শুধু নিজেরই ফাঁপানো ছবি। পূর্ণীকৃত আবরণের অন্তরালে রিক্ততা, শূন্যতা, ক্ষয়। I have lost my passion. এই পংক্তিতেই গভীর আত্মবাহের চাপ সমস্ত কবিতাটিতে ছুরে ছুরে কেটে পড়ে যেন এবং সমগ্র কাব্যের সৃষ্টিতে সম্ভবত আরো বেশীই কবিতাটিকে নিয়ে আসে গ্রন্থের কাব্যের পরবর্তী নির্দিষ্ট স্তরে।

বিচিত্র ও বিপরীতের সংহতিতে গেরনশন তাই এলিয়টের প্রথম যুগের কবিতায় দাঁড়িয়ে আছে তুলনাহীন। এর পাশে গ্রন্থের অন্যান্য কবিতায় যেন-বা পরীক্ষা, গেরনশনে তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধি। সমগ্র কাব্যের রিক্ততা ও ধর্মপ্রসঙ্গ এইখানে একটি কবিতায় দানা বাঁধলো স্ফটিকে। গেরনশন থেকে যাওয়া যায় দুইনী কবিতাবলীতে, ধর্মপ্রসঙ্গের কবিতাতেও, আবার সেখান থেকে ফেরা যায়, ফিরতে হয় গেরনশনে। The tiger springs in the new year. Us he devours. এখানে tiger-এর কথায় মনে হবে বীভৎস এবং springs in the new year-এর ইঙ্গিত থেকে পূর্ববর্তী স্তবকের juvescence of the year বসন্তের যৌবনের প্রাণের উচ্ছল উৎসুক প্রাচুর্য, যে প্রাণ শরীর সীমায়ও ফেটে পড়ে দুরন্ত আবেগে, আবার যে প্রাণ আত্মিকও, প্রকাশিত যেখানে আবির্ভাব— মেশে এমনি করেই যৌনতা ও ধর্ম এবং ১৯২০র সমগ্র কাব্যের প্রসঙ্গও তাই। এজন্যই এ কবিতার পরিণত স্বীকৃতিতে খুলে যায় একালের শারীরিক মানসিক আত্মিক সর্ব রিক্ততার সময়ে বন্ধ রাখা অন্তরমহলের ভারী ভারী কপাটগুলি। গেরনশনের দর্পণে ফোটে আমাদেরই প্রাত্যহিক প্রতিহত নিষ্ফল মুখের গভীর কুঞ্চিত রেখার ছবি। জানা যায়:

We have not reached conclusions, when I
Stiffen in a rented house.

এই কথাতে দুইনী কবিতাবলীর পাশবিকতার জোড়ে আরেকটি স্তর— তারাও

নিষ্কাশে পৌঁছতে পারেনি। এবং তখন স্পষ্ট হয় কেন আসে পাশাপাশি বিপরীত এবং সদৃশ, সদৃশ অথচ বিপরীত অতীত ইতিহাস পুরাণের ছবিগুলি একসঙ্গে একই কবিতায়। সোজা যায় হুইসপারস্ অব্ হাইয়াসিন্থ্স-এ আমাদের তত্ত্বের জগতের অনুভববিচ্যুত দৃঢ়প্রাণতার চেতনাই অনিবার্য টানে ঐ একটি কবিতার আধারেই একত্রিত করে তুল, গুয়েনটার এবং ক্রিসকিন, যারা সবাই উজ্জ্বল সজীব বেগবান উজ্জ্বল, কেউ বাইরেই কেউ-বা ভেতরে।

ভিন্নতার স্তরে স্তরে, বৈপরীত্যের বিচ্ছিন্নতার পাশে পাশে কাব্যপদ্ধতির এই সংলগ্নতা ও সামগ্রস্য চেতনাতেই এ কাব্যে ধ্বনির উল্লেখ বা প্রসঙ্গ যদিও নেই তেমন কিছু, তবু ধ্বনের বিভাস অনুসৃত এখানেও। অসংলগ্ন ও অসমস্তরের বিচিত্র অভিজ্ঞতার সংলগ্নতায় এ কাব্যের রচনাপদ্ধতির প্রেরণায় সাধারণত বলা হয় নিকটবর্তী কালে ডন, গোপ, ফরাসীতে ব্রদেল, ভেরলেন লাফর্গের নাম। তবু, বহুসমস্ত ও বহুদেশের বিচ্ছিন্ন ও বিযুক্ত অংশকুলের মধ্যে বসে থাকা আত্মজিজ্ঞাসার ক্ষুরধার আধুনিক কবির সমস্যা সমাধানে তাঁদের ঐতিহ্য স্বীকার করেও এ পদ্ধতিতে সিদ্ধির পূর্ণায়ত রূপ নিশ্চিতভাবেই ধ্বনে। আপন কালের সহায়তায় ধ্বনের সেই প্রায় নৈসর্গিক সিদ্ধির[৩] থেকে এলিয়টের প্রবন্ধেই ইঙ্গিত থাকে তবু-ও অনেকদূরে।[৪] বিশেষত দূরতম দার্শনিক প্রতিজ্ঞাকে জীবন্ময় অভিজ্ঞতায় রূপান্তরের যে অক্লান্ততা ধ্বনের সমগ্র কাব্যে, একদিক থেকে যা তাঁর কোয়ার্টেট্সিয়ার, ব্রিতা দুওতা-র অপূর্ণতা ও বহুত্বের অন্যতম কারণ, আপন কবিতার সেই বিশেষ প্রয়োজনে অন্তত ঐসব কবির তুলনায় এলিয়ট নিজের দিক থেকে জয়েই গেছেন ধ্বনের কাছে। বিচিত্র সদৃশ বিপরীতের যথাযথতার মধ্যেই সংলগ্নতা ও অভিজ্ঞতার স্তরান্তর অভিক্ষেপের যে পদ্ধতি ১৯২০-র কবিতায় সম্পৃক্তির একটি পর্বে উপনীত, সেইখানেই বলে সেই রকম কিছু কিছু চিন্তার সূত্র প্রসঙ্গের তুলনায় অন্তত স্পষ্টতর অনুসরণযোগ্য। প্রসঙ্গে গাইয়ো কাহিনীর ভূমিকাংশ প্রয়োগে, কাব্যারম্ভে পুরগাতোরিও-র উক্তিতে দূরত্ব চিন্তার বাসনা আসে। গেরনশনে কিন্তু I that was প্রভৃতি শক্তি ছুঁয়ে এলিয়টের জীবনজিজ্ঞাসা ধ্বনের কাব্যাংশের প্রত্যক্ষ সহায়তা যাচাইতেই অথচ ধ্বনেরই অনুসরণে সে দূরত্ব বা পরোক্ষতা কাটায়। মাঝে মাঝে এমন চিত্রকল্পের বিন্যাসেও ধ্বনে সে ইঙ্গিত, যেমন কবিতাটির শেষে—

---

৩ Donne। পৃ ২৫০
৪ The Metaphysical Poets। পৃ ৩৮৬-৮৮

Gull against the wind, in the windy straits
Of Belle Isle, or running on the Horn,
White feathers in the snow, the Gulf claims,
And an old man driven by the Trades
To a sleepy corner.

ভাবতে ইচ্ছে করে এই ছোকরা হাওয়ার কি বোধ আছে সেই প্রাগৈতিহাসিক হাওয়ার সঙ্গে যাতে উড়েছে Ariadne-র চুল, না কি এ হাওয়ায় কেবলই পাপ কলুষতা, কারণ যাদের deprived May, আর এ রকম হাওয়াতেই বুঝি-বা smell with haste the perjured sails (Sweeney Erect), না কি এই হাওয়াতেই Us he devours-এর ইঙ্গিত। যেমন ওয়েস্ট ল্যাণ্ড পড়বার পর আরো ঘাউ ঘাউ করে জলে সেই পংক্তি দুটি :

...Her shuttered barge
Burned on the water all the day.

আর সে অগ্নিময়তা তখন দৃশ্য অনুভব ও চিন্তা একই সঙ্গে, একটি পংক্তিই একটি সম্পূর্ণ কবিতা। এ কাব্যে বিচিত্রের সংহতিময় কাব্যপদ্ধতির পূর্ণতর সিদ্ধির দিক থেকে এলিয়ট হাল্কের অনুবর্তী এবং পূর্ববর্তী কাব্যের তুলনায় ছন্দে প্রায় ব্যবহার না করেও, ছন্দেই তাঁর প্রেরণা কাব্যানুভূতির মধ্য থেকে উৎসারিত চিন্তাসূত্রের স্পষ্টতায়।

সংলগ্নতা ও সংহতির শিকড় এবারে নেমেছে গভীরে, প্রবেশ করেছে আমাদের হাজারো জীবনে নিছক চূড়ান্ততম অসংলগ্ন ও বিচ্ছিন্নতার পোড়ো জমির প্রায় সম্পূর্ণ এলাকা জুড়ে। ওয়েস্ট ল্যাণ্ড (১৯২২) এলিয়টের সংকল্প অনেক বড়। ওয়েস্ট ল্যাণ্ডের ঐক্য কবির কবিতা রচনার পদ্ধতি ও প্রকল্পের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে প্রাপ্ত ও চিন্তিত পরিকল্পনা। একটি জটিল ও বৃহৎ আকৃতির জ্যামিতিক নকশার ওপর যেন দাঁড়িয়ে আছে ওয়েস্ট ল্যাণ্ডের ইমারত। ৪৩০ পংক্তির এ কাব্যে পাঁচটি ভাগ, পাঁচটি নামের পাঁচটি কবিতা। যেন পাঁচটি বিভিন্ন দৃশ্য বা পাঁচটি দৃশ্য পাঁচটি নাটকের। কিন্তু পড়া শেষ হলে জানি তারা সম্পৃক্ত একটি দেহে। অথবা যেন সিম্ফনির বিচিত্র আপাত-অসংলগ্ন অংশের পরিণামী অন্তর্লগ্নতা, রিচার্ড-কথিত 'মিউজিক অব আইডিয়াজ'।

অদ্ভুত অসঙ্গত ভাবনার প্রথম অংশ 'বেরিয়াল অব্ দি ডেড্' কবিতাটির আরম্ভ—' April is the cruellest month,— এবং আরো অদ্ভুত এই নির্মমতার কারণ। বসন্ত এখানে নির্মম, কারণ মৃত মাটির বুক চিরে সে

ফোটায় ফুল, লাইলাক। নির্জীব শিকড়গুলি নড়ে ওঠে তার সঞ্জীবনী বর্ষণে। বেদনায় স্মৃতি আর অতীপ্সা।

যদিও আকস্মিক তবু তাকে পারে হয়তো-বা প্রথমের memory সূত্রের সূত্রে এর পরেই আসে জাতি সম্পর্কের ভাইএর সঙ্গে খেলে চড়বার শৈশব স্মৃতি। সেখানে শাহারের মধ্যে মুক্তির ইশারা।

তারপর শুকনো পাথরের প্রসঙ্গ। এ পাথরে ঝরবে কোন্ শিকড়, জলপালা ছড়াবে কে? মানব সন্তান তার উত্তর দিতে পারে না। সে জানে কেবল ভয়ছায়ার একটি ধূপ। মৃত বৃক্ষতলে নেই ছায়ার আশ্রয়, জল নেই, শুধু শুকনো পাথর। আবার কবিতা ঘোরে পরিতে: মেয়েটি ফুল দিয়েছিল। সবাই তাকে তাকে তাকে হায়াসিন্থ গার্ল। ফুলের বাগান থেকে ফিরে এসেছি। তোমার চুল ভেজা। মনে হয়েছিল তাকিয়ে আছি আলোর মর্মে, শুদ্ধ স্থিরতায়। পার হয়ে গেছি জল মরণের সীমা। এরপর যাদের সোলোমন্ত্রিস্ প্রসঙ্গ, বিখ্যাত জ্যোতিষী। গণনা করেছেন অনেকেরই ভাগ্য। কিন্তু দেখতে পান না The Hanged Man.

অবান্তর নগরী। লণ্ডন ব্রীজ দিয়ে হেঁটে চলে অগণ্য মানুষ। মৃত্যু এদের পথে বসিয়েছে। ব্রীজের ওপর মৃত মানুষের সেই বিছিলে আরেকটি অদ্ভুত ঘটনা— স্টেটসনের সঙ্গে দেখা। মানুষটি ছিল পিউনিক যুদ্ধে Ypres-তে বন্ধুর সঙ্গী, সে হেঁটে চলেছে আজও। তার বাগানে সে পুঁতেছে একটি মৃতদেহ। বন্ধুর জিজ্ঞাস্য এ বছর কি তাতে ফুল ধরবে? মানুষের বন্ধু কুকুরটাকে ঘুরেই রেখো, না হলে হয়তো আবার নখ দিয়ে খুঁড়ে বার করবে ও সেই মৃতশরীর।

এইখানে ওয়েস্ট ল্যাণ্ডের প্রথম কবিতাটির শেষ, শেষ প্রথম অংশ। প্রসঙ্গ বিন্যাসের ধরণের মোটামুটি মূল কবিতার ক্রমিকতার অনুসরণ যতটা রক্ষা করা গেছে তা থেকেই অনুমেয় এ কবিতাটির এবং অনুমেয় সমগ্র কাব্যেরও অসংলগ্নতা, সূত্র বিচ্ছিন্নতা, সংযোগসঙ্কটিলতা। তবু এরই মধ্যে থেকে দু-একটি বিষয় যখন ফিরে আসে পরবর্তী অংশে তাদের সংযোগে ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়া যায় শেষ পর্যন্তই।

দ্বিতীয় অংশ 'এ গেম অব চেস্'। কবিতাটির আরম্ভে এক সম্ভ্রান্ত মহিলার সাজানো ঘর, অনেকটা যেমন চিরকালই, বিলাসে ঐশ্বর্যে। ঘরের ছবিটি মিলিয়ে আসতেই শোনা যাচ্ছে কথাবার্তা, যদিও আরেকজন প্রায়

নিস্পৃহ এবং তার কথা যেন-বা কবিরই কথা, কথাও নয় যেন চিন্তা, ঘটনার থেকেও সে প্রায় নেই, ঘটনার পরে, ঘটনার থেকে অনেক দূরে যেন সে। সে দেখতে পাচ্ছে যেন সবটাই। কি করবো, কি করবো আমরা শেষ পর্যন্ত, কাটাবো কেমন করে, এই প্রশ্ন ঘরের দেয়ালে বুঝি-বা প্রতিহত হয়ে উত্তর আনে, সে কি উত্তর, না কথা, না অনুভব, না চিন্তা :

'What shall we ever do ?'
The hot water at ten.
And if it rains, a closed car at four.
And we shall play a game of chess,
Pressing lidless eyes and waiting for a knock upon the door.

এখানে জীবন চলেছে বাঁধা ছকে— দশটায় গরম জল, বৃষ্টি হলে বেরিয়ে আসা বন্ধ গাড়িতে এবং দাবা খেলা। ( খেলা হয়তো-বা সবটাই, সব কিছুই। খেলার ক্লান্তিকর পরিক্রমা এ জীবনই কি game of chess ) তারই মধ্যে যেন চাপা দিয়ে রাখা ভয় জেগে উঠছে মাঝে মাঝে waiting for a knock upon the door. আসছে কে যেন বাধা দিল দরজায়, না কি হাওয়া কেঁপে উঠলো দরজায়। আছি এক কিছু গোয়ালার গলিতে, মৃত মানুষের অপহৃত হাতের শব্দ পাওয়া যায়। এ ছবি মিলিয়ে যাবে আবার ছুটি স্বীকৃতি। একজন সন্তান চায়নি। বান্ধবীর প্রশ্ন কেন সে তবে বিয়ে করলো। মৃদু হেসে স্বামী অ্যালবার্ট স্বভাবতই এখন একটু আমোদ প্রমোদে ( যেমন সহজ এক দান দাবার বাজী a game of chess ) সময় কাটাতে চাইবে।

আর এই রকম কথাবার্তার মধ্যে মধ্যেই শোনা যাচ্ছে আর সময় নেই, দেরী হয়ে গেছে, শোনা যাচ্ছে বিদায় বাণী, কবিতা শেষ হচ্ছে।

কারা বলছে আসের কথাগুলো, বিদায়বাণীই বা উচ্চারণ করছে কারা কবিতায় বলা নেই স্পষ্ট কিছু। তবু সব মিলিয়ে ভেবে নেওয়া যায় একটি কাকে বা অনেক মানুষের মেলা কোন। সেটা না ভাবতে পারলেও প্রথম কবিতা ও দ্বিতীয়ের ইতিমধ্যেই একটা সংযোগ দাঁড়ায় লণ্ডন চিত্রে, নগর জীবনে। লণ্ডন জীবনের ওপরেই হোক, কিংবা বাসস্থলে অথবা কাকে রেস্তোঁরায়, সময় নেই কোথাও, যে যার মত নিজেকে নিয়ে নিজের পরিমণ্ডলে এবং কেমন যেন এক শুষ্কতা, প্রাণহীনতা, কিংবা প্রায় মেলাই সবটা, কি দৈহিক কি মানসিক ( বা আত্মিক ) সম্পর্কে কিছুতেই যেন কিছু এসে যায় না আর। শুধু যা হত্যা করেছি এই যুদ্ধে ( জীবন সংগ্রামে ) তাকে রাখি চাপা দিয়ে, কুকুরকে

সবাই ঘুরে কি জানি যদি মৃতদেহটা খুঁড়ে ফেলে, যদি শিকড়ই মেলে বের ভালপালা। অ্যালবার্ট যদি না পায় হীকে, অন্তরা আছে :

If you don't like it you can get on with it, I said.
Others can pick and choose if you can't.

আবেগমৃত তুচ্ছতার এ জীবনে এইবার অতএব মোলমুহূর্তটা আসে প্রথম কবিতার রসহীন নীরক্ত প্রস্তর প্রলম্ব dry stone, stony rubbish-এর যেখানে অন্তরাত্মা কিছু, সম্ভাবনা নেই কোন সবুজ ডালপালার। তাই বসন্ত নিষ্ঠুর নির্মম, সে যে আছে এই শুষ্কতার উল্টোপিঠে। তাই বুঝি Starnbergersee-র বর্ষণে পালাতে হয় Hofgarten-এ আশ্রয় নিতে হয় কফির পেয়ালায়, And if it rains, a closed car at four.

তৃতীয় কবিতা 'দি ফায়ার সারমন'-এ যখন উৎসব শেষের টেম্‌স নদী, নগ্ন খাল, গ্যাসহাউসের পেছনে শীতের সন্ধ্যার কথা আসে, সে-ও যেন এই বিস্তৃত জীবনসাধনার এই অবাস্তব নগর প্রসঙ্গে। দুই জীবনের মধ্যে কম্পমান টাইরেসিয়সই এ তৃতীয় কবিতার দ্রষ্টা। তারই সব অভিজ্ঞতা যেন। টেম্‌সের ধারে বসে আরম্ভ থেকে যে গান শোনাচ্ছে, দেখছে বসন্তে দুইনী এলো Mrs Porter-এর কাছে, চাঁদের আলোয় তিনি আর তাঁর মেয়ে পা ধুচ্ছেন সোডার জলে। এ সবই বলা হচ্ছে যেন অন্ধ বৃদ্ধ কুঞ্চিত নারীষণ্ড টাইরেসিয়সেরই মুখে। তারই চোখে যেন টাইপিস্ট প্রসঙ্গের পর ভেসে ওঠে সুদূরকালের এলিজাবেথের বাভিচার কাহিনী, কানে জাগে প্রায় সংবাদপত্রসুলভ নীরক্ত ভঙ্গীতে, টেম্‌সকন্যাদের যৌবন লুণ্ঠনের, বঞ্চনার বেদনাময় গান।

'My feet are at Moorgate, and my heart
Under my feet. After the event
He wept. He promised "a new start."
I made no comment. What should I resent?'

এমনি করে একটির পর একটি ছবি কি একালের দুইনী ও সোঁতার, টাইপিস্ট-কেরানী, টেম্‌সকন্যারা, কিংবা সুদূরকালের এলিজাবেথ যেন দৃষ্টান্ত যুক্ত করছে দ্বিতীয় কবিতার সেই সন্তানহীন বিবাহবাসনা বা লণ্ডনবাসী নারীপুরুষের দৈহিক মানসিক সম্পর্কে; পরিধি ও ভীরতা বাড়ছে প্রাণহীন জীবনযাত্রার যান্ত্রিকতার অনুভবে। এ সবের পরে অতএব সম্ভবত টাইরেসিয়সেরই যন্ত্রণাময় ব্যাকুল উপলব্ধিতে এ তৃতীয় কবিতার উপসংহার, ঘুরে মিলিয়ে যাচ্ছে টেম্‌স-

কার্থেজের মানের la la ধ্বনি, শোনা যাচ্ছে নিষ্ফল গভীর যন্ত্রণায়, ফেটে পড়ছে ব্যাকুলতায়, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে :

To Carthage then I came.

Burning burning burning burning
O Lord Thou pluckest me out
O Lord Thou pluckest

burning

কবিতাটির বিন্যাসের ধারায় আকস্মিক নয় পংক্তিগুলি, বরং ধারাবাহিকতাতেই এসো যেন আকাঙ্ক্ষিত অনিবার্য উপসংহার। অনুভূত হয় যে যদিও বলা হয়েছে আগুন জ্বলছে কার্থেজে, তবু জ্বলছে তা দ্বারা তৃতীয় কবিতাটিতেই, জ্বলছে প্রথম তিনটি কবিতাতেই কমবেশী, আগুন জ্বলছে যেন-বা বিশ্ব জুড়েই হয়তো-বা অনাদ্যন্ত কালে কার্থেজ থেকে লণ্ডনে এ আগুন, লালসার আগুন। প্রথম তিনটি খণ্ডের বহিরঙ্গ বিচ্ছিন্নতা অতএব যুক্ত হয়ে যাচ্ছে নগরজীবনের বিস্তৃততায় এবং আয়তন বাড়িয়ে— আর নানা উল্লেখে কবিতায় তা বাড়েই— এক দৃতকল্প জীবনের অনুভবে, যেমন ছিল প্রস্তুতকে এবং ১৯২০-র সংকলনটিতেও। প্রথম কবিতাটি সিটি-র বিশেষণ এ জন্যই আরো unreal— এখানকার অধিবাসীরা ঠিক ঠিক বেঁচে নেই, অথচ মরেও যায়নি এবং কার্থেজের উল্লেখে সে নগর শুধু নয় লণ্ডন। ওয়েস্ট ল্যাণ্ডের প্রথম তিনটি অংশ এক বিষয়োত্তীর্ণ unreal city-র কবিতা।

চতুর্থ অংশ 'ডেথ্ বাই ওয়াটার'-এ কাহিনীটি অদ্ভুত এবং প্রথম তিন অংশের পাশে রীতিমত আকস্মিক। জলের তলে কিসকিসের মধ্যে সমুদ্রস্রোতে দুলে নিল ফিনিশীয় (বণিক!) ফ্লেবাসের হাড়। সী-গালের চীৎকার আর সে শুনবে না, সব লাভক্ষতির পারে যার্ঘ্য যৌবন পেরিয়ে এখন সে এক ঘূর্ণীতে প্রবেশ করলো। এ অংশের যোগসূত্র কিছু জটিল। জটিলতা অমীমাংসিত রেখেই আসতে হয় পঞ্চম কবিতায় : 'হোয়াট দি থাণ্ডার সেড্'। প্রথম তিন খণ্ডের পরিচিত দেশকালের রেখা, মহাযুদ্ধের পরের ইউরোপ, এ অংশে নেই একেবারেই। সম্পূর্ণই এক কাল্পনিক জগৎ। অন্ধকার রঙ্গমঞ্চে দৃশ্য ফোটে আস্তে আস্তে— ঘর্মাক্ত মুখের ওপর মশালের লাল আলো। যন্ত্রের আওয়াজ। ধসন্তের প্রতিধ্বনি। কিছু মৃত্যু, কেউ বা মুমূর্ষু। যাত্রীরা চলেছে। চারদিকে শুকনো জলহীন পাথর, পাহাড়। দাঁত বের করে আছে পাহাড়ের গর্তগুলো।

সুর জমে চলতে থাকে অনায়াসভায়। প্রায় সেই প্রথম কবিতার শুকনো পাথর প্রসঙ্গ, কিন্তু আরো তীব্র হাহাকারে যেন। এবং এক অদ্ভুত ভয়। শুনতে পেলে দেখা যায় হাঁটছে দু-জন। কিন্তু সামনের পথটার দিকে তাকালেই মনে হয় আরেক জন কে যেন সারাক্ষণ হেঁটে চলেছে পাশেপাশেই। **Who is the third who walks always beside you?** বাদামী চামড়ায় ঢাকা তার দেহ, বোঝা যায় না নর কি নারী। ফেটে যাওয়া রুক্ষ মাটিতে যাত্রীরা হোঁচট খাচ্ছে। আবার চলছে। চোখে পড়ে এবার আরও অদ্ভুত দৃশ্য। পাহাড়ের ওপর নগর ভাঙছে, গড়ছে, আবার ভাঙছে।

**Cracks and reforms and bursts in the violet air**
**Falling towers**
**Jerusalem Athens Alexandria**
**Vienna London**
**Unreal**

বেগুনী আলোয় বাদুড়ের মুখ। প্রাচীন ঘণ্টার শব্দ। ঘুরে চাঁদের আলোয় পূর্ণ গির্জা; হাওয়া ঘুরে ফেরে। আকাশে যন্ত্র, হাওয়ার কাপটায় বৃষ্টি, ডুবে গেল গম্বুজ, কালো কালো মেঘ ঘনালো হিমবরফে, অরণ্য নিঃশব্দ, গর্জন করে উঠলো আকাশে যন্ত্র। ধ্বনিত হলো যেমন বলেছেন উপনিষদ, মেঘকণ্ঠী সেই দৈববাণী দ, দ, দ, হৃদয় দয়ধ্বম, দামাত। থাকে পুরগাতোরিও থেকে উদ্ধৃতি **poi s'ascose nel foco che gli affina** [তারপর মেশে প্রবেশ করলো সে আগুনে, তাদের শুদ্ধির আগুনে] কবিতা শেষ হলো :

**Datta Dayadhvam Damyata**
**Shantih Shantih Shantih**

পঞ্চম অংশের এই বজ্রবাণী ধ্বনিত যাত্রার ছবিতেই ওয়েস্ট ল্যাণ্ড পরিসমাপ্ত। কিসের এই যাত্রা, কারা চলেছে, চলেছে কোথায়, কেন? মনে পড়ে প্রথম অংশেও একটি যাত্রার প্রসঙ্গ আছে লণ্ডন শহরে। শীতের ভোরে বাদামী কুয়াশার মধ্যে সে যাত্রাও কিছুটা অদ্ভুত। পঞ্চম ও প্রথমের সংযোগ সেদিক থেকে বিস্তৃততা মৃতকল্পতার মধ্যে যাত্রায়। আর তারই সূত্র থাকে দ্বিতীয়ে ও তৃতীয়ে, যেখানে লালসার বাভিচারে সদৃশ বিস্তৃততায় চলে জীবন-যাত্রা। বাকী থাকে চতুর্থ কবিতাটি। মৃত্যুর যে রূপ এ কবিতায় ধ্বনিত তাতে একটা শান্তির আভাস ফোটে। উপনিষদের যে শান্তিবাণীতে ওয়েস্ট ল্যাণ্ড শেষ হয়, সেই শান্তির টীকায় এলিয়ট লিখেছেন এ শান্তির স্বরূপ মানববুদ্ধির অতীত।

জলের মধ্যে অনুরূপ মানববৃদ্ধির অগোচর শান্তিই পেয়ে থাকবে ফেরার। পাথরের স্তব্ধতার প্রসঙ্গে বারেবারেই তাই বলেছেন এখানে জল নেই, এক বিন্দুও জল নেই, এ মরুভূমি। মরুভূমির সন্তানেরা তাই প্রথম কবিতার সৃষ্টি থেকে সরে থাকে, বসন্তকে ভাবে নির্মম। সারা ওয়েস্ট ল্যাণ্ডে এমনি বিচিত্র আভাসে জল জল থেকেও হয়ে ওঠে শান্তির প্রতীক, প্রতীক প্রাণময়তার,—যেমন তৃতীয় অংশে জলের ধার থেকে ভেসে আসা গানে মেয়ে জেলেদের গান, যারা থাকে জলের কাছে, মানববুদ্ধির অগোচর শান্তির প্রতীক নির্জনার কাছে। আগুন প্রতীক সর্বগ্রাসী পরিণামচিন্তাহীন আত্মদাহী লালসার। লণ্ডনের প্রসঙ্গ বারেবারেই মেশে অন্ত নগরে, ভিয়েনা আলেক-জান্দ্রিয়া কার্থেজে, সর্বনগরে। ফুরাশার মতপ্রাণ যাত্রীদের চলায়, দৈনন্দিনের যান্ত্রিকতায় সে নগর বিস্তৃত, অবাস্তব। মানুষেরা ছায়া। গুরুকণ্ঠের ছায়াসত্তা গেয়ননের রিক্ততার হাহাকারই জাগে ওয়েস্ট ল্যাণ্ডের অধি-বাসীদের জীবনের শোকোজবি জুড়ে। এ অনুভবসূত্রের স্নায়ু-শিরাতন্ত্র বেয়ে ওয়েস্ট ল্যাণ্ড সংলগ্ন হয়ে যায় পূর্ববর্তী কাব্যদেহেও। এলিয়টের ওয়েস্ট ল্যাণ্ডের ঐক্য ও সমগ্রতার বোধ অধিকার করে আপন কাল থেকেই সর্বকাল, বিচিত্রকে স্বীকার করেই পক্ষে সংলগ্নতা, সংহতি। তাঁর উৎসবশ্লাস্ত টেম্‌সের তীর স্পর্শ করে স্পেনসরের কাল। তাঁর গেম অব্ চেস-এর মহিলায় একই সময়ে ছায়া পড়ে ক্লিওপেট্রা এলিজাবেথ মেলিণ্ডা বা মিডল্‌টনের বিয়াত্রা। প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তর, এক পংক্তি থেকে আরেক পংক্তি, এক খণ্ড থেকে অন্য খণ্ড, এক কাব্য থেকে অন্য কাব্য, বর্তমান থেকে অতীত ভবিষ্যৎ জুড়ে জাল পাতেন এলিয়ট একই সময়ে একই অঙ্কে ওয়েস্ট ল্যাণ্ডে। সমকালের ব্যক্তিগত অভিক্ষেপের সিঁড়ি বেয়েই বিস্তৃতির এ ভয়াবহ যন্ত্রণার ট্রাজেডির সূত্রপাত, কিন্তু এই বহুসংলগ্ন জটিল প্যাটার্নের বুননে ক্রমেই তা রূপান্তরে স্পর্শ করে সমস্ত বিশ্ব, চিত্রিত করে সমস্ত কাল।

অতীতের সংলগ্নতার এক বৃহত্তর ঐক্যবোধের যে পরিকল্পনায় ওয়েস্ট ল্যাণ্ডের ভিত্তি, সেখানে নিজের কবিতার গঠনগত প্রয়োজনেই এখন ১৯২০-র তুলনায় এই ১৯২২-এ দান্তের প্রসঙ্গ, দান্তের অনুচিন্তা এলিয়টের কাছে আরো ঘনিষ্ঠ। ওয়েস্ট ল্যাণ্ডের প্যাটার্নের প্রতিরূপ নেই দান্তেতে। দান্তের কোম্‌মেদিয়া-র প্রসঙ্গ বিস্তার ইহলোক থেকে পরলোক। প্লেটো, অগাস্টিন, অ্যাকুইনাস, ডান্টে, হোয়েল, ব্রুনো, আপন কালের সঞ্চিত সমস্ত মানব ইতিহাস

কাব্য পুরাণ ধর্মবিশ্বাস বিচিত্র বিদ্যা ও বীর অভিজ্ঞতার অজস্র উপকরণ সেখানে অন্বিত এবং সমস্তই জীবিত। দুরূহজটিল দার্শনিক চিন্তা পদ্ধতি, হৃদয়ভাবের উচ্চতম থেকে নিম্নতম ভাবরাশি, ইতিহাস বিজ্ঞান থেকে সর্গ পরিকল্পনা কিংবা অন্ত্যানুপ্রাস পর্যন্ত তুচ্ছতম বহিরঙ্গ বিষয়কেও তাঁর অলোকসামান্য ঐক্যবোধ অবাচ অবহেলায় পরিত্যাগ করেনি। গ্রহণ করেছেন বিচিত্র কাব্যপদ্ধতি, বর্জন করেছেন, রূপান্তরিত করেছেন নিজের প্রয়োজনমত। তার পাশে এলিয়টের পরিধি যদিও সীমান্বিত সংকীর্ণ। সে নয় এখনও টনব্রিজ্‌লো থেকে পুরগাতোরিও ঘুরে পারাদিজো-র আলোকে অবতরণের বিশাল দীর্ঘ পরিক্রমা। তবু ওয়েস্ট ল্যাণ্ডে এসে এলিয়টও কাব্যের বেড়া ভাঙেন সহজেই, এক পংক্তিতেই ঘুরে আসেন সারা ইউরোপ, নেমে যাবার প্রয়াস তীব্র হয়ে ওঠে কখনো-বা সন্তারই তলস্থ অন্ধকারে। এখন তাঁর মানসিকতায় স্পষ্টতর আকাঙ্ক্ষা বিচিত্র দূরত্ব বিপরীতের মহত্তম থেকে তুচ্ছতম পর্যন্ত অকল্পনীয় ঐক্যসন্ধান, যে আকাঙ্ক্ষার পরিণাম মহাকাব্য। এলিয়ট মহাকাব্য লেখেননি, একালের মহাকাব্য কবিতায় লেখা হয় না, তিনি শুধু আপন কবিতায় সেভাবে ভাববার চেষ্টা করলেন ওয়েস্ট ল্যাণ্ডে। কাব্য পরিকল্পনার ঐক্যের তলায় তলায় যে জটিল টানাপোড়েন, সামান্যতম থেকে বৃহত্তম প্রসঙ্গ পর্যন্ত যে নিরন্তর সংগঠন চিন্তা রয়ে পাঠের অভিজ্ঞতা, সমগ্র সংস্করণের পূর্বভাবনা প্রুফক বা ১৯২০-র সংকলনের তুলনায় এ জন্যই ওয়েস্ট ল্যাণ্ডে মনে পড়ে নানাদিক থেকেই।

প্যাটার্নের জটিলতা ও বৃহৎ পরিকল্পনার রাস্তের যে অনুস্থতি এ কাব্যে অন্বিত তার মূল সম্ভবত শুধু গঠন নয়, বরং ওয়েস্ট ল্যাণ্ডে রাস্তের কাব্যাংশে সাবহারে প্রমাণ তার প্রেরণা চেতনার আরো গভীরে। আর তাই-ই স্বাভাবিক। কবির গভীর প্রসঙ্গ চেতনাই অধিকার করে বৃহৎ পরিকল্পনার প্যাটার্ন। সমগ্র কাব্যের মধ্যে একবার মাত্র আছে মূল পুরগাতোরিও থেকে উদ্ধৃতি, পঞ্চমাংশে যেমন আছে উপনিষদ মূল সংস্কৃতে, কারণ কবিতার কথা অর্থের অতিরিক্ত, ধ্বনির মূল্য তার কাছে অপরিসীম, এমন কি অর্থ বিশেষ না থাকলেও ক্ষতি নেই। পঞ্চম অংশে এলিয়টের বহুশ্রুত পুরগাতোরিও-র [২৮ : ১৪৮] সেই পংক্তি 'তারপর যেন প্রবেশ করলো সে আগুনে, তারপর শুদ্ধির আগুনে।' তার ঠিক আগেই আছে London Bridge is falling down falling down falling down, পরে আরো দুটি অন্য উৎস থেকে উদ্ধৃতি এবং তারপর—These fragments I have shored against my

ruins. আবার একটি উল্লেখ, তারপরই উপনিষদের মত ধ্বনিময় দামাত ও শান্তিবাণী, কবিতা শেষ হয়ে যাচ্ছে। ধ্বংস চারদিকে, বজ্রে বজ্রে; কালান্তরের যাত্রার যেন চলেছে যাত্রীরা, কেউ মৃত কেউ মুমূর্ষু. তারই মধ্যে সংস্থাপিত এই শুদ্ধির আগুনের কাহিনীগুলি প্রায় মেঘে মেঘে বজ্রে ধ্বনিত সেই মৃত ধ্বনিময় দামাত— দান কর, দয়া কর, দান্ত হও বাণীর দমাত্তরাল। প্রতিধ্বনি যেন একই। দান্তের পংক্তিতে আগুনে প্রবেশ করলেন যে আর্নল্ড দানিয়েল তিনি আছেন পুরগাতোরিও-তে। সেখানে শুদ্ধির আকাঙ্ক্ষায় এঁরা স্বেচ্ছায়ই বরণ করেছেন দাহ, অগ্নিতে প্রবেশ করেছেন ব্যাকুল বেগে। ফলে যে আগুন একবার মনে হয়েছিল লালসার, দান্তের ব্যবহারে এখানে সেই আগুনেই এলো শুদ্ধির আভাস; আগুনে মিললো দুই-ই যেন পাশাপাশি এবং এক। জাগলো যেন আগুন ঘিরে কবির গভীরতর চেতনা, যন্ত্রণার আগুন বরণ করতে হবে, সেই কথাই ধ্বনিত অতীত থেকে, ধ্বনিত মেঘে মেঘে— যন্ত্রণাই মাত্র কাম্য বলে নয় যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে কবিতায়, কবিতায় অগ্নিই জীবনের শুদ্ধতর রূপের[১]সম্ভব্য। আর কয়েকটি উল্লেখ দান্তের অনুসরণে রচিত প্রায় কয়েকটি অনুবাদ পংক্তি। যেমন প্রথমাংশে নরক বৃত্তের যাত্রীদের দেখে মনে হয়েছে :

I had not thought death had undone so many.
Sighs, short and infrequent, were exhaled.

ইন্‌ফের্নোতে নরকদ্বার পার হয়ে দান্তের প্রথম যে চেতনা এবং নিরোর অভিজ্ঞতাও অনুরূপ :

It never would have entered in my head
There were so many men whom death had slain

ইন্‌ফের্নো, ৩ : ৫৬-৫৭

We heard no loud complaint, no crying there,
No sound of grief except the sound of sighing
Quivering for ever through the eternal air ;

ইন্‌ফের্নো, ৪ : ২৫-২৭

দান্তের ব্যবহারে নরক বৃত্তের যাত্রীরা দাঁড়ালো নরকে, নগরের আন্ত-কেন্দ্রিক বাস্ত জীবনের চালে এলো নরকের আভাস। তৃতীয় অংশে টেম্‌স কল্যাণের গানে (পূর্বে উদ্ধৃত) লা সিআর বেদনাময় কাহিনীর বাচনভঙ্গী

**Remember me, that am called Pisty :**
**Siena made me and Maremma undid me**

পুরগাতোরিও, ৫ : ১৩৩

-র অনুকরণে বেদনার সিঁড়িতে মেপে একাল ও সেকাল এবং পক্ষমাংশে ধরুষম শব্দের সূত্রে যখন লেখেন :

**I have heard the key**
**Turn in the door once and turn once only**

সেখানে ইন্‌ফেরনোর [৩৩ : ৪৬] উগোলিনো কাহিনীর কারাগার-স্মৃতি মিশে এ অংশের আত্মকেন্দ্রিকতার ভাবটি তীব্রতায় হয়ে ওঠে ভয়াবহ, এ কারাগারে আমাদেরও যেন নরকদর্শন ঘটে। কোরিওলেনাস পার হয়ে আমাদের আত্ম-কেন্দ্রিকতার কারাগারে ধ্বনিত হয় অতীতের উগোলিনোর কারাগারে শেরেক পৌতার শব্দ ; আমাদের প্রেমের বঞ্চনায় মেপে না নিলার করুণ কাহিনীর সুর ; নগর হয়ে ওঠে নরক, শুধু প্রথমাংশেই নয়, পঞ্চমাংশের সমস্ত যাত্রার ছবিটিও যেন চলেছে আরেক ইন্‌ফেরনোর মধ্য দিয়ে এবং চোখে পড়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয়াংশ। বন্ধবাণীতে ধ্বনিত পুরগাতোরিও-র আভাসে মুক্ত হয় চতুর্থ অংশের প্রেক্ষাপটের জলের ধারে মৃত্যু। আর এমনি করে দেখা গেলে,— এবং দেখতেই হয় কারণ মাঝেমাঝেই এলিয়ট আলো ফেলে দিয়েছেন নিজেই হাত থেকে,— তখন মনে হবে যে শুধু প্যাটার্নের সৃষ্টিতেই নয়, এলিয়টের যন্ত্রণার অনুভব দান্তের কাব্যের অত্যন্ত নিকটবর্তী হয়ে ভাবতে চাইছে সে বেদনার নিহিতার্থ। বিশেষত যখন দেখা যায় প্রথম থেকেই কবিতায় তিনি বার বারই এসেছেন দান্তেতে এবং ক্রমেই তার ইঙ্গিত স্পষ্ট হচ্ছে, স্পষ্ট হচ্ছে কোন দিগন্ত তার লক্ষ্য। ওয়েস্ট ল্যাণ্ডে দান্তের হাত ধরে এই অনুর্বর পতিত রুক্ষ পাথুরে মাটির পৃথিবীর মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সূত্রে এলিয়ট পৌঁছেছেন কোন অজ্ঞাত দেবতা বা শয়তানের চক্রান্তে বিড়ম্বিত প্রবঞ্চিত মানবতাগোর চিরকালীন ট্রাজেডিতে ; এবং পৌঁছতে চাইছেন প্রায় একটা নৈতিক স্তরে যেখানে মানবাত্মা নিরন্তর পাপ ও পুণ্যের দ্বন্দ্বে মথিত। দান্তের কাব্যাংশ প্রয়োগের ক্রমবর্ধমান আভাস ইঙ্গিত আনছে এলিয়টের কবিতা এধারে অগ্রসর হচ্ছে সেই প্রার্থিত ও নিশ্চিত গন্তব্যে।

অ্যাশ ওয়েন্‌সডে-তে (১৯৩০) এসেই প্রায় সংশয়হীন সেই অনুভব। আপন

কাল ও জগৎ থেকে যাত্রা করে কবি এবারে পৌঁছেছেন এসে অনেকটাই অন্তরতর দেশে ও কালে। দেশকালের সীমারেখা ওয়েস্ট ল্যাণ্ডের পক্ষমাংশেই প্রায় মুক্ত হয়েছিল, যদিও ছিল লোকগাথার স্মৃতি থেকে হোলি গ্রেলের সন্ধানে যাত্রার আবছায়া পট। অ্যাশ ওয়েন্‌সডে-তে থাকে খ্রীষ্টীয় সেই পুণ্যদিবসের অনুষ্ঠানের ছক, কিন্তু সে নয় পবিত্র পাত্রের দেবালয় যাত্রার বহিরঙ্গ নাট্যবর্ষ। এ কাব্যে নাটক অন্তর্লীন, তার দ্রষ্টাও কবিরই হয়, বাঙ্ময় অবশ্য আমাদের শুচিস্নাতের সময় আস্বাদ্য। এ কাব্যে কবির প্রার্থনা ধ্বনিত উত্তম পুরুষেই এবং এ কাব্যে এই প্রথম এলিঅট অনেক সহজ।

ভাষা ও সামগ্রিক গঠনে এখানে বাধা নেই কখনোই, কোথাও। 'যাতে বিষয়ে সবচেয়ে বিস্ময়কর এই,' এলিঅট যখন বলেছিলেন, 'যে এক অর্থে তা পড়া অত্যন্ত সহজ' তখনই তাঁর মনে হয়েছে যে কবিত্বের যথার্থ পরীক্ষা তার ধ্বনিতে, কাব্যের আত্মা ধ্বনি। অবশ্য উল্টোভাবে ধ্বনিহীনতা থেকে কবিত্বের অনুপস্থিতির সিদ্ধান্ত সর্বদা সঙ্গত না-ও হতে পারে।* অ্যাশ ওয়েন্‌সডে-র ভাষার প্রবলভাবে অনুভূত সেই ধ্বনিময়তা এক্ষেত্রে যার অন্যতম কারণ কথার আশ্চর্য কারুবদ্ধতা। কোমলেদিআ পাঠের অভিজ্ঞতাও অনুরূপ। পড়ে যাওয়া যায় সহজেই। অথচ মাঝেমাঝেই জাগে গাঢ় ও গভীর অভিজ্ঞতার দ্যুতি বিন্যাস যার পরিধি, তলহীন যার অবতরণ এবং ক্রমেই যা পাঠককে কৌতূহলী ও নিমগ্ন করে সে অভিজ্ঞতার বৃহত্তর পূর্ণতর অনুধাবনে। ভাস্তে কথিত চার রকমের পথ ছাড়াও মাত্র কিছু কাব্য সংসারেই, অবীক্ষিত হয়ও মনেও এক রকম প্রবেশ করা যায় তাঁর কাব্যের তিন মহলে, অবশ্য বাধা কিছু কিছু থাকেই এবং মহত্তম কবিতামাত্রেই থাকবেও চিরকাল। অ্যাশ ওয়েন্‌সডে-র ভাষায় দেখা দিয়েছে এক তরল মসৃণ নৈসর্গ সরলতা প্রবীণের প্রায় সমগ্র পরিণতিকে অধিকার করেই।

তরল ধ্বনিময়তার জলমসৃণ পংক্তিগুলো ঘুরে ঘুরে চলে, যেন নদী খুব বড় নয়, নয় প্রবল বিক্ষুব্ধ, খুব চেনা, খুব কাছে আমাদেরই ঘরের পাশ দিয়ে। অথচ ঘুরে এসে চলতে সুরু করলে এই মসৃণ তরলতার মধ্যে মধ্যেই ধ্বনিত ইন্দ্রিয় সীমার দুর্বল হৃদয়ের ক্রন্দন; কখনো উঠে গেছে সিঁড়ি ধাপে ধাপে, ভয়, আশঙ্কা বুঝি-বা ঘনায়মান হয়; গোধূলির ছায়া ঘনায় জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে, কখনো শোনা যায় লাভ ক্ষতি দ্বিধা সংশয় পার হয়ে যেতাম তন্দ্রাহীন আনন্দ

* Dante। পৃ ২৩

গান ; এর গভীর তলদেশ আলোড়িত করে জাগছে অলোকসম্ভব আলোর সমুজ্জ্বল বিভায় নীল ও শ্বেত অবগুণ্ঠনে আবৃত কে এক করুণাবর্ষিণী নারী। আর যজ্ঞ সেই শব্দরাশিতে যারে যারেই কখনো আবেগব্যাকুল কখনো প্রত্যয়ে স্থির সংহত সংযত সমাহিত প্রার্থনাবাণী : দেখাও পথ হতে, দেখাও মমতা যারা নির্মমতা ও মর্মকামনা পরিত্যাজ্য নিয়ে চলে অসৎ থেকে সৎ-এ, জিজ্ঞাসা ও নিবেদন যারা পারেনি আত্মসমর্পণ করতে, ছিন্ন থেকেছে বিশ্বে, যারা অস্বীকার করে গেল সেই একমাত্র বরণীয় মুখচ্ছবি, নীল পাহাড়ের মধ্যে এই শেষ মরুভূমিতে শুকনো সেই আশ্লেষের বীজ যারা ছিটিয়ে দিলে মুখ থেকে তাদের জন্ম কি প্রার্থনা করবেন না সন্ততপিনীরা। প্রার্থনা আবার ফেরেআষাঢ়ীতে :

**And even among these rocks**
**Sister, mother**
**And spirit of the river, spirit of the sea,**
**Suffer me not to be separated**

**And let my cry come unto Thee.**

অ্যাশ ওয়েন্‌স্ডে-র আগে আপন কালের ধারণায় অকাব্যোচিত বিষয়ে কাব্যবিরোধী ভঙ্গিতে যখন এলিয়ট কবিতা লিখছিলেন সেখানেও প্রেরণা ছিল যজ্ঞতারই এবং সে যজ্ঞতা বুদ্ধিগত নয়, কাব্যগতই। অ্যাশ ওয়েন্‌স্ডে-ও সেই সরলতারই সাধনা, সাধনা সেই বিলুপ্ত ঐক্যবোধ সেই প্রাচীন ও প্রবীণ প্রকাশময়তাকে কাব্যে আবার ফিরিয়ে আনবার, ভিন্নতর ভঙ্গীতে। পূর্ববর্তী কাব্যগুলিতে চোখে দেখতে পাওয়া ছবিতে ছবিতে সংযোগ সূত্রগুলি ছিন্ন-বা দূরাগত, মাঝে মাঝেই মনে হতে থাকে প্রায় বিলুপ্ত। সেখানে এক স্তরের ছবির পাশেই বিপরীত স্তরের ছবি, ছিল পরিচিত আর অপরিচিতের, সহজ ও কৃত্রিমের অদ্ভুত সংঘাত। অবশ্য তারও লক্ষ্য ছিল কবিতার পথে অনেক কালগত সংস্কার-মূলক চলার বোধটিকে আঘাত করে যথার্থ কবিত্বের দিকেই আকর্ষণের প্রয়াস। জানানো এই বোধ যে কবিতা নয় যেমনটা আমরা জেনেছি, জানতে অভ্যস্ত, অথচ সেই অপরিচিত ভাষাই আমাদের প্রাথমিকতম ভাষা, সেই ভাষাই খুঁজি সকলে যখন বলবার মত কথা জমে অথচ বলতে পারি না এবং সেই ভাষাই সহজ সরল মসৃণ, বাইরে থেকে না হোক, ভেতর থেকে নিশ্চয়ই। অ্যাশ ওয়েন্‌স্ডে-র ভাষায় সংঘাতমুখর সেই বিচ্ছিন্নতার বোধটি প্রায় অনুপস্থিত। প্রত্যেকটি দৃষ্টিগ্রাহ্য ছবিই এখানে একে অপরের সঙ্গে অত্যন্ত সংযুক্ত। একটি থেকে

আরেকটিতে যেতে যেতেই বৃদ্ধি পায় অর্থগূঢ়তা ও গভীরতা যেমন দান্তেতেও এলিঅট দেখেছেন ছবিগুলোই ঠেলে দেয় ক্রমে অর্থের দিকে এবং অর্থ জমে ওঠে ছবির থেকেই। এ ঘটনায় মনে হতে পারে যে দান্তের peculiar lucidity-র অন্যতম কারণ বে অ্যালেগোরিক্যাল পদ্ধতি সম্ভবত তারই স্মৃতিতে এলিঅট তাঁর 'অবজেকটিভ কোরিলেটিভ' তত্ত্ব গড়ে থাকবেন। এলিঅটের শিক্ষায় জানা যায় প্রভাব আছে বহু দান্তে বিশেষজ্ঞের। এঁরা পাউণ্ডের সঙ্গে দান্তের কাব্যের গঠনগত দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন দীর্ঘকাল। স্বীয় কাব্যরচনার পরিকল্পনা ও সংকল্পেও দান্তের অনুধ্যান দেখা যাচ্ছে এ পর্যন্ত প্রায় অবিচ্ছিন্ন। এই অধিগত ঐতিহ্য ও সক্রিয় প্রচেষ্টার প্রথম আংশিক প্রাথমিক পরিণতি তাঁর অ্যাশ ওয়েন্‌সডে-তে। অনুভব ও চিন্তার জ্যা-বদ্ধ সংহতিতে উজ্জ্বল কাব্যভাষার অনায়াস মসৃণ তরলতা। অ্যাশ ওয়েন্‌সডে-তে এসেই সম্ভবত এলিঅটের কবিতার পাঠক প্রথম অনুভব করলো এলিঅটের বহু-উক্ত কথার তাৎপর্য— কবিতাও হবে গদ্যেরই মত সুনির্দিষ্ট। অ্যাশ ওয়েন্‌সডে-র ভাষাব্যবহারেই যেন এলিঅট অনেকটাই দান্তের অনুবর্তী। কাকস্বচ্ছ সেই ভাষা ব্যবহারে, গুরুত্ব বিন্যাসের এক জাতীয় মৃদু আকস্মিকতায় এবং অনিবার্যতার সামগ্রিক ছকে এ কাব্যের আনন্দ বেদনায় এসেছে অধিষ্ঠ অনুভবের জীবন্ত প্রত্যক্ষতা এবং সে অনুভবের গন্তব্য নিয়ে এবারে আর নেই কোন অস্পষ্টতা বা দ্বিধাই, দান্তের কাব্যপ্রয়োগের প্রবীণতর দক্ষতায়।

ওয়েস্ট ল্যাণ্ড পর্যন্ত দান্তেকে কবি জানেন যেন দূর থেকে, ঘট ভরে নিয়ে আসেন মাঝে মাঝে। ভাবেন, মনে হয় তাঁর, অনুভবের মধ্যে চিন্তার মধ্যে, রূপের ধারণায় কোথায় যেন স্পৃষ্ট এই মহাকবির অনুভব চিন্তা ও রূপচেতনায়। এ কাব্যে চাপ আরও বেড়েছে। সমগ্র কবিতার প্যাটার্নেই তার অর্থ তার ধ্বনি তার চিন্তা প্রবলভাবে প্রবাহিত হতে চাইছে প্রায় দান্তের সমান্তরালে। এ কবিতার জন্য খৃষ্টধর্ম বা দান্তে জানতেই হবে এমন নয়, কিন্তু কবিতা যতই পড়া যাবে, অ্যাশ ওয়েন্‌সডে-তে কবিতা থেকেই জাগবে তা জানবার জন্য একটা ব্যাকুলতা। মনে হবে কেবলই, যদি জানা থাকতো তাহলেই সম্ভবত খুলতো সব পাপড়িগুলো একে একে। কবিকেও তো আসতে হয়েছে তার প্রথম আলোড়িত অনুভব থেকেই সে উপলব্ধির অর্থ সন্ধানে ঐতিহ্যে, ক্যাথলিকতায়, দান্তেতে।

একদিন প্রভাতে, রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, তখন সমস্ত পৃথী নিদ্রিত, জনহীন

পথ, চিরহরিৎ এসেছিল অকালবরণ পারিজাত হাতে ; তারপর, একা সে, চলে গেল তার সোনার রথে। অ্যাশ ওয়েনস্ডে-র চতুর্থ কবিতায় উত্তানশেফতার পশ্চাৎবর্তী রাশিরাশি ভায়োলেটের মধ্য দিয়ে যেত এবং নীলে অবগুণ্ঠিতা নীরব ও বিন্ন নারীর হেঁটে যাওয়ার ছবিটি অনেকটা সেই রকম হরিতের বনবীথিতে চিরহরিতের আবির্ভাব কাহিনী। তার চলায় জেগে ওঠে বরণডালি, রুক্ষ প্রস্তরে নামে শীতলতা। বাঁশিতে ওঠে সুর। সে আছে তন্দ্রা ও জাগরণের মধ্যে, আছে ঘরেও নয়ে পারেও নয়ে জেগে ওঠে সেই মানুষ। সময়কে মুক্তি দিতে, স্বরকে খেলাতে জাগরণে ডেকে ওঠে পাখি এবং আবার সব মিলিয়ে যায়। ঘিরে থাকে নির্বাসন। পুরগাতোরিও [২৮ : ১৪৭] থেকে ছোট বাক্যাংশটি Foveguna vos ব্যবহারে এ কবিতার অলৌকিক স্বর্গছবি এবং সব ছুড়ে বিন্ন আবছায়া বেদনারত যাটি এক বিশেষ অভিপ্রেত লক্ষ্যে যাত্রা করে। সে যাত্রার চোখে পড়বে এ কবিতার প্রায় পরিপূর্ণ স্বর্গীয়তার মর্মে ধ্বনিতে সুখ হয়ে আছে পুরগাতোরিও-র শেষ পংক্তিগুলির বিশেষত আটাশ ঊনত্রিশ ও ত্রিশের পবিত্র অরণ্যনিঝুমের অপ্রারব্ধ জলহাওয়া মাটি এবং প্রথম বিন্ন বেদনা। সাতাশ স্বর্গের উপসংহারে যাকে কিরীটশোভিত করে চলে গেলেন ভার্জিল। বলে গেলেন আর এখন আশা করো না আমাকে। অপলক অপূর্ণতা এখন তুমি পুণ্যবান স্বর্গযাত্রী। এরই পরে আটাশ স্বর্গে পুণ্যবনভূমির দৃশ্যে দান্তের অবতরণ। নদীর ঢেউয়ে ঢেউয়ে সেখানে ঘাস দুলে পড়ে। সে জলের চিরছায়ায় কোনদিন জাগেনি জ্যোৎস্না বা রৌদ্র। ফুলে ভরে আছে ডাল। নদীর ধার বেয়ে আসে মাতেল্দা, ফুল তুলতে তুলতে, পথ কুসুমে আকীর্ণ। তিরিশ স্বর্গের আরম্ভেও ফুল, ফুল রাশিরাশি, যেন ফুলের মেঘের মধ্য দিয়ে, কুয়াশায় আচ্ছন্ন সূর্য, অন্ধকার আকাশে প্রথম উষার আলো আবির্ভূত বেআব্রিচে। সে স্বরূপম আবির্ভাবে দোলা লাগে রক্তে, অমনি সে আনন্দ যন্ত্রণায় দ্বিরভিন্ন দান্তের হৃদয় খোঁজে মায়ের কোল, চিরপরিচিত আশ্রয়, ভার্জিল। কিন্তু ভার্জিল চলে গেছেন বহুক্ষণ। তখন সব গেছে। এ যাত্রায় সব চেনামুখ ফেলে আসতে হয়েছে পেছনে। দীর্ঘ প্রার্থিত আবির্ভাবের আনন্দে তখন ভরপুর নির্বাসনের বেদনা। এলিঅটের কবিতাটিতেও স্বর্গছবির শেষ পংক্তি And after this our exile. এখনো তো স্বর্গ ছুঁয়ে, এখনো সে আসে চকিতে, অমিতার আত্মবিস্মৃত উল্লাসে মাত্র, পিছু টান থাকেই যেমন আছে ষষ্ঠ কবিতাটিতে :

(Bless me father) though I do not wish to wish these things
From the wide window towards the granite shore
The white sails still fly seaward, seaward flying
Unbroken wings

প্রার্থনার সংকল্পে স্থির হয়েও নামে যে আনন্দ বাসরে, 'শুধু লাইলাকে আর শুধু সমুদ্রের কণ্ঠস্বরে'। বেদনার বিষণ্ণতা থাকে নীরব ভঙ্গিমীরও (silent aisle।) মুখে। সেক্ষেত্রেও কবিতার eternal dolour বাক্যাংশে পূর্বোক্ত দান্তের হত্রেই মনে পড়বে নরকদ্বারে উৎকীর্ণ বাণীর সেই eterno dolore [ইন্‌ফের্নো ৩ : ৩] এবং sovegna vos বাক্যাংশটিও শেষ হয়েছে dolor-এই —sovegna vos a temps de ma dolor. (অবধান কোরো, কাল পূর্ণ হলে, আমার বেদনা)— পুরগাতোরিও ২৩ : ১৪৩। এবং ক্রমে মনে হতে থাকে দান্তের কাব্যাংশের এই বিচিত্র সূত্র বহুদীপ্তির পরিগ্রহণে এলিঅটের অন্তরঙ্গ আনন্দ বেদনার উদ্বেলতা চেতনে অবচেতনে, যেন তার অর্থ সন্ধানে এখন নিয়তই অনুপ্রবিষ্ট রয়েছেন। পুরগাতোরিও-র তিরিশ সর্গ প্রসঙ্গে এলিঅট লিখেছিলেন যে ডিটা হৃওডা না পড়া থাকলে এ সর্গটি সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। কিন্তু এটুকু অন্তত প্রথম পাঠেই বোঝা যায় যে দান্তে এই সর্গে একটি প্রাচীন আবেগের পুনর্জাগরণকে নূতন ভাবানুষঙ্গে নূতন পরিবণ্ডলে বর্ণনা করেছেন এবং তার ফলে সেটি বৃহত্তর তাৎপর্য লাভ করেছে।[৭] এলিঅটের কবিতাটিতেও দান্তের আলো পড়ে না কিরিয়া বা ওয়েস্ট লাভের প্রথম কবিতায় ধ্বনিত এমটি প্রাচীন অনুভব যেন এবারে তার বৃহত্তর তাৎপর্যের সম্মুখীন হচ্ছে, একজন কবির মতই। অনুভব করছে এ শুধুই নয় আর ছেলেটি বা মেয়েটির প্রেমের অনুভূত তীব্রতম সুখ বা দুঃখ। পুরগাতোরিও-র ধ্বনিষ্ঠ সংযোগে এবারের ছবিতে এলো পরিচিত প্রাথমিকতার প্রবীণতর স্তর। এখানে পরবর্তী দান্তে প্রসঙ্গে এলিঅট কথিত সেই beatitude, blessedness-এর দিকে যা তিনিই জানিয়ে গেছেন আধুনিক কালের cheerfulness-এর চেতনা থেকে বহু দূরবর্তী। এবং এ নিহিতার্থ সন্ধান শুধু নয় আকস্মিক চতুর্থ কবিতাতেই, সর্বত্রই। তৃতীয় কবিতার সিঁড়িতে তাই জাগে সম্পূর্ণ পুরগাতোরিও পর্বতের ভিন্ন ভাগের আভাস, কিংবা সেই সপ্তম ধাপে আরোহণের সূত্র, সাতাশ সর্গে। পুরগাতোরিও পাহাড়ের পশ্চিম প্রত্যন্তে আছে কল্যাণ ও করুণার নিরিখ। আগুনের মধ্য

৭ Dante। পৃ ১৩৭

দিয়ে সেখানে পৌঁছে সারারাত্রি কাটিয়ে সিঁড়ির বাঁশে, উষার আলোকে সপ্তম ধাপে উঠে তবে ধাপে দেখতে পেয়েছেন, তা-ও পাখির স্বর্গের ছবি, তখনো পারাদিজো-র প্রস্তুতি, ভূমিকা। পত্রিকায় প্রকাশ কালে এ তৃতীয় কবিতাটির নাম ছিল som de escalina (আরোহণের চূড়ায়), ছাব্বিশ সর্গে আর্নেত হানিএলের কথার অংশ। হানিএল বলেছিলেন দান্তেকে বিদায় দেবার সময়, যখন থামবে এসে আরোহণের সেই চূড়ায়, মনে কোরো কাল পূর্ণ হলে, আমার বেদনা। এ বহন ছাড়া যে পথ নেই পারাদিজো-তে। পথ সেছে অন্তহীন যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে, শুদ্ধির অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে। এলিয়টের সিঁড়িটিও এসবের পরে আর মনে হয় না ঘোরানো একটি সিঁড়ি মাত্র, অদ্ভুত আত্মিক। এখানেও প্রায় নিজের মত করে ভাববার চেষ্টা সেই আত্মশুদ্ধির যন্ত্রণার ধাপগুলি যেন স্পষ্ট পরিকল্পনায়। প্রথম বাঁকের নীচে the same face-এ মুক্তি-না আত্মকেন্দ্রিকতার আভাস, দ্বিতীয় বাঁকে পার হওয়া আত্মবিস্মৃতির ভয়াবহ অন্ধকার :

**There were no more faces and the stair was dark,**
**Damp, jagged, like an old man's mouth drivelling, beyond repair,**

তৃতীয় বাঁকে ফিরে হঠাৎ চোখে এসে লাগে যেন দূর স্বর্গের নক্ষত্রদীপ্তি এবং তা মিলিয়ে যায়। দ্বিতীয় কবিতায় তিনটি শাদা চিতা যখন খেয়ে ফেলছে সমস্ত শরীরটাই এবং তারপর শোনা যাচ্ছে শুভ্র অগ্নিরাশির আনন্দগান, স্মৃতিতে জাগে ইন্‌ফেরনোর তিনটি ব্যভিচারের পশু, এলিয়ট ভাবছেন দেহ-চেতনার অহংকার বিসর্জনের ছবি। যার কবিতায় এসেছে অনুবাদ পংক্তি :

**Our peace in His will**
**Is sua voluntate e nostra pace**

—দান্তের সেই প্রার্থনার অনুবাদ। সারা অ্যাশ ওয়েন্‌সডে জুড়ে ক্রমেই কবিতাগুলির ধ্বনি পৌঁছচ্ছে নিবিড় অভিপ্রেত গন্তব্যে। দেখা দিচ্ছে বেদনা বৈরাগ্য ও প্রশান্তির ঐকান্তিকতার ওপারান্তরের আভাসে মনুষ্যত্বের পুরুষার্থ সন্ধান দৃঢ়তর বন্ধনে। দেখতে চেয়েছেন স্বভাবকে সত্যভাষায় পটে রেখে, এলিয়টে স্পষ্টতই অধিষ্ঠে এখন বলা যায় কেন্দ্রস্থ অস্তিত্বের ইঙ্গিতাভাস। একদিন হয়তো নিছক রূপের চেতনাই এনেছিল কবিতার জগতে, কিন্তু ক্রমেই অনুভূত যে কবিতার সমস্যা নয় শুধু রূপ, রূপেরই সঙ্গতিতে, রূপের সঙ্গতির সমস্যা তত্ত্বতাৎপর্যে। কবিতার সন্ধান যেন-বা প্রায় এখন বলতে পারেন

এলিয়টও এক সত্য; কবিতার অন্বিষ্ট সত্য রূপ নয়, স্বরূপ। পরিণতির শিখরে পৌঁছে যেসব প্রবেশে রবীন্দ্রনাথকে লিখতে হয়েছিল কবিতার যাত্রা শেষ পর্যন্ত চোখে দেখা এ বিশ্বের গভীর সুদূর রূপের অমৃত অন্তঃপুরে :

দেখা আমি পিতামহী পড়ে বিশ্ব-পাঁচালির ছড়া
ইঙ্গিতের অনুপ্রাসে সাজা—
কেবল ধ্বনির যাদে একস্বপ্নে ভোলাব ভুলায়ে
মনেরে ভুলায়ে
নিয়ে যায় অস্তিত্বের ইন্দ্রজাল সেই কেন্দ্রতলে
বোধের প্রত্যূষে যেথা বুদ্ধির প্রদীপ নাহি জ্বলে।

রূপ-অরূপের দ্বন্দ্ব পার হয়ে তাঁর কবিতার যাত্রা থেমেছিল এসে রূপনারায়ণের পারে শান্তি সমুদ্রের অভিমুখে, জীবনমৃত্যুর পরিকীর্ণ ছলনা পার হয়ে স্নান করেছিল অক্ষয় সত্যের জ্যোতির্ময় দীপ্তিতে। অবশ্য সংশয় তবুও থাকেই, বিশেষত এলিয়টে। এলিয়ট প্রায় সারাজীবনই নানাপ্রসঙ্গে নানা-ভাবে বলে এসেছেন যে কবিতার আলোচনায় আমাদের প্রধান বিবেচনাই হবে যে এটি কবিতা, অন্য কিছু নয়। কবিতাকে ধর্ম, শাস্ত্রজ্ঞান বা দর্শনের বিকল্পরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে না।[৮] বলেছেন যে মহত্তম কবিতামাত্রেই যে জীবনদর্শনের অনুভূতি সঞ্চার করে, তা প্রাতিভাসিক।[৯] কবিতার পূর্ণতম আনন্দ উপলব্ধি ও ব্যাখ্যায় কবির বিশ্বাসের অংশীদার হবার প্রয়োজন নেই।[১০] প্রসঙ্গান্তরবর্তী এ সমস্ত কথাই সত্য এবং কাব্য ও কাব্য আলোচনার বিশুদ্ধতার জন্যই, মূলগতঅবলেপ থেকে বাঁচাতেই শেষ দিন পর্যন্ত এলিয়ট এই জাতীয় কথাই অত্যন্ত জোরালো ভাবে বলে এসেছেন। ইংরেজী কাব্য সমালোচনার প্রভাবশালী ধারাও আজ অগ্রসর এলিয়ট প্রদর্শিত এই পথেই। নিজে কাব্য আলোচনাতেও এলিয়ট তুলেছেন বারেবারেই কবিতার শিল্পগত সমস্যা, ভাষা, শব্দবিন্যাস, ধ্বনি, ইমেজ, কবিতার মানসিক গঠনের কথা। তবু কোন প্রসঙ্গে সততার কথায়, বোদলেয়রে ভ্যালেরিনের প্রসঙ্গ তুলে, লাফের ক্ষেত্রে humiliude, suffering প্রভৃতির কথায়, কবিতার গঠনের দিককে পরে পরে মনে পড়িয়ে দিয়েও তার গন্তব্যের আলোচনার সূত্রে মানবজীবন ও নীতির

৮ Shakespeare and the Stoicism of Seneca : পৃ ১৩৭
৯ Ibid : পৃ ১৩৪
১০ Dante : পৃ ২৬৯

প্রসঙ্গ তিনিও ক্রমে সম্পূর্ণ পরিহার করতে পারেননি। এবং একদিন জীবনের শেষ কাব্যগ্রন্থে কবিতারই মধ্যে চরম পরিণতির চেতনায়, শুনতে পেলেন যেন অতীতের প্রেতকণ্ঠ ফিরে এসেছে জীবন্ত বর্তমানে, বলে যাচ্ছে যেন-বা দৈববাণী, শুদ্ধির আগুনে পুড়ে কবিকে যাত্রা করতে হবে পরিবর্তমান বিশ্বের ক্ষেত্রে, অস্তিত্বের সেই ইন্দ্রজালে যেখানে স্থির বিন্দু শুদ্ধ নটরাজ সত্তায়, মেলাতে হবে তারই পদক্ষেপে কবিতার লয়, তাল, বিন্যাস, চলতে হবে সেই সত্যেরই অভিধানে :

**From wrong to wrong the exasperated spirit**
**Proceeds, unless restored by that refining fire**
**Where you must move in measure, like a dancer.**

সেই সত্যের স্বভাবের সমতায় এলিয়টের কবিতা প্রথম সরাসরি উত্তর পুরুষেই উচ্চারিত হলো অ্যাশ ওয়েন্‌সডে-তে। জীবনের পূর্ণতার মুহূর্তগুলির তাৎপর্য খোলে না বলেই বেদনা, কিন্তু বৈরাগ্যে হৃদয় বেঁধে অগ্রসর হতে হবে বাগানের দিকে যেখানে বাঁশির সুর, অনেক ফুল, উৎসমুখগুলি থেকে জল ঝরে যায় দারুদিন অবিরাম, পেরিয়ে কঠিন রুক্ষ পাহাড় এবং পাথরেও নামে স্নিগ্ধতা শীতলতা। এইসব কবিতায় স্পষ্ট অনুর্ণ পরিণত স্বীকৃতি থেকে আলো ছড়ায় ফেলে আসা কবিতায়। প্রস্রুক বা মহিলার ছবির মহিলা, গেরনশন বা সুইনী সবাই এসে বাসা বেঁধেছিল ওয়েস্ট ল্যাণ্ডের রুক্ষ পাথুরে মাটিতে এবং তারাই আবার ছায়াসহচর অ্যাশ ওয়েন্‌সডে-তেও। তাদেরই লক্ষবত দেখা গিয়েছিল সিঁড়ির প্রথম বাঁকটায় আর না ফিরিয়া বা বেরিঅল অব দি ডেড্-এর সুন্দরমহুমারীর মুহূর্তগুলোই ফিরেছে রূপান্তরিত ভাবাদ্বয়ে শুধু নয় ভাইলেটেরানির কবিতাটিরই মধ্যে, দেখা গিয়েছে সিঁড়ির তৃতীয় বাঁকে, দেখা গিয়েছে ঘুরে ঘুরেই বার বার এইখানে এখন এবং পরে আরও। হাস্তের মতই, যদিও নতুন করে নতুন ভঙ্গীতে কিন্তু সমূল পরিকল্পনারই মূলের জীবনসত্যের মুখোমুখি হবার ইতিহাসই ক্রমে জমে উঠলো এলিয়টের কাব্যে। দেখা গেল একটি কাব্য নয়, কয়েকটি কাব্যের মালায় পরিণতিতে আসছে সেই চিন্তা সেই লক্ষ্যের উদ্ভাস যা দেখা গেছে মহাকবিদেরই। এ পর্যন্ত এলিয়টের মহাকাব্য ভাবা যেতে পারে তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির সমবেত যোগফল। আর সেই সমস্ত কাব্যেরই মধ্যে এলিয়টের হাত ধরে আছেন দান্তে। দান্তেই পথ দেখাচ্ছেন, দেখাচ্ছেন সাতশো বছর আগের সেই ইন্দ্রজালের একালে অবতীর্ণ ওয়েস্ট

ল্যাণ্ডে, দেখাচ্ছেন কবি যিনি, যিনি সচেতন, সংবন্ধ যাঁর বৈরাগ্য নিরাসক্তি তাঁর জীবনে প্রার্থনার পুরগাতোরিও আসে এই বিশ্বেই উৎসব বেদনায় বরণ করে তাই এবং সে তীর্থযাত্রায় কখনো কখনো জলে ওঠে স্বর্গীয় নক্ষত্র অমনি দীপ্ত শান্ত কিন্তু দূরত্ব, কখনো-বা জলে বৈশব স্মৃতিরই আলোকিত মুহূর্তে, কখনো-বা যেমন পুরগাতোরিও-র শেষে পার্থিব স্বর্গে মাতেলদা বা বেজাজিতে নদীর ধারে, এখানেও আপ ওয়েন্‌দরে-তে :

The silent sister veiled in white and blue
Between the yews, behind the garden god,
Whose flute is breathless, bent her head and signed but
spoke no word
But the fountain sprang up and the bird sang down
Redeem the time, redeem the dream
The token of the word unheard, unspoken...

জীবনের শেষ কাব্য কোয়ার্টেট্‌স-এ (১৯৪৩) এসে অবসান এতকালের সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার, দেখা দিল অপেক্ষিত স্বকীয়তা। ওয়েস্ট ল্যাণ্ডে গদ্য কবিতা নাটক গান সব মিলিয়ে একটা ঐক্য থাকে নিশ্চয়ই তবু কোয়ার্টেট্‌স-এর পাশে সে ঐক্য কিছু-বা যেন বিশ্লিষ্ট। কবিতার মাঝেমাঝেই নিত্যদিনের টুকরো ছবির ঘুনসে ছন্দে কথা বলার রীতির ঝোঁকে দীর্ঘকালের গীতময়তার সংস্কারের প্রতিবাদে ওয়েস্ট ল্যাণ্ড পর্যন্ত কবিতা যেন আরেক সীমান্তে, দীর্ঘকালের অকাব্যোচিতকে বারেবারেই কাব্যে প্রতিষ্ঠা দিয়ে পূর্বস্মৃতি তোলবার দুর্বল প্রয়াসের সিদ্ধিতে প্রায় সমবায় শিল্প, নাটক। ক্যাথিদি রিযুনিঅন থেকে এলভার স্টেট্‌সম্যান পর্যন্ত কাব্যনাটকগুলিতেও এলিঅটের সমস্যা কবিতা থেকেই নাটক, কখনোই যেমন এতকাল হয়ে এসেছে বা হতে চায় নাটককে ঘিরেই করে কবিতা, তা নয়। কবিতার মধ্যেই, কবিতাতেই কথা বলছে সাধারণ নিত্যদিন এবং যার ছুঁয়া সম্ভবত ককটেল পার্টি, দৈনন্দিনের, গদ্য ও কবিতার ভেদরেখা যেখানে প্রায় লুপ্ত, কথা বলছে সাধারণ মানুষই, সাধারণ কথাই, অথচ তা-ও আশ্চর্য কবিতা। কিন্তু অ্যাশ ওয়েন্‌সডে থেকে ক্রমেই প্রাধান্য পেলো সুরময়তা। কোর কোয়ার্টেট্‌স-এ কবিতা অনেকটাই যেন পূর্বস্মৃতিতে। এখানে কবিতা ও সংগীত একত্র, সংগীত থেকেই যেন কবিতা। আশ্চর্য নয়, কারণ এই রকমই সাধারণত ঘটেছে এলিঅটে, মাত্র এক বছর আগে প্রকাশিত প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন যে অপেরা হাউসের চেয়ে একটি কবিতার

বীজ অনেক তাড়াতাড়ি অঙ্কুরিত হবার সম্ভাবনা রাখে কনসার্ট রূপে।[১১] জোব কোয়ার্টেট্স-এর কবিতার পেছনেও অনুভূত কোয়ার্টেট, সিম্ফনি বা সোনাটার প্রেরণা। এ কাব্যের পরিধির মধ্যেও আছে সবই, গল্প নাটক বিতর্ক বিস্তৃত সংগীতও বা, কিন্তু চলতে চলতে সবকিছুই রূপান্তরিত কবিতায়, সবকিছু এসে মেশে এক সুরের সমমে। একালের ভাষায় এই সম্ভবত বিশুদ্ধ কবিতার একটি সীমা যার প্রাপময় সংহতির চেহারা শব্দের বিন্যাসে মূর্ত করা প্রায় অসাধ্য এবং শব্দসঙ্গের সীমারেখাও এ কাব্যে অবশ্য পর্বে পর্বেই বিশেষত কবিতাগুলির দ্বিতীয় বা তৃতীয় চালে ককটেল পার্টির আগে,আরেক রকম ভাবে প্রায় নিষ্কিয়। এ কাব্যে একই ক্ষণে একই সময়ে যেন চলে বিতর্ক ও গান, চিন্তা ও অনুভব। এর ভাষা একই সময়ে সংহত অথচ বিলম্ব। ওয়েস্ট ল্যাণ্ডের তুলনায় এখানে পর্ব থেকে পর্বে ভাঙনের চূর্ণরেখা অনেকটাই মিলিয়ে গেছে। আবার অ্যাশ ওয়েন্সডে-র তুলনায় এর অধিকার বহু স্তর ছুঁয়ে। জোব কোয়ার্টেট্স-এর সমগ্রতায় বোধ হয় এলো সেই মানসিক সংপ্রক্তার প্রত্যক্ষ ও পূর্ণ প্রতিফলন, যে অসামান্য যৌলিক সমাহৃত অনুভবে মেশে একই সময়ে স্পিনোজা পড়া, টাইপরাইটারের শব্দ, বা রান্নার গন্ধ এবং কবি ভালবাসছেন একটি মেয়েকে।[১২] নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট মিলে রূপকের পরিমণ্ডলে যেমন প্রত্যক্ষ, এখানে প্রতিটি স্বতন্ত্র কবিতা, আবার চারটি কবিতাই এক এবং মিলিয়েও ঐক্য— যেখানে প্রণয় বিশেষভাবেই সময়, এবং যে সময়ের পরিমাপ আত্মিক, কেন্দ্রের প্রতীক যার পরিবর্তমান বিশ্বে ছুঁয়ে ওঠা একটি বিন্দু কিন্তু অথচ নৃত্যময়।

এই প্রণয় ও প্রতীকের রূপকল্প ছুঁয়ে সন্ধ্যার আদিঅন্তব্যাপী দেবালয় গম্ভীরার নিঃসঙ্গ অন্ধকারে জোব কোয়ার্টেট্স-এর অবতরণ। হারিয়ে গেছে যৌবনের সেই চমক প্রতি কথাতেই, চাপা হাসির ভঙ্গী সুরের নিরাসক্তিতে, পাতাল ছুঁয়ে ছড়িয়ে পড়া অন্ধকারের মধ্যে চিন্তার বিমূঢ়তা, কবির ভূমিকা পরিবর্তিত। এখন কবিকণ্ঠ গম্ভীর মন্দ্র, পরিচিত কলকণ্ঠ কিচিমিচির থেকে অনেক দূরে, এক সমুদ্রের যৌনের নিকটবর্তী। সন্ধ্যা পেরিয়ে এ আরেক আত্যন্তিকাল অন্ধকারে নৈঃশব্দে যৌনতায়, যৌনতার সমীপবর্তী বাঙ্ময়তায়। পরিচিতের রেখা ছুঁয়েছিল অ্যাশ ওয়েন্সডে-তেই। ফিরেছিল

১১ The Music of Poetry ( ১৯৪২)

১২ The Metaphysical Poets : পৃ ৮৮৭

এলিয়েন কবিতাবলীতে, ছিল মিউ ব্রাশপাহার প্রভৃতি নিসর্গসূত্রের কবিতায়, রূপান্তরিত এবং নগর প্রায় নেইই। কোর কোয়ার্টেট্স-এ ট্রেন বা জাহাজের যাত্রী, লণ্ডনের উপকণ্ঠে ভাষাক্রান্ত মানুষ, বিজ্ঞানের আবিষ্কার, হাত ধোয়া কোর্টবিচার এ সবের উল্লেখে নগর আসে এবং নিসর্গও এবং নিসর্গই তুলনায় প্রধান, প্রতিটি কবিতারই অন্তত ঐক্যসূত্র এখানে স্থানদৃশ্য প্রায় পাহাড় গিরি, কিন্তু রূপান্তরিত যেন আরেক সত্তায়। আছে সবই, দেখা যায়, দেখা যায় যেন খেয়ার ঘাটে বসে সন্ধ্যায় বাতি না জ্বলা অন্ধকারে বিন্দুর এবং নিমূঢ়, যখন বাসছে darkness of God. সরাসরি মানসিক ও আত্মিক কোর কোয়ার্টেট্স-এর এ জগৎ তুলনায় প্রায় অপরিচিততম। বিশেষত সমস্ত বিশ্বাসবিচ্যুত সমস্ত মূল্য বিচূর্ণ যেকালে নিরন্তর অবিশ্বাসে, ভয়ে, অপ্রেমে মানুষ কেবলই এড়িয়ে চলে সেই অন্তত্তর অন্ধকার, সেখানে কোর কোয়ার্টেট্স-এর এ অন্ধকার ছুঁয়ে ঠেলে অনেককেই। কোর কোয়ার্টেট্স-এ কবিতার প্রতীকা সেই রিক্ত ঠাণ্ডা গভীর অন্ধকারে আত্মসমর্পণের এবং সেই অন্ধকার আলো হবে। এইখানে প্রবাহিত চিরকাল অতীত ভবিষ্যৎ বর্তমান এবং এইখানেই নিত্য শাশ্বত। অগ্রসরতা নয় এইখানে কথা অন্তত্তর স্তরে।

চারটি কবিতাই জলের মত ঘুরে ঘুরে কথা বলে সমর্পণের সময়ের প্রবাহে, পরিবর্তন যেখানে নিরবচ্ছিন্ন এবং শিল্পীর পক্ষে শিল্পেরই সঙ্গে একসময় অনুকূল অনিবার্যতার সময় পেরিয়ে আসা অস্থির শুভ্র আলোকে এবং সেইখানেই সমস্ত মূর্তী, নৃত্য। ঘড়ঘট ঘটনে জলে ওঠে তাই কখন কখনই গোলাপবাগানের না-খোলা বন্ধ দরজার, অকস্মাৎ পূর্ণ হয়ে ওঠা শূন্য দীঘির, পাতার আড়ালে ছেলেরা, পাখির ডাকের দীপ্ত মুহূর্তগুলি। কারণ এইখানেই পুরাতন থেকে নূতনের একান্ত সংহতিতে, এইখানে ঘূর্ণমান বিশ্বের স্থির কেন্দ্রে শিকার শিকারীর সম্পর্ক সমাহৃত নক্ষত্র শান্তিতে। গান ছবি সব দুর্গবিদ্যুতের পার হয়, হয়তো ভাঙেও পারে না আর। চৈনিক কলস পার হলো সময় আবর্তিত চিরকাল স্তব্ধতায় এবং এইবার দরজাগুলি খুলে গেল গোলাপবাগানে। ইস্ট কোকারে অভিনয়মঞ্চের দিকে আগত দর্শকের সামনে আলোকপূর্ণ অন্ধকারের সমাজরালে জেগেছে সত্তার নিঃসঙ্গ তিমিরে আলো জ্বলবার প্রতীক্ষা যেমন আছে বাউল সেই জলের দশটি সিঁড়ির প্রতীকে। আমাদের বিশ্বব্যাপ্ত অসুখে, এ পৃথিবী হাসপাতাল, ছেঁড়ে হওয়া নক্ষত্রপতির উত্তরাধিকার। অন্তহীন হীনতার মধ্যে জলের এ আলোকিত অভিজ্ঞান থেকে ঘুরে চলেছিল

দুটি বছরের ক্লান্ত সাধনা তাঁদের, প্রকাশের। পরিণামী বার্তাতো এবারের তীর্থযাত্রা অন্ধকারে, প্রতীক্ষা আত্মসমর্পণের : I said to my soul, be still, and wait without hope. আর সেইখানেই So the darkness shall be the light, and the stillness the dancing. কাল ও কালাতীতের উপেক্ষিত সেই বিরল অথচ একমাত্র গন্তব্যের মন্ত্রই উচ্চারিত ছাই তাদতেভ্ স-এ, অবিরাম ধ্বনিত যেন angelus মুহূর্তগুলি থেকে গর্জমান, তবু প্রশান্ত। সে লক্ষ্য হয়তো পূর্ণ হবে না এখানে, ইতিমধ্যে উদাস নিরাসক্তিতে চলতে হবে মানুষকে জন্ম আর মৃত্যুর অশৌচাতায় যেমন বলেছিলেন কৃষ্ণ অর্জুনকে কিংবা হেরাক্লাইটাস, আরোহণে অবরোহণে পথ নয় ভিন্ন, আমাদের অধিকার মাত্র prayer, observance, discipline, thought and action-এ। তখন হয়তো বলা দিতেও পারে The hint half guessed, the gift half understood, is Incarnation. লিট্‌ল গিডিং-এর আরম্ভ শিশির কথায়। তারপর এল্লার রেড রাত্রির ভোরে অতীতের অন্ধকার থেকে চেনা অচেনায় ধ্বনিত শিল্পযাত্রার গন্তব্য আপ্তি থেকে আপ্তি পেরিয়ে এক অনিন্দ্য ঘটনাকে সন্ধায়। সে কথা দিয়ে মেলে সেই দুঃখরাতের রাজার কাহিনীতে রয়ালিস্টদের পরাজয়ে মৃত্যুতে সম্পূর্ণ একটি প্রতীক ; সময় পূর্ণতার ইতিহাস। তাই আগে হীন স্বীকৃতি অতএব যাত্রার শেষ সেই সূত্রতে, তাকেই জানতে পারা যথার্থ করে সেই বিন্দু উদ্ভাসিত ক্ষেত্র যেমন এখন এবং ইংলতে এই দেবালয়ে আলো পড়েছে শীতের বিকেলে :

We shall not cease from exploration
And the end of all our exploring
Will be to arrive where we started
And know the place for the first time.

চক্রে চক্রে ঘুরে সর্বদা মুহূর্তায় ক্রমে সমাহৃত মহত্তার ঐক্যে সমর্পণ, শিল্প সময় এবং সময়ই প্রধানত এ কবিতাবলীর গন্তব্য ও ক্ষেত্র। সময়কে দেখা যেমন দেখেন প্রজ্ঞাবান, দেখেন মরমী সাধক এবং দেখি আমরাও। এখানে এলিয়টের ভাবনার অনুষঙ্গে বারেবারেই তাই আসেন হেরাক্লাইটাস, সেন্ট জন এবং শ্রীমদ্ভাগবত গীতা, দান্তের কথা তাদের পাশে বিরলতর।

বর্ন্‌ট নর্টনে :

Words strain,
Crack and sometimes break, under the burden,

Under the tension, slip, slide, perish,
Decay with imprecision, will not stay in place,
Will not stay still.

অংশের সাদৃশ্যে মনে পড়তে পারে দান্তের—

How weak are words, and how unfit to frame
My concept— which lags after what was shown
So far, 'twould flatter it to call it lame!

—প্যারাডিসো ৩৩ · ১২১-২৩

অবাঙ্‌মনসগোচরের প্রকাশে শব্দের অন্তর্হীন পঙ্গুতার ভাবটি কোটাতে সামান্য একটু ছবি ব্যবহার করেছেন দান্তে ঐ lame পদে। এলিঅটেও প্রসঙ্গ অনুরূপ। শব্দের উল্লেখ করেননি এলিঅট। কিন্তু crack, break প্রভৃতি ক্রিয়াপদে সদৃশ ছবিই ফুটেছে এবং তাদের বিন্যাস পারম্পর্যে ধীরে ধীরে মূর্ত হয়ে ওঠে সমগ্র যাত্রাটির ক্রমবর্ধমান দুর্গমতা, দুস্তরতা। দান্তেরই অনুসরণ চলতো এখানে, তবু এ এলিঅটেরও নিজস্ব ছবি, ক্রিয়াপদগুলির ব্যবহারে ও মূল কবিতায় তাদের বিন্যাস স্থান নির্বাচনে, নিজেরই বিশিষ্ট রীতিতে। কিংবা এ কবিতার দ্বিতীয়াংশে At the still point of the turning world অংশটিতে সম্ভাবনাময় উৎসমুখের অন্যতম মনে হতে পারে কোমেদিআ-র শেষে:

Yet, as a wheel moves smoothly, free from jars,
My will, and my desire were turned by love,
The love that moves the sun and the other stars.

পূর্ববর্তী পংক্তিগুলির পরিমণ্ডলে দান্তের সমগ্র কাব্যের স্মৃতি যুক্ত হয়ে এ তিনটি পংক্তিতে যে বিরাট আকাশ জেগে ওঠে সে বিশালতা আশাই করা যায় না এবং সেইও বর্ন্‌ট নর্টনের উক্ত অংশে। কিন্তু still pointএর সমগ্র অংশটিতে মেত্রির সময়ে জটিল অথচ অনায়াস যে স্বরবিন্যাস মনে এসে স্পর্শ করে প্রায় এলবাষীর আষাঢ়ী, মিলিয়ে যায় তৃতীয়ে, চতুর্থে, নব রূপান্তরে আবার যেন কথা বলে পঞ্চমে— এ পদ্ধতি এলিঅটেরই নিজস্ব। অন্তত এ বিস্তারে লঘুতা ও পুনরাবৃত্তির ঋজুতা উত্তীর্ণ হওয়ার কীর্তিটুকু এলিঅটেরই একীয়তার প্রসাদ। দান্তে এখানে মনে পড়লেও সেইই প্রায়। যা বলা যায় ইস্ট কোকারে দ্বিতীয় অংশে যেখানে সময়ের দ্বিত জ্ঞানের সীমাবদ্ধতায় চলে যে জীবন তার রূপ সৃষ্টিতে অরণ্য ছবিটি:

In the middle, not only in the middle of the way
But all the way, in a dark wood, in a bramble.

On the edge of a grimpen, where is no secure foothold.
And menaced by monsters, fancy lights,
Risking enchantment.

মনে পড়িয়ে দেবে অনেককেই দান্তের সেই জীবনের মধ্যদিনে অন্ধকার অরণ্যে পথ হারানো, সেই সিংহ চিতা আর স্ত্রী-নেকড়ের ভয়। দান্তের প্রায় বাট পংক্তির সেই বিরাট ক্যানভাস এখানে কয়েকটি রেখায়। ইন্‌ফের্নো-তে এ অনেকটাই মূলগত, এলিয়টের ছবি রূপান্তরিত প্রায় সঙ্গীতে। দান্তেরই প্রেরণা, তবু এলিয়ট বলেছেন অনেক সহজে যেন-বা নিজেরই কথা, নিজেরই কণ্ঠস্বরে। ফোর কোয়ার্টেট্‌স-এ যখনই মনে পড়বে দান্তে, সর্বত্রই প্রায় একই অভিজ্ঞতা, সব অধিকার করে জেগে আছেন এলিয়ট। যেমন এসব অংশের তুলনায় লিট্‌ল গিডিং-এ দান্তের কাব্যাংশের স্মৃতি সবচেয়ে উজ্জ্বল তার দ্বিতীয় চালে Compound Ghost-এর অংশে দান্তের রচনা মনে পড়বে পরিস্থিতি পট ও প্রসঙ্গ কল্পনায়, উপমাবিন্যাসে, ছন্দে বিচিত্র সূত্রেই। মনে পড়বে ব্রুনেতো লাতিনির কাহিনী [ ইন্‌ফের্নো : ১৫ ]। সে কাহিনীতে দান্তের দিকে ছায়াশরীরেরা তাকিয়ে আছে :

And knitting up their brows they squinted at me
Like an old tailor at the needle's eye.

এলিয়ট সেক্ষেত্রে লিখেছেন :

And as I fixed upon the downturned face
That pointed scrutiny with which we challenge
The first-met stranger in the waning dusk

লাতিনির চেহারার কথায় দান্তে লিখেছেন :scorched face'''shrivelled skin'''features scarred. এলিয়ট লিখেছেন brown baked features. বক্তার পরিচয় দুজনেই দিয়েছেন master শব্দে এবং বক্তব্য প্রসঙ্গে কাব্যরচনার কথাও থাকে উভয়তই। এ ছাড়া এলিয়টে Ghost যখন বলছে To set a crown upon your lifetime's effort, মনে পড়বে পুরগাতোরিও-তে ভার্জিলের বক্তব্য : Whence o'er thyself I mitre thee and crown [ ২৭ : ১৪২ ]. From wrong to wrong অংশটির লক্ষ্য যে সুদূর উজ্জ্বল নিত্য অস্থিরতার দিব্য কেন্দ্র তার সৃষ্টিতে এবং পাঠকের চেতনায় Ghost-এর বিদায় সূত্রের মৃদু অস্পষ্ট বেদনার অনুভবে মনে পড়বে পুরগাতোরিও-র ছাব্বিশ সর্গের আর্নেত দানিয়েলের শেষ কথাগুলির

ধ্বনি। এবং যদিও অন্ত্যানুপ্রাস বর্জিত তবু এ অংশের ছন্দেও আসে দান্তের টেরজা রিমার অভিনব সাদৃশ্য। অথচ এতদূর এবং এত বিচিত্র সমান্তরালের পরেও কাব্যপাঠকালীন অভিজ্ঞতায় থাকে এই উপলব্ধিই যে এলিঅট যা লিখেছেন, লিখছেন তাঁরই মত এবং কথাগুলিও তাঁরই নিজস্ব, অনুকরণ নয়, অনুসরণ নয়, অধিকার। তাঁরই উপমা, তাঁরই ছন্দ, তাঁরই বিশেষ বক্তব্য এসব, দান্তে উপলক্ষ মাত্র। পারাদিজো-র শেষ সর্গে ঈশ্বর দর্শনের মুহূর্তটির অভিজ্ঞতায় দান্তে দেখেছেন আলোর কেন্দ্রে প্রেমে সংবৃত একত্ব বিস্তৃত বিশ্বরূপ একটি শিখার ছবি। অংশটি এলিঅট নিজেই অনুবাদ করেন :

**Within its depths I saw ingathered, bound by love in one mass, the scattered leaves of the universe : substance and accidents and their relations, as though together fused, so that what I speak of is one simple flame...** [ ৩৩ : ৮৫-৯০ ]

আর লিট্‌ল গিডিং-এর উপসংহারে লেখেন :

**All manner of thing shall be well**
**When the tongues of flame are in-folded**
**Into the crowned knot of fire**
**And the fire and rose are one.**

পাশাপাশি পংক্তিগুলোর দিকে তাকালে মনে হবে দান্তেরই simple flame এলিঅটে fire ; substance, and accidents and their relations দান্তেতেই হয়ে উঠেছিল scattered leaves, এলিঅটে rose ; দান্তের Ingathered, fused এলিঅটে are one. দান্তেতে যা ছিল বিশদ, এলিঅটে তারই ছায়া, সংবৃত, সংক্ষিপ্ত। অবশ্যই সমগ্র কোর কোয়ার্টেট্‌স জুড়ে এ কথাগুলোর বাঙ্ময়ঋদ্ধি ও গাম্ভীর্যের তুলনা নিশ্চয়ই নয় দান্তের পাশে। এলিঅটে প্রণয় সম্ভাবনা, দান্তেতে উত্তীর্ণ পরিণতির প্রত্যক্ষতা। তবু এলিঅটের লক্ষ্য যে সম্ভবত সমগ্র কোর কোয়ার্টেট্‌স-এর উপসংহারে এ পংক্তিসমূহের আলোকদীপ্তি ও গভীরতা সে বিচারে কিছুমাত্র কম নয়। আপন সীমার মধ্যেই দান্তেকে গ্রহণ করেও এ কাব্যে এলিঅট সম্পূর্ণই স্বতন্ত্র, মৌলিক একজন কবি। কবিতায় দান্তের পদ্ধতি বিষয়ে এলিঅট তাঁর অ্যালেগোরিক্যাল রীতিতে লক্ষ্য করেছেন চোখের সামনে ভেসে ওঠা স্পষ্ট সব ছবি। সে ছবির দিকে তাকাতে তাকাতে তাৎপর্য আসে যেন আপনিই, বিজ্ঞানে রেখার মর্মে আলোতে অবহিত হতে

থাকলে ক্রমে ঠেলে সেয় ছবিগুলো নিজেরাই। এমন কি অনির্বচনীয় যা, প্রায় যা বোধের অতীত এবং যা চিন্তনীয় প্রত্যয়গম্য সেখানেও হাত্তে চলেন এই ছবির পদ্ধতিতে। বর্ন্ট নর্টন-এ লণ্ডন আণ্ডারগ্রাউণ্ড, ইস্ট কোকারে পুরোনো ইংরেজীতে অতীতের ছবিটি, থিয়েটারের অন্ধকারে প্রতীক্ষারত দর্শক, ড্রাই সালভেজেস্ জুড়ে নদী ও সমুদ্র এবং লিট্‌ল গিডিং-এ এয়ার রেড রাত্রির শেষে শহর রাস্তার চিত্রগুলিতে কিছু-বা সরল স্মৃতি সেই পদ্ধতির তবু অবিস্মরণীয় এ সব অংশে তাঁর নিজস্বতা। তাঁর ছবিও অস্পষ্ট নয় এবং সর্বত্রই ছবি অল্প অল্পমনে জুড়ে যাচ্ছে কিন্তু চলমান ছবিগুলি চলতে চলতে অবসর না দিয়েই প্রায় রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে এক সংশ্লেষণের ঐক্যে, ছবিরা থাকে না আর, স্মৃতিতে ধ্বনিত এক সুর যে সুর কবিতারই। দুরূহতম দার্শনিক বক্তব্যের ক্ষেত্রেও প্রয়োজনমত কখনো কখনো এলিয়ট চলেছেন হাত্তেরই সে পদ্ধতিতে চূড়ান্ত রূপ যার বর্ন্ট নর্টন-এর still point-এর অংশ বা ইস্ট কোকার-এ ও ড্রাই সালভেজেস্-এর তৃতীয় চালে। তবু এখানে এলিয়টের প্রায় আবিষ্কৃত পদ্ধতিতে কথা বলার বিশিষ্ট ভঙ্গীটি তাঁর স্বকীয়। বিচার বিতর্ক বক্তব্যের সঙ্কোচিত উচ্চারণ অথচ কোথাও কবিতা এবং যে কবিতার প্রেরণা-ও লক্ষ্য হয়, সেই কবিতার চেতনা আহত হয় না, চলে স্বচ্ছন্দেই, সহজে। নদী চলেছে তীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে হয়তো-বা ভেঙে ভেঙেও, অধিকার করে শৈবকিছু, নিজের বেগে ভেঙেছে পথ, সব পড়ে রইলো পেছনে অথচ আছে সঙ্গে সঙ্গেই। ফোর কোয়ার্টেট্‌স-এ সেই চলার বেগে হাত্তেও পড়ে আছেন পেছনে এবং আশ্চর্য তাঁকে ভোলাও যায় না একেবারে। এলিয়টের স্বকীয়তার পাশে পাশে মাঝে মাঝেই মনে হবে যেন হেঁটে চলেছেন আরেক জন, ছায়ার মত।

ফোর কোয়ার্টেট্‌স-এ হাত্তের পরিগ্রহণে এলিয়টের মৌলিকতা পৌঢ়োর সেই সৃষ্টিশীল মৌলিকতার স্তরে,[১৭] যেখানে উজ্জ্বল অবিস্মরণীয়তায় দীপ্ত হন মৃত কবিরা, কবির পূর্বপুরুষ। তবু হাত্তে নন, এইখানেই, এতকাল ঘুরেছেন যে নানা ধারায় অঙ্গীকৃত তাঁরা সমস্তই, রূপান্তরিত আপন বিন্যাসে; ততটুকুই তাঁরা যতটুকু জীবন্ত আজও, যতটুকুতে আছি আমরাও, আমাদের কাল এবং যতটুকুতে চিরকাল। এইখানেই যথার্থ নূতন সংযোজন, এইখানেই চীন পড়ে এতকালের সমস্ত গঠনে। প্রথম যৌবনের ভূমিকা পর্বের, ওয়েস্ট ল্যাণ্ডের

১৭ Tradition and the Individual Talent। পৃ ১৯

এইখানেই চরম পরিণতি, কোর কোয়ার্টেট্‌স; পরিণতি গঠনে ও তত্ত্বে। আগে ওয়েস্টল্যাণ্ড-র তাগা বাসহারেই আছে প্রথম পর্বের জটিল বিন্যাস ও চরমের পরে দানেকের সহজতা। এখানেও আছে তা, কিন্তু সংযুক্ত এবারে আশ্চর্য কৌশলে আগেকার পরীক্ষার লব্ধ অভিজ্ঞতা।

কোর কোয়ার্টেট্‌স-এ ফেরে এলিয়টের সারা জীবনের সমস্ত প্রশ্নই। ফেরে তাদের চরম রূপে, যে রূপের জন্য বার বার পরিবর্তন, পথ খোঁজা ছিল অন্তহীন। এত দিনে দেখা গেল স্পষ্টই ফেলে আসা কায়াগুলিতেও এলিয়ট চিহ্নিত আত্মিকতায়, তিনি ভাবছেন অন্তরালের কথা। চোখ থেকে যোছেনি উপরিতল কখনোই, কিন্তু ক্রমে ততটুকুই এবং সেই রকমই যাতে ঐ অন্তরাল ঐ অন্ধকার এসে দাঁড়ায় আমাদেরও সামনে। দেশ কাল ঘটনা রইলো ঠিকই, বাদ পড়লো না পারিপার্শ্বিকতা, শুধু তারা অর্জন করলো সেই দীপ্তি যে আলোয় তাঁর মত তাঁর দেশে তাঁর কালে কবিতায় আমাদের মুখ আমরা দেখতে পেলুম যেমন, এমন দেখা গেল অল্পেরই মধ্যে। দেখা গেল, দেখা যাচ্ছে এখনও হিংসা হতাশা জিঘাংসা লালসা এ সবই এবং আরো অনেক কিছু, কিন্তু এমন আলোকিত তাৎপর্যে, এমন গভীর জিজ্ঞাসায় অনুপ্রাণিত করেনি; আমাদের একালের মানুষের দ্বিধা সংশয় ও গ্লানিতে সত্যতা ও ঐতিহ্যের প্রশ্ন তুলে সে ছবিতে এমন বিদ্যুতের কশাঘাত আর কেউ করেনি। আমাদের সচেতন করলেন আমাদের সম্বন্ধেই এবং সে ছবি আঁকতে সবচেয়ে বেশী ঋণ রেখে গেলেন দান্তের কাছে যে দান্তের পদ্ধতি অ্যালেগোরিকাল, যে দান্তের সিঁড়ি কবিতারই পথে চলে যান ঈশ্বর দর্শনে।

ঈশ্বরের মুখ দেখেননি এলিয়ট। তবু দান্তেরই লক্ষ্য তাঁরও, যদিও যেতে পারেননি অতদূর। ঐতিহ্যের বিভিন্ন বিচিত্র ধরনা খুলে তীব্রতায় চলে গেছেন সংকল্পে, দেখতে আসেননি। আসেননি ঈশ্বর আমাদের মধ্যে, যা এদেও বুঝিনি আমরা, আমরা যারা পরিত্যক্ত ধ্বংসস্তূপে, দেখতে পাইনি আলো জ্বলা মুহূর্তগুলো, খোলেনি ছিন্নপত্র ঢাকা, ঈশ্বরের মুখ থাকে অপিহিত। এলিয়টেরই কাব্যে শুধু থাকে ঘির বিন্দুর সূত্রে কিছু-না দীপ্তি, আভাস পল্লবের। জলস্থিত চূড়া হয়তো ঢাকে বারেবারেই, আচ্ছন্ন করে কুয়াশা, কখনো বা মহত্তর সমুদ্রত বজ্র; বাতাসের ঝাপটায় নিস্পন্দ ঘির সূত্র দেবদার। তবু যাত্রা থামে না। চলে বিচার বিতর্ক উপলব্ধি, প্রার্থনা, প্রার্থনা প্রতীক্ষাতুর অন্ধকারে হীনতায় বৈরাগ্যে। আগে যেমনারই গান ধারে ধারে

উত্তরসূরি অন্যত্র। বুঝি দান্তের পাশে রেখে দেখবারই কবি এলিয়ট, যদিও নয় দেখবার তেই যায়। দেখবার মধ্য দিয়ে তাঁর কবিতা উত্তীর্ণ হতে চেয়েছে অন্য কোথাও, কখনো দীন প্রার্থনায়, কিন্তু প্রধানতই চিন্তাধর বৈরাগ্যে। তাঁর হৃদয়ের চাবি দেখা ও বৈরাগ্য দান্তের যেমন এলিয়ট বলেন amore.[১১] দান্তের পাশে রেখেই সে কথাই বলা চলে, হয়তো সে আয়তন নেই, নেই ততদূর বৈচিত্র্যও তবু সমগ্রতার বৃত্তরেখায় বার বার ফিরে আসা পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষায় তাঁরও যাত্রা চলেছে ঈকুয়েনোক্স-এ আগুনে পুড়ে পুরগাতোরিও-র শুদ্ধির মধ্যে দিয়ে,যার চোখে আছে পারাদিজো-র স্বপ্নছায়া কখনো দীন, কখনো-বা উজ্জ্বল।

এলিয়টের কবিতায় দান্তের বিন্যাসে সুতরাং উত্তরাধিকারীর প্রশ্ন নয়, তুলনাও ভাবা চলে না, তবু পাশে রেখে দেখলে একটা অন্তত বোঝা যায় যে আমাদের কালে, একালেরই আবেগগত গভীরতার রূপে নিমন্ত্র থেকে এলিয়ট মুক্ত করেছিলেন, চেয়েছিলেন ফিরে ফিরে যারে বারেই সমকালকে মুক্ত করতে আমাদের বিচিত্র রূপের অন্তরঙ্গে, দেখতে চেয়েছিলেন এবং দেখেছিলেন আমাদের ভাঙাচোরা বেঁকে যাওয়া মুখের রেখাগুলি, বলতে চেয়েছিলেন এমন হয়েছে আরো অনেক, হবেই, কারণ পেছনে থাকে সময়ে স্থিত জ্ঞানবৃক্ষের ফলের পীড়িত উত্তরাধিকার, কাটা বিঁধবে হবে রক্তক্ষরণ, তারপর সন্ধ্যায় অন্তত হৃদয় যদি ফেরে দীনতায়, দেখা দেবে সেই কল্যাণতম রূপ, সেইদিন করুণার পথে সংযুক্ত হবে অগ্নিশিখা। স্বপ্নে নয়, ইন্দ্রিয় চেতনার বর্তমানকে উপস্থিতকে পূর্ণতম মর্যাদা দিয়েই ক্রমসাধ্য ধৈর্যে বিনয়ে সততায় প্রতিটি কাটা মাড়িয়ে অতীতের সমস্ত বদ্ধ ধরনার করাঘাত করে আমাদের কালে এলিয়ট অন্তত চেষ্টা করেছিলেন ঐক্যের সংহতির সংবৃত্তির। দান্তের স্মৃতির পাশে এই দিক থেকেই তাঁকে ভাবতে ইচ্ছে করে এবং ভাবলে স্পষ্ট হয় তাঁর সংকল্প ও অভিপ্রায় তাঁর সিদ্ধি ও পরাজয় এবং বুঝি সাতশো বছর পার হয়ে আমাদের কালের কবিতায় এলিয়টে দান্তে জন্মছেন অন্তর্লগ্ন একটি ভিন্ন শ্বেত শিখা।

---

১১ A Talk on Dante, ১৯৩০-এ লন্ডনে ইতালিয়ান ইন্সটিট্যুটে প্রদত্ত বক্তৃতা।

[ এ প্রবন্ধে ব্যবহৃত এলিয়টের কবিতার অনুবাদগুলি প্রায় সবই নেওয়া হয়েছে শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে-র 'এলিয়টের কবিতা' থেকে। দান্তের অংশ ব্যবহৃত Dorothy L. Sayers ও Barbara Reynolds-কৃত ইংরেজী ভাষান্তরণ Dante : The Divine Comedy. গদ্যনিবন্ধের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি Selected Essays : T. S. Eliot থেকে। — লেখক ]

# বঙ্গীয় নাট্যশালায়

নটচূড়ামণি

# স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী।

( নটের জীবনী ও নাট্যলীলা )

নাট্যসম্রাট

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক লিখিত।

## মিনার্ভা থিয়েটার

হইতে

শ্রীমনোমোহন পাঁড়ে কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১০ই আশ্বিন, ১৩১৪ সাল।

মূল আখ্যাপত্রের বিবরণ

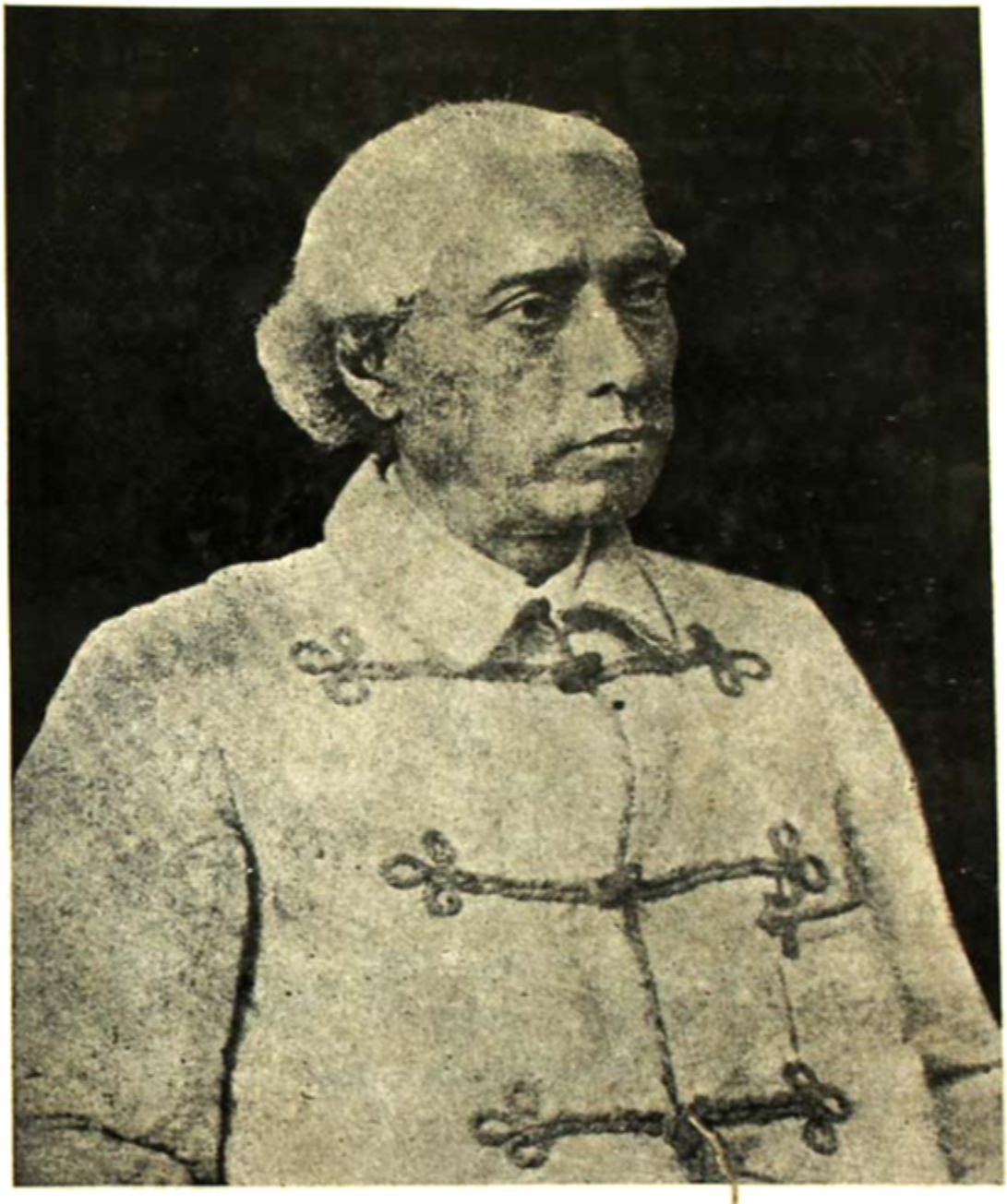

অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী

১৮৫০—১৯০৮

# বঙ্গীয় নাট্যশালার
# নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী

## গিরিশচন্দ্র ঘোষ

গত ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে নাট্যগগণ্য অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর জীবনলীলার অবসান হয়। কর্ত্তব্যবোধে আমি গত ৩রা আশ্বিন, শনিবার, মিনার্ভা থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চ হইতে এই শোক সংবাদ প্রচার করি; কিন্তু আমায় নানা প্রকারে আবদ্ধ হইয়া এই নিদারুণ সংবাদ প্রচার করিতে হইয়াছিল। প্রথমতঃ ঐ নটরাজের বর্ণনা সময়সাপেক্ষ। যতদিন তিনি রঙ্গালয়ে লিপ্ত, তখন রঙ্গালয়ের অবস্থা অন্যরূপ, রঙ্গালয় গঠন করিতে তাঁহাকে বিস্তর আয়াস পাইতে হইয়াছে; রঙ্গালয় লইয়াই তাঁহার জীবন। তাঁহার প্রথম উদ্যম ও চেষ্টা বর্ণনা ব্যতীত, তিনি কি, তাহা বুঝান যায় না। বহুদিন গত হইয়াছে, অনেক ঘটনা ভুলিয়া গিয়াছি, সুতরাং বুধবার হইতে শনিবারের ভিতর সমস্ত সংগ্রহ করিতে পারি নাই। যাহাদের লইয়া তাঁহার কার্য্য ছিল, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই কালগ্রাসে পতিত। সুদক্ষ ষ্টেজম্যানেজার শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস সুর, প্রসিদ্ধ প্রহসন-প্রণেতা ও দক্ষ অভিনেতা শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন নিয়োগী, শ্রীযুক্ত রাধামাধব কর ও শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ব্যতীত বোধ হয় আর অপর কেহই জীবিত নাই। অবৈতনিক সম্প্রদায়ে যাঁহারা কয়েক দিনের জন্য যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ জীবিত আছেন, কিন্তু তাঁহাদের নামোল্লেখ তাঁহাদের অনুমতি ভিন্ন অকর্ত্তব্য বিবেচনায় করিলাম না। ইঁহাদের নিকট ঘটনাবলী সংগ্রহ করা সুবিধা হইল না এবং যদিও সে সমস্ত ঘটনা কোনও মতে সংগ্রহ করিতে পারিতাম, তাহা বিবৃত করাও উক্ত রাত্রে অসম্ভব ছিল। সে দিন মিনার্ভায় একখানি নূতন গীতিনাট্যের অভিনয় মিউনিসিপ্যাল আইনে তাহা ১টার মধ্যে শেষ করিতে হইবে, সুতরাং নটের যথাযোগ্য জীবন বর্ণনায় সময় অতিবাহিত করা অসম্ভব হইল।*

* মিউনিসিপ্যাল আইন সম্বন্ধে আমার বক্তব্য পুস্তকের শেষভাগে পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইল।

আইনের বাধা প্রযুক্ত ও অন্যান্য কারণে অর্দ্ধেন্দুশেখরের জীবনবৃত্তান্ত সংক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছি। যাহা লিখিয়াছিলাম, নিম্নে প্রকটিত হইল। কিন্তু এক্ষণে যাহা অনুরুদ্ধ হইয়া লিখিতেছি, তাহাও সময়সাপেক্ষ, কিন্তু অনেকেরই অনুরোধ, উপস্থিত যতদূর পারি, এই নটকুলাগ্রগণ্যের বিবরণ লিখি। লিখিতেছি বটে, কিন্তু পাঠক, তাহা পূর্ণ হইবে না, এ নিমিত্ত মার্জ্জনা করিবেন।

## নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী।

(১৩১৫ সাল, ৩রা আশ্বিন, শনিবার, মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনয় আরম্ভের পূর্ব্বে দর্শক সম্মুখে পঠিত।)

দর্শক মহোদয়গণ,—

স্বর্গীয় রঙ্গালয়ের শেখর বলিয়াছে, অর্দ্ধেন্দুশেখর পরলোকগত। বিধাতার বিড়ম্বনায় সকলাপেক্ষা বয়োধিক হইয়াও আমাকেই মহারথী অভিনেতাগণের ত্রুটী উল্লেখ করিতে বার বার বাধ্য হইতে হইয়াছে। অর্দ্ধেন্দুশেখর স্বর্গীয় মহারাজ স্যার্ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের স্বর্গীয় মাতুল, বাগবাজার নিবাসী শ্যামাচরণ মুস্তফীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। মুস্তফী মহাশয়ের বাটীর সম্মুখে স্বর্গীয় কৃষ্ণকিশোর নিয়োগীর বাটীতে নিয়োগী মহাশয়ের ও ৺দীননাথ ধর প্রভৃতি কতবিদ্য ব্যক্তিগণের উদ্যোগে একটী Morning School স্থাপিত হয়, ঐ স্থলে বালক অর্দ্ধেন্দুকে আমি প্রথম দেখি। সংবাদপত্রে দেখিতে পাই, ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ফাল্গুনী মাসে অর্দ্ধেন্দু জন্মগ্রহণ করেন। তাহাতে নির্ণয় করা যায় যে, ৪৯ বৎসর বয়সে, নিষ্ঠুর কাল, রঙ্গালয়ের এই অমূল্য রত্ন হরণ করিয়াছে। কিন্তু উক্ত বিদ্যালয়ে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত তাঁহাকে এক অবস্থায় দেখিয়া ও প্রসিদ্ধ স্বর্গগত অভিনেতা মতিলাল সুরের তিনি সমবয়স্ক হওয়ায় আমার ধারণা ছিল, অর্দ্ধেন্দুর বয়স আরও দুই এক বৎসর বেশী। Morning School এ দেখিবার পর মধ্যে কিছুদিন আর অর্দ্ধেন্দুকে দেখি নাই। তৎপরে আমার এক বন্ধু স্বর্গীয় কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় বহুপাড়ার ৺দিগম্বর দে মহাশয়ের বাটীতে বাস করেন। তাঁহার অগ্রজ লোকনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ মুস্তফী মহাশয়ের একজন বন্ধু ছিলেন। লোকনাথ নকুলে লোক, বেশবিন্যাসের ভাষা অনুকরণ করিতে পারিতেন। বহুদিন

পরে অর্দ্ধেন্দুশেখরকে আমি সেই লোকনাথ মুখোপাধ্যায়ের নবভিবাহারে দেখি। লোকনাথ বলিতেছেন, "ধল দল স্যাটের যে কামর' দলতো ?" অর্দ্ধেন্দু পূর্ব্ববঙ্গীয় উচ্চারণে এই শব্দটির আবৃত্তি করেন। এই আবৃত্তিটী লোকনাথ অনুকরণ-পটু হইলেও তাঁহার অনুকরণ অপেক্ষা অর্দ্ধেন্দুশেখরের অনুকরণ অতি স্বাভাবিক শোনা গেল। স্মরণ হইতেছে যেন সে সময় ঠাকুর-বাড়ীতে "চন্দ্রদান" ও "উত্তর সতের" অভিনয় চলিতেছিল। অর্দ্ধেন্দু সেই অভিনয়ের অনুকরণ আমার বন্ধুর বাসায় আসিয়া কখন কখন করিতেন। "তোর লাগি তাবি তাবি নাতি ঘুমেছে।" অর্দ্ধেন্দুর মুখনিঃসৃত এই শব্দটি আমার এরূপ সুন্দর লাগিয়াছিল যে তাহা উল্লেখ করায় আমার বোধ হইতেছে যেন এখনো আমি তাহা শুনিতেছি। তৎপরে বহুদিন আর অর্দ্ধেন্দু কোথায় জানিতাম না।

যখন বাগবাজারে "সধবার একাদশী" থিয়েটার সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়, তখন উক্ত সম্প্রদায়ের উৎসাহী প্রসিদ্ধ অভিনেতা স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, যে তিনি কয়লাহাটায় "কিছু কিছু বুঝি" প্রহসনের অভিনয় দেখিতে গিয়া, একজন অত্যুৎকৃষ্ট অভিনেতা দেখিয়াছেন, অভিনেতা বাগবাজারেই থাকে। আমার বিশেষ আগ্রহে নগেন্দ্রনাথ, অভিনেতাটীকে আনেন। দেখিলাম আমার পূর্ব্ব পরিচিত অর্দ্ধেন্দুশেখর।

কৃতবিদ্য বন্ধুরূপে বেষ্টিত হইয়া গ্রন্থকার দীনবন্ধু বাবু, রায় বাহাদুর ৺রামচন্দ্র মিত্র মহোদয়ের ভবনে, উক্ত অবৈতনিক সধবার একাদশী সম্প্রদায়ের অভিনয় দর্শনার্থে আসেন। অর্দ্ধেন্দুর "জীবনচন্দ্রের" ভূমিকা (Part)। জীবনচন্দ্রের অভিনয় দর্শনে সকলেই মুগ্ধ। স্বয়ং গ্রন্থকার অর্দ্ধেন্দুকে বলেন, "আপনি অটলকে যে লাথি মারিয়া চলিয়া গেলেন, উহা improvement on the author. আমি এবার সধবার একাদশীর নূতন সংস্করণে অটলকে লাথি মারিয়া গমন লিখিয়া দিব।" অর্দ্ধেন্দুশেখরের প্রত্যেক অভিনয়ের যদি পূর্ণ ব্যাখ্যা করা যায়, তাহা হইলে দর্শকবৃন্দ থিউনিসিপ্যাল আইনবদ্ধ ১টা রাত্রি পর্য্যন্ত শুনিয়াও শেষ করিতে পারিবেন না। সুতরাং সে সকল বর্ণনায় আমি ক্ষান্ত রহিলাম।

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর, অর্দ্ধেন্দুর "জীবনচন্দ্র" দেখিয়া তাঁহার সম্পূর্ণ প্রতিভার পরিচয় পান নাই। "লীলাবতীতে" অর্দ্ধেন্দুকে "হরবিলাস" দেখিয়া একেবারে চমৎকৃত হইলেন। তাঁহার মুখে আর প্রশংসা ধরে না। তাঁহার

পর গ্রাসান্তাল থিয়েটার স্থাপিত হইয়া টিকিট বেচিয়া প্রথম "নীলদর্পণ" অভিনয় আরম্ভ হইল। অর্দ্ধেন্দু শেখর বসু, উচ্চ সাহেব, একজন রায়ত ও সাবিত্রী-রূপে দর্শকবৃন্দের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। প্রত্যেক ভূমিকাই বিস্ময়কর, প্রশংসায় কলিকাতা পরিপূর্ণ। আমি শুনিয়াছিলাম, দেখি নাই, কারণ গ্রাসান্তাল থিয়েটারের সহিত প্রথমে আমার সম্বন্ধ ছিল না। ক্রমে ক্রমে দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের নাটক ও প্রহসনগুলির অভিনয় চলিতে লাগিল। প্রতি প্রথে অর্দ্ধেন্দু প্রধান ও অতুলনীয়। তন্মধ্যে নবীন তপস্বিনীর "জলধরের" অভিনয় অতুলনীয় মধ্যে অতুলনীয়। নাট্যোল্লাধিপতি উচ্চ স্তর রাজা চন্দ্রনাথ তখনে বিভোর হইয়াছিলেন বলিলে ঠিক বর্ণনা করা হয় না। সঙ্গীতাচার্য্য ৺গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বলিতেন,—"সমজদার গুণীর গোলাম, আর গুণী বে-সমজদারের গোলাম।" গুণী অর্দ্ধেন্দুশেখর ও সমজদার রাজা চন্দ্রনাথ, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কথার একটী প্রমাণ। ক্রমে গ্রাসান্তাল থিয়েটারে "নয়শো রোপেয়া" অভিনয় হইল। যাহাদের ধারণা ছিল যে ইংরাজি থিয়েটারে ভিন্ন প্রকৃত অভিনয় হয় না, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অমৃত বাজার পত্রিকার প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষের সম্মুখে, অর্দ্ধেন্দুকে দেখাইয়া বলেন যে নয়শো রোপেয়ার "হাতুলালের" ভূমিকায় এই বাবুটীর অভিনয় যাহা দেখিলাম, তাহা যে কোন বিলাতী থিয়েটারে কোন অভিনেতা পারে, ইহা আমাদের বিশ্বাস হয় না। আক্ষেপ— সময় নাই, প্রত্যেকটী বর্ণনা করিতে পারিলাম না। অর্দ্ধেন্দু যে অংশ স্পর্শ করিতেন, তাহাই অননুকরণীয় হইত।

এতক্ষণ অর্দ্ধেন্দুর অভিনয়-শক্তির যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার চেষ্টা করিতেছিলাম; কিন্তু তিনি শিক্ষা প্রদানে কিরূপ দক্ষ ছিলেন, তাহার উল্লেখ করি নাই। প্রথম সন্ধ্যার একাহশীতে প্রয়োদানন্দকে যাহা শিখাইয়াছিলেন, সেরূপ কেহ পারে বলিয়া আমার ধারণা নাই। অর্দ্ধেন্দুশেখর বাবুর— এরূপ সর্ব্বত্র প্রচার; প্রত্যেক ছাত্রকে কিরূপ শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা এস্থলে বর্ণিত হইতে পারে না। তাঁহার শিক্ষার পরিচয়, সুযোগ্য তাঁর থিয়েটারের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু। শুনিতে পাই, "বিশ্বকোষে" বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের ইতিবৃত্তে লিখিত হইয়াছে, "এখন বাঙ্গালা নাট্যশালায় দুইটী রীতিতে অভিনয় হইয়া থাকে।" লেখকের মতে দুইটীর মধ্যে একটী অর্দ্ধেন্দুবাবুর রীতি। ইহাতে বোধ হয়, বিশ্বকোষের এই লেখক বিশেষ যত্ন ও অনুসন্ধান করিয়া লেখেন

নাই। তিনি অর্দ্ধেন্দুর অভিনয় ও শিক্ষাপ্রণালী দেখেন নাই। অর্দ্ধেন্দুর কিরূপ শক্তি, সংক্ষেপে তাহা জানাইবার চেষ্টা করিব।

যাঁহারা Natural কথাটী কুড়াইয়া লইয়া অভিনয় সমালোচনা করেন, তাঁহারা আমি অর্দ্ধেন্দুর যে শক্তির পরিচয় দিবার প্রয়াস পাইতেছি, তাহা বুঝিবেন কিনা জানি না। যিনি পাশ্চাত্য প্রদেশের অভিনয় সম্বন্ধে সমালোচনা পাঠ করিয়া থাকেন, তিনি বুঝিবেন, যে অর্দ্ধেন্দুর যে শক্তি বর্ণনা করিবার প্রয়াস পাইতেছি, এক্ষণে সভ্যপ্রদেশে তাহা উচ্চ শ্রেণীর বলিয়া গণ্য। অর্দ্ধেন্দুর অভিনয় এই ;— অর্দ্ধেন্দু কি ভূমিকা ( Part ) লইয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়াছেন, অর্দ্ধেন্দু তাহা দর্শকদিগকে দেখিতে দিতেন না। দর্শক দেখিতে অর্দ্ধেন্দুবাবু আসিয়াছেন। যতবার প্রবেশ করিতেন, ততবারই দর্শক আগ্রহের সহিত বলাবলি করিতেন— অর্দ্ধেন্দুবাবু আসিয়াছেন। দর্শক দেখিতেন অর্দ্ধেন্দু কি ভূমিকা, তাহা নয়। এইরূপ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি একজন, দর্শকের সম্পূর্ণ প্রীতি জন্মাইতে পারে, দৃশ্যপট, অভিনেতা প্রভৃতির বিশেষ সাহায্য প্রয়োজন হয় না। বহুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় হেরকাস্‌ নামক এক ইংরাজ এই উচ্চ শক্তির নিরক্ষর শক্তিসম্পন্ন হইয়াও ইংরাজগুলীকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন। অর্দ্ধেন্দুকে লোকে সাহেব বলে, তাহার কারণ হেরকাস্‌ যেমন বাঙ্গালী বাবু লইয়া ঠাট্টা করিতেন, অর্দ্ধেন্দুও তেমনি পূর্ব্বোক্ত প্রথম শ্রেণির ভাবাক্রান্ত বিয়েটারে 'সাহেব' সাজিয়া বেহালা হাতে গান করিতেন,—

"হাম বড়া সাব হ্যায় দুনিয়ামে,
None can be compared হামারা সাথ।"

ঐ অভিনয়ের পর, অর্দ্ধেন্দুকে লোকে 'সাহেব' বলিত। Album of amusement-এ ইংলণ্ডের এক কলাবিজ্ঞানিপুণ ব্যক্তির উল্লেখ আছে। তিনি Lecture on heads বলিয়া বিজ্ঞাপন দিতেন। ঐ সুযোগ্য অভিনেতা কতকগুলি পিসবোর্ডে নরমুণ্ড প্রস্তুত করিয়া একা রঙ্গমঞ্চে দেখাইতেন। সেই পিসবোর্ডে লিখিত মুণ্ডগুলির নানারূপ মুখভঙ্গী ছিল। তিনি এক একটী মুণ্ড লইয়া নিজে মুখভঙ্গী পূর্ব্বক সেই মুণ্ডের অনুকরণ করিতেন এবং বলিতেন এই মুণ্ড যাহার ছিল, সে এইরূপ প্রকৃতির লোক,— নিজে তিনি সেই কল্পিত প্রকৃতির অভিনয় করিতেন। দর্শকের উচ্চ হাস্যে রঙ্গমঞ্চ যেন ফাটিয়া যাইত। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় তাঁহার প্রশংসা ধরে না। এ ব্যক্তিরও শক্তি অর্দ্ধেন্দুর শক্তির নিকট নিরক্ষরের। ইংলণ্ডের John Lawrence

'Tool এই শক্তির পূর্ণ বিকাশ। পূর্বে বলিয়াছি, অর্ধেন্দুকে বর্ণক অর্ধেন্দু দেখিতেন। অর্ধেন্দু এই অংশে বা ঐ অংশে এ লইয়া বিচার নয়, অর্ধেন্দুবাবু চমৎকার— এই কথা।

অর্ধেন্দুর এই উচ্চ প্রশংসা (প্রশংসা কেন, প্রশংসা বলিলে যেন কিছু বাড়াইয়া বলিতেছি বোধ হয়) অর্ধেন্দুর এই স্বরূপ বর্ণনায় কাহারও যা মনে হইতে পারে, যে ওরূপ অভিনয়ে নাটক বর্ণিত চরিত্রের সম্পূর্ণ অভিনয় হয় না। ঐরূপ মনে করা ভ্রম। কলাবিদ্যা— কলাবিদ্যা, স্বভাব নয়। চিত্রকর যখন কোন স্বভাবদৃশ্য অঙ্কিত করিতে চান, সেই দৃশ্যের অনেক বাদ দিয়া, অনেক যোগ করিয়া, তাঁহাকে চিত্রায়িত করিতে হয়। উদ্দেশ্য এই যে, যে দৃশ্য অঙ্কিত করিতেছেন, স্বভাবে সেই দৃশ্য দেখিয়া চিত্রকরের যেরূপ মনের ভাব হইয়াছিল, সেই ভাবটী যতদূর পারেন, তুলিতে তোলেন। স্বভাব-প্রসূত দৃশ্যেও অনেক যোগ করিতে হয়। Art galleryতে Approaching Storm অর্থাৎ ঝড় আসিতেছে, এই নামে একখানি ছবি আছে। ঘোর মেঘ উঠিয়াছে, বৃক্ষ সকল স্পন্দনহীন, পক্ষীকুল ব্যাকুল, ঝড়ের পূর্বে এই দৃশ্য স্বভাবে দেখা যায়। চিত্রকর সেই দৃশ্য আঁকিয়া তাহাতে কতকগুলি চাষা, পথিক, গাভী প্রভৃতি দিয়াছেন। ঝড় আসিবার পূর্বে যেখানে সেখানে চাষা, গাভী প্রভৃতি দেখা যায় না। কিন্তু চিত্রকর তাঁহার চিত্রপটে উহা দেখাইতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহার অঙ্কিত মেঘ স্পন্দনহীন বৃক্ষ অপেক্ষা অঙ্কিত মানবের মুখভাবে ঝড়ের আশঙ্কা বেশী প্রতীয়মান হইতেছে। অর্ধেন্দু উচ্চ কলাবিদ্যাবলে তাঁহার অভিনীত অংশে চিত্রকরের ন্যায় কতকগুলি কল্পিত হাবভাব দ্বারায় নাটককারের চরিত্র পরিপুষ্ট করিতেন। বর্ণিত চিত্রকরের Approaching Storm ছবিতে আমরা ছবি দেখি, কিন্তু ঝড় আসিবার ভাব মনে উদয় হয়; অর্ধেন্দুর অভিনয়ে সেইরূপ আমরা অর্ধেন্দুকে দেখি, এবং সঙ্গে সঙ্গে নাটক বর্ণিত চরিত্রের ঠিক ভাব উপলব্ধি হয়। রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে অভিনয়ে Natural কথা ব্যবহৃত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু রঙ্গমঞ্চ রঙ্গমঞ্চই, তাহার দৃশ্যগুলিও রঙ্গমঞ্চের দৃশ্য। অঙ্কিত দৃশ্য দুর্গ, — বাস্তবে নহে, কিন্তু অভিনেতা বলিতেছে, "এই দৃঢ় দুর্গ কাহারও গোলায় ভেদ করিতে পারিলাম না।" অভিনেতা তাহার শক্তির দ্বারা দর্শকের মনে প্রকৃত ঘটনায়, একজন সৈন্যাধ্যক্ষ ভেদ করিয়াছে, সেই ভাব উদ্রেক করিয়া দেয়। এই পর্য্যন্ত অভিনয়ের শক্তি।

মূলকায় প্রবন্ধ যাহাতে অভিনয় কি, বুঝান যায় না। আমি অর্দ্ধেন্দুর শক্তি স্পর্শ করিলাম মাত্র, সুযোগ অভাবে কিছুই পরিচয় দিতে পারিলাম না। মিনার্ভার স্বত্বাধিকারী মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয় অর্দ্ধেন্দুর স্মৃতিসভার আয়োজন করিতেছেন। যদি সুযোগ হয়, অভিনয় সম্বন্ধে কথা উত্থাপন করিবার প্রয়াস পাইব। মনোমোহনবাবু বলেন যে যখন তিনি থিয়েটার ব্যবসায়ে যোগদান করিতেছেন, যাঁহারা রঙ্গালয়ের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের স্মৃতিরক্ষা করা তাঁহার সম্পূর্ণ অভিলাষ। তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। কিন্তু অভিনেতৃগণ, যাঁহারা বঙ্গের শোণিত দানে রঙ্গভূমির উন্নতি সাধনে তৎপর হইয়া ছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া দিবার জন্য যে একজন ব্যক্তিও উদ্যোগী, ইহা অভিনেতৃগণের ভাগ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

অন্যের অভিনয়ের সহিত অর্দ্ধেন্দুর অভিনয়ের পার্থক্য কি? তাহার একটী দৃষ্টান্ত দিয়া কান্ত হইব। লোকে "প্যারিকের" অভিনয় দেখিয়া আসিয়া বলিত, হ্যামলেট চমৎকার হইয়াছে। এ অভিনয় এরূপ। উদ্ধিখিত John Lawrence Tool নামক অভিনেতার দর্শক-মনোমোহন অভিনয় অন্যরূপ। এই কলা বিদ্যাবিদ্ পণ্ডিতদের দেখিয়া, দর্শক সেই পণ্ডিতেরই নাম করিত; অভিনীত অংশের নাম করিত না। অর্দ্ধেন্দুর আর একটী শক্তি ছিল, অভিনয়কালীন নাটকের কথায়, নিজ মতিচ্ছ-প্রসূত কথা উপস্থিত যোগ করিয়া দিতে পারিতেন; যথা মুকুল মুঞ্জরায় "বরদচাঁদের" ভূমিকায় বরদচাঁদকে লক্ষ্য করিয়া যখন রাজা বলিতেছে—"এ কে ওঁড় না কি?" তখন অর্দ্ধেন্দু-বরদচাঁদ উত্তর করিল,—"মহারাজ, ওঁড়— মত বড় নই— আমি একখানি খুরি।" ইহা নাটকের কথা নয়। কিন্তু শ্রবণমাত্র যে হাস্যের রোল উঠিল, তাহা যিনি শুনিয়াছেন— তিনিই জানেন। সামান্য অভিনেতার অর্দ্ধেন্দুকে একেলে অনুকরণ করিতে যাওয়া বড়ই বিপজ্জনক। অর্দ্ধেন্দুর নিকট শিক্ষিত না হইয়া, তাঁহার ভাব চং করিতে গেলে ভাঁড়ামি হইয়া উঠে। অর্দ্ধেন্দুর যে শক্তি বর্ণনা করিলাম— তাহা হাস্যরস সম্বন্ধে। গম্ভীর ভূমিকাতেও তাঁহার সমধিকতা ছিল। কিন্তু গম্ভীর ভূমিকা লইয়া তিনি বাহির হইলে, দর্শক প্রথমে সে অংশের গাম্ভীর্য্য ধরিতে পারিত না। অবশেষে পরিশেষে সে ভূমিকার প্রকৃত পরিচয় পাইত এবং যেরূপ হাস্যরসাত্মক অংশে হাসিত, করুণরসাত্মক অংশেও কাঁদিত।

সময় ফুরাইয়া আসিল, আমি বাধা হইয়া সমাপ্ত করিতেছি। কিন্তু একটী বক্তব্য কাহারও কাহারও ধারণা যে আমরা উভয়ে উভয়ের বিরোধী ছিলাম। এ ভুল অর্দ্ধেন্দুর একটী কথায় দূর হইবে। অর্দ্ধেন্দু অনেকবার বলিয়াছেন, যে গিরিশ ঘোষ যদি আগে মরে, তাহা হইলে আমি ব্যতীত আর কাঁদিবার লোক নাই, আর আমি যদি আগে মরি, সে ব্যতীত আর কাঁদিবার লোক নাই। আমরা অনেক সময়ে একত্রে ও অনেক সময়ে বিরোধী থিয়েটারে কার্য্য করিতাম। কিন্তু অর্দ্ধেন্দু-গুণমুগ্ধ যিনিই থাকুন, যিনিই যত তাঁহার প্রশংসা করুন, যিনিই যত অন্তর হইতে বলুন, যে অর্দ্ধেন্দু স্বর্গগত হওয়ায় যত রঙ্গালয়ের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে, তাঁহাদের অপেক্ষা যদি বেশী না হই, অন্ততঃ আমি তাঁহাদের সমান অর্দ্ধেন্দুর গুণমুগ্ধ, একথা দম্ভ করিয়া বলিতে পারি।

অর্দ্ধেন্দুর মৃত্যু হঠাৎ, জোড়াসাঁকোর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে হয়। অর্দ্ধেন্দুভক্ত নরেন্দ্রনাথ জোর করিয়া চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে নিজ বাটীতে রাখেন। বুধবার অর্দ্ধেন্দুকে সকলে একটু ভাল দেখিয়াছে, আশা হইয়াছে— আরোগ্য লাভ করিবেন। বায়ু পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত বেনারস যাইবেন। বায়ু পরিবর্ত্তনে যাওয়া সম্বন্ধে আমার অমত ছিল।— অর্দ্ধেন্দুকে সুস্থ দেখিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ ব্যোমকেশ বিনার্ভা থিয়েটারে আসিয়াছে। আমি বাবাজীকে একরূপ ভর্ৎসনা করিয়া বলিতেছিলাম, যে কদাচ অর্দ্ধেন্দুকে লইয়া স্থানান্তরে যাইও না। রোগী বহুদিন ভুগিলে আপনার ইচ্ছায় চলিতে চায়, তুমি সঙ্গে থাকিলেও অত্যাচার করা সম্ভব। তাহাতে ব্যোমকেশ বাবাজী উত্তর করে, যে তিনি যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন, তাঁহাকে কেমন আর সহজ নয়। আজ বুঝিতেছি যে সত্যই সহজ নয়। সেইদিন রাত্রি ১টার সময়, যখন এই কথা হইতেছে, তখন পথিক অজানিত পথে গমন করিয়াছেন। চিরদিন আনন্দ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন যম তাঁহাকে তাড়না করিতে পারে নাই। মৃত্যুকালে যজ্ঞোপবীত হস্তে গঙ্গাজল চাহিয়া লইয়া শাস্ত্রমতে গঙ্গালাভ করিয়াছেন। অর্দ্ধেন্দু এক্ষণে উচ্চস্থানবাসী, ইহজগতে আর নাই।

কেহ কেহ বিশেষ বিজ্ঞতার সহিত হয়তো বলিতে পারেন যে, অর্দ্ধেন্দুবাবুর সম্বন্ধে যদি এত কথা, থিয়েটার বন্ধ দিতে পারিলেন না? যদি এরূপ কেহ থাকেন, তাঁহার নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া আমার নিবেদন, যে যাহাদের

নিকট অর্দ্ধেন্দুর নাট্যানুরাগ পরিচিত, তিনি বুঝিবেন— যদি ইহা উইল করিবার চেষ্টা, তাহা হইলে অর্দ্ধেন্দু উইল করিয়া যাইতেন, যে যেন আমার মৃত্যুর দিন অভিনয় রজনী না হইলেও অভিনয় করা হয়। রঙ্গালয়ে অভিনয় করিতে করিতে তাঁহার মৃত্যু হয়, এই তাঁহার চিরকামনা ছিল। মিনার্ভা থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে ইহা জানিতেন ও সকলে অর্দ্ধেন্দুর চিরকামনা তাঁহাকে বিশেষ করিয়া স্মরণ করিয়া দেওয়ায় অভিনয় বন্ধ হইল না। যাহারা কায়মনোবাক্যে রঙ্গালয় প্রিয় ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অর্দ্ধেন্দু অগ্রগণ্য। রঙ্গালয় তাঁহার জীবন ছিল, রঙ্গালয়ের কথা তাঁহার কথা ছিল, রঙ্গালয়ে ভীক্ষাদান তাঁহার কার্য্য ছিল, রঙ্গালয় তাঁহার আবাস ছিল, নাট্যামোদী ব্যক্তি ব্যতীত তাঁহার অন্য আত্মীয় ছিল না। সমাজে অভিনয় দেখিতে ভালবাসে, রঙ্গালয়ে অভিনেতার প্রশংসা করে, আদর করে, কিন্তু বাহিরে কেহ কেহ বা ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহাতে অভিনেতা বলিয়া পরিচয় দেওয়া একরূপ কঠিন হয়। কিন্তু রঙ্গালয়বৎসল অর্দ্ধেন্দু রঙ্গালয়ে পদার্পণ করিয়া অবধি গৌরবের পরিচয় দিতেন, আমি অভিনেতা। সে কলাবিদ্যাগর্ব্বিত —কলাবিদ্যাবিলাস অর্দ্ধেন্দু আজ নাই!

---

অবশ্যই পাঠক বুঝিয়াছেন যে, অর্দ্ধেন্দুশেখর সম্বন্ধে এই ক্ষুদ্র বর্ণনায় রঙ্গালয়ে যাহারা তাঁহার সহযোগী এবং যাঁহাদের সংস্রবে তাঁহার অভিনয় কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, তাঁহাদের নামের ঘোষণা উল্লেখের স্থান পাই নাই। অর্দ্ধেন্দুর প্রতিভা কিরূপে বিকশিত, তাহাও কিছু বলি নাই। বাল্যকালে তাঁহার অনুকরণশক্তি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা অতি সামান্য। যদি কোন সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি অর্দ্ধেন্দুকে পূর্ব্বকথিত Morning School-এ দেখিতেন, হয়তো তাঁহার ভবিষ্যৎ প্রতিভার আভাস দেখিতে পাইতেন। School বসিবার অগ্রে ও ছুটি হইলে বালকেরা আগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার নিকট কিয়দংশ নিয়োদ্ধৃত গান শুনিতেন :—

Birds are free so are we
And we live so merrily
Merrily merrily merrily
&c. &c &c.

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY

সে সময় হাস্যজনক গানও অনুকরণ হইত। অর্দ্ধেন্দুর নিকট বালকেরা আমোদপ্রার্থী ছিল। বাল্যকালে তাঁহাকে তাঁহার পিতৃব্যগণ, মহারাজ স্যর্

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের জননী, তাঁহার পাথুরিয়াঘাটা ভবনে লইয়া গিয়াছিলেন। মহারাজ স্যার্ যতীন্দ্রমোহনের অশেষ গুণরাশির মধ্যে নাট্যামোদে উৎসাহ প্রদানে বিশেষ অভিরুচি ছিল। রাজবাটীতে রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত করিয়া অভিনয় হইত, অর্দ্ধেন্দুর তাহা দেখিবার সুযোগ ছিল। সদা বাকি বাহীর সাধারণের সে সুবিধা ছিল না। মাইকেল তাঁহার "কৃষ্ণকুমারী" নাটকের ভূমিকা (Preface)র যে পূজনীয় কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া 'নটকুলচূড়ামণি' বলিয়াছেন, সেই শ্রদ্ধাস্পদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়, রাজবাটীর নাট্য সম্প্রদায়ের আচার্য্য ছিলেন। নাটকের মহলাও অর্দ্ধেন্দু ইচ্ছা করিলে দেখিতে পাইতেন। অভিনয়শিল্পে অর্দ্ধেন্দু যে কেবল গুনিতেন ও দেখিতেন, তাহা নয়, স্বালাভরে তাহা অধিত হইত। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতেও বছবিবাহ নিন্দা করিয়া "নব নাটক" অভিনীত হয়, অভিনয়-পারদর্শী অক্ষয়চন্দ্র সরকার সেই অভিনয়ের নায়ক। এই নাটক অভিনয় দেখাও অর্দ্ধেন্দুর পক্ষে সহজ ছিল। "বিশ্বকোষে" লিখিত আছে যে, এই অভিনয় দেখে অর্দ্ধেন্দুর অভিনয় শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। দেখিবার, জানিবার, শিখিবার আর কিছু বাকী রহিল না। এ স্থলে "বিশ্বকোষ" ভ্রান্ত।

পাথুরিয়াঘাটা রাজবাটীর "মালবিকাগ্নিমিত্র, বিদ্যাসুন্দর, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, বুঝ্‌লে কিনা? মালতীমাধব, উভয় সঙ্কট, চক্ষুদান, চক্ষুস্থিরকরণ, রসাবিষ্কাররুদ্রক" ও জোড়াসাঁকোর "নব নাটক" দেখিয়া যে নটের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়, ইহা যিনি নটের শিক্ষায় কি প্রয়োজন, তাহার কিছুমাত্র আভাস পাইয়াছেন, তিনি সাদা কাগজে লিখিবেন না। নটের কার্য্য To give the airy nothing a local habitation and a name অর্থাৎ বায়ুনির্ম্মিত আকাশকুসুমকে নাম ও ধাম দেওয়া নটের কার্য্য। কল্পিত ও সাংসারিক চরিত্র উপলব্ধি যাহাতে নট কখনও প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না। মানসিক ও আন্তরিক সূক্ষ্মদৃষ্টি না থাকিলে নটের কার্য্য হয় না, যে অংশ অভিনয় করিবে, তাহা নট বুঝিতে পারে না। "বিশ্বকোষ" উল্লিখিত শিক্ষা ভিন্ন অর্দ্ধেন্দুশেখরের অপর শিক্ষার নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছিল। পুস্তক পাঠ বা শিক্ষিত ব্যক্তির মুখে চরিত্র বর্ণনা বা শুনিলে অর্দ্ধেন্দু কদাচ প্রশংসা-ভাজন হইতেন না. Macbethএর witch প্রভৃতির অভিনয় করা সামান্য শিক্ষার কার্য্য নহে।

শুনিয়াছি স্বয়ং বলিয়াছিলেন "কিন্তু কিন্তু বুঝি"তে অর্দ্ধেন্দু অভিনয় করেন, সেই তাঁহার প্রথম রঙ্গমঞ্চে পদার্পণ। উক্ত খেয় প্রহসনে তাঁহার তিনটী

অংশ ছিল। তাহার একটী অংশ রাজবাটীর কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধ। ইহাতে তিনি তাঁহার পিতৃসমা-গৃহে বিরক্তিভাজন হন, তাঁহার পিতা তাঁহাকে অভিনয় করিতে নিষেধ করেন, কিন্তু নাট্যামোদী অর্দ্ধেন্দু ক্ষান্ত হইলেন না, তাহাতে তাঁহাকে পিতৃসমার গৃহ পরিত্যাগ করিতে হয়। তৎপরে বাগবাজারে আসিয়া 'সধবার একাদশী' সম্প্রদায়ে যোগদান করেন। এই সময় হইতেই তাঁহার সহিত আমার সংস্রব। বলিয়াছি অনেক সময় একত্রে ও অনেক সময় স্বতন্ত্র হইয়া কার্য্য করিতাম। যে সময়ে একত্র কার্য্য করিতাম, সে সময়ে প্রহসন ও নবীন তপস্বিনী এবং নয়শো রোপেয়া নাটক ভিন্ন বহুদিন অবধি সকল নাটকেই আমাদের উভয়ের ভূমিকা (Part) থাকিত। সুতরাং প্রত্যেক নাটকের মহলা হইতে প্রকাশ্য অভিনয় পর্য্যন্ত দেখিয়া অর্দ্ধেন্দুর শক্তি ও শিক্ষা বুঝিবার প্রয়োজন আমার হইত। যে সম্প্রদায়ে আমরা একত্রে অভিনয় করিতাম, সে সম্প্রদায়ের সাধারণের নিকট দায়িত্ব আমারই থাকিত।

জীবনী লিখিতে গেলে, লেখকের আত্মগোপন করা কর্ত্তব্য, কিন্তু অর্দ্ধেন্দু-শেখরের সহিত আমার নাট্যজীবনের এত সংস্রব, যে সকল স্থানে আমার পশ্চাতে থাকা অসম্ভব। অতএব যদি আত্মপ্রকাশ দেখিতে পান, পাঠক মার্জ্জনা করিবেন, জানিবেন তাহা অনিচ্ছাসত্ত্বেও করিতে হইয়াছে। যাঁহারা রঙ্গালয়ের কথা আলোচনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অর্দ্ধেন্দু ও আমাকে লইয়া বাদানুবাদ করিয়া থাকেন। তাঁহারা তাঁহাদের বাদানুবাদ লইয়া থাকেন, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই,— ও এতদিন ছিল না। কিন্তু সত্য ঘটনা লিখিতে গেলে, কাহারও বা যাহার প্রতিবাদ হইতে পারে। তিনি মার্জ্জনা করুন বা না করুন, কিন্তু সত্যপ্রিয় পাঠক বুঝিবেন, সত্য ঘটনা লিখিতে আমি বাধ্য।

"সধবার একাদশী" শেষ হইল। নীলাবতীর অভিনয় আরম্ভ হইল। এ সম্প্রদায় স্থাপনে আমার একজন পূর্ব্ববন্ধীয় বন্ধু উদারচেতা শ্রীযুক্ত গোবিন্দ-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ উৎসাহী। তাঁহার উদ্যম ও উৎসাহ না থাকিলে সম্প্রদায় স্থাপিত হইত না, তাঁহারই অর্থব্যয়ে আরম্ভ খরচ চলিত। বহুদিন নীলাবতীর আরম্ভ চলে। প্রথম অবধি আমার বেশী যাতায়াত ছিল না, কিন্তু শেষে বাধ্য হইয়া বিশেষরূপে যোগদান করিতে হয়। চুঁচুড়ার বঙ্কিমচন্দ্র ও সাধারণীর সুপ্রসিদ্ধ অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও অন্যান্য কৃতবিদ্য ব্যক্তি একত্র হইয়া "নীলাবতীর" সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই সম্প্রদায়ের দুর্দ্দশাতি

অমৃতবাজারে প্রকাশিত হইল। শ্রীরামপুরে 'লীলাবতী' বসিয়াছে বটে, কিন্তু সকল অংশই অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। যদিও অন্যরূপ কারণ মুদ্রাঙ্কিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে দেখিতে পাই, আমার যোগদানের স্বরূপ কারণ বলিতে আমায় বাধ্য হইতে হইয়াছে। উল্লিখিত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রতিভাশালী ষ্টেজ ম্যানেজার ধর্মদাস সুর— সমবেত হইয়া আসিয়া অর্দ্ধেন্দু আমার নিকট বলেন,— চুঁচুড়ার দলের নিকট হারিয়া যাইব, তুমি কি বসিয়া দেখিবে?" অর্দ্ধেন্দুরই সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ অনুরোধ। নাট্যকার দীনবন্ধু বাবু, তাঁহাকেই বলিয়াছিলেন, "তোমরা পারিবে না।" অর্দ্ধেন্দুর এরূপ আগ্রহ কেবল যে আমাকেই লইবার জন্য ছিল, তাহা নহে। অর্থবলহীন সম্প্রদায়ে বালক সংগ্রহ করা সহজ ছিল না। নগেন্দ্রনাথ, অর্দ্ধেন্দু, ধর্মদাস প্রভৃতি বহু কষ্ট ও লাঘবতা স্বীকার করিয়া এই কার্য্য করিতেন। এ সকল কথা বলিবার উদ্দেশ্য আমার এই, যে 'বিশ্বকোষে' আভাস পাই যেন এ সময় অর্দ্ধেন্দু আমার বিরোধী। না, তাহা নহে— আমরা একত্রেই উদ্যোগী। ন্যাশন্যাল থিয়েটার কি নিমিত্ত স্থাপিত হইয়াছে, তাহার স্বরূপ বর্ণনা করত। যা দেখায় পাই না। অর্দ্ধেন্দুর জীবনীতে তাহা আবশ্যক, এই নিমিত্ত "লীলাবতীর" প্রসঙ্গ স্থানোপযোগী। "লীলাবতী" অভিনয়ের অভিনয় প্রশংসা হইল। অভিনয় দর্শনে মুগ্ধ হইয়া দীনবন্ধু বাবু আমায় বলিয়াছিলেন, "তোমাদের অভিনয়ের সহিত চুঁচুড়া দলের তুলনাই হয় না,— আমি পত্র লিখিব— ছুয়ো বলিব!" সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺কানাইলাল দে, ঠাকুর বাড়ীর অভিনয়ের সহিত তুলনা করিয়া আমাদের নিকট প্রকাশ করেন যে, তিনি তথায় বলিয়া আসিয়াছেন,—"আপনাদের অভিনয় সোনার খাঁচায় পাঁড়কাক পোরা।"

আমি অর্দ্ধেন্দুর "হরবিলাসের" সম্বন্ধে পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। শ্যাম-বাজারের রাজেন্দ্রনাথ পালের বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণে রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত; দৃশ্যপটগুলি ধর্মদাস বাবুর তুলিতে অঙ্কিত, সামান্য চাঁদার অর্থে কার্য্যসম্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু অভিনয়ের সুখ্যাতি এত বিস্তৃত, যে দলে দলে লোক টিকিটের জন্য উমেদার। যদিচ বৃহৎ প্রাঙ্গণ, তথাপি স্থানাভাবে বহু টিকিট প্রার্থীকে বঞ্চিত করিতে হইত। এ অবস্থায় টিকিটের দাম করা যাক, প্রস্তাব হইল; এবং এই প্রস্তাবই ন্যাশন্যাল থিয়েটার স্থাপনের ভিত্তি। কিছুদিন পরে নীলদর্পণের রিহার্সেল বসিল। পূর্ব্বে যাঁহারা থিয়েটার অপ্রাহ্য করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে

অনেকেই পৃষ্ঠপোষক হইলেন। নিয়মাবলী প্রস্তুত করিতে লাগিলেন,—যে সকল নিয়মাবলী বাতীত "সধবার একাদশী" ও "লীলাবতী" সুন্দররূপে অভিনীত হইয়া গিয়াছে।

নীলদর্পণের শিক্ষা-সম্বন্ধে নানাবিধ তর্ক বিতর্ক শুনিতে পাই ও মুদ্রাঙ্কিত কাগজ দেখিতে পাই। সেই সব কাগজ ও কথার বিশেষ ঘর, যাহাতে প্রতীয়মান হয় যে নীলদর্পণের রিহারস্যালে আমার কোন হস্তক্ষেপ ছিল না, কেবল অর্দ্ধেন্দুর শিক্ষাতেই সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল। আমার সংস্রব ছিল বা না ছিল, তাহা জানাইবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু নীলদর্পণ সম্প্রদায় গঠিত করিয়াছিলেন, এ কথায় অর্দ্ধেন্দুর বিশেষ প্রশংসা হয় না। কারণ উক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ ছুইবার অতি উচ্চ প্রশংসার সহিত 'সধবার একাদশী' ও 'লীলাবতী' অভিনয় করিয়াছে। নীলদর্পণে নাটককারের কৃতিত্ব 'লীলাবতীর' অপেক্ষা অধিক হইলেও 'লীলাবতীতে' নীলদর্পণ অপেক্ষা অধিক শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। যাহারা লীলাবতী অভিনয় করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেককেই চাষার শিক্ষা দিলেই যথেষ্ট হইত, কারণ কঠিন কঠিন ভূমিকা সাবিত্রী, উত্ত, সোলক বস্থ প্রভৃতি অর্দ্ধেন্দুশেখর স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'লীলাবতীতে' সম্প্রদায় যেরূপ শিক্ষিত হইয়াছিল, তাহাতে নবীনমাধব, বিন্দুমাধব, সৈরিন্ধ্রী, সরলা প্রভৃতি ভূমিকার অধিক শিক্ষার প্রয়োজন ছিল না। যথা 'লীলাবতীর' শ্রীনাথের পক্ষে নীলদর্পণের দাশুরাম বিশেষ কঠিন নয়। নীলদর্পণে আমার কোন সংস্রব ছিল না, ইহা প্রমাণ করিয়া যিনি অর্দ্ধেন্দুশেখরের বিশেষ প্রশংসার চেষ্টা করিবেন, তাহাতে তিনি কৃতকার্য্য হইবেন না। অর্দ্ধেন্দুশেখরের সহিত নীলদর্পণের শিক্ষার অংশ না হোক্, সধবার একাদশী ও লীলাবতী শিক্ষার ভাগী শ্রীযুক্ত রাধামাধব করও রাখেন। নীলদর্পণ শিখাইবার অংশ অন্যাবধি জীবিত বর্ত্তমান বাবু আমাকে কাগজ-কলমে দেন। নীলদর্পণ সম্প্রদায়ের অনেকেই মহেন্দ্রলাল, মতিলাল, কাত্তেন বেল, শিবচন্দ্র প্রভৃতি আজীবন আমাকে গুরু বলিয়া গৌরব করিতেন। যাহার অপর প্রশংসা নাই, তাঁহার পক্ষপাতী ব্যক্তি যদি সত্যের অপলাপ করিয়া তাঁহার প্রশংসা বৃদ্ধির প্রয়াস পান, তাহাতে ফল না হোক্, কতক পরিমাণে মার্জ্জনীয় হইতে পারে। 'নীলদর্পণ' লইয়া আমার সহিত অর্দ্ধেন্দুর বিবাদ কেহ কেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু উহা অমূলক। ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপনের কর্তৃত্বভার শ্রীযুক্ত বর্ত্তমান সুর ও

জনমেজয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্ত ছিল না। নরেন্দ্রনাথ কুড় কুড় অংশের শিক্ষাও দিতেন। কলিকাতা ষ্টার থিয়েটারের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুও এ কর্তৃত্বের দাবী রাখেন। তিনি এই নীলদর্পণে 'সৈলাবতীর' ঝীরোদবাসিনী চলিয়া যাওয়ার সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকা পান ও এই তাঁহার প্রথম নাটক শিক্ষা। যে সময়ে অমৃত বাবু নীলদর্পণে যোগ দেন, সে সময়ে আমি না থাকিবার কারণ কোনও বিবাদ নয়, মতের অনৈক্য মাত্র। আমার রচিত গান "পৃথ্বেশী বহিছে তিরোধার" তাহার প্রমাণ। গানের শেষ এই—"প্রাণ মাহাত্ম্যে হাতী শুঁড়ি পয়সা যে দেখে যাহার।" গ্রাসানাল থিয়েটার নাম দিয়া, গ্রাসানাল থিয়েটারের উপযুক্ত সাজ-সরঞ্জাম যাতীত, সাধারণের সম্মুখে টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় করা আমার অমত ছিল। কারণ একেই তো তখন বাঙ্গালীর নাম শুনিয়া ভিরমাতি ঘুম বাঁকাইয়া যায়, এরূপ হৈহৈ অবস্থা গ্রাসানাল থিয়েটারে দেখিলে কি না বলিবে— এই আমার আপত্তি। গ্রাসানাল থিয়েটার নামে অনেকেই বুঝিবে যে ইহা জাতীয় রঙ্গমঞ্চ, বঙ্গের শিক্ষিত ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের সমবেত চেষ্টায় ইহা স্থাপিত। কিন্তু কয়েকজন যুবক যুবা একত্র হইয়া কুড় সরঞ্জামে গ্রাসানাল থিয়েটার করিতেছে, ইহা বিসদৃশ জ্ঞান হইল। এই মতভেদ। সে সময় টিকিট বেচিয়া টিকিটের অর্থ আত্মসাৎ করিবেন, এমন দুই একব্যক্তি পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন। তাঁহারাই এই মতভেদকে শত্রুতা বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বাস্তবিক শত্রুতার কোন কারণ ছিল না। গ্রাসানাল থিয়েটারের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। বলিয়াছি, তখন আমার সময় ছিল না। কিন্তু যখন রুক্মকুমারীর অভিনয় হইয়াছিল, তখন আমায় যোগ দিতে হয়। ভীমসিংহের ভূমিকা আমার উপর অর্পিত হইল। বর্ণিত মতভেদ এই সময় কিছু বিস্তৃত হইয়া বিচ্ছেদের আকার ধারণ করে। আমি আমার নাম **Amateur** বলিয়া বিজ্ঞাপিত না হইলে, অভিনয় করিতে অসম্মত হই। অর্থলোভী ব্যক্তিরা আমার যোগদানে তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে না, এই আশঙ্কায় ওরূপ বিজ্ঞাপন দিতে আপত্তি করিলেন। অকৌশলেও সে আপত্তি বুঝাইতে তাঁহারা সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু উক্তরূপ বিজ্ঞাপিত না হইয়া আমি রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতে একান্ত আপত্তি করায় ভীমসিংহ— **By a distinguished amateur** বাকাতে প্রকাশিত হয়। যথা আশ্বিনে জোড়াসাঁকোর সাধারণ বাটীর প্রাঙ্গণে অভিনয় করা

অসময় ৩৪৫ার ন্যাশন্যাল থিয়েটার বন্ধ হয়। প্রকৃত বিবাদ এই সময়। অর্দ্ধেন্দু অর্থ কোথায় থাকিবে, নাম-সম্ভ্রম কে রাখিবে ?— বিবাদ এই লইয়া। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিবাদ নয়, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিবাদ, বন্ধুতা ও কাজ-করণে সর্ব্বত্র প্রকাশিত। প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোন কারণই ছিল না। যে যে নাটক আমরা একত্রে অভিনয় করিয়াছি, প্রত্যেক নাটকেই আমার নায়কের ( Hero ) ভূমিকা এবং অর্দ্ধেন্দুর হাস্যরসোদ্দীপক ভূমিকা ছিল। "নীলদর্পণ" দেখিয়া গিরিশ বাবু স্বয়ং আক্ষেপ করিয়াছিলেন যে ইহাতে একজন যোগ্য গম্ভীর অংশের ( Serious part ) actor যোগদান করে নাই। ভিন্ন রসের অভিনয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় না। অমূলক সংবাদের প্রতিবাদ অর্দ্ধেন্দুর জীবনীর উপযোগী বিবেচনায় যথন বর্ণনা করিলাম।

বিবাদ মীমাংসা হইল না, দুইটী দল হইল। দুই দলেরই ইচ্ছা যথাস্থলে অভিনয় করে। এক দলে অর্দ্ধেন্দু আর এক দলে আমার থাকা না থাকা সমান, কারণ ন্যাশন্যালে যেরূপ আমার শক্তি, সুযোগ ও ইচ্ছা ছিল না। ৺হরেন্দ্রলাল নিয়োগী দ্বিতীয় দলের প্রকৃত পরিচালক, শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস সুর সেই দলে ছিলেন। যে দলে অর্দ্ধেন্দু ছিলেন, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুও সেই দলে। অবশেষে দলাদলের মধ্য উভয়ে অস্থিতে অস্থিতে বুঝিয়াছিলেন। দলের পরিচালক যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের অর্থ-পিপাসায় ন্যাশন্যাল বিভক্ত হইয়া যায়, এখনও মধ্যে মধ্যে আজও আলোচিত হইয়া থাকে।

ন্যাশন্যাল থিয়েটারের পরিচয় ও অর্দ্ধেন্দুর কৃতিত্বের বিষয় পাঠককে যথাযথ পরিমাণে অবগত করিয়াছি। তৎপরে শ্রীযুক্ত মধুসূদন নিয়োগীর অর্থব্যয়ে, শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস সুরের শিল্পনিপুণতায় গড়ের মাঠে দুইস থিয়েটারের অনুকরণে গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার উপস্থিত মিনার্ভা থিয়েটারের জমীতে প্রস্তুত হয়। প্রথম অভিনয় রজনীতে থিয়েটার বাটীর সম্মুখভাগে হঠাৎ সামান্য আগুন ধরে, তাহাতে অভিনয় বন্ধ হইয়া যায়। গ্রেট ন্যাশন্যালে প্রথম উল্লেখযোগ্য অভিনয় "সতী কি কলঙ্কিনি ?" প্রারম্ভে আমার তত হয় নাই, ক্রমে তৎকালে প্রকাশিত অভিনয় যোগ্য নাটকসকল পুরাতন হইয়া আসিল, তাহাতে আর অর্থাগম হয় না। আবার আমার প্রয়োজন পড়িল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সকল নাট্যাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া অভিনয় চলিতে লাগিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র Panto-mimeএরও আবশ্যক হইল। একদিন এক রজনীর জন্য বুধবারে চারি পাঁচখানি প্যান্টোমাইম বিজ্ঞাপিত হইল, শনিবারে অভিনয় হইবে—কিন্তু Pantomimeএ

এক খানিও প্রস্তুত হয় নাই। শুক্রবার রাত্রি ৯টার সময় অপর পক্ষ হইতে এক রকম চলিল, কিন্তু 'মাউসি' নামে একখানি বিজাতিতে প্রহসন দিখিবার সাবকাশ রহিল না। স্থির হইল আমি, অর্দ্ধেন্দুশেখর, অভিনেত্রী শ্রীমতী ক্ষেত্রমণি তিনজনে মিলিয়া অভিনয় করিব। অভিনয় হইল,— অর্দ্ধেন্দুর কৃতিত্ব সমান প্রস্ফুটিত রহিল। পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, মহলা দেওয়া ব্যতীত কিরূপে ঐ সকল কার্য্য সম্পন্ন হইত? পক্ষান্তরে হইল, তাহারও তো মহলা দেওয়া প্রয়োজন? এরূপ বিস্ময় জন্মিতে পারে, কারণ পাঠক জানেন না, যে ন্যাশান্যাল থিয়েটার হইতেই প্রম্‌টার নামে একজন বেশধো অভিনয়কারী সৃষ্টি হইয়াছে। প্রম্‌টারের বলেই ন্যাশান্যাল থিয়েটারে নূতন নূতন নাটক বুধবার ও শনিবারে হইত। ইহাতে রঙ্গালয়ের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা আজও চলিতেছে। তবে অর্দ্ধেন্দুশেখরের অভ্যস্ত নৈপুণ্যে সে সময়ে সকল দোষ চাপা পড়িত।

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে অর্দ্ধেন্দুশেখরের প্রহসনের কথায় যোগদান করিয়া নাটকের উৎকর্ষ সাধন করিতেন। একটী দৃষ্টান্ত দিই,— নাটকে জলধর কবিতা রচনা করিয়াছেন;—

"মালতী মালতী মালতী ফুল
মজালে মজালে মজালে কুল।"

জলধর-অর্দ্ধেন্দু কবিতার এক ছত্র রচনা করিয়াছেন—

মালতী মালতী মালতী ফুল

দ্বিতীয় ছত্র আর হইয়া উঠিতেছে না— নানাপ্রকার চেষ্টা হইতেছে, বহু কষ্টে দ্বিতীয় ছত্র রচিত হইল—

"বিঁধেছে পাপ্‌ড়িতে বোল্‌তার হুল"

কিন্তু ছত্রটী জলধরের মনোনীত হইতেছে না। কারণ 'পাপ্‌ড়ী' এ কথাটী 'বিঁধেছে'র দিকে দেওয়া যায়, কি বোল্‌তার হুলের দিকে দেওয়া যায়? এই পাপ্‌ড়ি এদিকে কি ওদিকে দেওয়া যাইবে, ইহার আলোচনা পুনঃ পুনঃ হইতে লাগিল। পাপ্‌ড়িতে পাপ্‌ড়িতে— উহা জলধরের মনোনীত হয় না। শেষে বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় মনে উঠিল,—

মজালে মজালে মজালে কুল।

যখন পাপ্‌ড়ি লইয়া ব্যাকুল, তখন দর্শক হাসিয়া আকুল। 'মরণো রোশেনায়' ভাদুলাল, সরকার একাবলীর নিমচাঁদের অনুকরণ। নিমচাঁদ

র্থ ও গাজাখোর হইলে যেরূপ চলনা সম্ভাবনা, ছাতুলাল তাই। এ গাজাখোর নিমচাঁদের ন্যায় মদমত্ত ও উচিত বক্তা, নিমচাঁদের মদের গ্লাসের ন্যায় গাঁজার ছঁকো হাতে করিয়া অভিনয় করিতে হয়। অর্দ্ধেন্দু-ছাতুলালের গাঁজার কল্কে চটিতে চটাৎ আগুন পড়িয়া গেল। এই— যাহার সহিত অভিনয় হইতেছিল, তাহার প্রতি ছাতুলালের তাড়না,—"হামারা পা পুড়িয়ে যাতা হায়, তোম্ দেখ্‌তা নাই?" তাড়িত অভিনেতা অবাক! তাহার ভূমিকায় (Part) তো এরূপ কোন কথা নাই। ছাতুলালের তাড়না বাড়িল, সে পলাইবার চেষ্টা করে, তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া অভিনয় চলিল। এরূপ দিন দিনই উদ্ভাবন পাওয়া যাইত। "চারুমুখীহরণে" ধনদাসের অংশে উচ্চ-হাস্যোদ্দীপক কথা কিছু নাই। অভিনয় করিতে করিতে অর্দ্ধেন্দু কিছু বিরক্ত। রঙ্গমঞ্চে বরেন্দ্রসিংহ আছে, মজলেশের রাজার দূতের সহিত ধনদাসের বাদানুবাদ চলিতেছে, বরেন্দ্রসিংহ উত্তরদানে উৎসাহ দানে বাদানুবাদ বাড়াইতেছেন। ধনদাস-অর্দ্ধেন্দু দেখিলেন, তেমন হাসিতো হয় না:—আর মজলেশের দূত কোথায় যাইবে, মাথায় দুই আছড়! মজলেশের দূত তো রাগিয়া প্রস্থান করুক, বরেন্দ্রসিংহ অবাক্ হইয়া দাঁড়াক, অমনাত করিয়া ধনদাস কলাপাতার ভেঁপু পোঁ করিয়া ফুঁকিয়া বিজয় ঘোষণাপূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। অনেকে উহাতে আপত্তি করিয়াছিলেন যে এরূপ ভাল নয়। কিন্তু ধনদাসের চরিত্র যেরূপ বর্ণিত, যেরূপ তাহাকে রাস্তায় রাস্তায় ভ্রমণ করিতে দেখা যায়, তাহাতে এ বর্ব্বরতার চরিত্র অনুযায়ী ব্যতীত হয় নাই। ধনদাসের ভূমিকা বটে, কিন্তু অর্দ্ধেন্দু ধনদাস, ইহা প্রকাশ পাইল। এরূপ করায় কখনও যে ক্ষতি না হইত, তাহা নয়, কিন্তু অর্দ্ধেন্দু দর্শকের এতদূর প্রিয় ছিলেন, যে ক্ষতি বৃদ্ধি গণ্য হইত না। আমোদের স্থলে আমোদই হইত।

গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারের পর অর্দ্ধেন্দু বহু স্থান ভ্রমণ করেন। এই সময়ে বহু নাট্যসম্প্রদায় তাঁহার দ্বারা শীক্ষিত হয়। নব্যবঙ্গের বাবুদের প্রতিষ্ঠিত নাট্যসম্প্রদায় গঠন অর্দ্ধেন্দুর একরূপ কার্য্যের শেষ।

যেন ভ্রমণ করিয়া যে সময় কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইতেন, প্রায়ই যে রঙ্গমঞ্চে তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত অভিনেতারা থাকিতেন, তথায় যোগদান করিতেন। যখন ৺প্রতাপচাঁদ জহুরী, গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারের অধিকারী হইয়া, ন্যাশন্যাল থিয়েটার নাম দিয়া আবার তত্ত্বাবধানে থিয়েটার চালেন, সে সময়ে অর্দ্ধেন্দু বিদেশে। প্রতাপচাঁদকে নূতন রঙ্গপট ও পরিচ্ছদাদি প্রস্তুত

করিতে হইয়াছিল। পূর্বোক্ত ব্যবহৃতকারীর অর্থ-পিপাসায় পুরাতন দৃশ্যপট ও সাজসরঞ্জামাদি লোপ হইয়াছে। প্রসিদ্ধ নট ৺মহেন্দ্রলাল বসুর পর্যবেক্ষণে নূতন সরঞ্জাম প্রস্তুত হইল। এই সময়ে আমি পার্কার সাহেবের অফিস পরিত্যাগ করি, এবং রঙ্গালয় আমার উপজীবিকা-স্থান হয়। তদবধি অর্থশোষকেরা দূর হইতে দেখিতেন, রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিবার আর উপায় রহিল না। এই সময় হইতে রঙ্গালয়ের বাহিরে ব্যবসায়ী আমার বিপক্ষে ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল দর্শিল না। পরে নানাকারণে প্রতাপ-চাঁদের সহিত অবনিবনাও হওয়ায় ৺গুর্মুখ রায়ের অর্থে তাঁর থিয়েটার স্থাপিত হইল। আমার একদল কোহিনুর থিয়েটার, তাঁর থিয়েটার ঐ স্থানে নির্মিত হয়। সে সময়ে প্রতাপচাঁদ ৺কেদারনাথ চৌধুরীকে ম্যানেজার করিয়া থিয়েটার চালাইবার চেষ্টা করেন। অর্দ্ধেন্দুও কেদারনাথের সহিত মিলিত হন। প্রতাপ-চাঁদের থিয়েটার বসিল না, কেদারনাথের "ভ্রমরতক" নাটক তাহার শেষ অভিনয়।

কিছুদিন পরে ৺গোপাললাল শীল তাঁর থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চ ক্রয় করেন। তখন থিয়েটার গুর্মুখ রায়ের নয়, উপস্থিত তাঁর থিয়েটারের স্বত্বাধিকারীগণের। তাঁর থিয়েটার সম্প্রদায় চাকায় অভিনয়ার্থে গমন করিল। কেদারনাথ পরি-চালিত গোপাললাল শীলের অর্থে রঙ্গমঞ্চ পরিবর্দ্ধিত ও অর্দ্ধেন্দু প্রভৃতি অভিনেতাগণ সম্মিলিত এমারেল্ড থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইল। তাহার প্রথম অভিনয় কেদারনাথ বিরচিত পাণ্ডব-নির্ব্বাসন নাটক। দুই চারি রজনী অভিনয়ের পর গোপাললাল আমায় তাঁহার থিয়েটারে গ্রহণ করিলেন। কেদারনাথের পরিবর্ত্তে আমায় ম্যানেজার নিযুক্ত করেন। কেদারনাথ চলিয়া গেলেন, অর্দ্ধেন্দুও তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন।

পরে যখন শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় মিনার্ভা থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন আমি ও অর্দ্ধেন্দু পুনর্ব্বার একত্রিত হই। যদ্যে তিনি নানাস্থান ভ্রমণ করেন। মিনার্ভার প্রথম অভিনয় ম্যাক্‌বেথ— তাহাতে Porter, Witch, Oldman ও Doctor এই চারিটী অংশ গ্রহণ করেন। এই অভিনয়ে তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠা পুনরুজ্জীবিত হইল। পরে আবুহোসেনে 'আবুহোসেন', মুকুল মুঞ্জরায় 'বসন্তরায়', জনার 'বিদূষক' প্রভৃতি অভিনয়-দক্ষতায় নবশ্রেণীর দর্শক চমৎকৃত ও প্রত্যেক নাট্যামোদীর মুখে অর্দ্ধেন্দুর কুশলী ব্যাখ্যা। জনার 'বিদূষক' দুই চারি রজনী অভিনয়ের পর তিনি স্বয়ং স্বত্বাধিকারী হইয়া

থিয়েটার চালাইবেন— এই অভিপ্রায়ে এমারেল্ড থিয়েটার ভাড়া লইলেন। কতকগুলি অভিনেতাও তাঁহার থিয়েটারে যোগদান করিলেন। এটী অর্দ্ধেন্দুর জীবনে একটী ভ্রম। তিনি অভিনেতা ছিলেন, বিষয়ী ছিলেন না। তিনি শিক্ষা দিতে জানিতেন, কিন্তু কিরূপে সকল দিক সামলত রাখিয়া থিয়েটার চালাইতে হয়, তাহা জানিতেন না। যখন নূতন নাটকের অভিনয়ের তারিখ বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, সকলকে বিশেষ শিক্ষা দিবার প্রয়োজন, বড় বড় অংশ, যাহাতে সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টি হয়, তাহার বিশেষ চেষ্টা আবশ্যক, কিন্তু অর্দ্ধেন্দু কোন এক ক্ষুদ্র অংশ ভাল হয় নাই, তাহা কিরূপে সম্পূর্ণ হইবে, তাহারই জন্য চিন্তিত। যাহারা বড় অংশ গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা শিক্ষা গ্রহণের জন্য উৎসুক হইলে বিরক্ত, ক্ষুদ্র অভিনেতা কোনওরূপে শিখিতেছে না, অর্দ্ধেন্দু তাহাকে কোনরূপে শিখাইবেনই। যদি কোনও অভিনয়-শিক্ষালয় থাকিত, যথায় ছাত্রেরা শিক্ষিত হইয়া রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিবে, তাঁহার এরূপ শিক্ষাদানে প্রশংসার হইত, কিন্তু রঙ্গালয়,—কার্য্য চালাইতে হইবে, অভিনয় রাত্রি বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, এখন আর সময় অপব্যয় করিবার নয়, ইহা তিনি শিখাইবার ভেবে বুঝিতেন। তাঁহার কার্য্যে কেহ বাধা দিলে অতিশয় বিরক্ত হইতেন, নিখুঁত না হইলে সে অভিনেতার নিস্তার নাই। এরূপ কার্য্যের ফলাফল তিনি স্বয়ং থিয়েটার করিয়া, অল্পদিনের মধ্যেই বুঝিয়াছিলেন। এই প্রকার নানা বিষয়ে কার্য্যের উপযোগিতা তিনি বুঝিতেন না, এ নিমিত্ত ঋণগ্রস্ত হইয়া তিনি থিয়েটার রাখিতে পারিলেন না।

কবি, নট, চিত্রকর প্রভৃতির প্রায়ই বিষয়বুদ্ধি কম হইয়া থাকে। চিন্তার পাছে বিঘ্ন হয়, এ নিমিত্ত বিষয়ীর সংসর্গ প্রায়ই তাঁহারা পরিত্যাগ করেন। যাঁহারা বিষয়ী, তাঁহারা কিসাসের এক পয়সার জন্য মামলা-মকদ্দমা করিতে, এক পয়সার জন্য মাসাধধি খাতা উল্টাইয়া দেখা মিলাইবার নিমিত্ত বিব্রত থাকিতে, এক পয়সা খরচ কমাইবার জন্য তিন দিন মস্তিষ্ক ঘামাইতে কিছুমাত্র ক্লেশ বিবেচনা করে না; কিন্তু নট প্রভৃতি যাহারা কল্পনার পথে দিবারাত্র বিচরণ করেন, তাঁহাদের বিষয়কর্ম্মের ভিতর একবার আহারের চেষ্টা থাকে, তাহা ফুরাইলে আবার কল্পনায় বিভোর হইয়া পড়েন, বৈষয়িক সংসর্গ তাঁহাদের একেবারেই বিরক্তিকর। অর্দ্ধেন্দুশেখরের জীবনী ইহার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থল। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, প্রভাবশালী আত্মীয়ের বিশেষ উপেক্ষা করিয়াছেন, যাঁহাদের পুত্র-কলত্র কিছুরই তোয়াক্কা রাখিতেন না। যাহার

চলিলেই চটল, তাহার পর যাহা হউক না কেন, থিয়েটার লইয়াই আছেন। কখনও বা ছাত্রমুলক কোনও শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিতেছেন, কখনও বা নাটকের অংশ লইয়া বাদানুবাদ করিতেছেন, কখনও বা কোনও চরিত্রের উপযোগী পরিচ্ছদ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিতেছেন, কখনও বা কোথায় কিরূপ কোন নাটক অভিনীত হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করিতেছেন, কখনও বা কোন নাটককার, রচিত নাটক লইয়া আলিয়াছে শুনিতেছেন, শ্রোতারা সকলে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া চলিয়া গেল, অর্দ্ধেন্দু অটল ভাবে বসিয়া আছেন, হয়তো গ্রন্থকার পণ্ডিতে হাস্য কিন্তু অন্যান্য অর্দ্ধেন্দু "পড়ে যাও ভাই!" বলিয়া উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। অনেক সময় দেখা গিয়াছে, রঙ্গালয়ে আর কেহ কোথাও নাই, এক চেয়ারে গ্রন্থকার অন্য চেয়ারে অচল অটল অর্দ্ধেন্দু, বিরক্তির লেশমাত্র মুখে অঙ্কিত নাই। উপর্য্যুপরি সাতদিন গ্রন্থ পাঠ করিয়াও অর্দ্ধেন্দুর ধৈর্য্যচ্যুতি করিবার কাহারও ক্ষমতা ছিল না। গ্রন্থকারের পাঠ কথা শেষ হইয়াছে, এইবার তাঁর বড় বিপদ। অর্দ্ধেন্দু তাহার প্রতি চরিত্র সম্বন্ধে উপদেশ আরম্ভ করিয়াছেন, সে নিজ রচিত চরিত্র সম্বন্ধে বুঝুক না বুঝুক, অর্দ্ধেন্দু পুঙ্খানুপুঙ্খ তাহার নাটকের চরিত্র বিশ্লেষণ করিতেছেন। যদি কোন গ্রন্থকার ছুটের বশতঃ বলিত যে আমার তো এরূপ লেখা নাই, অর্দ্ধেন্দু বলিত, "খোল ভাই তোমার খাতা খোলো।" গ্রন্থকারকে খাতা খুলিতেই হইবে, এবার তাহার আরও বিপদ, তাহার আসল আবার অন্যান্য স্থান খুলিতে বলিবেন, তাহা হইলে আজ আর তাহার বাড়ী ফেরা হইবে না। যদি কেহ অর্দ্ধেন্দুকে বলিত, "মশায়, ও সব কি শোনেন?" অর্দ্ধেন্দু গম্ভীর হইয়া বলিতেন, "আমরা না শুনিলে উহারা শিক্ষা পাইবে কোথায়?" কোন রঙ্গরসের কথা যে কেহ সে সময় শুনিতে চাহিত, অর্দ্ধেন্দু শুনাইতে প্রস্তুত, বিতীয় বার অনুরোধ করিতে হইত না; রঙ্গরস অর্দ্ধেন্দুর জীবন ছিল। অর্দ্ধেন্দু সমাজে সর্ব্বজন প্রিয় ছিলেন, যথায় বসিতেন, আনন্দের স্রোত চলিত, কিন্তু বিচারকালে বসিলে অভিনেতা-অভিনেত্রীর সর্ব্বনাশ। কাহাকে শিক্ষা দিতেছেন, এমন সময় এক কোণে কেহ কাহারও নিকট একটী পান চাহিয়াছে, অর্দ্ধেন্দু অমনি সেইদিকে ব্যাঘ্রের ন্যায় চাহিলেন, যাহাকে শিক্ষা দিতেছিলেন, তাহাকে বলিলেন, "থাম বাবুদের কি কথাবার্ত্তা হইতেছে, তাহা শেষ হোক, তাহার পর কার্য্য হইবে।" কেহ উঠিয়া গেল, পানের পথ হইয়াছে, অমনি ছাত্রকে বলিলেন, "স্থির হও, আর কে কে উঠিয়া যাইবেন যান, তার পর নিশ্চিন্ত হ'য়ে কার্য্য আরম্ভ করি।"

তাহার শিক্ষা প্রদানে এরূপ আগ্রহ ছিল, সে সামান্য বাধাবিঘ্নে চঞ্চল হইয়া উঠিতেন, কিন্তু যখন বিদায়গ্রহণ করিতেন, অতি ক্ষুদ্র অভিনেতাও তাঁহার বন্ধু। বন্ধুভাবে এখনে কথাবার্ত্তা, চোখের আয়োজন, এখনে উপদেশ প্রদান, — এইরূপে বায়োস্কোপের মতো এপারো মাস কাটিয়া যাইত। অর্দ্ধেন্দুর থিয়েটারে নিয়মাবলীও কঠিন ছিল, অভিনয়ে নেপথ্যে সৈন্যগণের "আল্লা আল্লা হো" শব্দ করিবার আবশ্যকতা। নেপথ্যে দুই একজন মাত্র "আল্লা আল্লা হো" শব্দ করে, তাহাতে জমাট হয় না। অর্দ্ধেন্দু নিয়ম করিলেন, যখন "আল্লা আল্লা হো" করিবার প্রয়োজন হইবে, তখন যে যেখানে থিয়েটারে যে অবস্থায় আছ, একবার "আল্লা আল্লা হো" শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিলেই, সকলকে "আল্লা আল্লা হো" শব্দ করিতে হইবে। কেহ হুঁকা হাতে করিয়া "আল্লা আল্লা হো" করিতেছে, কেহ মুখের খাবার ফেলিয়া "আল্লা আল্লা হো" করিতেছে, কাহারও কাহারও চলের গ্লাস হাতে কেহ বা বেঞ্চিতে শুইয়া একটু তন্দ্রাবস্থায়, কেহ বা পাইখানায়— সেই অবস্থাতেই "আল্লা আল্লা হো" করিতে হইবে, সাহেব সিবিা দিয়াছে।

অভিনেতৃগণের প্রতি অর্দ্ধেন্দুর অপেক্ষ ছিল, প্রয়োজন হইলে বেতনে আমরা দুই টাকা বেশী মনে করিতাম, অর্দ্ধেন্দু পাঁচ টাকা দিতেন। কেহ যাইতে চাহিলে যেরূপে পারেন তাহাকে পরিতৃপ্ত করিয়া পাঠাইবেন। সামাজিকতায় অর্দ্ধেন্দু আমীর অপেক্ষা আমীর ছিলেন।

অর্দ্ধেন্দুর যশ যে কেবল বঙ্গদেশ ব্যাপ্ত, এরূপ নহে। ভারতবর্ষে যে স্থানে দশজন বাঙ্গালী মিলিয়া নাটকের কথা হয়, সেই স্থানেই অর্দ্ধেন্দুর নাম প্রচার; সকলেই অদ্বিতীয় অভিনেতা বলিয়া জানেন। কিন্তু অর্দ্ধেন্দুর ভাগ্য যেরূপ প্রসন্ন ছিল না, সে বাঙ্গালার ভাগ্য কেবল অর্দ্ধেন্দুর ভাগ্য নয়। Variety Theatre অর্থাৎ যে স্থলে নানাবিধ রসের কৌতুক কলাপ হইয়া থাকে, এরূপ থিয়েটারের দর্শক বাঙ্গালায় যথেষ্ট নাই। এরূপ দর্শক থাকিলে, অর্দ্ধেন্দু একক মস্ত সাহায্য লইয়া "দেবকাননের" ন্যায় প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতেন। উপস্থিত হাবভাবের পরিবর্ত্তন করিতে অর্দ্ধেন্দুর ন্যায় সুনিপুণ কলাবিদ বিশাল পৃথিবীতে অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, অর্দ্ধেন্দু সকল স্থানেই অর্দ্ধেন্দু। নীলদর্পণে "গোলক বসুর" অভিনয় হইতেছে, কিন্তু তাহাতেও 'অর্দ্ধেন্দুত্ব' একটু টিপ্‌নি আছে। চাষা হাঁ করিয়া বলিয়া ঢুলিতে ঢুলিতে একটী মশা যাইল, অমনি 'অর্দ্ধেন্দুত্ব'। "রক্তা" ও "উড়"

সাহেব সাজিয়া নৃত্য, ইহাতে অর্দ্ধেন্দু প্রকট। "আবুহোসেনে" সখীদের সহিত পিটবয়, মাথায় চক্রে ছড়াইয়া সখীভাবে নৃত্য, "কুত্তা শালিদের থাকে যৌ" প্রহসনে গলা খানসামাকে খানসামাগিরি শিক্ষা দেওয়া, চেঁচে কাহারও সাজিয়া স্টেজ হইতে বিলম্ব হইতেছে,— নাটকের কথাবার্ত্তা বন্ধ রহিয়াছে, হঠাৎ নেপথ্য হইতে একজনকে টানিয়া আনিয়া তাহার সহিত কথা কওয়া; 'নীলাবতীতে' হরবিলাস বসিয়া আছে, (কাহার আসিতে বিলম্ব হইতেছে, আমার স্মরণ হয় না) অর্দ্ধেন্দু বলিলেন, "জমাদার সাহেব, তোমার আসামী পটুকেছে, এখন তুমিই আসামী আর জমাদার দুই হ'য়ে যাও, আমাদের কাজ চলুক। (দর্শকগণকে দেখাইয়া) বাবুরা সব ব'সে আছেন।" এ সমস্ত কাহারও বিসদৃশ লাগিত, অপর কেহ করিলে যে বিসদৃশ হইত না, তাহা নহে, কিন্তু অর্দ্ধেন্দুর অতুল প্রতিভায় সমস্ত ঢাকিয়া যাইত। ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি— যদমক্ষ দ্রব্যকর্ত্তা, ইহা কলাবিদ্যা, স্বভাব নয়। ইহা বুঝাইবার এখনে পুনরুক্তির চেষ্টা পাইব,— আমরা দেখিয়াছি,—"শ্রীমন্তের মশান" যাত্রা হইতেছে, যাহারা দারোগান সাজিয়াছে, তাহারা "ভোঁকি ব্যাটা—ভোঁকি" বলিয়া হাসাইবার চেষ্টা করিতেছে। কদাচিৎ এই, শ্রীমন্ত চণ্ডীর স্তব করিতে চাহিয়াছে, কোতোয়ালেরা বলিতেছে "ডাক বেটা চণ্ডীকে ডাক"। শ্রোতারা হাসিতেছে, শ্রীমন্তের হাতে লাল রুমাল ঝুলান, পীড়নের কোন চিহ্নই নাই। শ্রীমন্ত গান ধরিল—"মা, কোথায় আছিস্ সতী। পড়ে ঘোর দায়, ডাকি মা তোমায়, বন্ধন আমায় ঘুচাও যদি।" ইহাতে শ্রোতারা অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। লাল রুমাল হাতে ঝুলানোতে বন্ধন-জ্বালা কিছুই লক্ষিত হইতেছে না, তথাপি শত শত ব্যক্তির অশ্রু বিগলিত, সঙ্গীতে শ্রীমন্তের মশান উদ্দীপন করিয়াছে; বলিতেছে "আহা 'লোকা' কি গায়!" কিন্তু শ্রীমন্তের ভাবে বিমোহিত! অর্দ্ধেন্দুর অভিনয়ও সেইরূপ। "মুকুল মুঞ্জরায়" বঙ্গচাঁদের অভিনয় বিশেষ মনে আছে, তাহারই দৃষ্টান্ত দিই;— মনের ভিতর বঙ্গচাঁদ বসিয়াছিল, মন্ত্রী আসিয়া চিনিয়াছে, বঙ্গচাঁদ আত্মগোপনের চেষ্টায় "আমি কেলোর মা'র কেলো" প্রভৃতি যাহা মুখে আসিল— তাহা বলিল। সকলেই দেখিতে লাগিল যে অর্দ্ধেন্দু, কিন্তু আত্মগোপন বঙ্গচাঁদ সকলেরই মনে অঙ্কিত হইল। অভিনয়কালে অর্দ্ধেন্দু যেন সকলকে বলিতেন— আমি অর্দ্ধেন্দু;— যে অংশ দেখিতে চাও তাহা এইরূপ, যেন দর্শকের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কার্য্য হইতেছে। কিন্তু দর্শক যাহা দেখিতে চান, তাহাও ঠিক দেখিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অর্দ্ধেন্দুকেও দেখিতেন।

অর্দ্ধেন্দু স্বদেশ-অনুরাগও বিশেষ ছিল। "ভারতমাতা" প্রভৃতি ন্যাশনাল থিয়েটারে যাহা অভিনীত হইয়াছিল, সে সমস্ত অর্দ্ধেন্দুর প্রযোজনায়। যে সকল পঞ্চরং অভিনয় হইত, তাহাতে বিশেষ রাজনৈতিক কটাক্ষ ছিল এবং তীব্র ব্যঙ্গ-পরিহাসে ঐ সকল পঞ্চরং রচিত না হইলেও অর্দ্ধেন্দুর অভিনয়ে সেই ভাবের পূর্ণ বিকাশ হইত। অর্দ্ধেন্দুর ধারণা ছিল যে, রঙ্গমঞ্চ হইতে অনেক কুরীতির প্রতি দর্শকের ঘৃণার উদ্রেক করা যায়, অনেক কদাচারী দমিত হয়, নীতিশিক্ষা, রাজনৈতিক শিক্ষা, রঙ্গমঞ্চ হইতে দেওয়া যায়, রঙ্গমঞ্চের কার্য্য— দেশের কার্য্য— তাহার জ্ঞান ছিল। অর্দ্ধেন্দু বহু সদ্‌গুণবিশিষ্ট ছিলেন, কিন্তু তাহা বিকাশ হইবার এক প্রবল বাধা ছিল। যে কেহ আসিয়া স্বার্থসিদ্ধির জন্য অর্দ্ধেন্দুর আত্মীয় হইবার ইচ্ছা করিত, তৎক্ষণাৎ সে আত্মীয় হইতে পারিত এবং সেই পথ যেদিকে লওয়াইবার চেষ্টা করিত, অর্দ্ধেন্দুকে সেইদিকে লইয়া যাইতে কৃতকার্য্য হইত। বলা হইয়াছে অর্দ্ধেন্দুর অভিনেতৃগণের প্রতি বিশেষ মমতা ছিল, যাহারা অকর্ম্মণ্য, কর্তৃপক্ষীয়ের নিকট তাড়িত হইয়া অর্দ্ধেন্দুর আশ্রয় গ্রহণ করিত এবং কর্তৃপক্ষীয়ের নিন্দা রচনা করিয়া অর্দ্ধেন্দুকে শুনাইত। কর্তৃপক্ষীয় হইতে অর্দ্ধেন্দু সম্বন্ধে এ কথা উঠিয়াছে, ও কথা উঠিয়াছে, কর্তৃপক্ষ অর্দ্ধেন্দুকে অযোগ্য জ্ঞান করে, নানাবিধ নিন্দা করে, "সাহেব, আর এখানে তোমার থাকা উচিত নয়"— এইরূপে অর্দ্ধেন্দুর মনোভঙ্গ করিত। অর্দ্ধেন্দুও তাহার বিশেষ তত্ত্ব না করিয়া, সেই সকল মিথ্যাকথা প্রত্যয় করিতেন। মিথ্যা কথা বলিবারও তাহাদের কৌশল ছিল। হয়তো কার্য্যস্থলে বলা হইয়াছে, সাহেব অমন বলেন, উঁহার মতে সকল কার্য্য করা চলে না। সে অবস্থা নয়, কথার উত্তরে কথা, তাহা অবস্থাভেদে ব্যাখ্যা করিয়া অর্দ্ধেন্দুর ক্রোধ উৎপাদন করিত এবং অর্দ্ধেন্দুকে লইয়া নূতন দল বসাইবার প্রয়াস পাইত। এরূপ অনেকবার হইয়া গিয়াছে। প্রতিবারই শেষে অর্দ্ধেন্দু বুঝিতেন, কিন্তু বুঝিয়াও কোন ফল হয় নাই, আবার তাহাই হইত। অর্দ্ধেন্দুর সহিত আমার রঙ্গমঞ্চে মিলন হওয়া অবধি ক্রমান্বয়ে ষড়যন্ত্রকারী বহু ব্যক্তি জুটিয়াছিল। অর্দ্ধেন্দু তাহাদিগকে চিনিয়াও চিনিতেন না। ইহাতে বহুবিধ কষ্ট পাইয়াছেন; তাঁহার গুণবিকাশে বিস্তর বাধা হইয়াছে; কিন্তু ইহা দৈব বিড়ম্বনা। যখন শেষ অসুখের সূত্রপাত হয়, উহারূপ সুহৃৎ জুটিয়া মিনার্ভা হইতে তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করে। কোহিনূরে গিয়া পীড়ার যথেষ্ট সাহায্য করিতে হয় করিয়াছে। মৃত্যুর দুই এক ঘণ্টা পূর্ব্বে এ সুহৃৎ নিকটে ছিল। নাট্যজগতের উজ্জ্বল তারা

পশিল, ঐ সকল কপটাচারীর মুখে এখন তাঁহার নিন্দা— উনি কথা শুনিতেন না, ও অত্যাচার করিয়াছেন, ও অত্যাচার করিয়াছেন।— আমি তাঁহাদের লক্ষ্য করিয়া বলি,—"বাপু, তোমাদের মঙ্গল হউক, রঙ্গালয় যে কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইল, তাহা তোমরা স্বপ্নেও কখন বুঝিতে পারিবে না। 'জলধর' ও 'যোগেশ' অর্দ্ধেন্দুর শেষ অভিনয়। রঙ্গমঞ্চে বহুদিন আর "নবীন তপস্বিনীর" অভিনয় সম্ভব হইল না।

অর্দ্ধেন্দু চলিয়া গেলেন। ইতিপূর্ব্বে অনেক অভিনেতা যাঁহারা তাঁহার ন্যায় ইস্কুলে বেঙ্গল করিয়া থাকিতেন, তাঁহারা অগ্রে গিয়াছেন। যদি এরূপ হয় যে মৃতব্যক্তী আত্মা একত্রে বাস করে, তাহা হইলে তাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রেও যেরূপ ছিলেন, তথায়ও সেইরূপ একত্রে আনন্দ করিতেছেন। কিন্তু হেথায় "অর্দ্ধেন্দু নাই— অর্দ্ধেন্দু নাই" এই শব্দ। যিনি কখনও রঙ্গালয়ে পদার্পণ করিয়াছেন, অর্দ্ধেন্দুর মৃত্যুতে তিনিও ব্যথিত। যাঁহারা তাঁহার সহযোগী, তাঁহাদের মনে দিবারাত্র উদয় হইতেছে—"অর্দ্ধেন্দু কোথায় গেল!" ভাবিতেছে আর তাঁর দেখা পাইবে না, আর তাঁর সহিত পরামর্শ হইবে না, আর তাঁহাকে নাতনের ঘরের সহিত সজ্জা করিতে দেখিবে না, আর তাঁহার অলৌকিক অভিনয় শুনিবে না; সকলই ফুরাইয়াছে। অর্দ্ধেন্দুর স্মরণার্থে মূর্ত্তি প্রস্তুত হোক, তাহার কোন প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান হোক, যাহা হইবার হউক, স্মৃতি-চিহ্ন দেশে দেশে থাকুক, কিন্তু অর্দ্ধেন্দু আর নাই, সে আর ইহ জগতের বার্ত্তা কিছুই রাখিবে না, যোগ্যস্থান লাভ করিয়াছে, অন্য কোন উচ্চ কার্য্যে নিযুক্ত আছে, কিন্তু অর্দ্ধেন্দু কি তাঁহার প্রিয় রঙ্গালয় ভুলিবেন? কখনও না! দেবকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও যদ্যপি তিনি জানেন, যতদিন বাঙ্গালায় রঙ্গালয় থাকিবে, কেহ তাঁহাকে ভুলিবে না। রঙ্গভূমি চিরদিন তাঁহার উজ্জ্বল স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিবে। রঙ্গালয়ে অর্দ্ধেন্দুশেখর অমর।

---

## পরিশিষ্ট।

মিউনিসিপ্যাল আইনটী ভাল কি মন্দ, তাহা যাহারা আইন রচনায় বিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝুন। কিন্তু যে দিন এই আইন থিয়েটারে প্রবর্ত্তিত হয়, সে দিন স্বাধীনচেতা নট, যেন এই Anglisised আইনের বন্ধন অসহ্য জ্ঞানে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। যেন গ্রন্থকারের, অভিনেতার ও দর্শকের দারুণ অসুবিধা অনুভব করিয়া এই আইনবন্ধনে কার্য্য করিতে অসম্মত হইয়া কার্য্যস্থলে অবসর লইলেন। এ স্থলে পাঠক মনে না করেন, যে আমরা সমস্তরাত্রি অভিনয়ের পক্ষপাতী। আমাদের বক্তব্য এই, যাঁহারা এই আইন প্রস্তাব করিয়াছেন, যাঁহারা এ আইনে সম্মতি দিয়াছেন,বলিয়াছেন ১টা পর্য্যন্ত হইলেই যথেষ্ট, তাঁহারা যদি বাঙ্গালী হন, হয় সে সময় সাহেবি ফ্যাসান ঘাড়ে চাপায় বলিয়া দিয়াছেন, যে তাঁহারা বাঙ্গালী, কিম্বা বাঙ্গালা নাটকের অবস্থা ও বাঙ্গালী দর্শকের অবস্থা একেবারে জানেন না। বাঙ্গালা নাটকে পৌরাণিক বিষয় ব্যতীত যদি কোন নূতন বিষয় হয়, তাহা বুঝাইবার জন্য কতকগুলি দৃশ্য রচনার প্রয়োজন, কেবল ঘাত প্রতিঘাতের দৃশ্য রাখিলেই চলে না। সাধারণ দর্শক এত দূর উন্নত হয় নাই, যে বুঝাইবার দৃশ্য না থাকিলে তাহা বুঝিতে পারে। সমালোচকের সমালোচনা— প্রতি নাটক অভিনয়ের পরে বৃহৎ গুরুতর "বাঙ্গালায় আর এমন নাটক হয় নাই" এই পর্য্যন্ত, কি দোষ কি গুণ তাহা তাহাতে নাই। সেই সমালোচনা পাঠে পাঠকও কিছু দেখে না, কি লক্ষ্য করিবে তাহা দর্শকও বুঝিতে পারে না ;— গ্রন্থকার হয়তো একটু স্ফীত হন এই মাত্র ফল। একেই আপনার লেখায় পক্ষপাত বশতঃ দোষ লক্ষ্য করা কঠিন, তাহার উপর সমালোচক যে কোন বিদেশী উচ্চ নাটকের কথা শুনিয়াছেন বা পড়িয়াছেন, তাহার চরিত্রের সহিত আলোচ্য নাটকের চরিত্র সমান উজ্জ্বল বলিয়া দেখিতে পান। আবার একশ্রেণীর সমালোচক কখন' কখন' দেখা দেন, তাঁহারা নাক সিঁটকাইয়া আছেন, "বাঙ্গালায় নাটক নাই, অভিনয় নাই, সকলই দোষ।" বহু শতাব্দী স্থাপিত বিদেশী রঙ্গালয়ের সহিত অর্দ্ধশতাব্দী-অসম্পূর্ণ বাঙ্গালা রঙ্গালয়ের তুলনা পূর্ব্বক তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া চলিয়া যান। পণ্ডিত-প্রবর বুঝেন না, যে বাঙ্গালী দর্শকের জন্য বাঙ্গলা নাটক লিখিতে হইয়াছে। সেক্সপিয়রের নাম উল্লেখ করিয়া থাকেন, কিন্তু বুঝেন না যে, যদি সেক্সপিয়ার

যদি বাঙ্গালায় আসিয়া নাটক দেখেন, তাহা বাঙ্গালী দর্শকের বোধগম্য হইবে না। সমালোচক না হয় বুঝিয়া যাইবেন, কিন্তু অপর দর্শক তাহা পয়সা দিয়া দেখিতে আসিবে না। আমার এ কথাটী আনুমানিক নয়। যখন মিনার্ভায় "ম্যাকবেথ" অভিনয় হয়, দুই চারি অভিনয় হইবার পর রঙ্গালয় প্রায় দর্শকশূন্য হইয়াছিল। প্রথম প্রথম যে সকল দর্শক আসিয়াছিল, তাহার মধ্যে একজন আমাদের নাগালে বলেন, "আমি প্রায় দশ বৎসর থিয়েটার দেখিতেছি, কিন্তু এমন ঠকন কখনও ঠকি নাই।" তাহার পর 'আনুহোসেন' হওয়ায় অনেকে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। 'মজুল মুজরায়' দুইবার মুজুল ও তাহার পরিচয় আছে, তথাপিও কেহ কেহ বলিয়াছেন— "ভাই, ভাল বোঝা গেল না।" এই তো দর্শকের অবস্থা। তাহার পর অনেক দর্শকেরই শনি ও মঙ্গলবারে ৯টার পূর্ব্বে আসিবার অসুবিধা; কার্য্যস্থলে অবসর পাইয়া, আহারাদি করিয়া আসিতে গেলে ৯টার পূর্ব্বে আসা চলে না। ৯টায় অভিনয় আরম্ভ করিলে চারি ঘণ্টা সময় পাওয়া যায়। সেই চারি ঘণ্টার মধ্যে কম্পার্টের বিরাম দিয়া পাঁচ অঙ্কের নাটক, বর্দ্ধিত দর্শকের নিকট সাফল্যের সহিত প্রদর্শিত হওয়া যে দুঃসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, ইহা ইংরাজি-বেঙ্গল-আইনে সমভিব্যাহারে মস্তিষ্কে উদয় হয় নাই। তাঁর থিয়েটার বঙ্কিম বাবুর "চন্দ্রশেখর" নাট্যাকারে প্রবর্ত্তিত করিয়া অভিনয় করে। বঙ্কিম বাবুর "চন্দ্রশেখর" অনেকে পাঠ করিয়া, অভিনয় দর্শনে আসেন। ইহাতে ঘুরাইবার ঘুরগুলির প্রয়োজন হয় না, তথাপি ১টার মধ্যে আসিবার জন্য নাটকের আকার ছেদ করিতে ম্যানেজার বাধ্য হইয়াছেন।

অর্দ্ধেন্দুশেখরের জীবনীতে এ সকল উল্লেখ করিতেছি, পাঠক বিরক্ত হইবেন না। এই নটরাজের জীবনীতেই এই সকল কথা উপযোগী। তিনি জীবিত থাকিলে এই সকল কথা তাঁহারই মুখে শুনিতেন।

নাটককার ও দর্শকের অসুবিধার বিষয় বলিলাম। এই অসুবিধার অভিনেতাও নিস্তার পায় নাই। আমি অভিনয়ের সময় সংক্ষেপের পক্ষপাতী, কিন্তু ১টা অবধি সময় নির্দ্দীত হইবে, ইহা শুনিয়া প্রতিবাদ করিতে যাই। ২টা অবধি সময় স্থির হওয়া উচিত, আমি ফিজিনিলিপ্যাল সভায় বলি। একটী দৃষ্টান্ত দিয়া আমার মত সমর্থনের চেষ্টা পাই; দৃষ্টান্ত এই— আমি তৎপূর্ব্বে ইংরাজি থিয়েটারে "Sign of the Cross" দেখিতে যাই। তাহাতে আছে নীরোর আজ্ঞামত রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া দর্শকসমীপে বন্যপশু দ্বারা একে একে ক্রিশ্চানদিগকে বধ করা হইবে। উপস্থিত নাটকে নীরোর এই আদেশমাত্র

দর্শকবৃন্দ শুনিয়াছে। এই আদেশ যে কার্যে পরিণত হইতেছে, তাহা দুর্বা-ধনিতে ইংরাজ দর্শক বুঝিল। কিন্তু আমার সহিত দুই একজন অভিনেতা ছিল, তাহারা সে দুর্বাধনি কি, বুঝিতে পারিল না। শেষ দৃশ্যে নায়িকা মার্সিয়ার ধর্মোপদেশে, নায়ক মার্কাস, যে ক্রিশ্চানবিরোধী ছিল, বুঝিল ক্রিশ্চান-ধর্ম সত্য। নায়িকা সিংহ দ্বারা বধ হইবে, নীরোর আদেশ। সিংহ-পিঞ্জর মেলিবে— সেই পিঞ্জর মধ্যে নায়িকা প্রবেশ করিবে,— স্বইচ্ছায় নায়িকা প্রবেশ করে কিনা, তাহা দেখিতে নীরোর দূত উপস্থিত। এমন সময় মার্সিয়ার উপদেশে, মার্কাস পরিবর্তিত হইয়া, মার্সিয়ার হস্তধারণ পূর্বক পিঞ্জরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। কেবল নীরোর দূতকে বলিল—"Tell Caesar I am a Christian" অর্থাৎ সিজারকে বলিও আমি খৃষ্টধর্ম অবলম্বন করিয়াছি। এই কথার পর যবনিকা পতিত হইল। আমি এই বিষয়টী বর্ণনা করিয়া সোমাস-পুষ্ট-মস্তিষ্ক মিউনিসিপ্যাল সভাপতিকে বলিলাম যে "Tell Caesar, I am a Christian" কেবল এই ছত্রটী বাঙ্গালা থিয়েটারে যতদূর উৎকৃষ্ট অভিনেতা দ্বারা উচ্চারিত হইত, তাহাতে ইংরাজি থিয়েটারে যে ফল দেখিয়াছিলাম, তাহা হইত না। সহৃদয় পাঠক, আপনার নিকট নিবেদন করিতেছি যে আমিও একজন অভিনেতা বলিয়া কলিকাতায় পরিচিত। কিন্তু উপস্থিত দর্শকবৃন্দের সম্মুখে, কেবলমাত্র ঐ একটী পংক্তি অভিনয় করিয়া ফল-লাভ করিতে পারি না; এবং যদি কেহ পারেন— তিনি আমার পরিচিত নন। যথাযোগ্য হাবভাবের সহিত যে উক্ত পংক্তিটী অভিনয় করা যায় না, ইহা বলিতেছি না। কিন্তু সকল দর্শকের তাহাতে তৃপ্তিসাধন করা উপস্থিত অবস্থায় অসাধ্য। ইহার একটী প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দিতেছি; আমার "রাবণ বধ" দর্শকের প্রিয় হইয়াছিল। এই 'রাবণ বধে' যখন রামচন্দ্র সীতাকে অগ্নি পরীক্ষা দিতে বলেন,— তখন সীতাদেবী লক্ষ্মণকে উদ্দেশ করিয়া বলেন, "কেনরে লক্ষ্মণ তুমি না সন্ধান মোরে?" লক্ষ্মণ উত্তর দিল :—"জোষ্ঠ অগ্রগামী মাতঃ!" স্বর্গীয় মহেন্দ্রলাল, লক্ষ্মণের অংশ লইয়াছিলেন। জিজ্ঞাসাসূচক স্বরে পংক্তিটী উচ্চারিত হইয়াছিল, কিন্তু দর্শক তাহা বুঝিতে পারিল না। পরদিবস মহেন্দ্রলালের অনুরোধে, কয়েক ছত্র স্বগত উক্তি যোগ দিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। "কেন মাগো জন্মিলে জননী, দিয়াছিলে পতি বনবাস" ইত্যাদি যেমন লক্ষ্মণের মুখে নিঃসৃত হইল, অমনি করতালিতে প্রেক্ষাগৃহ কাঁপিয়া উঠিল। আমি উপরোক্তভাবে সভাপতিকে বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছিলাম, কিন্তু বৃথা,— আমার মত সমর্থনের

জন্য আমি একা,— সভাপতি আইন করিবেনই, উত্তর করিলেন—"আপনার মতে দেখিতেছি, audienceকে মুক্তাইবার জন্য সমস্ত রাত্রি থিয়েটার করিলে ভাল হয়।" আমি বলিলাম, "না, আর এক ঘণ্টা সময় চাই।" উত্তর করিলেন—"৮টার সময় থিয়েটার করো।" আর তাঁর কথার উপর কথা কি? পাঠক বিরক্ত হইবেন না, এসম্বন্ধে আর দুই একটী কথা;— যদি কেহ মনে করেন, ৪ ঘণ্টা অভিনয়-উপযোগী দর্শকের মনোহারী নাটক, অযোগ্য নাট্যকার করিতে না পারেন, প্রকৃত নাট্যকার পারেন, কিন্তু সে প্রকৃত নাট্যকার তো প্রায় চল্লিশ বৎসর রঙ্গালয়ে বেড়াইয়া দেখিতে পাইলাম না।

---

বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে অর্দ্ধেন্দুশেখর (১৮৫০-১৯০৮) ও গিরিশচন্দ্রের (১৮৪৪-১৯১২) খ্যাতি কিংবদন্তীতে পরিণত। বলতে গেলে তাঁদের দু'জনের হাতেই প্রধানত আমাদের থিয়েটার গড়ে উঠেছে। অর্দ্ধেন্দু ও গিরিশ উভয়েই অভিনেতা ও নাট্যশিক্ষক। গিরিশচন্দ্র আবার তার ওপর নাট্যকার ও সুলেখক। অর্দ্ধেন্দুশেখর সাহিত্যিক ছিলেন না। রঙ্গমঞ্চ ও অভিনয়ের জগৎ তাঁর ধ্যানজ্ঞান ও সর্বসময়ের চিন্তার বিষয় ছিল। রঙ্গভূমির জন্য তিনি নিজের সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর মত প্রতিভাবান নট সর্বযুগে ও সর্বদেশে বিরল। অভিনয়প্রতিভা সম্পর্কে অভিনেতার মৃত্যুর পর সঠিক মতামত ও বিচার স্থির করা কঠিন। এ বিষয়ে সমসাময়িক পত্রপত্রিকা ও বই আমাদের একমাত্র দিগ্‌দর্শন। দুর্ভাগ্যের বিষয় সেগুলিও বর্তমানে প্রায় বিলুপ্ত। গিরিশচন্দ্র সাহিত্যিক ছিলেন বলে সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি স্থান পেয়েছেন যথারীতি। তাঁর নিজের রচনা ও তাঁর সম্পর্কে অন্যের আলোচনার পরিমাণও নেহাৎ কম নয়। কিন্তু অর্দ্ধেন্দুশেখর সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানার উপায় নেই। তাঁর একটি স্মৃতিকথার খবর পাওয়া যায়, কিন্তু তা মুদ্রিত হয়নি। উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী, নগেন্দ্রনাথ বসুর 'বিশ্বকোষ' (রঙ্গালয়-অংশ), ব্যোমকেশ মুস্তফীর রঙ্গালয়ের ইতিহাস, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাট্যশালার ইতিহাস, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের তারকীয় রঙ্গমঞ্চের বৃহৎ ইতিবৃত্ত এবং তৎকালীন পত্রপত্রিকার ছিন্ন ছিন্ন ইতস্তত নাট্যসমালোচনার ওপর নির্ভর করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই।

বলা বাহুল্য, এই সব রচনার বক্তব্য প্রায় একই কথার পুনরাবৃত্তি বলে মনে হয়। এবং প্রায় অধিকাংশ রচনাতেই মনোযোগ হয়েছে গিরিশচন্দ্রের ওপর। আবার গিরিশচন্দ্রের ওপর যাঁরা গ্রন্থ রচনা করেছেন তাঁরা অর্দ্ধেন্দুশেখরের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। ফলে সেই প্রশ্নটিও এক্ষেত্রে বিশেষ কাজে লাগে না। এই যখন অবস্থা, তখন স্বয়ং গিরিশচন্দ্রের রচনা এই 'নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী' পুস্তিকাটি অর্দ্ধেন্দুশেখর সম্পর্কে সমসাময়িক সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যপ্রতিভার প্রত্যক্ষ ও প্রামাণ্য বিবরণ সঙ্কলন করে অপরিসীম মূল্যবান হয়ে রেখা দিয়েছে, বলাই বাহুল্য। বাংলা দেশে রঙ্গমঞ্চ গঠনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তাঁরা দু'জনই বহন করেছেন। তাঁরা ছিলেন সহকর্মী, সমব্যবসায়ী। তাঁদের পরস্পর মতবিরোধ ও মনোমালিন্যের অভাব ছিল না। বারংবার উভয়ে বিরোধী দল গঠন করেছেন, নতুন নতুন থিয়েটার গড়েছেন, ভাঙ্গছেন। এমন কি, উভয়ের অভিনয়রীতি সম্পূর্ণ পৃথক ছিল, যেমন ছিল তাঁদের শিক্ষার পদ্ধতি। তথাপি পরস্পরের প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধার অভাব ঘটেনি। গিরিশচন্দ্রের এই রচনাটি তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। অর্দ্ধেন্দুশেখরের অনেকখানি পরিচয় যেমন এখানে প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি স্বয়ং গিরিশচন্দ্রও এখানে স্বাভাবিক আত্মপ্রকাশ করেছেন। এ যেন গিরিশচন্দ্রেরও অসম্পূর্ণ আত্মকথা। রচনাটি থেকে এটা আমাদের আশাতিরিক্ত প্রাপ্তি। অর্দ্ধেন্দুশেখর ও তাঁর অভিনয় সম্পর্কে আজ পর্যন্ত যা কিছু লেখা হয়েছে তার প্রায় বারো আনা তথ্য গৃহীত হয়েছে গিরিশচন্দ্রের এই রচনাটি থেকে। আর অভিনয়কলা সম্পর্কে আলোচনার একটি পদ্ধতিও এখানে নির্দিষ্ট হয়েছে। পরিশিষ্টের মিউনিসিপ্যাল আইন বিষয়ে মতামত তখনকার নাটক ও প্রযোজনার একটি মূল সমস্যার ওপর আলোকপাত করেছে। সব মিলিয়ে পুস্তিকাটির গুরুত্ব সহজেই অনুমান করা যায়।

সম্পাদক, এক্ষণ।

# পোল এলুয়ার : দু'টি কবিতা

অবন্তীকুমার সান্যাল

১

যে নারীর সহবাসে কেটেছে জীবন
যে নারীর সহবাসে কাটাই জীবন
যে নারীর সহবাসে কাটাবো জীবন
চিরদিন এক অদ্বিতীয়া
তোমার তো প্রয়োজন লাল কামিজের
লাল ছত্রাক এক লাল মুখোসের
আর কালো আলাহ-মোজার
তারা যে কারণ তারা যে প্রমাণ
পরিপূর্ণ নগ্নরূপে তোমাকে দেখার
নগ্নতা অকলংক ঘিরি অলংকৃত অলংকার

স্বনবৃণ আহারে ক্ষয়।

— *Par une nuit nouvelle.*

•

২

তীর দুটি কম্পমান হাতে
বুষ্টিতে নাবছিলো
কুয়াশার সিঁড়ি বেয়ে
তুমি দেখা দিলে সম্পূর্ণ অনাবৃত
ঘরোয়ারো সকল মার্বেল
স্বপ্নভাতের ছোপ মাখানো
এক ঐশ্বর্য বিশাল অন্ধকের পাহারায়

তারা পাহারা দিত আমার নিচে কিছু সূর্যালোক
তোমারই জন্যে
যে-জন্মের চিনতে পেরেছিলাম না দেখেই

আমাদের রাত্রিগুলোর বেয়ালের ওপারে
আমাদের চুম্বনের দিগন্তের ওপারে
হারনাবের শঙ্কাজনক অট্টহাসি
ভালো করে চিনতে পারতো তাদের বুকো হাতগুলো
যারা বেঁচে থাকে একের পরে একে

আমরা খেলা করেছি রৌদ্রে বৃষ্টিতে সমুদ্রে
একটি মাত্র বৃষ্টির প্রান্তিতে একটি আকাশ আর একটি সমুদ্র
আমাদের।

—*Grand Air.*

•

## শান্তির বেদীতলে

### বেলা দত্তগুপ্ত

[ ব্রাঁা ব্রাঁাস Arc Pauls এর অনুবাদ। রচনা সময় ১৮-১৫ আগষ্ট, ১৯১৪। ]

স্বর্গীয় শান্তি!
অন্তহীন ঘৃণার অতল হতে
আজ তোমার উদ্দেশ্যে তুলে ধরেছি আমার গান,
শব্দের ঝনৎকার পারবে না একে ডুবিয়ে দিতে;
আদি অবিচলিত।

দেখতে পাচ্ছি,
রক্তবন্যায় ভেসে চলেছে
সুন্দরী ইওরোপার ছিন্ন ভিন্ন দেহ,

শুনতে পাচ্ছি,
মরু প্রভঞ্জনের গর্জন
মানুষকে তাড়িয়ে তুলছে।

আমি একক, সঙ্গীহীন,
কিন্তু তোমার প্রতি অবিচল, অনির্বাণ থাকবে
আমার নিষ্ঠা ;
জীবন নিয়ে হোরি খেলার শরিক হব না আমি,
পারব না মুখে তুলে দিতে মানবশত্রুর লেহ্যাংশ।
সবাই আমার ভাই
ভালবাসি আমি সবাইকে।

মানুষ !
ক্ষমা কর তোমরা,
নিজেদের মরু আজ নিজেরাই হরণ কর,
আর,
তারি সাথে হরণ কর মহত্ত্বের বিজয়মাল্য।

বনস্পতির ঊর্ধ্বে,
পবিত্র পর্বত চূড়ায়,
আমার অন্তর হতে জন্ম নিক
এক জলপাই গাছ,
তার শাখায় শাখায় হাসুক রৌদ্র,
থাকুক স্নিগ্ধির ঝংকার।

ঈশ্বর শান্তি,
তোমার মহিমময় হস্তদ্বারায়
তুমি আড়াল করে আছ

পৃথিবীর মত আশাবি ;
আমার,
ঢেউএর সংঘাতে সংঘাতে
ছন্দময় করে তুলছ সমুদ্রকে।
বিপরীত শক্তির সুচারু ভারসাম্যেই
প্রতিষ্ঠিত হয় শান্তির সীমা,
তার ঘাঁধানো গোলাপ জানালায়
শিল্পীর সুষমায় সৃষ্ট কারুকার্য হতে
স্বর্গের রক্ত বুঝি
উদ্ভিত হয় সবেগে।

পাখার মতোর সীমানা আড়াল করে,
আকাশের শীর্ষবিন্দুর প্রান্তে উড়ে যাওয়া
বিরাট পার্থীটির মত
তুমিও পাখা মেলেছ আকাশে
সমস্ত সত্তা, স্মৃতি, ভবিষ্যতের উর্ধ্বে।

আনন্দ ও বিষাদের সহোদরা তুমি,
কবিতা কিন্তু জানে শ্রেয়তমা!
তুমি দু'জনকে ধরেছ দু'হাতে।
তুমি যেন এক স্বচ্ছ কবিতা
মুক্ত করেছ দু'টি নদীকে।
পাতুর পপলারের সারিটানা সে কবিতায়
আকাশের প্রতিভাস।
স্বর্গের দূতী তুমি!
সোনালো পাখীর মত
আসা যাওয়া কর এপারে, ওপারে,
স্নেহস্পর্শ দিতে দুই পাড়ে ;
একে বলো, "কান্না নয়, ঐ এল আনন্দের দিন ;"
ওকে বলছ, "পরম নিশ্চিন্ত থেকোনা, আনন্দ তো ক্ষণায়।"

তোমার লীলায়িত বাহু
সস্নেহে ঘিরে আছে তোমার হারানো সন্তানদের,
তারা তোমার পীন স্তন কামড়ে ধরছে
আর তুমি তাদের পানে চেয়ে
হাসছ মৃদু মৃদু।
যারা পরস্পরকে খুঁজতে এসে
পালিয়ে ফেরে নিজেদের কাছ থেকে,
তুমি তাদের হাতে হাত বেঁধেছ,
জন্মে, জন্মে।
শমন-না-যানা যত যণ্ডকে
জোয়াল ভাঙ করেছ তুমি।
প্রবৃত্তির রক্তক্ষয়ী হানাহানিতে
তাদের বীর্য অপচিত হতে দাওনি,
বরং তাকে নিয়োজিত করেছ
ধরিত্রীর গর্ভাধানে,
বীজ, গভীর কর্ষিত ক্ষেত্রে—
যেখানে অঙ্কুরিত হবে বীজ,
মুকুলিত হবে প্রাণ।

প্রিয় সখা তুমি!
বিশ্বস্ত বান্ধব!
রণক্লান্ত সৈন্যদের তুমি স্বাগত জানাও
ফেরার মুখে;
তোমার ভালবাসায়
বিজেতা আর বিজিতের নির্বিশেষ অধিকার।
যুদ্ধের পুরস্কার?
সে তো এক কালি জমি নয়
যে জমি
বিজয়ী ভোগ করে নিশ্চিন্তে
বিধিবদ্ধ স্বত্বে রক্ষিত;

যুদ্ধের পুরস্কার
নিষ্কৃতি নিরয়ণে,
নিয়তির ক্রীড়নক হওয়ার নয়।
শান্তি,
আমার শান্তি :
দুই চক্ষে ভরে নিয়ে জল
তুমি হাসছ।
নিদাঘ রামধনু,
রৌদ্রময়ী সন্ধ্যা,
তোমার খনির আঙুলে
আদর করছ তোমার নিজ প্রান্তর,
তুলে ধরছ খসে পড়া ফলগুলিকে,
দিচ্ছ প্রলেপ বুলিয়ে দিচ্ছ
ক্ষত আর ক্ষয়কায় আহত গাছগুলিতে।
ঠিক এমনি করেই,
নিরাময়ের অঞ্জন পরিয়ে দাও আমাদের,
প্রত্যহ মিলিয়ে দাও আমাদের বিষাদের ক্ষত।
জানি,
দিন একের ফুরোবে,
আমাদেরও ;
শুধু তুমি রইবে
অনাদি
নিরবধি।
সোদর প্রতিমেরা,
এস, মিলিত হই আমরা ;
আমাদের অন্তরে যে সব শক্তি হানাহানি করছে,
আজ তারা হাতে হাত ধরুক,
বাঁচুক।
আমরা এগিয়ে যাব নিরুদ্বেগে,
কাল আমাদের মৃন্ময় নয়,

কাল আমাদেরই অনুকূলে,
কালের অযুত তুচ্ছতাতেই
শান্তি নির্বাস করে
তার কূলায়।

আমি যেন সেই মাঠে-মাঠে-গান-করা-ঝিঁঝি পোকা!
রস শুষে,
নামে ধারাসার,
জোগে কর্ষিত ক্ষেত্র,
জোগে ঝিঁঝির গান।
কিন্তু দুর্যোগ শেষ হতেই
ছোট সে গুরুকায় আবার নির্ভরে শুরু করে
তার সঙ্গীত।
দুর্যোগিত পূর্ব দিগন্তে,
বিজয়ী পৃথিবীতে
চায় ঘোড়সওয়ারের বজ্র নির্ঘোষ শুনে
(যাদের অশ্ব যুদ্ধের শব্দ এখনও দূর থেকে ভেসে আসছে)
আমিও মাথা তুলেছি,
ধরেছি গান।
অ-গণ্য আমি
কিন্তু অনমনীয়, অবিচল।

*

---

'আরা পাসিস' বোনে হয় ( Bonnet Rouge ) ২৮শে ডিসেম্বর ১৯১৫; জুর্নাল ও জেনেভ ( Journal de Genève ) ২৪-২৫শে ডিসেম্বর ১৯১৫; লেস তাবলেতস্ ( Les Tablettes ) জুলাই ১৯১৭ প্রভৃতি সাময়িক পত্রে ছাপা হয়। জুর্নাল ও জেনেভে রলাঁ লিখেছিলেন—"আরা পাসিস একটি গল্প ও কবিতা সঙ্কলনের শিরোনামা। যুদ্ধের আগে থেকেই এর ( সঙ্কলনের ) পরিকল্পনা তৈরী হয়েছিল। বর্তমান লেখাটি যুদ্ধের প্রথম বছরে লেখা হয়— এর একটি অংশ সম্প্রতি পরিমার্জনা করা হয়েছে।"—বড়দিন ১৯১৫, আর. আর.। সর্বশেষ স্তবকটি ১৯১৯ সনের ফেব্রুয়ারীতে লেখা। —অনুবাদক।

# পাশাপাশি

## প্রলয় সেন

খেলা ছুটোয় ছুটি হয়ে গেল। অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। শুধু নিখিলেরই জানা ছিল না। ঠীক অফিটর আগেন যাচ্ছেন, কি একটা জরুরী কাজে এ্যাটেণ্ড করতে। সেই সুবাদে ছাক-ও। নিখিল নিয়মিত অফিসে আসছে। সকলের সঙ্গে গল্পগুজবও চলছে যথারীতি। অথচ ঘুনাক্ষরে জানতে পারেনি। মুকুতে এমন ছুটি পাওয়া যাবে। জানলে চমৎকার একটা পরিকল্পনা করা যেত। সোদপুরে শ'শিসিমারা আছেন। পুকুরবাগান সমেত অনেকটা জমি নিয়ে বসতবাড়ি। কতকাল যাওয়া হচ্ছে না। অথবা বাঁশদ্রোনীতে। মেজশালী রানীর ওখানে। গল্পগুজবে সময় কাটত। নিদেনপক্ষে দু' পা হেঁটে সাহেবপাড়ায়। নিরিবিলি ম্যাটিনী শো দেখা। সিঁড়ি দিয়ে যাতায়াত সময় এদিনের চিন্তা নিখিলের মস্তকের কোতর ছোটাছুটি করছিল।

টিফিনের কৌটো হাতে দিয়ে আঁচলের খিঁট খুলে পয়সা বের করে রানী। পালঙ্গে থেকে দু-দুবার ট্রামভাড়া পাল্টে যাতায়াত পাঁচটা কাচি সিগ্রেট দু'কাপ চা। একুনে পঁচাত্তর পয়সা। ঝুল করে একটাকার একখানা নোট দেয় না কখনো। ওর ধারণা, বাড়তি পয়সা দিলেই এলোমেলো খরচ করে ফেলবে। শেষে অভ্যাসটা স্বভাবে গড়িয়ে যাবে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে ধড় ধড় পা ফেলে নিখিল গেটের বাইরে এসে দাঁড়াল। আধঘন্টার ভেতর এতগুলি অফিস ফেরতা। লোকজন সব যেন উবে গেছে। বুড়ো ঘারোয়ান খাটিয়া পাতছে। রেলিং-এর ধার ঘেঁষে। এবার গুদের বিধি খেলা শুরু হবে। নিখিল ধীরে সুস্থে একটা কাচি ধরাল। হাতে অনেকটা সময়। গল গল করে ধোঁয়া ছেড়ে সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে চাইল। এখন বাড়ি ফিরলে, রানী কি অবাক হবে। বিয়ের পর-পর কিছুদিনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। ছুটির দিনগুলো। দরজায় তালুপ লাগিয়ে শুয়ে পড়া। খানিক আদর খানিক অভিমান। কিছুটা ঘুম কিছুটা জাগরণ। দিনের তাপটুকু নিতে না নিতে বেলাল ছায়া-ছায়া হয়ে উঠল। নিখিল সুন্দর একটা ধোঁয়ার রি:

ঘুলল। আট ন' বছর আগেকার কথা। এখন, যেন খুবজন্মের স্মৃতি। এই দুপুরে বাড়ি ফিরলে, এঁটোকাঁটা কলতলায় ফেলে সবে আঁচলে হাত মুছে ঘরে ঢুকছে রানী। খাটে গা এলাবে এবার। পাশে ছবি শুয়ে, একবছর বয়স থেকে ওর পায়ের হাড় গুকিয়ে যাচ্ছে, পচে পচে ঘুমোচ্ছে। নিখিলের সাড়া পেয়ে বেয়ানের দিকে রানী পাশ ফিরবে। আঁচলে কপাল অবি ঢেকে গুটিসুটি নিঃসাড় পড়ে থেকে জানান দেবে, বিরক্ত করোনা।

সিগ্রেটের পোড়া টুকরোটা টিপ করে হাইড্র্যাণ্টের দিকে ছুঁড়ে দিতে নিখিলের চোখের সামনে ছিতের ময়দান ভেসে উঠল। বাদামগাছ তলায় রামায়ণ পাঠ হচ্ছে, শক্তিবর্ধক গুড়ের প্রচার চলছে কোথাও, পুতে মাজন জলিয়ে দিচ্ছে যাদুকর। ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে বিকেল হেঁকে পড়বে। তারপর হাটতে হাটতে হাওড়ার পুল পেরিয়ে ট্রামে চাপা। সদর ধরজার বড়া নাড়াতে সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে শাঁখের ফুঁ বেজে উঠল। নিখিল বড়েচড়ে উঠে বাপার দিকে চোখ মেলল। যা ঘুমকাতুরে। মহুমেণ্টের সিঁড়িতে বসে এক দণ্ড দুচোখ বুঁজে এল। তারপর, সৈনিক কাগজের তৃতীয় পৃষ্ঠার খবর, চলমা। গড়ি মনিব্যাগ আর ছাতার উধাও।

নিখিল গেটের কাছ থেকে দু'পা হেঁটে রাস্তার ধারের বকুলগাছটার নিচে এসে দাঁড়াল। প্রতিদিন ছুটির পর এই বকুলগাছটার নিচে এসে দাঁড়ায় নিখিল। একটু ঘুরেই স্টপ। এখান থেকে ওদিকের রাস্তাটা দেখা যায় স্পষ্ট। বাড়িঘরগুলো বাড়িটার ফাঁক দিয়ে বাসের মাথা উঁকি মারতেই পা দুটো লোহার মত শক্ত হয়ে ওঠে। জোরে কয়েকটা টান মেরে সিগ্রেটটা শেষ করে নাকমুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ঠিক সময় ছুটতে শুরু করে। সারাদিনে এইটুকুই যা অ্যাক্সারসাইজ। স্টপে বাস এসে থামতে না থামতে, সকলের আগে পুতে লাফ দিয়ে অত্যন্তভাবে মগল হাতেলটা ধরে ফেলে। আর মধ্যবর্তী সময়টুকু, চারদিকের নিরন আলোয় মাঝখানে অন্ধকার বকুলের নিচে; তালপালার ভেতর থেকে পাখির আওয়াজ, যেন হাজার নূপুর বেজে উঠছে,—আত্মগোপনকারী নিখিল সারাদিনের ক্লান্তি ধুলে দিয়ে একটা অপূর্ব রচনা করে।

নিখিল আর একটা সিগ্রেট ধরাল। দু'কাপ চায়ের পয়সা বেঁচে যাচ্ছে। সুতরাং কিছুটা অনিয়মী হতে বাধা নেই। ঘড়ির দ্যাও আলগা করতে করতে ও ভাবল, বিউটিসিরামটা ঘুরে আসা যাক। কতদিন, বলতে গেলে একবার, সেই ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে বিউটিসিরাম দেখতে গিয়েছিল।

দোকানের এক ছায়া-ছায়া ঘরে, মনে পড়ছে, তিমিরবাহের মস্ত ছুটো চোয়াল দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। তারপর বুকের ভেতর বাছুর ঘুমুচ্ছে, নিখিল এ কারণে নিজেকে লঘাট ভাবে। কেননা, সেই পঞ্চর কলকাতায় সে ইচ্ছে করলেই, যে কোনদিন, দোকানের সেই ছায়া-ছায়া ঘরে গিয়ে তিমিরবাহের চোয়াল ছুটো দেখে আসতে পারে। মতির মা ওটা আশঙ্কা করে বেরুতেই, বাছুরের যাবার ইচ্ছাটা মরে গেল। কেননা তার ভয়, এতটা পথ হেঁটে গিয়ে সে হয়ত চোয়াল ছুটোকে খুঁজেই পাবে না।

ওপরের দিকে মুখ তুলতে অবাক নিখিল। কোথায় সেই অন্ধকার সেই পাখির ডাক। বকুলপাতার ফাঁকফির ভেতর টুকরো টুকরো আলো ছটফট করছে। সামনের দিকে চোখ মেলল নিখিল। সেন্ট্রাল এভিন্যু, যাত্রাবী, শীতের দুপুরে।

ঝকঝকে রাস্তায় মোটরগাড়ি বাস ট্রাম ছুটছে। ও পাশের ফুটপাতে বিচিত্র চলাচল। ক্রত পথচারী ভবঘুরে বিদেশিনী কলগার্লা অন্তর্ভিখিরি। শুধু চাহিবার কি নিরুদ্যম, পথহীন। কাচের পালিতে রোদ্দুর ঠোক্কর খাচ্ছে। মানবের আট্টালিকার সার। সব মুক্ত কেমন যেন ঘুরন্ত, সম্পর্কহীন। বাতাস নেই শুধু উদাসভাব। পাঞ্জাবীর পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিতে বকুলের ফাকফি থেকে বেরিয়ে আসবার প্রেরণা পাওয়া গেল। নিখিলের বুকের তল টলটলিয়ে উঠল। মোটরবাসের বীরত্ব সকরুণ যাত্রাবী রৌদ্র উদাসীন পথচারী ফুপাথের অট্টালিকার সার,—এমন কিছুর ভেতর বড়দুর, যেখানে খুশি, হেঁটে যেতে, উদ্দেশ্যহীন পথ চলতে ভাল লাগবে।

যাচ্ছেতাই নিখিল দাঁড়িয়ে পড়ছিল। খাদিভবনের এক কোণে রেলিং-এ হেলান দিয়ে একটা লোক বাঁশি বাজাচ্ছে। ওর কাঁধে ঝোলানো জামড়ার থলিতে কতগুলো লাল লালের বাঁশি, বাঁশি বেচবার ভঙ্গিমায় বিশেষ মুদ্রা, ঠিকুকের ছন্দ ওঠানামার উপেক্ষা, দুই চোখ অর্ধনিমীলিত। দোকানের ফুরন্ত শো কেসের কাচে নিজের আপাদমস্তক ছবি দেখে উঠতে ঘনকে দাঁড়াল নিখিল। সেদিকে আড়চোখে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলে উঠল, কি হে! এতদিন কোথায় ছিলে চাঁদ!—এক বুড়ি তিমিরি ফুটপাতে পা বিছিয়ে উবু হয়ে যাচ্ছে। কোলে মলিন ঝুলিকাথা, ওর সওদার। নিখিল দাঁড়িয়ে পড়ল। এতগুলো বছর বুড়ি কোথায় ছিল। এই ফুটপাতে। ওর মুখের অসংখ্য নদীনালায় ওর চোখের কৃপণতায় কি খেলে খেলে উঠছে, জলবতের স্মৃতি মুখস্থাপ অবিস্মৃতি না সুদীর্ঘ অতীত।

জবাকুসুম বাড়ির কাছে এসে নিখিল ডান দিকে বাঁক নিল। নিখিল জানে, এই রাস্তা ধরে এগুতে শুরু করলে পরিচিত জগতের সন্ধান পাবে। শহরের প্রাচীনতায় পৌঁছে যাবে। রাস্তাটা অপেক্ষাকৃত ছায়া-ছায়া। দুপাশে জরাজীর্ণ বাড়ির দায়, ঝুঁকে পড়ে সূর্যকে আড়াল করতে ব্যস্ত। মনোহারী দোকানে ঝাঁপ তোলা হচ্ছে। হাইড্র্যান্ট থেকে গঙ্গার জল উপচে পড়ছে, ফুটপাত নরম পলিমাটিতে ভরে যাচ্ছে। ছেলের দল রাস্তায় ক্যাম্বিস বলে ক্রিকেট খেলছে। সামনের মাঠকোঠার নিচতলায়, নাদুস-নুদুস ফুলিঝলা টাটে বসে আনমনা রাস্তার দিকে তাকিয়ে। খানিকটা ধুলো লাট খেয়ে রাস্তার রোদটুকু ঢেকে দিতে চাইছে। একটা পরিচিত গন্ধ, কেরাসীন কাঠ রং গালা পোড়ানো আর তারপিন তেলের। নিখিল আকাশের দিকে মুখ তুলে বড় বড় পা ফেলে এগুতে লাগল আর বুকের ভেতর, পরিচিত গানটা, থেকে থেকে গুমরে উঠছে।

এমন সময় কেউ একজন পেছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল, নিখিল, নি-খি-ল, এ-ই-ই—। নিখিল ঘুরে দাঁড়াল। কে ডাকছে। খুব পরিচিত কণ্ঠস্বর। পা দুটো লোহার মত শক্ত হয়ে উঠল। নিচের ঠোঁট থিরথির করে কাঁপছে। নিখিল দেখল, দূরের এক গলি থেকে একজন বেরিয়ে আসছে। নীরন্ধ্র বিজন পরিবেশ, নিখিল বিড়বিড় করে উঠল। নামটা কিছুতেই মনে করে উঠতে পারছে না। কে হতে পারে। ও ততক্ষণে ছুটতে ছুটতে রাস্তায় নেমে এসেছে। নিখিল দু'পা এগিয়ে গেল। ওর দু'হাত টেনে ধরে বলল, তুই!— জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে ইচ্ছা করছিল। ও তখন হাঁপাচ্ছে। বলল, উফ্! কতদিন বাদে দেখা হল, মাইরি!— নিখিল দেখল, ও একটুও পাল্টায়নি। ঠিক আট ন' বছর আগেকার মতই। পুরু লেন্সের চশমার ভেতর বিষণ্ণ দুখানি চোখ তীক্ষ্ণ চিবুক বাঁ দিকের জুলপির নিচে কাটা দাগটা কপালের মাঝখান দিয়ে সিঁথি তোলাহাতা জাওলুমের পাঞ্জাবী লটপটে পা-জামা ছাই রঙের ছহরকোট কাঁধে ঝোলানো রংদার কাপড়ের থলি।

পকেট থেকে চারমিনারের প্যাকেট বের করে নিখিলের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে ও বলল, নে, ধরা। এদিকে কোথায় যাচ্ছিলি?—হেসার হাত, বলতে বলতে ওর দেহের সবগুলো ভাপসা হয়ে যাচ্ছিল। একটা লরী ব্রেক কষতে কষতে ওদিকে ডানদিক দিয়ে বেরিয়ে গেল। নাক মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে নিখিল বলল, কোথাও না।—ও নিখিলের হাত ধরে ফুটপাতে টেনে নিয়ে

এল। বলল, তার মানে!—ওর হাতটা কি ঠাণ্ডা, নিখিল ভাবল, এখনও কি ওর প্যানক্রিয়াসের ব্যথাটা আছে। মা বাউণ্ডুলে, নিত্য নিজারের ব্যথায় ভোগে। শীত-গ্রীষ্ম সব সময় ওর হাত পা নাকের ডগা ঠাণ্ডা থাকে। নিখিল বলল, হঠাৎ ছুটি হয়ে গেল। বাড়ি ফিরতে ভাল লাগছে না, তাই ঘুরছি।—ও বলল, সেই যে, কোথায় যেন কাজ করতিস? হাঁ-হাঁ, রানীঘুড়িতে না?—নিখিল লজ্জা করল, কথা বলতে বলতে ওর দুচোখ মাটির দিকে নেমে যাচ্ছে। আর ডানহাতের আঙুলগুলো, ক্ষুরিত দুই ঠোঁটের মাঝখানে নড়ে নড়ে উঠছে। নিখিল ওর কাঁধে হাত রাখল, বলল, নারে! সে চাকরী কবে ছেড়ে দিয়েছি। এখন আছি সেণ্ট্রাল এভিন্যুতে, এক মার্চেণ্ট অফিসে। ঢোলা পাঞ্জাবীর ভেতর বাঁ হাতটা দোলাতে দোলাতে ও বলল, তাই নাকি! কিছুই জানিনা।—নিখিল আড় চোখে ওর দিকে তাকাল! বোঝা গেল পাঞ্জাবীর ভেতর ওর বাঁ হাতটা মুষ্টিবদ্ধ। ছেলেবেলায়, যখন ওর বয়স পাঁচ কি ছয়, পাশের বাড়িতে দুপুরবেলা বড়দের নাটকের মহড়া চলছিল। ও চুপিচুপি ঢুকতে যাবে, ঠিক এমন সময়, কে যেন, হাঁ হাঁ, ও বাড়ির বড়দা, ভেতর থেকে সজোরে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার, কিনিক দিয়ে রক্ত, বুড়ো আঙুল কেটে দু টুকরো। ওর ঢোলা হাতা পাঞ্জাবী পরার আরো এক গোপন কারণ নিখিল জানে। খুব ছোট বয়সে ওর মা-বাবা দুজনেই মারা যায়। কাকাদের সংসারে অনাদরে অবজ্ঞায় মানুষ। স্কুলে পড়তে কিছুদিন অনার্সে পড়ে বসে গিয়েছিল। একবার সঙ্গীদের সঙ্গে, ও তখন চাকুরিয়ার থাকত, কসবা বাজারের পেছনে, গাঁজা আফিমের দোকানের ঠিক উল্টো দিকে, কাঠের জলচৌকিতে বসে বাঁ হাতে উল্কি পরিয়েছিল। নাম ও উপাধির আদ্যাক্ষর। একবার, কলেজে পড়ার সময়, উল্কি তুলবার জন্যে মরীয়া হয়ে উঠেছিল। পরিচিত এক ডাক্তার দোকান থেকে খানিকটা নাইট্রিক অ্যাসিড জোগাড় করেছিল। উল্কির ওপর ঢেলে দিতে পুড়ে ঘা হয়ে গিয়েছিল। ব্যাণ্ডেজ বেঁধে রেখে দিল কয়েক মাস।

পঞ্চার ঘোলাজল ফুটপাত ভাসিয়ে দিচ্ছে। পা-জামা উঁচিয়ে বড় বড় পা ফেলে জল পেরুতে পেরুতে ও বলে উঠল, এত কাছে চাকরী করছিস। অথচ কোন খোঁজখবর দিস না। আশ্চর্য তো!—হুমেন হাসল। আমরা সবাই এই শহরেই আছি। প্রতিদিন একই আলোবাতাস মিশ্চি। পাশাপাশি হাটছি, হাসছি কাঁদছি। অথচ কত বিচ্ছিন্ন। কেউ কারুর খবর রাখি না,

আমরা কি তবে ভিন্ন গ্রহের জীব। ওর চোখ আবার বাটির দিকে নেমে গেছে। কানহাতের আঙুলগুলো ফুরিত দুই ঠোঁটের মাঝখানে নড়েচড়ে উঠছে। পাঞ্জাবীর ভেতর মুষ্টিবদ্ধ বাঁ হাতটা দুলছে। ভাঙেতে পুরনো হটহট শব্দ উঠছে। নিখিল জিজ্ঞেস করল, তুই আজকাল কি করছিস রে? চাকরী বাকরি কিছু—। ও ঘড় করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, নাহ্। এতদিনে এম-এ পরীক্ষাটাই দিয়ে উঠতে পারলুম না। কয়েকটা টিউশনি করি, আর— হুঁ, তোর খবর কি বল্। কবিতা লিখছিস তো। কি চমৎকার হাত ছিল তোর—। নিখিলের বুকের ভেতরটা টনটনিয়ে উঠল। কবিতা! শব্দ চলতি এখন কচিৎ দু একটা লাইন মনে পড়ে,—'এখনও নক্ষত্রগুলি কাঁপে স্থির জানালায় পাশে/জলের শব্দের মত অবিরল দিন ঝরে যায়/গ্রামেগঞ্জে তুলসীমঞ্চে কি বিপুল কোলাহল কাটে/আমন ধানের গন্ধে হরিদাস ভালে পৈঠায়।' নিখিল হেসে উঠল, দূর! ও সব পাগলামি কবে ছেড়ে দিয়েছি!—ও নিচু স্বরে বলল, আমি জানতুম এই হবে। এই আমাদের নিয়তি, আমাদের ভবিতব্য। তুই ছিলি আমাদের সেরা। বিয়ে করে আর দশজন বাঙালির মত —। হঠাৎ রোদ মরে গেল। মুখ তুলে তাকাতে দেখল নিখিল, ট্রাম লাইনের ওপাশে বড় বাড়ির পেছনে একখণ্ড কালো মেঘ উঁকি দিচ্ছে। একদিনের কথা মনে পড়ে গেল নিখিলের। আকাডেমিতে ছবি দেখতে গিয়েছিল, ওরা চারজন। তারপর বহুদিনের নরম ঘাস মাড়িয়ে অন্ধকারে বাদুড়ঘাট অব্দি হেঁটে এসেছিল। রায়কল্পতরুর নিচে উঠে পড়েছিল। তেমন যাত্রী ছিল না, সন্ধ্যা থেকে ঝড়ের আভাস, আকাশ থমথমে, ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চিরে দিচ্ছে দিগন্তকে, হাওড়া পুলের চূড়োয় নিঃসঙ্গ আলো যুদ্ধে চলেছে অন্ধকারের সঙ্গে, আর নিচে জলের ফোঁস ফোঁসানি। ওরা সমবেতভাবে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চেঁচিয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আউড়েছিল। তারপর প্রস্তাবটা ছিল নিখিলেরই। আমরা অনিকেত। আমাদের জীবন শিল্পের জন্যে নিবেদিত। আমরা কখনো গতানুগতিক জীবনে ধরা দেব না। সে রাতে আর মেসে ফেরা হল না। খিদিরপুরে পরমেশদের বাড়ি। ওখানে রাত কাটিয়েছিল।

নিখিল হেসে চেঁচিয়ে উঠল, ভাল কথা। পরমেশের খবর কিরে। কেমন আছে।—ও সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, পরমেশের কথা আর বলিস না। গোল্লায় গেছে হারামজাদা। দু-দুটো ভাল চাকরী খুইয়েছে। রেস বদ মেয়েমানুষ সর্বনাশ করেছে ওকে।—ওরা ট্রাম রাস্তার কাছে এসে পৌঁছল। শব্দের কাবে

নিয়ে একদল যুবক রাস্তা পার হচ্ছে। আকাশের দিকে হাত তুলে বন্ধুকের মত বেঁকে ওরা প্রাণপণে হরিধ্বনি দিচ্ছে। নিখিল ভাবল, সেই পরমেশ, বেঁটে খাটো নিরীহ পরমেশ, মফঃস্বলের ছেলে, বন্ধুদের ভেতর একমাত্র ওরই কিছু সৎ আদর্শবোধ ছিল! আসলে আমরা, আমি নীরদ বিজন পরমেশ সবাই,—ঠুঁটো জগন্নাথ। কোন কিছুই লঙ্ঘন করতে পারিনা। আমরা অযোগ নিয়মের দাস। অদৃশ্য কেউ একজন সুতো ধরে ইচ্ছেমত তোমাকে টানছে ছেড়ে দিচ্ছে। তুমি কি তোমার সম্রাট! হঠকারিতা ভাল নয়। নিখিল এব কথাটাকে চাপা দিতে চাইল। চটপট বলল, চা খাওয়াবিনা। আমার কাছে কিন্তু পয়সা নেই। ও বললে, আমি খাওয়াবো। আয়, গোবিন্দ কেবিনে বসি। কতদিন যাবে দেখা হল! আজ আমার টিউশনি নেই। গল্প করা যাবে।

চায়ের দোকানে ঢুকে ওরা এক কোণে দুটো চেয়ার দখল করল। ভেজা বেঞ্চ মেঝে দেখে বোঝা গেল সবে ধোয়া হয়েছে। অন্ধের নেই। সেই গোবিন্দ কেবিন। জীবনের কতগুলো বছর, দুপুর সকাল সন্ধ্যা কেটেছে এখানে। কাউন্টারে ম্যানেজার বসে। সেই লোকটা, যার বাঁ চোখের মণি গলে সাদা হয়ে গেছে। টাটা গোঁফ। ঘুতনিতে ভাঁজ। লোকটা ঢুলে ঢুলে পড়ছিল। এখনও দুপুরের ঘুম চটেনি। লোকটা ভারি সুন্দর ভাসসঙ্গীত গাইত। কাউন্টারের মাথায় ফ্রেমে বাঁধানো সেই ছবিটা, 'বঙ্গে সূর্যাস্ত'। এতদিনে ধুলোবালিতে আরো মলিন। নিখিল রাস্তার দিকে চোখ ফেরাল। ট্রামের তারে বিকেলের বিবর্ণ আলো দুলছে। ওপাশে ফুলের দোকানে জল ছিটোচ্ছে দোকানী। নিখিলের মনে হল, ফুলের দোকানের ওপাশ থেকে এবার কেউ রাস্তা পেরিয়ে এদিকে আসবে। বিজন নীরদের খবর কি। ওকে জিজ্ঞেস করতে ভয় হল। নীরদ ছবি আঁকত, বিজন ছিল মুখচোরা। এই সেই কোণার চেয়ারগুলো। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা, এখন আড্ডা জমত। সেই পুরনো গন্ধটা উঠছে। সেই আবছায়া। দেয়ালে জলতরঙ্গের সাক্ষ্য, প্রাকৃতিক জীব-জন্তুর আভাস। কে জানে, পরমেশের মত ওরাও—

ও বললে, কি খাবি বল্। আজ পকেটে কিছু পয়সা আছে।—নিখিল নড়েচড়ে উঠল, নারে শুধু চা। কৌটো ভর্তি খাবার রয়েছে সঙ্গে। মিছেমিছি—। ও শরীর কাঁপিয়ে হেসে উঠল, আজও বুড়িয়ে গেছিস তুই! কৌটোয় করে অফিসে খাবার আনিস? কটি হল, বিজনের খবর কি?—ও চোখ মটকে

একটা কিছু ইঙ্গিত করতে চাইল। এতক্ষণে নিখিলের চোখ পড়ল, হাসতে গিয়ে ওর বাঁ দিকের ঝুলকির নিচের কাটা দাগটা নড়ে উঠছে। ছেলেবেলায় ও জামরুল গাছ থেকে পড়ে গিয়েছিল। খুড়ি পাড়তে উঠেছিল গাছে। সে এক রক্তারক্তি কাণ্ড। সাতদিন শম্ভুনাথ হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল। সেই থেকে বিশ্রি কাটা দাগটা, বড় করে ঝুলকি রেখেও ঢাকা যায়নি। নিখিল বলল, তেমন কিছু নয়। মোটে একটা, রিকেটে ভুগছে।—নিখিলের কাঁধে জোরে একটা থাপ্পর কষিয়ে ও বলল, সে কিরে! মোটে একটা! আমাদের প্রেস্টিজ ডোবালি তুই!—বয় এগিয়ে আসছে, বাঁ হাতের কব্জে আঙুলটা কানে ঢুকিয়ে নাড়াতে নাড়াতে ওদের সামনে এসে বলল, কি খাবেন স্যার।—নিখিল ওর নামটা মনে করতে পারছে না। কি নাম যেন, পাঁচু জগা হরি। এক সময় খুব খাতির করত। একদিনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। নীরদের একটা ছবি ভাল দামে বিক্রি হয়েছিল। দিনটা চমৎকার সেলিব্রেট করা হয়েছিল। ওরা চারজন। দুপুরবেলা। গ্র্যাণ্ড হোটেলের নিচে একটা দোকান। সেই প্রথম মদ খাওয়া। মুরগীর রোস্ট আর গ্লাস কয়েক পেগ। দোকান থেকে বেরিয়ে ডবল ডেকারে উঠতে একটা লোক বিজনের দিকে তাকিয়ে মুখে কষাস শুঁকতে শুঁকতে বলেছিল, রাবিশ! আজকাল ঘাতালদের জ্বালায় বাসে ওঠা যায়। বউবাজারের মোড়ে নেমে গোবিন্দ কেবিনে এসেছিল ওরা। তখন সন্ধ্যা হব-হব। চেয়ার থেকে উঠে বেসিন পর্যন্ত যেতে পারেনি নিখিল। দোকানশুদ্ধ অন্ধের। সলসল করে বমি। নিখিলের গা ঘোলাচ্ছে, গা টলছে। এই লোকটা সাহায্য করেছিল। মাথায় জল ঢেলে নেশা কাটিয়েছিল।

ও বয়কে বলল, দু কাপ ডবল হাফ নিয়ে আয়।—নিখিল হাই তুলল। আর সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতর চোরা যাথাটা টনটনিয়ে উঠল। এমন ম্লান বিকেলে, মনে পড়ে যায় মেস-বাড়ির কথা। কলেজে ঢুকেই কাকাদের সংসার ছেড়ে দিয়েছিল। টিউশনি করে নোট লিখে নিজের খরচ জোগাত। সেই মেস-বাড়ি, কতকালের পুরনো সদর গেট দিয়ে ঢুকে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে দোতলার কোণার ঘরটা। এখান থেকে কতদূর। খুব কাছেই। দোকান থেকে বেরিয়ে ডানদিকের রাস্তায় ঢুকে মিনিট কয়েক হাঁটা। তারপর বটগাছের গা ঘেঁসে যে গলিটা গেছে তারই প্রান্তে। প্রায়ই তাদের আড্ডা বসত। কয়েক প্যাকেট চারমিনার, এক কুঁজো জল। মাঝে মাঝে ওরা চেঁচিয়ে উঠত।

নো টাম্পল্ টু হাউস কোর স্পেসেস্ ভাবল্। জানলার বাইরে রোদের আভা করে যাচ্ছে। এক সময় ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি নামল। ঢাক দিয়ে চাকর ঘুমুকে ডাকা হল। ছেলে ভাজা গরম মুড়ি এল। হাত পা কোমরে বাঁধা ঘরে ফেলে খেলা ভাঙত। তারপর কোনরকমে পাঞ্জাবীটা গায়ে গলিয়ে নেওয়া। নাইট শো সিনেমা। এক চাট্টি জল ছেড়ে মাথা হাতে মেসে ফেরা।

ও তাড়া দিল, ফিরে, চটপট শেষ কর। পার্কে গিয়ে বসল খানিকক্ষণ।— নিখিল দুই চুমুকে চা শেষ করল। কাপ চুকিয়ে ওরা নেমে এল রাস্তায়। ও আগে আগে নিখিল পেছনে। ট্রামবাসের ব্যস্ততা বাড়ছে। অফিস ছুটির ভিড় শুরু হয়ে গেছে। ট্রাম লাইনে পাতর শব্দ ঝকিয়ে উঠছে। নিখিল একবার মুখ তুলে তাকাল। দেখল, পুবের মেঘ কখন মাথার উপরে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। মেঘের আড়াল ভেঙে তেরছা হয়ে রোদ্দুর নেমে আসছে। হঠাৎ কলকাতাই সেনের টিউশনিটার কথা মনে পড়ে গেল। এমনি তারা বিকেলে প্রতিদিন টিউশনিতে যেত। পাঁসারো পার্টি। ক্লাস টেনের মেয়ে। ভাল জলখাবার দিত। লুচি তরকারি ছানুয়া, সঙ্গে চমৎকার এক কাপ চা। গরমের দিনে সন্দেশ এক গ্লাস সরবৎ। মাসের শেষে একবার চটিটা গেল ছিঁড়ে। হাতে আর পয়সা নেই। চমৎকার এক ফন্দী বাৎলে দিয়েছিল পরমেশ। ফাকড়ায় আলতা মেখে পায়ে জড়িয়ে দিব্যি মাসকাবার হয়ে গেল।

পার্কে তেমন ভিড় নেই। এদিক ওদিক ইতস্তত লোকজন ছড়িয়ে আছে। ওরা দুজন পামগাছের নিচে বসল, মুখোমুখি, ঘাসের ওপর। ও আড় হয়ে শুয়ে পড়ল। নিখিল ডান পা উঁচু করে হাটুতে থুতনি ঠেকিয়ে, দাঁত দিয়ে ঘাস কাটছিল। বিজনের সঙ্গে একদিন গলেছিল নিখিল। এই বেহালা বিকেলে। বিয়ের বছর খানেক পরের কথা। বিজন এখন কোথায়। নিখিল জানতে চায় না। ওকে জিজ্ঞেস করতে ভয় হয়। ধুবুলিয়া না পাঁসলাচণ্ডী। লালগোলা লাইনে কোথাও। মাস্টারি নিয়ে চলে গিয়েছিল। চিঠিপত্রে যোগাযোগ ছিল। চমৎকার করে চিঠি লিখত বিজন। ব্যর্থতা আর গ্লানির কথা। আমরা সব ফুরিয়ে গেলাম হারিয়ে গেলাম। আমাদের কি কিছুই করার ছিল না। অফিস থেকে আগে ছুটি নিয়ে ঠিক সময় এসেছিল নিখিল। এই পামগাছতলায় এই ঘাসে। বিজনের কিছুই বলা হয়নি। ছাইপাশ বলতে বলতে ও এক সময় কেঁদে ফেলেছিল শিশুর মত, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। অল্প পাড়াগাঁয়ে মাস্টারি। চাকরীর অর্ডারে যেন প্রাণপাখি, দিনযাপন। সমস্তকে

ঘুরে ঘুরে খাওয়া। খেয়ে খেয়ে জীবনটাকে ঘৃণ্য করে ফেলা। এই কি জীবনের মূল্য। নিখিলের বুকের ভেতরের চোরা ব্যথাটা কের টনটনিয়ে উঠল। হায় ভাখো, আমরা কত প্রতিকারহীন ভাবে বেঁচে আছি। নিখিল সেদিন বিজনকে কোন সান্ত্বনা দিতে পারেনি। শুধু মনে হয়েছে, এর চেয়ে দূরেই থাকা ভাল, চোখের আড়ালে, বিচ্ছিন্ন হয়ে। কেবল চিঠির মধ্য দিয়ে, মনোরম ভাষায় নিজেদের জানাজানি হবে। বিজন আর চিঠি দেয়নি। নিখিল ওরতর খুঁজেছে। ঠিকানা পাওয়া যায়নি। আর দশটা ভালতু কাগজের সঙ্গে ওর চিঠিগুলো রানী প্যাচার করে দিয়েছে বর্ষায়।

ও বললে, একটা গান হোক না। কি মিষ্টি গলা তোর, রবীন্দ্রসঙ্গীত, কতকাল গান শুনি না। নিখিল ওর দিকে তাকাল। ওর চশমার পুরু লেন্সে তার মুখটা অদ্ভুত হয়ে জেগে উঠেছে। নাকের ডগা থেকে চোয়াল পর্যন্ত তুলনায় বড়, চোখ দুটো কপালটা সংক্ষিপ্ত। একটা কাক ডাকছে কোথাও। করুণ, মধুর। সন্ধ্যার ছায়ারা ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। দিনের তাপটুকু মরে গিয়ে মাটি জুড়িয়ে যাচ্ছে। নিখিলের বুকের মধ্যে শীতলতা টনটন করে উঠল। গান! ও হেসে বলল, এখন আর গানটান গাই না। কেমন বেসুরো হয়ে যায়, কথা ঠিক ঠিক মনে আসে না।—এক দমক হাওয়া বইল। গ্র্যাণ্ড ঠেলে যে বুড়িটা এতক্ষণ ঘাসের ওপর ঘোরাফেরা করছিল, সে উত্তরমুখো চলে যাচ্ছে। লতাবিতানের নিচে বুড়োদের কথাবার্তা আর শোনা যাচ্ছে না। এক কোণে, গেটের পাশে ফুটকোঅলার লণ্ঠনের আলো লকলক করছে। পার্কের ওপাশের এক বাড়ির আলো জ্বলে উঠল। দ্রুত অন্ধকার থাবা বসাচ্ছে মাটিতে। যান-বাহনের শব্দ খুব ক্ষীণ হয়ে কানে বাজছে। কয়েকটা শালপাতা মাঠময় ছোটাছুটি করছে। দূরে কোথাও ছাপাখানার মেশিনের শব্দ, অন্ধকারে হাপরের শব্দের মত জেগে উঠছে।

ও আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসল। অন্ধকারে নিখিলের শরীর ছুঁল। সেই ঠাণ্ডা হাত। বলল, এক-বছরের ভেতর তুই কি হয়ে গেলি নিখিল!—তারপর হাত ধরে নিখিলকে টেনে তুলল। বলল, চল আমার সঙ্গে।—অন্ধকারে ওর মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। ঘাসে চটির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। হঠাৎ খুব কোমল বিদ্যুৎ চমকে উঠল। নিখিল ভাবল, বৃষ্টি! এই অকালে। তারপর ওর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, কোথায় যাবি?—ও দমকের সুরে জবাব দিল, চলনা। এইতো পার্কের ওপাশে।—নিখিল মনে মনে হাসল। বিনতির

সঙ্গে দেখা করবে ও! এই পার্কের ওপাশেই তো। ট্রাম রাস্তা পেরিয়ে প্রথম বাঁদিকের গলি। কি যেন নাম গলিটার। একটা সাহেবী আমলের দোতলা বাড়িতে থাকে মিনতিরা। মিনতি, এখনো কি টেলিফোন অফিসে চাকরি করে। বেঁটেখাটো শ্যামলা মেয়েটা। টানা টানা শান্ত চোখ দুটো। কি মিষ্টি গলা। খিল খিল করে হাসে। ঠোঁটের নিচে একটা বড় তিল। কতদিন ওরা চারজন আর মিনতি কফি হাউসে গোল হয়ে আড্ডা মেরেছে। নিখিল বিড়বিড় করে উঠল, হায়, তুই কি বোকা, কি নির্বোধ! এখনও তুই ঘুরছিস, অন্ধকারে, পার্কের ওপাশের গলির ভেতরকার লালবাড়ির মিনতির জন্যে। আট দশ বছর হয়ে গেল, তুই কি এতদিনেও জানতে পারিস নি, মিনতি কাউকে বিয়ে করবে না, বিয়ে করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা, ওর ডায়াবেটিস। ডাক্তারেরা বলে মেয়েদের এ রোগ হলে সন্তান হয় না। তোর কিছুই মনে পড়ে না।

পার্ক থেকে বেরিয়ে ওরা ট্রাম রাস্তা পেরুল। এসে দাঁড়াল গলির মুখে। ও বললে, প্রীজ নিখিল, একটু দাঁড়া। আমি এক্ষুনি ফিরে আসছি।—তারপর কথা বলবার অবসর না দিয়েই চোখ দুটো মাটির দিকে নামিয়ে পাঞ্জাবীর ভেতর মুঠো করা বাঁ হাতটা দোলাতে দোলাতে স্ফুরিত দুই ঠোঁটের মাঝখানে আদরে করে ডানহাতের আঙুলগুলো নাড়াতে নাড়াতে আঁকাবাঁকা গলির ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল ও।

নিখিল দু-পা এগিয়ে পানের দোকানের সামনে এল, উজ্জ্বল আলোয়। পকেট থেকে একটা কাচি বের করে ঘড়িতে ধরিয়ে নিল। একবার দোকানের আয়নায় মুখ দেখল। ওপরের দিকে চোখ তুলতে দেখল, দেয়াল ঘড়িতে সাতে ছ'টা বেজেছে। নিখিল দ্রুত সরে এল। ফের এসে দাঁড়াল গলির মুখে, অন্ধকারে। গুরু গুরু মেঘ ডাকছে। বাতাসের গতি বাড়ছে। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। নিখিল একবার গলির ভেতর ঢুকে পড়ল, দু-পা এগিয়ে ফিরে এল। সময় যেন নিঃশ্বাসের সঙ্গে গুমরে উঠছে। সাতটা বাজল। যা দায়িত্বহীন বাউণ্ডুলে ও। নিখিলের শিরদাঁড়ার ভেতর কি যেন কিলবিল করে হাঁটছে। নিখিল ঝুঁকিয়ে উঠল। তারপর পোড়া সিগ্রেটটা হাইড্র্যান্টের দিকে টিপ করে ছুঁড়ে দিয়ে মাটির দিকে চোখ নামিয়ে হনহন করে ঢুকে গেল গলির ভেতর।

গলিটা আঁকাবাঁকা, অন্ধকার। দুপাশের ঘরগুলো জানলা বন্ধ। ভেতর

থেকে ক্ষীণতম আওয়াজও ভেসে আসছে না। চটির চটচট শব্দ উঠছে। কিছুক্ষণ চলবার পর নিখিলের মনে হল, সে ঘুরে ফিরে একই জায়গায়, একটা গ্যাসবাতির নিচে এসে পৌঁছচ্ছে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আটের বি, মিনতিদের বাড়ির নম্বর। নিখিল আর একটা কাঠি ধরালে। বিড়বিড় করে উঠল, আটের বি, আটের বি। লালরঙের দোতলা বাড়ি। সেই বাড়ির ভাড়াটে মিনতিরা। নিখিল আবার চলতে লাগল। শেষে ঘুরতে ঘুরতে, সেই বাড়িটার খোঁজ পাওয়া গেল। নিখিলের তখন পা টলছে, মাথা ঘুরছে, গা ঘোলাচ্ছে।

দুধাপ সিঁড়ি ভেঙে গোড়ালি উঁচিয়ে নিখিল কলিং বেল্-এ ঠাণ্ডা হাত রাখল। একটু পরে, কেউ সিঁড়ি বেয়ে নেবে আসছে। দরজার একটা পাল্লা খুলে গেল। একটা থমথমে সন্দিগ্ধ মুখ গলা বাড়াল, কে—? নিখিলের গলার স্বর জড়িয়ে যাচ্ছে, আজ্ঞা, এটাই তো আটের বি···।—ভেতর থেকে মুখটা নড়ে চড়ে উঠল, হাঁ-হাঁ, আটের বি। কাকে চান?—নিখিল স্বর বন্ধ করে বলল, মিনতি, মানে, মিনতি চাকলাদার আছেন?—লোকটার দুচোখ ভাঁটার মত জ্বলে উঠল, হুংকার ছাড়ল, মিনতি চাকলাদার? এ বাড়িতে? কখনই ছিল না।—বলতে বলতে দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিল। নিখিল বাড়িটার দিকে মুখ তুলে তাকাল। এই তো সেই বাড়ি। দোতলার কোণার ঘরখানা। ঢুকতেই দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের ফটো। ঘরের মাঝ বরাবর একটা কাঠের পার্টিশান। গোটা তিনেক বেতের চেয়ার। টেবিলের রেকাবে ঢাকা কাচের গ্লাসে জল। দেয়াল-আলমারীতে কিছু বই। নিচের তাকে কাপড়ে ঢাকা হারমনিয়াম। ভেতরের সিঁড়িতে দুমদাম শব্দ উঠছে। সেই ভারি গলার আওয়াজ, যতসব বদমোক—!

নিখিল দু-পা পেছিয়ে গ্যাস বাতির নিচে এসে দাঁড়াল। কোথাও একটা লোক দেখা যাচ্ছে না। শব্দহীন চারিধার। অন্ধকার আস্তে আস্তে গ্যাস বাতির আলো গিলে ফেলছে। নিখিল চলতে শুরু করল। ও তবে কোথায় গেল, কোথায়—। নিখিলের দু-পা লোহার মত শক্ত হয়ে উঠছে। গলিটা কিছুতেই শেষ হচ্ছে না। নিখিল ভাবল, ও, ও কে, বিজন বীরের পরমেশ। বুনো, পানের দোকানে আয়নায় মুখ বাড়িয়ে নিখিল দেখেছিল, নিজের থুতনির নিচের কাটা দাগটা। তার হাতের আঙুলগুলো কেন ক্ষুরিত দুই ঠোঁটের মাঝখানে তিরতির করে কেঁপে উঠছে, মুঠো করা বাঁ হাতের ভেতর কাটা বুড়ো

আঙুলটা, আর, ঢোলা পাঞ্জাবীর চাতা মোটাসে সেই বীভৎস কতচিহ্ন। নিখিল প্রায় ছুটতে শুরু করল।

অনেকক্ষণ বাদে গলির মোড়ে এসে দাঁড়াল নিখিল। একটু দূরে, পানের দোকানের উজ্জ্বল আলোয় কাকে দেখা যাচ্ছে। আয়নার দিকে মুখ করে, ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে। নিখিল কিছুতেই ওদিকে যাবে না। কেননা নিখিল জানে, ও তাকে নিয়ে এক অদ্ভুত খেলা খেলছে। তাকে এই অন্ধ গলির ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে কখন এসেও দাঁড়িয়েছে ওই দোকানের সামনে।

নিখিল আড়াআড়ি ছুটে রাস্তা পেরুল। বাতাসের গতি বাড়ছে। অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে। গুরু গুরু মেঘ ডাকছে। বিদ্যুৎ ঝলসে ঝলসে মেঘমালা চিরে দিচ্ছে। বাঁকের ওপাশ থেকে একটা বাস ছুটে আসছে। বাসের আলোটা দেখা যাচ্ছে। নিখিল পিছন দিকে তাকাতে ভয় পেল। স্টপ পনিকটা দূরে। নিখিল ছুটতে শুরু করল। তাকে দৌড়ে গিয়ে, লাফিয়ে, যে করেই হোক, বাসের মসৃণ হ্যাণ্ডেলটা ধরতে হবে।

# বাঙলায় 'আন্তিগোনে'

প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য

আমি গ্রীক জানি না। অতএব আমার পক্ষে 'আন্তিগোনে'র[১] বাংলা অনুবাদের আলোচনা অনধিকার চর্চা এবং সমালোচনা হিশেবে তার মূল্য নগণ্য। যে-লোক ইংরেজি তর্জমায় 'আন্তিগোনে' পড়েছে তার প্রতিক্রিয়া যদি কারোর ( বিশেষত অনুবাদকের ) কিছুমাত্র কাজে লাগে সেটাই এ-লেখার একমাত্র দাম।

বঙ্কিমচন্দ্রের একটা চিঠিতে ( ১৯ পৌষ ১৩০০ ) 'আন্তিগোনে'র উল্লেখ আছে। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে বঙ্কিমচন্দ্র লিখছেন, বিষবৃক্ষের ইংরেজি অনুবাদ প'ড়ে কোনও সমালোচক বলেন যে, 'Sophocles প্রণীত Antigone চরিত্রের পর আর ইহার তুল্য স্ত্রীচরিত্র কোনও সাহিত্যে সৃষ্ট হয় নাই। এ-সকল কথা আমি বড় গৌরবের কথা মনে করিয়াছিলাম।' এ-চিঠি প'ড়ে বহুবার ভেবেছি, ঠিক কী অর্থে ঐ তুলনায় বঙ্কিম গৌরব বোধ করেন? আন্তিগোনেকে অনেক সময় ইওরোপীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নারীচরিত্র বলা হয়; সাহিত্যকৃতি হিশেবে সূর্যমুখী বা কুন্দনন্দিনী তার সমপর্যায়ভুক্ত— এই প্রশংসাই কি তার কারণ? অথবা, মহত্তর অর্থে ধর্ম বলতে যা বোঝায় তার, যা মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠায়— এবং বিশ্ববিধানের শক্তি হিশেবে— আন্তিগোনের যে-তাৎপর্য, তার সঙ্গে কুন্দনন্দিনী-সূর্যমুখীর তুলনীয়— এই স্বীকৃতি বঙ্কিমচন্দ্রের উৎসাহের কারণ? এ-প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর পাওয়া কঠিন। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্য বাঙালীর বিশ্বসাহিত্য-চর্চার ইতিহাসে একটি মূল্যবান বিবৃতি হিশেবে গণনীয় তো বটেই, আমাদের বর্তমান আলোচনায় তার বিশেষ প্রাসঙ্গিকতা আছে। কারণ, তাঁর সাহিত্য-সাধনার পটভূমি ছিলো, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সমাজ ও মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব এবং তা থেকে জাতীয় আত্মস্বরূপের সন্ধান।

১ সোফোক্লেস, 'আন্তিগোনে', অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত অনূদিত, সাহিত্য অকাদেমী, নিউ দিল্লী, ১৯৮৩।

বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য চমকপ্রদ লাগে আরও এইজন্যে যে তারপর দীর্ঘ ৭০ বছরের মধ্যে 'আন্তিগোনে'র কোনও বাংলা অনুবাদ হয় নি। আমাদের অনুবাদকদের আগ্রহ আবর্তিত হয়েছে প্রধানত ইংরেজি সাহিত্যের একটা সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে। ( অন্য সাহিত্য থেকে ইদানীং যে-টুকু তর্জমা হয়েছে তারও চোদ্দ আনা ইংরেজির মারফৎ। ) উনিশ শতকের রেনেসাঁস এবং তৎপ্রসূত সংস্কৃতির এটা একটা দুর্লক্ষণ। ইউনেস্কোর আনুকূল্যে সাহিত্য অকাদেমী 'আন্তিগোনে'র অনুবাদ প্রকাশ ক'রে সেই পরিধি প্রসারিত ক'রে দিলেন। অনুবাদ গ্রীক নাটকের তালিকায় অকাদেমী প্রথমেই বেছে নিয়েছেন 'আন্তিগোনে'কে। তাঁদের এই নির্বাচন সর্বতোভাবে সমর্থনযোগ্য। 'আন্তিগোনে'তে এক জায়গায় ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ স্বর্ণদেশের উল্লেখ আছে। পুরোনো বিদেশী নাটকে স্বদেশ-প্রসঙ্গ স্বভাবতই ভালো লাগে; আর সোনার ভারতের প্রতিমা তো আমাদের জাতীয় স্মৃতি ও আবেগের অবিভাজ্য অঙ্গ। এমনিতে বিশ্বসাহিত্যের চিরায়ত নাটক হিসেবেই 'আন্তিগোনে'র অনুবাদ-যোগ্যতা অসামান্য। তাছাড়া গ্রীক মননের ধর্মই ছিলো, যা বিশেষ ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাকে নিঃসঙ্গ, তারপর বিশ্লেষণ ক'রে নির্বিশেষে ও সাধারণ নীতিতে পৌঁছনো। সর্বকাল ও সর্বজনকে স্পর্শ করার গুণ তাই অন্যান্য গ্রীক নাটকের মতোন 'আন্তিগোনে'র প্রকৃতিগত। তবে 'আন্তিগোনে' যেন অন্য নাটকের তুলনায় আরও তীব্রভাবে আমাদের সমকালকে ছুঁতে পারে। ব্রেখ্‌ট হয়তো এইজন্যেই 'আন্তিগোনে'র 'টপিক্যালিটি'র কথা বলেছিলেন। বলা যায়, ফ্যাসিস্ট-বিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলনের সময় থেকে 'আন্তিগোনে' নতুন তাৎপর্য পেয়েছে। এই নাটক তখন ইওরোপে বারংবার অভিনীত হয়েছে, মনুষ্যত্বের হন্তারক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে মানুষের অপরাজেয় সংগ্রামের আলেখ্য হিসেবে। তারপর, হিটলার-মুসোলিনী প্রভৃতি একনায়কের পতন, সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির বিংশ কংগ্রেস, স্ট্যালিনের পুনর্মূল্যায়ন ও সমাধি-উৎখনন, গণতন্ত্রের সংকট, সাম্প্রতিক ইতিহাসের নানান বাঁক, সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের জোয়ার-ভাঁটা— এই সবের পটভূমিতে 'আন্তিগোনে' যেন নতুনতর অর্থগভীরতা পায়। কতকগুলো জিনিশ আছে— যেমন মনুষ্যত্ব, মানুষের জীবন বা তার অন্তিম সৎকার— যার মূল্য পরম, চূড়ান্ত ও অলঙ্ঘনীয়: 'আন্তিগোনে' নাটকের এই প্রজ্ঞা সমকালকে যদি তবে স্পর্শ না ক'রে পারে না।

অর্থাৎ মূল্যবোধের প্রশ্ন 'আন্তিগোনে'র কেন্দ্রগত বিষয়। সেই সূত্রে 'প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের পারস্পরিক সম্প্রদান-গ্রহণেচ্ছা পরিবর্ধনের জন্য ইউনেস্কোর যে সুবৃহৎ পরিকল্পনা আছে এই গ্রন্থপ্রকাশ তাহারই অন্তর্গত', সাহিত্য অকাদেমীর এই বিজ্ঞপ্তি তাৎপর্যময়। অনুবাদের সাফল্য-বিচারের সময় ঐ লক্ষ্য স্বভাবতই খুব সামনে এসে পড়ে। পশ্চিমের মূল্যমান পাঠকের বোধে সঞ্চারিত হ'তে পারে একটাই শর্তে। তা হচ্ছে: নাটকের আবেদনবস্তু অনুবাদক যতোটা সাফল্যের সঙ্গে পাঠকের কাছে হাজির করতে পারছেন। এবং সেটা আবার শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে অনুবাদকের ইন্টারপ্রিটেশন বা অর্থনিরূপণের ওপর। 'আন্তিগোনে' নাটকের এই তাৎপর্য-নির্ণয়ের ব্যাপারে অনেক জায়গায় অলোকরঞ্জনের সঙ্গে একমত হওয়া কঠিন। এ-রকম মতান্তরের কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

ভূমিকার ৫৪ পৃষ্ঠায় মঞ্চনির্দেশ দেখছি 'ক্রেয়োনের প্রবেশ।' তক্ষুনি প্রশ্ন ওঠে: ক্রেয়োনের প্রস্থান ঘটলো কখন? তার কোনও নির্দেশ বা ইঙ্গিত অনুবাদক দেন নি।

চতুর্থ ওস্ত শুরু হবার আগে কোনও কোনও ইংরেজ অনুবাদক *Exit Creon* এ-রকম স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। সম্ভবত অলোকরঞ্জনেরও তাই অভিপ্রায় ছিলো; কোনও কারণে তা ছাপা হয় নি।

কন্তোর 'আন্তিগোনে'তে এই জায়গায় ক্রেয়োন প্রস্থান করে না। কিটোর তর্জমায় তো স্পষ্ট নির্দেশই রয়েছে: *Creon remains on the stage*। দৃশ্যান্তরের প্রস্থান-প্রবেশ বিষয়ে সোফোক্লেস নিজেই অবশ্য স্পষ্ট সংকেত দিয়ে থাকেন। এখানে ক্রেয়োনের নিষ্ক্রমণ হোক, এ-রকম ইঙ্গিত তাঁর লেখায় নেই।

ব্যাপারটা শুধু মঞ্চনির্দেশের খুটকচালি ঘটিত নয়। চতুর্থ ওস্ত অভিনীত হবার সময় ক্রেয়োন মঞ্চে উপস্থিত থাকবে, নাটকের তাৎপর্যের দিক দিয়েই এটা দরকারি। তার কারণ বলি।

পলুনিকেসের মৃতদেহ সৎকার করা হবে না— তার দেহ শকুনি-শিয়াল-কুকুরে ছিঁড়ে খাবে— ক্রেয়োনের এই আদেশ সহোদরের প্রতি স্বাভাবিক ভালোবাসার টানে আন্তিগোনে অগ্রাহ্য করলো। তাই ক্রেয়োন তাকে মৃত্যুদণ্ডও দেয়। ক্রেয়োনের আচরণ অমানুষিক। এবং তা অমানুষিক ব'লেই প্রাকৃতিক ও ঐশ বিধানের প্রতিকূল।

আন্তিগোনে আর ক্রেয়োনের পুত্র হাইমোন পরস্পরের প্রতি বাগদত্ত ছিলো। হাইমোন ক্রেয়োনকে বোঝাতে চাইলো, তার রাজ্যদেশে ন্যায়ধর্মের অনুমোদন এবং প্রজাপুঞ্জের সমর্থন নেই।

পশুনিকেতের অন্ত্যেষ্টি নিষিদ্ধ ক'রে ক্রেয়োন বিশ্ববিধানকে লাঞ্ছিত এবং (ফলে) স্বর্গ ও পাতালের দেবতাদের রুষ্ট করেছিলো। এখন হাইমোনের আবেদন অগ্রাহ্য এবং আন্তিগোনেকে তার সামনেই হত্যার সংকল্প ঘোষণা ক'রে সে ভালোবাসার দেবতাকে অপমানিত করলো।

কিন্তু ভালোবাসার দেবতা অপরাজেয়; আর এই কথাটিই ৪র্থ ওডের বিষয়বস্তু।

কোরাসের মধ্যে দিয়ে সোফোক্লেস এই ভাবী ঘটনার পূর্বাভাস দিতে চাইছেন, লাঞ্ছিত প্রেমের দেবতার প্রতিশোধ অমোঘ সর্বনাশের রূপ নিয়ে ক্রেয়োনের মাথার ওপর প্রহৃত হবে। পড়ে থেকে বোঝা যায়, এই নাটক দৃশ্যত আন্তিগোনের, কিন্তু গভীরতর অর্থে ক্রেয়োনের ট্র্যাজেডি (মঞ্চ থেকে আন্তিগোনের চূড়ান্ত প্রস্থানের পরেও নাটক আরও টেনে নিয়ে যাবার জন্যে যারা সোফোক্লেসের নিন্দে করেন, তাঁরা এই দিকটি ধরতে পারেন না)। ক্রেয়োনের ট্র্যাজেডি দর্শকের কাছে উন্মীলিত করার জন্যে ৪র্থ ওডে তার উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা আছে। ঐ ওড শুনতে শুনতে দর্শক যদি চোখের সামনে ক্রেয়োনকে দেখতে পায় তা হ'লে ওডের মানে— এবং সমগ্র নাটকের অভিপ্রায়— তার কাছে স্পষ্ট হ'য়ে উঠবে। তাছাড়া, ঐ নিহিত তাৎপর্যের জন্যে— এবং সেই তাৎপর্য সব চরিত্রের কাছেই এখনও প্রচ্ছন্ন ব'লে— এখানে ক্রেয়োনের উপস্থিতি নাট্যমুহূর্তে টান ও তীব্রতা এনে দেয়। আমি গ্রীক কোরাসের নাচের ছন্দ সম্বন্ধে কিছুই বিশেষ জানি না। তবে এটুকু সহজেই বুঝতে পারি, নাচের তালে তালে কোরাস প্রচণ্ড নাটকীয়তা তৈরি করতে পারে এখানে। আর তখন স্টেজে ক্রেয়োন নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে এ জায়গার নাটকের আবেগ আরও উঁচু গ্রামে চড়তে পারে।

অবশ্য ঐ নাটকীয়তার দিক দিয়ে একটা বিরুদ্ধ যুক্তিও তোলা যায়। নাচ-গান-আবৃত্তির সহযোগে ৪র্থ ওডের অভিনয় যতক্ষণ চলতে থাকবে, ততক্ষণ ক্রেয়োন মঞ্চে কী করবে? তার সংলাপ তো যেন কিছুক্ষণ পরে। এই আপত্তি ২টো কারণে অগ্রাহ্য! ১. অন্য ওডের (যেমন ৩য় ওডের)-জায়গায় অনেকেরই নিজেও ক্রেয়োনকে মঞ্চে রেখেছেন। ২. অভিনয় ও সংলাপ

অভিনয় মনে করা মূলতঃ ছাড়া কিছু নয়। মনে হয়, এই নাটকে সোফোক্লেস নির্বাক অভিনয় নিয়ে একাধিকবার সার্থক ও সাহসিক পরীক্ষা করেছেন। উদাহরণত ৬৪ পৃষ্ঠায় এউরিদিকের নীরব প্রস্থানের উল্লেখ করা যায়।

তেতাল্লিশ পৃষ্ঠায় আন্তিগোনে বলছে, 'এই কি তোমার পিতা? আইমোন হরিত আমার।' (গিলবার্ট মারের ভর্জমায় : *Haemon beloved! Thy father wrongs thee sore.* রেবের অনুবাদে : *Haemon beloved! How thy father wrongs thee.* কিটো : *O my dear Haemon! How your father wrongs you!*) ইংরেজির সঙ্গে বাঙলা ভর্জমার কিছুটা তফাৎ আছে, কিন্তু আপাতত সেটা আমার বক্তব্য নয়। আমার আপত্তি, ঐ উক্তি আন্তিগোনের ওপর আরোপ করায়। পণ্ডিতেরা বলেন, 'আন্তিগোনে' নাটকের সমস্ত পাণ্ডুলিপিতেই এটা ইসমেনের সংলাপ হিসেবেই স্থান পেয়েছে। অধিকাংশ সম্পাদক (ও অনুবাদক) অবশ্য আন্তিগোনের মুখে এই উক্তি বসিয়েছেন। সেটার্স ঠিকই বলেছেন, সম্পাদকদের 'রোমান্টিক ঝোঁক' এই পরিবর্তনের কারণ। সহজ বুদ্ধিতে মনে হয়, ক্লাসিকল গ্রীক রুচি, নীতি এবং আন্তিগোনের চরিত্রের সঙ্গে তার মুখে এই সংলাপের সংগতি নেই। গ্রীক নাটকের নায়িকারা 'দুর্গেশনন্দিনী'র আয়েষা-প্রমুখ রোম্যান্টিক নায়িকার মতোন পুরুষের সামনে অকুণ্ঠিত প্রেম-ঘোষণায় অভ্যস্ত নয়। তাই আন্তিগোনের জবানিতে এ-কথা বসালে সমস্ত ব্যাপারটা সোফোক্লেসের জগৎ থেকে অনেকটা দূরে স'রে আসে। (এ প্রসঙ্গে দুটো জিনিস লক্ষণীয়। ১. দুইশ্বার্লিনপন্থী রোম্যান্টিক কেমিলতার জন্যে গিলবার্ট মারের ভর্জমা নিয়ে এলিয়ট একবার বহু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছিলেন। সেই নিন্দিত গিলবার্ট মারে কিন্তু এই উক্তি বসিয়েছিলেন ইসমেনের মুখেই। ২. ওয়াইলিঙে একটা যদিও আন্তিগোনের সংলাপ, তবে তা থেকে *beloved* বা তার প্রতিশব্দ সম্পূর্ণ বর্জিত হয়েছে।)

আর একটা কথা। গ্রীক নাটকের *stychomathia* বা 'কথা-কাটাকাটি'-র রীতি অনুযায়ী এ-উক্তি আন্তিগোনের হ'তে পারে না। 'কথা-কাটাকাটি'র মধ্যে এ-রকম ক্রমভঙ্গের নজির, যতদূর জানি, আর কোনও গ্রীক নাটকে নেই।

নাটকের পঞ্চম ও শেষ রীতিবদ্ধ অংশ। ঐ কোরাসে পর পর দানাএ, লুকাউর্গাস এবং জেওপেত্রা-ডিনেউসের দুই শিশুসন্তানের উল্লেখ আছে।

ব্যাপারটা এমনিতে অসংগত লাগতে পারে। ক্রেওপেত্রার সন্তানরা ও ফানাএ নির্দোষ ; আর লুকাউর্গাস ছিলো দোষী। তাছাড়া এদের জীবন-কাহিনীতে মিল নেই। আন্তিগোনের সঙ্গেই বা ওদের যোগ কোথায় তাও অস্পষ্ট। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, সমস্ত অনুষঙ্গের মধ্যে সোফোক্লেস এই ঘটনার ওপর জোর দিয়েছেন : লুকাউর্গাসকে পাথরের আর ফানাএ-কে বাস্তব কারাগৃহে অবরুদ্ধ করা হয় : আর ক্রেওপেত্রার নিষ্পাপ সন্তানদের দু চোখ অন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছিলো। শুদ্ধ যুক্তিক্রমের স্তরে দেখলে ফানাএ, লুকাউর্গাস ও ক্রেওপেত্রা-সন্তানদের পুরাণ-প্রসঙ্গ দুর্বোধ্য ও অসংলগ্ন মনে হবে। কবিতার গভীরতর স্তরে যা এই সব বিষম ও বিচ্ছিন্ন বিষয়কে ঐক্যবদ্ধ— এবং সমস্ত গুচ্ছকে একটি অখণ্ড ক্ষেত্রে স্থাপিত— করেছে, তা হচ্ছে, বারংবার প্রত্যাবৃত্ত 'অন্ধকার' বা তার সমার্থক শব্দ। সোফোক্লেসের নাটকে অন্ধকার সব সময়ই তাৎপর্যময় এবং নিয়তি বা অতিলৌকিকের ( ইর্র্যাশনল ) সঙ্গে সম্পৃক্ত।

নাটকের গঠনের দিক দিয়ে একটা জিনিশ এখানে লক্ষ্য করার মতো। সকল গুচ্ছ স্থান পেয়েছে আন্তিগোনের শেষ দৃশ্য এবং তাইরেসিয়াস দৃশ্যের ঠিক আগেখানে। অর্থাৎ অন্ধকারের পুনরাবৃত্ত অভিঘাত এক দিকে আন্তিগোনের নির্মম পরিণামের উপযুক্ত আবহ এবং অন্যদিকে অন্ধ ভাবী-বক্তৃক তাইরেসিয়াসের ( যে আকাশপ্রদীপের মতোন মহা-অন্ধকারকে ছুঁয়ে জ্বলতে থাকে ) আবির্ভাবের যোগ্য ভূমিকা তৈরি করে।

নাটকের ঠিক মোড় ঘোরার সময় আবেগঘন একটি অসাধারণ মুহূর্তে সমগ্র জাতির স্মৃতি মথন-ক'রে-আনা কয়েকটি পুরাণ-ঘটনার উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে 'অন্ধকার' শব্দের ক্রমাগত উচ্চারণের আক্ষেপ একটা অসম্ভব অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটিয়ে দেয়।

অলোকরঞ্জনের তর্জমায় অন্ধকারের এই গুরুত্ব থাকে নি। উনচল্লিশ পঙ্‌ক্তি জুড়ে তিনি ৪র্থ গুচ্ছের তর্জমা করেছেন, তার মধ্যে 'আঁধার' শব্দটি মাত্র একবার ব্যবহৃত হয়েছে। প্রতিতুলনার জন্যে গিলবার্ট মারের তর্জমার প্রথম শ্লোকের প্রথম ৩ পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

**So Danae from *sun-light* was *forbidden***
**In that brass-walled prison-house immured ;**
***Tomb-dark* was her marriage chamber hidden.**

তিন লাইনের মধ্যেই অন্ধকারের কথা ২ বার এলো : *from sunlight was forbidden* এবং *Tomb-dark*। কিটোর তর্জমাতেও প্রথম শ্লোকের কেবল প্রথম ৩ লাইনের মধ্যে অন্ধকারের প্রসঙ্গ এসেছে ২ বার। অলোকরঞ্জন কিন্তু সমগ্র প্রথম শ্লোকের অনুবাদে একবারও অন্ধকারের উল্লেখ আনেন নি।

নাটকের প্রথম পঙ্‌ক্তির অনুবাদই অর্থগ্রহণের দিক দিয়ে অনুবিধে সৃষ্টি করে : 'ইসমেনে শুনেছিস, ইসমেনে বোনরে আমার।' ইসমেনে আন্তিগোনের দিদি। আন্তিগোনে তার দিদিকে বোন ব'লে ডাকলে সম্পর্কটা বিভ্রান্তিকর হ'য়ে পড়ে। ব্যাপারটা এমনিতে তুচ্ছ মনে হ'তে পারে। তবে আমার বিশ্বাস, আন্তিগোনেই যে বয়সে ছোট, এই তথ্য বাদ দিলে বিশেষ ক'রে প্রারম্ভিক দৃশ্যের নাটকীয়তা অনেকটা হারিয়ে যায়। আর সে সবচেয়ে ছোট ব'লেই (বা কথাটাকে একটু অন্যভাবে বললে, সে আমাদের বাড়ির ছোট বোনটির মতোন ব'লেই) ট্র্যাজেডির সমস্ত মহনীয়তার মধ্যে অকথা কোমল কারুণ্যের মায়া এসে পড়ে।

তাছাড়া আন্তিগোনের অনমিত চারিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে ভাবলে ব্যাপারটা নাটকের দিক দিয়ে অতোটা গৌণ লাগবে না। নগণ্য-ক্লীব রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে একা দাঁড়াতে তার লেশমাত্র ভয় নেই। দিদি ইসমেনেও যেখানে দ্বিধাগ্রস্ত ভীত, আন্তিগোনে সেখানে নির্দ্বিধ নিঃসঙ্গ। আন্তিগোনের অনুকম্প তার আত্মবোধে উজ্জ্বল নিঃসঙ্গ দৃঢ়তা ও নিষ্পাপ চিত্তবৃত্তির স্বাধীনতাকে আরও দীপ্ত ক'রে তোলে। এই শুদ্ধ চারিত্রের শক্তিতেই সে এতো সহজে জেনেছে : যা প্রাকৃতিক, তা-ই বিশ্ববিধানসংগত।

আসলে তর্জমার কতকগুলো বিশিষ্ট অংশের প্রশ্ন নয় : যে-নীতি ও পদ্ধতিতে অলোকরঞ্জন অনুবাদ করেছেন তা আমার গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। এ-রকম মন্তব্য করলেই অনুবাদের বিকল্প নীতি— অর্থাৎ আমার সমালোচনার প্রতিমান— বিবৃত করার দায় আসে। সে দায় এড়াবো না। কিন্তু তার আগে অন্য একটা কথা স্পষ্ট করা দরকার।

অনেক সময় লেখকরা ক্লাসিক অবলম্বন ক'রে সাহিত্য রচনা করেন। এ ধরনের লেখাকে মোটা হিসেবে অনুবাদ-সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত করা হ'লেও

এগুলো ঠিক তর্জমা নয়। এ ক্ষেত্রে ক্ল্যাসিক আসলে তাঁদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও বক্তব্য রূপায়ণের বা রূপকল্পগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার বাহন। অনুবাদের সাধারণ বিধি-বিধান এই ধরনের লেখার প্রযোজ্য নয়। কক্তোর 'আন্তিগোনে' এই শ্রেণীর সাহিত্যের দৃষ্টান্ত। সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমির সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার জন্যে কক্তো মূল নাটককে অংশত রূপান্তরিত (এবং সংক্ষিপ্ত) করেছিলেন। ১৯২৭ সালের মঞ্চ-বিবরণ থেকে কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করলে আমার কথাটা স্পষ্ট হবে: *five monumental plaster heads of youngmen framed the Chorus···The costumes were worn over black bathing suits, and arms and legs were covered. The general effect was suggestive of a sordid carnival of kings, a family of insects.* 'আন্তিগোনে' অবলম্বনে এই ধরনের নাটক লেখার অধিকার, আর সকলের মতোন, অলোকরঞ্জনের আছে। এবং সে ক্ষেত্রে অনুবাদের নীতিগত প্রশ্ন তোলা অবান্তর।

কিন্তু অকাদেমীর মতোন সাহিত্যমান সংরক্ষক সংস্থা যখন কোনও নাটকের অনুবাদ (রূপান্তর নয়) ছেপে বার করেন এবং যদি তার ঘোষিত উদ্দেশ্যই হয়— পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক মূল্য প্রাচ্যদেশীয়দের উপলব্ধিগত করানো, তখন ব্যাপারটা অন্য রকম হ'য়ে দাঁড়ায়। এবং সেক্ষেত্রে তর্জমার নীতি-বিষয়ক প্রশ্ন তোলা সংগত ও স্বাভাবিক হয়ে পড়ে।

ই. ভি. রিউ-এর সাধারণ সম্পাদনায় প্রকাশিত পেঙ্গুইন ক্ল্যাসিক্স গ্রন্থমালা বর্তমান শতাব্দীতে অনুবাদ-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আন্দোলন হিসেবে গণ্য হ'তে পারে। সম্প্রতি (১৯৬০) একটি প্রবন্ধে রিউ তাঁর অভিজ্ঞতার কথা এবং যে সুচিন্তিত নীতি তাঁর সম্পাদন-কর্মের নিয়ামক ছিলো তা লিপিবদ্ধ করেছেন। ওঁদের অভিজ্ঞতা থেকে শেখবার জিনিস অনেক আছে। তবে নিশ্চয়ই যাছি-মাফা কেরানির মতোন ক'রে নয়। যা গ্রাহ্য তা হচ্ছে মূলনীতি। এবং বাংলা ভাষার বিশিষ্ট সমস্যা বা আমাদের বিশেষ প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খাওয়াবার জন্যে প্রয়োগের সময় ঐ মূলনীতির কিছু হের-ফেরও ক'রে নিতে হবে। রিউ পেঙ্গুইন ক্ল্যাসিক্স-এর অনুবাদ-নীতির নাম দিয়েছেন 'প্রিন্সিপ্‌ল অফ ইকুইভ্যালেন্ট এফেক্ট'। ঐ 'সমমানিক প্রতিক্রিয়ার তত্ত্ব'কে বিশ্লেষণ করলে ছুটো সরল সূত্রে পাওয়া যায়: ১. মূলের ভাব ও স্টাইল (স্টাইল ও ইডিয়মের অভেদ রিউ মানেন না) অবিকৃত

রাখতে হবে। ২. তর্জমার ভাষাকে মূলভাষে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে সমকালীন বাগ্‌রীতির গুণে। এই দুটো সূত্রকেই আমি আলোচনার প্রতিমান হিশেবে কাজে লাগিয়েছি।

প্রথম সূত্রটি প্রায় স্বতঃসিদ্ধের মতোন লাগে। কিন্তু বাণিটা যতো সহজ, কাজটা ততো কঠিন। কবিবন্ধুপ্রাণী ভিক্টোরিয়ান তর্জমাকারদের কাণ্ডিয়ানার উত্যক্ত হয়ে কার্লাইল যখন বলেছিলেন, *Tell us what they thought; none of your silly poetry*, তাঁর ধারণা ছিলো গ্রীক সাহিত্যের অনুবাদ গদ্যে করলে ভাষান্তরের ঘটতে যাবে। গদ্য-তর্জমা দুরূহতর সন্দেহ নেই, তবে গদ্যের ছুড়ি টাকালেই ভাষান্তরের কাঁচা মেটে যাবে তাঁর এ-ধারণা ভুল। কারণ সাহিত্যের প্রাথমিক উপকরণ হচ্ছে শব্দ বা শব্দবন্ধ; আর শব্দবন্ধের মতোন প্রায়-অনুবাদ্য বস্তু খুব কম আছে। শুধু অভিধা ছাড়া প্রত্যেক শব্দে নিহিত থাকে: ভাব ভাবনা আবেগ ও মূল্যবোধ। আর শব্দার্থের এ-সব উপাদান ন্যাফ্‌থালিনে ঢোলানো নির্বিশেষ বস্তু, পদার্থ নয়, ওগুলোর মূল প্রথিত থাকে ইতিহাস-নির্ধারিত দেশ-কাল-সমাজের মাটিতে এবং লোকস্মৃতির অনুষঙ্গে। অনুবাদ-নীতির প্রশ্ন তাই এতো জরুরি। অলোকরঞ্জনের পদ্ধতি ভাবের অবিকৃত অনুবাদের উপযোগী নয়। কারণ, তাঁর তর্জমা-রীতির মূল লক্ষ্যই হলো, ভারতবর্ষ ও গ্রীসের ভাবলোকের দূরত্ব সরিয়ে ফেলা। এই উদ্দেশ্যে তিনি স্থানে স্থানে কল্প-যন্ত্র বসিয়েছেন, গ্রীক পারিভাষিক শব্দকে ভারতীয় রূপ দিয়েছেন এবং হিন্দু ও গ্রীক দেব-দেবীকে প্রতিস্থাপিত করেছেন। তাঁর ভূমিকা থেকেই উদ্ধৃত করি: 'একাধিক স্থলে জিউস বা আরেস বা দিয়নুসাসকে তাই আক্ষরিক তুর্গমতা থেকে সরিয়ে এনে অনুরূপ সদৃশ কোনো-কোনো ভারতীয় দেবতার পাশাপাশি বসিয়েছি। এভাবে পাশাপাশি বসালে দুটি নামের সাহিত্যে সেই নাটকীয় মুহূর্তের ইঙ্গিত সাধিত হয় এবং গ্রীস ও ভারতবর্ষ একটি মহাদেশের অভিন্ন আকাশের নিচে মিলিত হতে পারে।' এভাবে 'সেই নাটকীয় মুহূর্তের ইঙ্গিত' কি ক'রে সাধিত হয়, তা বোঝা কঠিন। তার চেয়ে গুরুতর প্রশ্ন হলো: ভারতবর্ষ ও গ্রীসকে এইভাবে মিলিয়ে দেওয়া সম্ভব ও সংগত কি না? ভারত ও গ্রীসের ভাবলোকে যথেষ্ট পার্থক্য আছে; দুটো জগৎকে একাকার করা সম্ভবও নয়, অনুবাদে তার প্রয়োজনও নেই।

ইউরোপ ও ভারতবর্ষের মধ্যে এই ধরনের সাদৃশ্য-সন্ধানের চেষ্টা আসলে পঞ্চমন; এবং তা ইতিহাসবোধের বিরোধী। ইউরোপ ও ভারতবর্ষের

পৃথকত্ব-মণ্ডিত ডায়ালেক্‌টিক্‌স উভয়ের সংযোগের মুহূর্ত থেকে ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত করেছে। যেমন সামাজিক বা রাষ্ট্রিক ইতিহাসে, তেমন মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক কাল পর্যন্ত আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে এই ডায়ালেক্‌টিক্‌স ক্রিয়াশীল। ইওরোপের অভিজ্ঞতাকে অধিগত ক'রেই আমাদের জাতিগত আত্মপরিচয়ে পৌঁছতে হবে ও এগিয়ে চলতে হবে, এ আমাদের ঐতিহাসিক নিয়তি। গত শতাব্দী থেকে ভারতবর্ষে কি রাজনীতিতে, কি সাহিত্যে যে-কাজ হয়েছে, তা মূলত এই প্রচেষ্টারই সাফল্য-ব্যর্থতার ইতিহাস। ভুল হয়েছে, যখন আমরা পেণ্ডুলামের মতোন দুটো উল্টো বিন্দুর দিকে ঝুঁকেছি: একদিকে ইওরোপের মডেলে ভারতবর্ষকে হুবহু মিলিয়ে দেখার বিকার, অন্যদিকে ইওরোপের অস্তিত্বই সম্পূর্ণ অস্বীকার করার অন্ধতা। অন্য প্রভাব, অন্য জগৎ দেখার একটা বড়ো ফল হচ্ছে তাতে নিজের কাছে নিজের স্বরূপটা স্পষ্ট হয়। সরল সমীকরণের দ্বারা ভেদরেখা মুছে ক'রে নয়, ইওরোপ বা তার আদি জননী গ্রীসের ভাবজগৎ অবিকৃতভাবে স্থাপিত ক'রেই আমাদের অনুধাবকরা এই প্রক্রিয়াকে সাহায্য করতে পারেন। 'যাহাদের প্রাণ বিদেশী হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা কথায় কথায় বলেন— ভাব সর্বত্রই সমান। কথাটা শুনিতে বেশ উদার, প্রশস্ত। কিন্তু আমাদের মনে একটি সন্দেহ আছে। আমাদের মনে হয়, যাহার নিজের কিছুই নাই, সে পরের সব লোপ করিতে চায়।··· দুইটি স্বতন্ত্র জাতির মধ্যে মনুষ্যত্বভাবের সাম্যও আছে, বৈষম্যও আছে। আছে বলিয়াই রক্ষা, তাই সাহিত্যে আদান-প্রদান, বাণিজ্য-ব্যবসায় চলে' (রবীন্দ্রনাথ)।

যা স্ব-ভাবে গ্রীক তাকে ভারতীয় রূপ দিলে অর্থ ও ভাব-গত বিকৃতি ঘটতে বাধ্য। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, অলোকরঞ্জন আন্তিস্রোফের নাম দিয়েছেন 'অন্তরা' এবং স্রোফের 'স্থায়ী'। আন্তিস্রোফের অর্থ, *lines recited during returning movement from left to right in Greek choruses*। স্রোফেরও অনুরূপ পারিভাষিক অর্থ আছে। অন্তরা বা স্থায়ী সেই বিশিষ্ট অর্থ বহন করে না; বরং এ-ধরনের প্রতিশব্দ ব্যবহারে ভুল বোঝার— এবং না-বোঝার—আশঙ্কা বাড়ে। একই কারণে, কোরাসের মুখে বন্ধ-ঘর বসানো যুক্তিহীন। যদি ওতে গ্রীক দেবতা দিয়নুসাসের -এর আছে। অলোকরঞ্জন তার প্রথমে ঋগ্‌বেদের অগ্নিবন্দনা সংযোজন করেছেন।

অগ্নি ও হিরণ্যদাসের একত্ব এতই দুর্নিরীক্ষ্য যে এখানে হিরণ্যদাস-বন্দনার যা উদ্দেশ্য তার সঙ্গে অগ্নিস্তবের যোগ খুঁজে বার করা অসম্ভব। অনুবাদের এই রীতি অর্থ-পরিগ্রহের দিক দিয়ে কি বিপত্তির সৃষ্টি করে জেরোনের এই উক্তি তার দৃষ্টান্ত :

'ঈশ্বরের ঈগলের কাঁক
মৃত্যের কঙ্কাল বয়ে জিউসের শীর্ষসিংহাসনে
নিয়ে যাক' ( পৃষ্ঠা ৪৯ )

ঈগলগুলো যে আসলে জিউসেরই, এ-ভাবে অনুবাদ করলে তা বোঝা দুষ্কর।

অলোকরঞ্জনের আর একটি রীতি নাটকের ভাবলোক অবিকৃত রাখার ব্যাপারে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা হচ্ছে : কথার আধিক্য। পণ্ডিতেরা বলেন, সোফোক্লেস গ্রীক নাট্যকারদের মধ্যেও আবার বিশেষভাবে মিতবাক। এই সংযত সমাহিত বহু গড়নের সঙ্গে নাটকের তাৎপর্য অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। ইংরেজ অনুবাদকরা লিখেছেন, সোফোক্লেসের ভাষার বাহুল্যবর্জিত রূপ ইংরেজিতে অব্যাহত রাখা কঠিন। বাঙলায় যে তা কঠিনতর, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু অলোকরঞ্জনের সঙ্গে জেব বা কিটোর তর্জমা মিলিয়ে পড়লে বোঝা যাবে, তাঁর অনুবাদে কথার যে জলোচ্ছ্বাস, বাঙলা ভাষার স্বাভাবিক প্রবণতাই তার একমাত্র কারণ নয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে জেরোনের এই উক্তিটিকে নেওয়া যেতে পারে :

'এ-কোন লাগামছাড়া মুখ-আলগা অবাধ্য বাচাল !' ( পৃষ্ঠা ৩৫ )

*Thou art a born babbler* ( জেব )

*You are a babbling fool* ( কিটো )

যেখানে অলোকরঞ্জন ৪টে বিশেষণ ব্যবহার করেছেন, জেব ও কিটো সেখানে ২টো।

'মানের চাপড়া ঠিক আছে' ( পৃষ্ঠা ৩৩ ) প্রহরীর এই সংলাপের অথবা "বুকে ভৈরবী 'তোর ভরি' 'তোর ভরি'" দ্বিতীয় গুচ্ছের ওই চরণটির ( পৃষ্ঠা ৩৬ ) অনুরূপ কোনও পঙ্‌ক্তি আমি যে-কটা ইংরেজি তর্জমা দেখেছি, তার একটাতেও পাই নি।

এমনিতে শেষ গুচ্ছের তর্জমা রীতিমত সুখপাঠ্য ও কবিত্বময়। সবটা উদ্ধৃত করি :

'মানুষের কাছে প্রজ্ঞার চেয়ে মহত্তর
আর-কিছু নেই। বিধাতার বাণী সগৌরবে
নিত্য ধ্বনিছে, সেইখানে মাথা নোয়াতে হবে।
ধূসর ধস্ত প্রস্তর অনল এড়ালো কবে?
মহানির্বাণে স্বর্গ হরো,
তার আগে তুমি বৃদ্ধের করো জ্ঞানবৃদ্ধ, গোধূলিনতে।' (পৃষ্ঠা ৬৯)

আমার আপত্তি ঐ শেষের 'গোধূলিনতে' শব্দবন্ধে। ইংরেজি অনুবাদগুলোয় এ-রকম কোনও শব্দ দেখি নি। নিশ্চয়ই ওটা সংযোজন। অনুপ্রাসের টানে 'গোধূলিনতে' আমায় এখানে অবশ্যিকরভাবে অলোকরঞ্জনের কবিতার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। তাই এটা শুধু সাধারণ সংযোজন নয়, এখানে অনুবাদকের কবি-ব্যক্তিত্বের অভিক্ষেপ ঘটেছে।

এবার অনুবাদ-নীতির দ্বিতীয় সূত্রে আসা যাক। 'আন্তিগোনে'র নিজস্ব নিহিত শক্তিই আছে আমাদের দেশ-কালের মানুষকে স্পর্শ করার, এ-কথা আগেই বলেছি। তাই আমাদের সংবেদ ক'রে তোলার জন্যে অন্তত অনুবাদে কোনরকম বাইরের অলংকরণ-রূপান্তরণের দরকার পড়ে না। ভাব ও স্টাইল যথাসম্ভব অবিকৃত রাখা অনুবাদকের প্রাথমিক দায়িত্ব। তাছাড়া তাঁর করণীয় শুধু সমকালীন বাগ্‌রীতির ওপর ভর্জমার ভাষাকে দৃঢ়ভাবে স্থাপিত করা। নাটকে এ-দায় আবার অন্য শিল্পরূপের চেয়ে বেশি। বাগ্‌রীতিবিরুদ্ধ ভাষা সংলাপে চলে না। তা ছাড়া, আবেগের চাপ, পরিস্থিতি ও চরিত্র-বিশেষের চাহিদা অনুযায়ী সংলাপের ভাষার ওঠা-নামা করতে পারা চাই; এ-কারণেও জীবন্ত ভাষার সঙ্গে তার যোগ অপরিহার্য। অলোকরঞ্জনের অনুবাদে বাঙলা ভাষার বিশিষ্ট বাগ্‌রীতি সর্বত্র রক্ষিত হয়েছে কি না, এ-বিষয়ে আমার কিন্তু সংশয় আছে।

১. 'কেউ তাকে এককাঠা কবর কি একফোঁটা জল দিতে পারবে না' (পৃষ্ঠা ২৩)
২. 'জোর চল' (পৃষ্ঠা ৩২)
৩. 'ভূতের পুণ্যাহ করতে যাও' (পৃষ্ঠা ৪২)
৪. 'এ মেয়েটি/নিরিবিলি কবর সাজাচ্ছিলো যজ্ঞ লোকটার' (পৃষ্ঠা ৩৭)
৫. 'যেআইনী যজ্ঞ লোকটাকে যেই কবর দিচ্ছিলো আমি ওকে যেতে পাই' (পৃষ্ঠা ৩৭)

৯ 'মতা শোলুনাইকেস প'ড়ে ছিলো' ( পৃষ্ঠা ৬৪ )
চতুর্থ পঞ্চম ও ষষ্ঠ দৃশ্যান্তে 'মতা' হয় বানান কুলের, নয়তো বাগ্‌রীতি লঙ্ঘনের উদাহরণ।

কাব্যনাট্যে শেষ বিশ্লেষণে, বাগ্‌রীতির সঙ্গে বাক্‌স্পন্দের প্রশ্ন জড়িত। বিদেশী নাটকের তর্জমায় এ-দিকটার ওপর বাঙলায় এখনও যথাযোগ্য গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। ম্যাকবেথের তর্জমায় গিরিশ ঘোষ বা যতীন সেনগুপ্ত যে-সব সমস্যা নিয়ে ভেবেছিলেন সেগুলিই যথেষ্ট নয়; *Edward II*-এর তাবাস্তর করতে গিয়ে ব্রেখ্‌ট যে-সমস্ত প্রশ্ন সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন, সেগুলো এড়িয়ে চললে কাব্যনাট্যের অনুবাদের কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। অর্থাৎ যখন নিয়মিত প্যাটার্ন বজায় রাখাই সব নয়; আবেগের চাপে দরকার মতো যাঁরা চাঁচ ছেঁড়ে ফেলে কথা বলার জীবন্ত ও জটিল ছন্দ-স্পন্দের ওপর নাট্যভাষাকে ন্যস্ত করাতে হয়। এ-ধরনের বেড়ি-ভাঙার চেষ্টা অলোকরঞ্জন করেছেন বলে মনে হয় নি। আমার বিশ্বাস, 'আন্তিগোনে'র সর্বসাকুল্যে ১০৪৩ পঙ্‌ক্তির মধ্যেই আবেগের এতো বিচিত্র যাত্রাভঙ্গি, বিস্তার ও নাটকীয় প্রতিন্যাস আছে যে ছন্দোমুক্তির প্রসারিত আকাশ-গঙ্গাতেই তার সেই বহুস্বর ব্যাপ্তিকে তিনি ধরতে পারতেন। আর, পেরিক্লেসের আবেগের জীবন-যাত্রার ছন্দকে বাঙলায় ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত করার জন্য কী উপায় আছে? আমার ধারণা, প্রাকৃতিক ছন্দের তালে তালে পদগুলোকে বাজিয়ে নিতে পারলে আজকের বাঙলা দেশের বহুরহীন দৈর্ঘ্যহীন মধ্যবিত্ততার প্যাটার্ন থেকে সম্পূর্ণ অন্য এক দূরত্বদীর্ঘ জগতের আভাস আনা সম্ভবপর।

পরিশিষ্টে 'আন্তিগোনে নাটকের দেবায়তন' যোজিত হয়েছে। দেবায়তন সম্ভবত প্যান্‌থিয়নের তর্জমা। তাহলে প্রশ্ন ওঠে: ডিনেউস বা লাইকাস-এর নাম দেব-দেবীর তালিকায় কেন এলো? আমার মনে হয়, নাটকে উল্লিখিত সমস্ত পুরাণ-প্রসঙ্গের ওপরেই টীকা থাকলে ভালো হতো।

সাহিত্য অকাদেমীর বই ব'লেই কিছু মুদ্রণ-ত্রুটির উল্লেখ করছি। এক-চল্লিশ পৃষ্ঠার 'কোন'-র জায়গায় 'কোণ' ছাপা হয়েছে। কয়েকক্ষেত্রে বানানসঙ্গতি রক্ষিত হয় নি। যেমন, প্রথম পৃষ্ঠায় 'উষা' অথচ ৬৯ পৃষ্ঠায় 'প্রত্যূষা'; ৫৩ পৃষ্ঠায় 'সুকাউর্গাস', কিন্তু ৭৫ পৃষ্ঠায় 'সুকাউর্গোস'।

গোড়ার কথায় আবার ফিরে আসি। গ্রীক না জানার জন্যে এ আলোচনায় আমি প্রায় পদে পদে হোঁচট খেয়েছি। আর লিখতে গিয়ে হাতে হাতে টের পেয়েছি, পুরো বিষয়টা সম্বন্ধেই আমার অজ্ঞতা কী আকাট। আসলে আমরা প্রায় সকলেই এখনও যবন পণ্ডিতের গুরু-দ্বারা চেলা। আর সেইজন্যেই আমাদের সংস্কৃতিচর্চার মৌলিক দৌর্বল্য কিছুতেই ঘুচছে না। গ্রীকভাষা ও সংস্কৃতির যথোপযুক্ত অনুশীলন ঐ দৌর্বল্য কাটানোর একটা প্রশস্ত উপায়। তবে সেটা বাণিজ্যিক পুঁজিতে অথবা দৌখিন পাণ্ডিত্যবিলাসে দাঁড়িয়ে যাবার একটা ভয় আছে। সেই অনুশীলন চরিতার্থতা পায় আমাদের জাতিগত সত্তার পরিচয় খুঁজে বার করার জন্যে অনির্বচনীয় চেষ্টার সঙ্গে সংলগ্ন হলে। স্বদেশচেতনা, অন্তত এ-যুগে, আত্মবোধেরই গুপিঠ। নিজেকে এবং নিজেদের শনাক্ত করার ব্যাপারে অনুবাদচর্চা কখনও কখনও পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হ'তে পারে; সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তার বহু নজিরও আছে।

আর একটা কথা। অনুবাদের নীতি সম্বন্ধে সাহিত্য অকাদেমী ভাবছেন এবং তাঁদের সুসংবদ্ধ ভাবনা সাধারণ্যে বিবৃত করবেন, অকাদেমী কর্তৃপক্ষের কাছে এই দাবি পেশ করতে চাই। এটা এমন একটা কাজ যেটা অকাদেমীর মতোন সাহিত্য-সংস্থার এক্তিয়ারে পড়ে। তাছাড়া, ওঁদের কর্মসূচীতে তর্জমার প্রাধান্যও কিছু কম নয়।

## অর্দ্ধেন্দুশেখর প্রসঙ্গে আরও কথা

বর্তমান সংখ্যার ৬৮ পৃষ্ঠায় অর্দ্ধেন্দুশেখর সম্পর্কে আমাদের মন্তব্যে যে কয়জন লেখকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের সঙ্গে 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' গ্রন্থের লেখক অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম না করলে খুবই অন্যায় হয়। অপরেশচন্দ্র ছিলেন অর্দ্ধেন্দুশেখরের শিষ্য। অর্দ্ধেন্দুর শিক্ষাগুণে তিনি অভিনেতা হিসেবে সুনাম অর্জন করেছিলেন। সুলেখকও ছিলেন তিনি। 'রূপ ও রঙ্গ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ও পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত স্মৃতিকথা 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' নামক সুখপাঠ্য ও অত্যন্ত মূল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থটি তার প্রমাণ। অর্দ্ধেন্দুর অভিনয় ও শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে তিনি 'রঙ্গমঞ্চ' পত্রিকায় একসময়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছিলেন। অর্দ্ধেন্দুশেখরের মৃত্যুর পর গিরিশচন্দ্র যে পুস্তিকাটি রচনা করেছিলেন (বর্তমান সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত) তা সর্বাংশে অপরেশচন্দ্র পছন্দ করতে পারেন নি। গিরিশচন্দ্রের কিছু কিছু মন্তব্য তাঁর কাছে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপাত্মক মনে হয়েছে। তাই তিনি অর্দ্ধেন্দুশেখর সম্পর্কে একটি ১১ পৃষ্ঠার পুস্তিকা রচনা করেছিলেন। এই পুস্তিকা গিরিশচন্দ্রের পুস্তিকার সমালোচনা বা উত্তর। খুবই সংক্ষিপ্ত হলেও এ রকম বিদগ্ধ ও রসগ্রাহী রচনা আমাদের স্বভাবতই মুগ্ধ করে। মৃত্যুর পূর্বে অর্দ্ধেন্দুশেখর মিনার্ভা থিয়েটার ছেড়ে কোহিনূর থিয়েটারে যোগদান করেছিলেন। গিরিশচন্দ্রের পুস্তিকা মিনার্ভা থিয়েটারে শোকসভায় পঠিত ও সেখান থেকেই প্রকাশিত হয়, আর অপরেশচন্দ্রের পুস্তিকাটি ('স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখরের নট-জীবন') কোহিনূর থিয়েটার থেকে প্রকাশিত ও এই স্বনামধন্য অভিনেতার প্রতি কোহিনূরের শেষ শ্রদ্ধার্ঘ। অপরেশচন্দ্র-রচিত সেই পুস্তিকাটি এইসঙ্গে পুনর্মুদ্রিত না করলে অর্দ্ধেন্দুর কথা অনেকখানি অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

সম্পাদক, এক্ষণ।

# স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখরের নট-জীবন

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কোহিনুর থিয়েটার।

চন্দ্রশেখর পুস্তকে, চন্দ্রশেখরের ভূমিকার শিক্ষা প্রসঙ্গে অর্দ্ধেন্দু বাবুর সহিত আমার প্রথম পরিচয়। অর্দ্ধেন্দু বাবুর শিক্ষাদান কৌশলে প্রথম বুঝি, আমরা রঙ্গালয়ে হাত পা ছুড়িয়া, চীৎকার করিয়া যে অভিনয় করি, তাহার একটা ব্যাকরণ আছে, একটা সংযম আছে। অর্দ্ধেন্দু বাবুর নিকট প্রথম শুনি, যে ভূমিকা লইয়া অভিনেতা রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইবেন, সেই চরিত্রের গুরুত্ব অনুসারে অভিনেতার উক্তি বিশুদ্ধ ও পরিমার্জ্জিত ও সংযত হওয়া উচিত। যেমন,—যিনি চন্দ্রশেখরের ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইবেন তাঁহার উচ্চারণ পদ্ধতি, আঙ্গিনয়িক ভঙ্গি, চন্দ্রশেখরের ন্যায় মার্জ্জিত রুচি, পাণ্ডিত্য, সুপণ্ডিতের ন্যায় হওয়া বিধেয়। তিনি বলিতেন, চন্দ্রশেখর যখন মায়াবাদের আলোচনা করিতেছেন, চন্দ্রশেখর যখন সমাস-বহুল-শব্দপ্রয়োগে মনোভাব ব্যক্ত করিতেছেন তখন তিনি লোকাভাব বলিবেন না, মায়া বলিবেন না, রোজনী বলিবেন না, পিশাচের পরিবর্ত্তে পিশাশ বলিবেন না, মহীর স্থানে মৃত্তী বলিবেন না। তাঁহার মার্জ্জিত জিহ্বা সর্ব্বথাই বলিবে,—সংসার, রজনী, মায়া ইত্যাদি। সংস্কৃতের ন্যায়, বাঙ্গলা শব্দ ভিন্ন, বাঙ্গলা শব্দেও যে হ্রস্ব দীর্ঘের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উচ্চারণের সার্থকতা আছে, তাহা তাঁহার নিকট শুনিয়া বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যের লালিত্য অনুভব করি। তাঁহার উচ্চারণ যেরূপ বিশুদ্ধ ও ব্যাকরণের শাসনানুযায়ী ছিল, সচরাচর কোন অভিনেতার মুখে সেরূপ শুনিয়াছি কি না তাহা মনে হয় না। বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া তাঁহার সহিত আলাপে, তাঁহার নিকট শিক্ষা গ্রহণে, গুরু শিষ্য সম্বন্ধে তাঁহার সহিত হৃদয়ের বিনিময়ে, অভিনেতা অর্দ্ধেন্দু বাবুকে আমরা যে ভাবে বুঝিয়াছিলাম বা যে ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, বক্ষ্যমান প্রবন্ধে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিবার চেষ্টা পাইব।

প্রবাদ আছে, বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গালীর আদি কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, পাঁচ বৎসর বয়সে, কলিকাতায় অবস্থান কালে, তাঁহার জনৈক আত্মীয় যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "হাঁরে ঈশর কলিকাতার কেমন

আছিস?" তখন বলিয়াছিলেন, "রেতে যখা দিনে যাছি—এই নিয়ে কাজকেতায় আছি।" বাঙ্গলার স্বভাব কবির এই উত্তরে যেমন তাঁহার ভবিষ্যৎ শক্তির বীজ নিহিত ছিল, অর্দ্ধেন্দু বাবুর বাল্যজীবনের কার্য্যাবলিতেও তাঁহার ভবিষ্যৎ আভিনয়িক প্রতিভার ক্ষুদ্র বিকাশও পরিলক্ষিত হইত। সম্মানাস্পদ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি, কথা প্রসঙ্গে অর্দ্ধেন্দু বাবুর নিকটেও শুনিতাম, শৈশবে পাঠশালায় তিনি অনুকরণ করিয়া সমপাঠীদিগকে আভিনয়িক কৌশলে মুগ্ধ করিতেন। বালোর এই অনুকরণ প্রবৃত্তি উত্তর কালে অর্দ্ধেন্দুশেখরকে নটকুলচূড়ামণি অভিধান প্রদান করিয়াছিল। বিদ্যালয়ের সহিত সংস্রব পরিত্যাগের পরে এবং বাঙ্গলার সাধারণ নাট্যশালার প্রতিষ্ঠার পূর্বেও তিনি ক্রীড়া প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু প্রভৃতি সমপাঠীসহযোগে, ইংরেজ ভিক্ষুক, রাস্তা বন্ধি ইন্সপেক্টর, উড়ে বুলি, হাসপাতালের রোগী সাজিয়া সকলের প্রীতি উৎপাদন করিতেন এবং তাঁহার সঙ্গীদিগকেও তাঁহার ন্যায় অনুকরণ করিতে শিক্ষাদান করিতেন। এই শিক্ষাদান প্রবৃত্তি উত্তর কালে তাঁহাকে বঙ্গীয় নাট্যশালায় প্রতিদ্বন্দ্বিহীন গৌরবময় স্থানিকের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।

অর্দ্ধেন্দু বাবুর আভিনয়িক শক্তি যেরূপ উচ্চ ছিল, তাঁহার সাধনাও তদনুযায়ী কঠোর ছিল। তিনি হঠাৎ একদিন সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া যেমন নাই যে, স্ব-অভিনেতা বলিয়া তাঁহার নাম বঙ্গদেশে কীর্ত্তিত হইতেছে। গুরুতর পরিশ্রম, প্রাণপণ সাধনা ও সর্ব্বোপরি অদ্ভুত আত্মত্যাগের দ্বারা তিনি অভিনেতার যশমালা অধিকার করিয়াছিলেন। পুত্রপরিজনবেষ্টিত সংসারী হইয়াও তিনি নাট্যশিল্প-মন্দিরে, ভাবময়ী প্রতিমার সম্মুখে সংসার যাত্রাকে অনায়াসে বলি প্রদান করিয়াছিলেন। থিয়েটার করা ভিন্ন তাঁহার জীবনে যে অন্য কোন কার্য্য আছে, পুত্র পরিবার আত্মীয় স্বজনের নিকট যে কোন দায়িত্ব থাকিতে পারে, সমাজের প্রতি তাঁহার যে কোন কর্ত্তব্য থাকা উচিত এ ধারণা তাঁহার আদৌ ছিল না। আমরা দেখিয়াছি, কোন স্থানে চাকরী নাই, কি খাইবেন তাহার কোন সংস্থান নাই, শিশুসন্তান দুগ্ধ পানে ধরিয়া সাহিত্যেছেন "বাবা বাড়ী চলুন, কেন অকারণ কষ্ট পাইতেছেন" সে কথায় ভ্রূক্ষেপ নাই— দু' পয়সার কচুরি খাইয়া, শ্রাবণ ভাদ্রের দারুণ গ্রীষ্মে পদব্রজে অর্দ্ধেন্দুশেখর, নাট্যকল্পতরু অর্দ্ধেন্দুশেখর রীজানীয় অসহ্য যন্ত্রণার হাত হইতে ক্ষণিক নিষ্কৃতি লাভের জন্য কোলাকাকর্ম্ম শুঁকিতে শুঁকিতে, কোন স্থানে বসিয়া অত্যন্তভাবে, পূর্ণ

উৎসাহে, চরিত্রচিত্রণে কোন বাকি রিহার্সেলে, কোন নাটকের কোন ভূমিকা শিখাইতেছেন। সাধারণ রঙ্গভূমিতে একত্রে কার্য্য করিবার সময়, তবু আমরা নই, অনেকেই দেখিয়াছেন ও জানেন, বেলা দশটা হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত অর্দ্ধেন্দু বাবু সমান ভাবে রঙ্গমঞ্চের কথা। বিভিন্ন চরিত্রের আঙ্গিকগত কৌশল শিখাইতেছেন। এরূপ প্রাণপণ সাধনা, এরূপ কঠোর পরিশ্রম, এরূপ একাগ্রতা, এরূপ ঐকান্তিকতা, এরূপ দৃঢ় সংকল্প, এবং এরূপ ত্যাগ স্বীকারে,— এই বিপুলা পৃথিবীর কোন্ ধনুর-পর্ব্বতে, কোন্ দুরারোহ্য পর্ব্বতের নিভৃত গুহায়, মানবের আকাঙ্ক্ষিত কোন্ মৃন্ময়ী রসোপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত আছেন যাহাকে আত্মসাৎ করিতে পারা যায় না— তাহা জানি না।

কবি কাব্য লেখেন, নাট্যকার চরিত্রের সৃষ্টি করেন, চিত্রকর চিত্রপট আঁকেন, ভাস্কর পাথর কুঁদিয়া মূর্ত্তি গড়েন। পৃথিবীর আদি দিন হইতে দেশে দেশে কবি এইরূপ কাব্য রচনা করিয়া আসিতেছেন, নাট্যকার চরিত্র সৃষ্টি করিয়া আসিতেছেন, চিত্রকর তুলি ধরিয়া চিত্র আঁকিতেছেন।— আদি কবি বাল্মীকিও কবি, আর আজিকার দিনে চৌদ্দ তুনিয়া পয়ার লিখেন রায়গুনিও কবি। শব্দ-সম্পদ্ অভিধানের গহ্বরে নিহিত। তাহাতে সকলেরই সমান অধিকার। তবুও এক কবি হইতে অন্য কবির পার্থক্যও অপরিসীম। এ পার্থক্যের কারণ কি? কারণ,—ভাব; কারণ,—সৌন্দর্য্য দেখিবার, সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিবার, সৌন্দর্য্য বিকাশ করিবার প্রণালীর স্বাতন্ত্র্য। এই স্বাতন্ত্র্য এক কবি হইতে অন্য কবির পার্থক্য, এক চিত্রকর হইতে অন্য চিত্রকরের বিভিন্নতা বিধান করিয়াছে। এই পার্থক্যের জন্যই নানাদেশে নানা কবি নানাভাবে আদর, প্রতিষ্ঠা, ও পূজা পাইয়া আসিতেছেন। যে কবির এই স্বাতন্ত্র্য নাই তিনি কবি নহেন, যে চিত্রকরের এই স্বাতন্ত্র্য নাই তিনি চিত্রকর নহেন, যে নাট্যকারের এই বিশেষত্ব নাই তিনি নাট্যকার নহেন।

এইরূপ, পৃথিবীর সকল কার্য্যেই যিনি স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় না দিয়াছেন তিনি কখন কোন দেশে, কোন জাতি বিশেষের নিকট কার্য্য বীর বলিয়া পরিচিত হন নাই বা ভবিষ্যতে কাহারও হইবার আশাও নাই। অর্দ্ধেন্দুশেখর তাঁহার অভিনেতৃ-জীবনে এই স্বাতন্ত্র্যের সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাহার সম্পূর্ণ সাফল্যও লাভ করিয়াছিলেন। অভিনয় সম্বন্ধে তাঁহার একটা নিজের অভিমত ছিল যাহা তিনি বঙ্গ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠার প্রথম দিন হইতে তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করেন নাই।

যোড়াসাঁকো সাঙ্গাল বাড়ী যে দিন প্রথম মঞ্চ রঙ্গালয়ের সৃষ্টি হয় সেই দিন সুরেন্দ্রা প্রতিদ্বন্দ্বী সকলকে বাদ দিয়াও যে এদেশে নাট্যশালার সৃষ্টি হইতে পারে, তাহা অর্দ্ধেন্দু বাবু তাঁহার প্রবল আত্মবিশ্বাসের সাহায্যে সকলকে দেখাইয়াছিলেন. এবং সেই কারণেই যত দিন বঙ্গদেশে বঙ্গীয় নাট্যশালার অস্তিত্ব থাকিবে ততদিন তাহার উদ্ভবের পত্তাকায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিবে— "অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী বঙ্গীয় নাট্যশালার প্রতিষ্ঠাতৃগণের মধ্যে অন্যতম এবং অগ্রণী"। পত্রিকা প্রবাহে কি করিয়া গা ভাসাইতে হয় তাহা তিনি আদৌ জানিতেন না। তিনি নিজে বলিতেন,—বিদ্যাসাগরের লেখক মহাশয় বলিয়া চোর দায়ে ধরা পড়েন নাই যে, বাঙ্গলা দেশে দুই প্রকার অভিনয় শিক্ষা পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে—"আমি মূর্খ, আমার এক পথ— আর এক পথ অন্যের"। কোন্ পথ ভাল, কোন্ পথ মন্দ এসম্বন্ধে আমরা তাহার বিচার করিতেছি না। অর্দ্ধেন্দু বাবুর এই কথা প্রসঙ্গে ও তাঁহার জীবনব্যাপী কার্য্যে, তাঁহাতে আমরা যে স্বাতন্ত্র্যের ভাব দেখিয়াছি, তাহারই উল্লেখ করিবার জন্য এই কথা তুলিলাম। আমাদের মনে হয় "অর্দ্ধেন্দু বাবু যে ভূমিকা লইয়াই রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতেন, সেই ভূমিকাতেই দর্শক দেখিতেন— অর্দ্ধেন্দু, কি ভূমিকা তাহা নহে,"— তাহা অর্দ্ধেন্দু বাবুর প্রকৃত অভিধান নহে। ইহা প্রশংসার ঐতিহাসিক আবরণে তাঁহার নিন্দা —সত্যের অপলাপ। বরং একথা বলা যাইতে পারে যে, যে ভূমিকা লইয়াই অর্দ্ধেন্দু বাবু রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতেন তাহাতেই দর্শক দেখিতেন অর্দ্ধেন্দু নহে, অর্দ্ধেন্দুর বিশেষত্ব অর্দ্ধেন্দুর কৃতিত্ব, অর্দ্ধেন্দুর মৌলিকত্ব। আত্ম গোপন অভিনেতার একটী প্রধান ক্ষমতা। যে অভিনেতা অভিনয় করিতে আসিয়া আত্ম গোপন করিতে শিখে নাই, তাহার ভাঁড় বলিয়া অপ্রতিহত হুল্লোড় হইলেও হইতে পারে কিন্তু প্রকৃত অভিনেতা বলিয়া পরিচিত হইবার আশা তাহার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। যদি "হ্যামলেট" দেখিতে গিয়া "হ্যামলেটের" পরিবর্ত্তে কোন ব্যক্তি বিশেষকে দেখিয়া আসিলাম মনে হয়, তাহা হইলে আটগণ্ডা পয়সা দিয়া থিয়েটারের টিকিট কেনা অপেক্ষা ট্রাইট্‌রাম্ রেলওয়ে চড়া সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ। অর্দ্ধেন্দু বাবুর অভিনয় দেখিয়া আমাদের মনে হয়, অর্দ্ধেন্দু বাবু যে চরিত্র সাজিয়াছেন, হুবহু তাহা যেন সেই চরিত্রের অনুযায়ীই হইয়াছে। নীলদর্পণে চারিটী বিভিন্ন ভূমিকা লইয়া তাঁহাকে রঙ্গমঞ্চে কখন দেখি নাই, সে কথা বলিতে পারি না; কিন্তু নীলদর্পণে তোরাপ ও উড্‌সাহেব এই দুই চরিত্র তাঁহাকে

অভিনয় করিতে দেখিয়াছি এবং এই দুই বিভিন্ন চরিত্রে, সম্পূর্ণ বিভিন্ন মূর্ত্তিতে তাঁহাকে দেখিয়াছি বলিয়া সত্য সাক্ষ্য দেওয়া যায়। "ম্যাক্‌বেথে" তাঁহাকে উইচ্, পোর্টার, দূত ও ডাক্তার এই কয়টী ভূমিকা লইয়া অবতীর্ণ হইতে দেখি; কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, একা অর্দ্ধেন্দু বাবু যে এই চারিটী চরিত্র অভিনয় করিতেছেন, তাহা আমরা তখন বুঝিতে পারি নাই। আমরা এই চারিটী পাত্রে অর্দ্ধেন্দুকে দেখি নাই— অর্দ্ধেন্দুর বিশেষত্ব, অর্দ্ধেন্দুর মৌলিকত্ব দেখিয়া বিস্ময় বিমুগ্ধ হইয়াছিলাম। বাঙ্গলায় আর কোন অভিনেতা যে এরূপ ভাবে আত্ম গোপন করিয়া চারিটী বিভিন্ন চরিত্রে, বিভিন্ন মূর্ত্তির বিকাশ করিতে পারেন,— অর্দ্ধেন্দু বাবুর অভিনয় চাতুর্য্য যদি আমরা প্রত্যক্ষ না দেখিতাম তাহা হইলে তাহা বিশ্বাস করিতাম না। কেবল "ম্যাক্‌বেথে" নহে "সীতারামে" সামান্য একটা ভরোয়ানে ও কাজীতে, "প্রতাপাদিত্য" নাটকে "বিক্রমাদিত্য ও রত্নায়" এবং অন্য অসংখ্য বাঙ্গলা নাটকে অর্দ্ধেন্দু বাবুর এইরূপ আত্ম গোপন শক্তির বহুল পরিমাণে পরিচয় পাইয়াছি।

৺দীনবন্ধু মিত্রের নাটকের সমালোচনায় পূজ্যপাদ বঙ্কিম বাবু বলিয়াছিলেন, যে দীনবন্ধুর সৃষ্ট নিমেদত্ত, অটল, আদুরী, তোরাপ্ প্রভৃতি চরিত্র সকল যেমন সম্পূর্ণ তেমন আর কোন বাঙ্গালা পুস্তকে দেখিতে পাই না। দীনবন্ধুর তোরাপ্, দীনবন্ধুর আদুরী, নিমেদত্ত কর্ত্তা প্রভৃতি যেন এক একটা আস্ত জীবন্তমানুষ, যাহাদিগকে আমরা আমাদের আশেপাশে একটু চোখ চাহিয়া দেখিলেই দেখিতে পাই; কবি ফটোগ্রাফ্ লইয়া এই সকল চিত্র— আঁকেন নাই— আস্ত তুলিয়া লইয়াছেন। এই সকল চিত্র বিকাশে কবি যেমন অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিয়াছেন,— অভিনেতা যদি নাট্যকারের সৃষ্ট চরিত্রের যথার্থ অভিব্যক্তির উপাদান হয়েন,— তাহা হইলে মুক্তকণ্ঠে বলিব,— গ্যারিক্ যেমন আত্ম অভিনয়শক্তির সাহায্যে সেক্সপিয়রের হ্যামলেট, লিয়র, ম্যাক্‌বেথ প্রভৃতি চরিত্রের অভিনয় করিয়া বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছিলেন যে,— নাটকের চরিত্র শুধু কবির কল্পনা নহে, তাহা তুমি আমি যেমন সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতে গঠিত উত্থানপতনোন্মুখসঙ্কুল মানুষ, হ্যামলেট, লিয়র, ম্যাকবেথও সেইরূপ এই সংসারেরই মানুষ,— অর্দ্ধেন্দু বাবুও তেমনি নাট্যকার দীনবন্ধুর সৃষ্ট চরিত্রের অভিনয়ে দেখাইয়া গিয়াছেন যে, রঙ্গমঞ্চে অর্দ্ধেন্দু অবতীর্ণ নহেন— একটা আস্ত তোরাপ, একটা আস্ত উত্

সাহেব, একটা আস্ত হরবিলাস— যেমন দীনবন্ধুর পুস্তকে দেখি, যেমন অপেরার রাইস্তর সম্প্রদায়ে দেখি, যেমন নীলমেঘলো ফুটবল সাহেবে দেখি, সেইরূপই রঙ্গমঞ্চে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। অভিনয়ে এইরূপ শক্তির বিকাশ অর্দ্ধেন্দু বাবুতে যেমন দেখিয়াছি সচরাচর তেমন বাঙ্গলায় আর কোন অভিনেতায় দেখিতে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। আমাদের এই অল্পজ্ঞানে মনে হয়, আমরা যে রঙ্গমঞ্চকে হীরো সাজিয়া অভিনয় করি, তাহা বিভিন্ন নাটকের, বিভিন্ন নাটকীয় চরিত্রের অভিনয়ের পরিবর্ত্তে,— কতকটা নহে, সম্পূর্ণ ভাবে ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক হইয়া পড়ে। অনেকে এমত আছেন এই রঙ্গমঞ্চকে যাহারা বাঁধা হীরো সাজিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদিগকে যে কোন চরিত্র অভিনয় করিতে দেখি না কেন, তাঁহাদের অভিনয়ে যেন ফুটিয়া উঠে,— এখন দেখ, আমি অমুক, অমুক সাজিয়াছি, আমাকে চিনিতে পারিবে না তাহার উপায়ও রাখি নাই। অধুনা নটসম্প্রদায়ে এই রোগ এমন সংক্রামিত হইয়াছে যে, কোন থিয়েটারে একখানি নূতন নাটকের বিজ্ঞাপন দেখিলেই দর্শকগণ বলিয়া দিতে পারেন, এই নাটকে অমুক বাবু অমুক সাজিবেন এবং অমুক নাটকে তাঁহাকে যে রাবহরি সাজিতে দেখিয়াছিলাম এই নূতন নাটকে রাবহরির পরিবর্ত্তে রাবরাম চরিত্রেও সেইরূপ রাবহরিই দেখিব। যদিও নামটা বদলাইয়া রাবরাম হইয়াছে কিন্তু সেই স্বর, সেই কণ্ঠ, সেই অঙ্গভঙ্গি, সেই উচ্চারণ পদ্ধতি, সেই চলন, সেই বল। অর্দ্ধেন্দু বাবুর এ দুর্নাম আদৌ ছিল না। তিনি এক পুস্তকেই হউন বা বিভিন্ন পুস্তকেই হউন, যে যে ভূমিকা লইয়া অবতীর্ণ হইতেন, সেই সেই চরিত্রানুযায়ী ভাব, ভাষা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনা সাজসজ্জা, আকার ইঙ্গিত, কণ্ঠস্বর প্রভৃতি সমাক দেখাইতে চেষ্টা করিতেন এবং তাহাতে বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিতেন।

নানাবেশের নানাভাষায় তিনি কথা কহিতে জানিতেন। কণ্ঠস্বরের উপর তাঁহার অদ্ভুত অধিকার ছিল। তিনি মুহূর্ত্তে মধ্যে আশ্চর্য্য গোপন করিয়া বিভিন্ন স্বরে কথা কহিতে পারিতেন। যাহারা অভিনয় করিয়া যশস্বী হইতে চাহেন, অর্দ্ধেন্দু বাবুর এই সকল শক্তি সাধনার দ্বারা সফল করা তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

যাহারা কখন ব্যবসায় সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সংস্পর্শে আসেন নাই তাঁহারা জানেন না— কিন্তু যাহারা রঙ্গভূমির সেবাকল্পে জীবন পণ করিয়াছেন

তাঁহাদের সকলেই বিশেষ ভাবে জানেন যে, রাজনৈতিক ভাব শুধু সংবাদপত্রের সুদৃঢ় প্রাচীরের ব্যবধানে আবদ্ধ নহে, থিয়েটারেও একটা রাজনীতি বা পলিটিক্স আছে, যদিও তাহাতে রাজদ্রোহিতার কোন বিভীষিকা নাই। কথাটা কি ভাঙ্গিয়া বলি। আপনি এক থিয়েটারের কর্ত্তা; কোন নূতন লোক আপনার থিয়েটারে অভিনেতার কার্য্য করিতে আসিল। আপনি দেখিলেন তাহার চলন একটু সামান্য গুপনাও আছে, কিন্তু থিয়েটারের পলিটিক্স অমনি আপনাকে বুঝাইল, ইহাকে বাড়িতে দেওয়া উচিত নহে, তাহা হইলে আমার অমুকের পশারের পাথরবাটীর এককোণ ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে; লাভও উহাকে কাটা সৈন্য, বল উহার কিছুই হইবে না, বুঝাও তাহাকে,— তোমার অভিনেতা হইবার কোন গুণ নাই, অমুক অভিনেতা উত্তর মুখো হইয়া ভূমিকা মুখস্থ করে, তুমি দক্ষিণ মুখে বসিয়া আবৃত্তি কর, অমুক দ্বিতীয় অঙ্কের বানান জানে না— সেই কারণে করাঘাত-বর্ষণের ভার তাহারই উপরায়ত্ত, তুমি বেশ কথামালা পড়, থিয়েটার করা তোমার কার্য্য নহে, সর্ব্বোপরি তোমার প্রধান দোষ তুমি নাটকের সমালোচনা কর, অতএব তুমি যাহাদের যাও ইত্যাদি। ইহাই থিয়েটারের পলিটিক্সের একটা বিশেষ সূত্র! কিন্তু বড় গলা করিয়া বলিতে পারি, এ থিয়েটারী পলিটিক্স অর্দ্ধেন্দু বাবু আদৌ জানিতেন না— তাঁহার কাছে ইতর বিশেষ ছিল না— নদীর জল যেমন সকলের সহজলভ্য— অর্দ্ধেন্দু বাবুর নিকট উৎসাহ লাভ ও শিক্ষাগ্রহণও সেইরূপ সকল শ্রেণীর অভিনেতা অভিনেত্রীর সহজলভ্য ছিল। তিনি প্রাণান্ত পরিশ্রমে সকল শিক্ষার্থীকেই সমানভাবে শিক্ষাদান করিতেন; তাঁহাদের ভিতরে কাহারও এতটুকু ক্ষমতা দেখিলে শতমুখে তাহার প্রশংসা করিতেন; সস্নেহে বলিতেন "বাপু পরিশ্রম করিয়া শিক্ষা কর, সাধনা কর, কালে আমার অপেক্ষাও বড় অভিনেতা হইতে পারিবে।" মনুষ্যত্বের হিসাবে অর্দ্ধেন্দু বাবুর এই সহৃদয়তা ও মহত্ত্ব কেবল নটজীবীর নহে, মনুষ্য মাত্রেরই অনুকরণীয়।

অর্দ্ধেন্দু বাবুর নটজীবন সম্বন্ধে আমরা যাহা বুঝিয়াছি এই প্রবন্ধে তাহার কথঞ্চিৎ আভাষ দিবার প্রয়াস পাইয়াছি মাত্র। চল্লিশ বৎসর ধরিয়া যিনি রঙ্গভূমির সেবায় জীবন যাপন করিয়াছেন, এরূপ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁহার জীবনের সকল কথা বলা যাইতে পারে না; আরও এক কথা, অর্দ্ধেন্দু বাবুর সমসাময়িক অনেক অভিনেতা ও সহযোগী এখন জীবিত। অর্দ্ধেন্দু বাবুর

সম্বন্ধে সকল কথা খুলিয়া বলিতে গেলে সেই সকল জীবিত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধেও অনেক কথা বলিতে হয়, তাহাতে অনেক অপ্রিয় সত্য প্রকাশ হইয়া পড়ে, অনেকের বিকট চরিত্র প্রকট হইয়া উঠে, তাহাই সংক্ষেপে বলা ভিন্ন উপায় নাই। কাল সকল সত্যের চির রক্ষক। উপস্থিত যিনি যে ভাবেই সত্যের অপলাপ করিতে চেষ্টা করুন না কেন, কাল আত্মপ্রকাশ করিবেই। তাহা একদিন প্রকাশ করিবেই। অর্দ্ধেন্দুশেখর পরলোকে— তাঁহার জীবদ্দশায় দেখিয়াছি, তাঁহাকে লইয়া তাঁহার সমব্যবসায়ী অনেক বন্ধুরা— অবশ্য তাঁহারা কপটাচারী নহেন— বড়ই বাড়িবাড়ি,— আর আজ অর্দ্ধেন্দু মানব মৃত্যুর পরেও দেখিতেছি — তাঁহার জীবনী লইয়া তাঁহার সেই সকল সমব্যবসায়ীর মধ্যে কোন কোন বন্ধুরা— অবশ্য তাঁহারা সকলেই সজ্জন, এবং কপটাচারী নহেন, বড়ই সোরগোলে পড়িয়াছেন— অর্দ্ধেন্দু-শেখরের নটজীবনে ইহাই একটা বিচিত্র বিশেষত্ব!

—•—

# পত্রিকার কথা

## মহাকবি দান্তে প্রসঙ্গ

এক বছর আগে এক্ষণ-এর দান্তে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। সে সংখ্যাটি তখন সুধীমহলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ জাতীয় সংখ্যার স্বভাবতই নানা অসম্পূর্ণতা থাকতে বাধ্য। অনেক প্রসঙ্গ তখন আলোচিত হতে পারেনি, আরো বহু তথ্য সংকলন করা সম্ভব হয়নি। উপযুক্ত লেখার অভাব ও পাণ্ডুলিপির দুষ্টাপ্যতা আমাদের বিশেষ ক্ষোভের কারণ হয়েছিল। বর্তমান সংখ্যায় শ্রীসলিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'এলিয়টের কবিতায় দান্তে' প্রবন্ধটি যথাসময়ে সে সময় প্রকাশ করা যায়নি— এখন তা প্রকাশিত হলো। এই বিলম্বে ধৈর্যচ্যুতি হয়েছে একজনেরই : তিনি স্বয়ং ঐ প্রবন্ধের লেখক। অবশ্য আমাদের মনে হয়, একটি দান্তে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করলেই দান্তে-চর্চা থেমে যায় না, বরং তার ঠিক বিপরীত, দান্তে-চর্চার সূচনা হয়। সেই হিসেবে আরো প্রবন্ধ এবং আরো নানা তথ্য মাঝে মাঝে পত্রিকার কোঠরে রূপে সংযোজিত হওয়া উচিত। আমি ও মননের সাধনা এ ভাবেই উৎসাহ ও অগ্রগতি লাভ করতে পারে। শুধু দান্তে কেন, জগতের সকল মনীষীর আলোচনাতেই এ পদ্ধতি অনুসৃত হওয়া সঙ্গত।

## স্বীকৃতি

দুষ্প্রাপ্য রচনার পুনর্মুদ্রণ পরিসংখ্যানে এ সংখ্যায় অদ্বৈতমল্লবর্মণের মৃত্যুকীর্ণ গদ্য গিরিশচন্দ্র ও অপরেশচন্দ্রের দু-টি পুস্তিকা প্রকাশ করা হলো। গিরিশচন্দ্রের পুস্তিকাটির জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কাছে আমরা সপ্রশ্রদ্ধ ঋণ স্বীকার করি। অপরেশচন্দ্রের পুস্তিকাটি দেখতে পেয়েছি প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদির সংগ্রাহক প্রতিষ্ঠান 'সুবর্ণরেখা'-র কাছে।

ছাপাখানার জন্যে দু-টি পুস্তিকারই পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছেন শ্রীসুশীল কুমার মল্লিক।

শ্রীযুক্ত কমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অঙ্কিত চিত্রের ব্লক ও মুদ্রণ হয়েছে রেডিয়ান্ট প্রসেস-এ। প্রচ্ছদপট ও অদ্বৈতমল্লবর্মণের মৃত্যুকীর্ণ আলোকচিত্র নিউ ইন্ডিয়া প্রসেস-এ মুদ্রিত।

এক্ষণ

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজেস্ট্রেশন ( কেন্দ্রীয় ) আইনের
৮ ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

| | | |
|---|---|---|
| ১। | প্রকাশের স্থান | : ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৯ |
| ২। | প্রকাশের কালানুক্রম | : দ্বিমাসিক |
| ৩। | মুদ্রাকরের নাম | : প্রবীর ঘোষ |
| | জাতীয়তা | : ভারতীয় |
| | ঠিকানা | : ১ কবীর রোড, কলিকাতা ২৬ |
| ৪। | প্রকাশকের নাম | : প্রবীর ঘোষ |
| | জাতীয়তা | : ভারতীয় |
| | ঠিকানা | : ১ কবীর রোড, কলিকাতা ২৬ |
| ৫। | সম্পাদক | : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নির্মাল্য আচার্য |
| | জাতীয়তা | : ভারতীয় ভারতীয় |
| | ঠিকানা | : পি ৪৯৩ পূর্ণ দাস ৯বি নবীন কুণ্ডু লেন, |
| | | রোড, কলি ২৯ কলিকাতা ৯ |
| ৬। | স্বত্বাধিকারী | : নির্মাল্য আচার্য |
| | | ৯ বি নবীন কুণ্ডু লেন, কলিকাতা ৯ |

আমি, প্রবীর ঘোষ, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরে প্রদত্ত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

তারিখ ১৫. ৫. ৮৭ ( স্বাঃ ) প্রবীর ঘোষ

---

প্রবীর ঘোষ কর্তৃক মানসী ও মার্কিন্য প্রেস, ৯।১ ঈশানচন্দ্র বসুমল্লিক স্ট্রীট, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৯ হইতে প্রকাশিত।

পঞ্চম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা

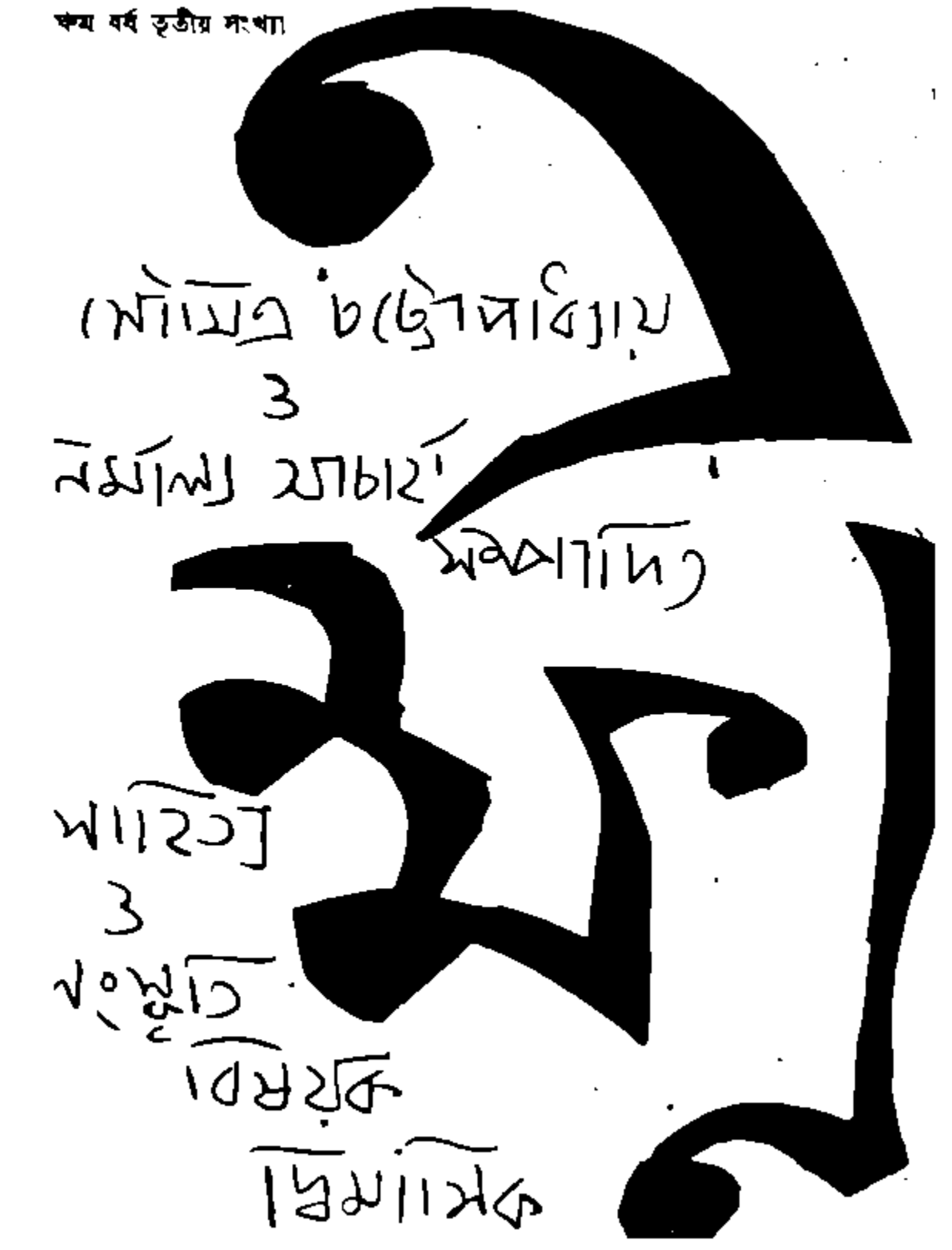

# বর্ষার পথে সাবধান!

আসন্ন বর্ষার কথা ভেবে আজই এক জোড়া বাটার ওয়াটারপ্রুফ জুতো কিনে রাখুন। এই ঋতুতে কিনা আর সেরা এমন জোরাই বজায় যা পায়ের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়।

প্রসঙ্গত জানাই যে বিশ্বখ্যাত বাটার : উপরন্তু দেখবেন জুতোজোড়া ফ্যাশনের উপযোগী, আরামের জন্য সবরকম সুযোগ রাখা হয়েছে, অথচ দামও অতি সামান্য সাশ্রয়ী হবে। সব দিক থেকে বর্ষার পথে নিশ্চিন্ত নির্ভরতা।

বিশ্বাস নয়, বিশ্বাস করলেই বাটার ওয়াটারপ্রুফ জুতো, আপনার বিশ্বাসই যে বাটার সেরা সেবাকে পাওয়া যাবে। আসুন, আজই কিনে নিন ওয়াটারপ্রুফ জুতো জোড়া।

ওয়াটারপ্রুফ
পাম্পশু ৭.১১

ওয়াটারপ্রুফ
পাম্পশু ৭.১১

**Bata**

বর্ষার পথে নিশ্চিন্ত নির্ভরতা

*JUST OUT !!* *JUST OUT !!*

By
Prof. D. K. Roy

**A Guide to Degree English ( For Arts )** 4·50
(Paper I and II for Degree Part II Exam.)

**A Guide to Degree English (for Commerce)** 4·50
( Paper I and II for Degree Part I Exam.)

**Pre-University English Suggestions** 2·25

**Suggested English Essays and Composition** 3·60
**( For Degree Students )**
With last Minute Suggestions Free of cost

*To be had of :*

**BENGAL BOOK AGENCY**
1, Shyama Charan Dey Street, Cal-12
**ENGLISH CORRESPONDING INSTITUTE**
(Centre of B. A (Hons.) M. A. Postal Coaching)
22P, Sankar Ghose Lane, Calcutta-6

# সাহিত্যপত্র

সাহিত্যপত্র ১৩৫৫ সাল থেকে নিয়মিত বা অনিয়মিত প্রকাশ হয়ে আসছে। বাঙলাদেশের সংস্কৃতি ও সমাজ-জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা এ-পত্রিকায় হয়েছে।

নতুন উদ্যমে এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি আগামী আশ্বিন থেকে নিয়মিত বের হবে। সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছেন শ্রীঅরুণ সেন। বাঙলাদেশের সংস্কৃতিতে ঐতিহ্যের সংজ্ঞা, আধুনিকতার সমস্যা ও ভবিষ্যৎচিন্তা : এই হচ্ছে পত্রিকাটির বিষয় ও উদ্দেশ্য।

প্রতিক সংখ্যার চাঁদা : বার্ষিক ৪ টাকা ৫০ পয়সা। লেখা, চিঠিপত্র ও চাঁদা পাঠাবার ঠিকানা : ৯ কাশীঘোষ লেন, কলিকাতা ৬

অসীম রায়ের উপন্যাস

# দেশদ্রোহী

যে লোকটা বাংলা উপন্যাসের রয়্যালটি থেকে দক্ষিণ কলকাতার ফ্ল্যাট চালায়, ছেলেকে দার্জিলিং-এ মিশনারী স্কুলে পড়ায় সে গত পাক-ভারত যুদ্ধের সময় একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল কেন? শেষ পর্যন্ত কেন সে চলল বর্ডারের দিকে পাগলের মতো সেই রাস্তা ধরে যেখান দিয়ে ছেলেবেলায় তার বাপের সঙ্গে যেত তার দেশের বাড়ি?

'আমার কাছে দেশ মানে ঐ বঙ্গোর রোড ধরে ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে যাওয়া, দুপাশে গাছ আর গাছ। আমাদের বাড়িটার ছ্যাংলা পড়া পাঁচিল যার ওপরে বসে আমি প্রথম সিগারেট খেয়েছি···দেশ বলতে আমাদের ছাতের ওপর ঝুঁয়ে পড়া লম্বনে গাছ, ছাতে ওঠার সিঁড়ি। ছ্যাংলা-পড়া পাঁচিল, চাঁদনি রাতে সামনের চাতালের পাশে জুঁই ফুলের ঝাড়।'

এই আশ্চর্য দেশের কথা এবং সঙ্গে সঙ্গে এক জনপ্রিয় লেখকের মর্মান্তিক আত্মোপলব্ধির কাহিনী 'দেশদ্রোহী'। দেশ-বিভাগে বাঙালী সাহিত্যিকের প্রতিবাদ নেই 'দেশদ্রোহী' প্রকাশের পর সে অভিযোগ আর টেকে না।

মূল্য : সাড়ে তিন টাকা।

সুবর্ণরেখা : ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা ৯

৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা ৯

## বিজ্ঞপ্তি

যে সমস্ত গ্রাহকের চাঁদা ফুরিয়ে গেছে তাঁদের আমাদের চাঁদা পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে। বার্ষিক গ্রাহক-চাঁদা সাত টাকা পাঠালেই পত্রিকার গ্রাহক তালিকাভুক্ত করে নেওয়া হয়।

গ্রাহকদের বছরে মোট ছয়টি সংখ্যা প্রাপ্য।

●

এক্ষণের শরৎসংখ্যাই শারদীয় বিশেষ সংখ্যা।

অন্যান্য বছরের মত এবারও মূল্যবান রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে বর্ষিত আকারে মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে। গত বছর শারদীয় সংখ্যা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। যাঁরা বর্তমান বছরের শারদীয় সংখ্যা সংগ্রহ করতে ইচ্ছুক তাঁরা আগে থেকেই আমাদের বা পত্রিকা স্টলের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। নিশ্চিত পত্রিকা পেতে হলে গ্রাহক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। গ্রাহকদের বিশেষ সংখ্যার জন্য অতিরিক্ত দাম দিতে হয় না।

●

গ্রাহকদের পত্রিকা সার্টিফিকেট অফ পোস্টিং-এ পাঠানো হয়, রেজিস্ট্রেশন ফি অতিরিক্ত দেওয়া থাকলে রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠানো যায়। সম্ভব হলে শারদীয় বিশেষ সংখ্যাটি নিকটবর্তী গ্রাহকদের পত্রিকা-অফিস থেকে সংগ্রহ করতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

●

সমস্ত বিষয়ে যোগাযোগ ও টাকা পাঠানোর ঠিকানা :

ম্যানেজার, এক্ষণ

৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৯

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক **এক্ষণ** ত্রৈমাসিক পত্রিকা

পঞ্চম বর্ষ : তৃতীয় সংখ্যা

# সূচীপত্র

**প্রবন্ধ**

| | | |
|---|---|---|
| রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে | অশোক মিত্র | ১ |
| অ্যাবসার্ড নাট্যরীতি ও নতুন চেতনা | দেবব্রত রেজ | ৪ |
| সাহিত্যের ভাষা ও ধ্বনি-ব্যবহার | দেবব্রত চৌধুরী | ৫০ |

**গল্প**

| | | |
|---|---|---|
| শোভাযাত্রা | সৌম্যিক সান্যাল | ১০ |

**কবিতা**

| | | |
|---|---|---|
| কালের নিসর্গ চক্রাবলী | কৃষ্ণ ধর | ৫২ |
| পুনর্যোজনার কাজ | ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায় | ৫৫ |
| সারাটা দিবস | বিমল চক্রবর্তী | ৫৬ |
| অনুক্তি | সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় | ৫৭ |
| বিজ্ঞিরত্ন প্রসঙ্গে কিছু বক্তব্য | শ্রীমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় | ৫৮ |
| বিষ্ণু দে-র 'চোরাবালি' | অরুণ সেন | ৭০ |
| রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' | পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় | ৮৩ |

**গ্রন্থসমীক্ষা**

| | | |
|---|---|---|
| রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা | শঙ্খ ঘোষ | ৯৯ |
| ভিয়োলিও-র জীবনী | ভবতোষ দত্ত | ১০৮ |

**প্রচ্ছদপট**

সত্যজিৎ রায়

**সম্পাদক**

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নির্মালা আচার্য

কার্যালয় : ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা ৯

পঞ্চম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা ১৩৭৮

# রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে

অশোক মিত্র

আজ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১০৮ জন্মদিন। তিনি বাঙালী জীবনকে গড়েছেন, তার সংস্কৃতিকে রূপ দিয়েছেন, বাঙালীকে তার সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব ভাষা দিয়েছেন, বাঙালীকে বিশ্বের কাছে পরিচিত, সম্মানিত করেছেন, বাঙালীকে তার মন, চিন্তা, সুষমা, সূক্ষ্ম অনুভূতি ও বোধে দীক্ষিত করেছেন, সবই মানি, সবই বুঝি, অতি উত্তম কথা। তিনি ছিলেন পিতা, আজকের বাঙালী আমরা তাঁর সন্ততি। পিতৃঋণ আমরা স্বীকার করবো, কিন্তু পিতার মহত্বের দোহাই পেড়ে নিজেদের আমরা এখন কেন খর্ব করবো? আমাদের দেবার মতো কি কিছুই নেই, যা ঘটনাচক্রের গুণের মতো শুধু দুর্বলই হয়ে থাকবে না, বরং নিজের বলে বলিষ্ঠ মহীরুহ হবে? প্রতি বছর এই দিনে আমরা কি শুধু তাঁর মহত্বের বিরাটত্বের গুণগান করে নিজেদের ক্ষুদ্রতা স্বীকার করে, বাকি সারা বছর সুষুপ্তির ব্যবস্থা করে কাটাবো?

বেশুমাস কাল আগে কলকাতা শহরে বনামধন্য, কৃতী, বাঙালী লেখক, সাহিত্যিক, শিল্পীগোষ্ঠি বাংলাদেশের নবাগত দূতকে সভা করে সম্বর্ধনা জানান। সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্যে আমার প্রতি লেখককেই আহ্বান জানানো হয়। আমাকেও। কার্যগতিকে আমি যেতে পারিনি। সেই প্রসঙ্গে আমার মনে প্রশ্ন হয় বাঙালী জীবনের এই ক্রান্তিকালে বাঙালী লেখক, বুদ্ধিজীবী, শিল্পীর কর্তব্য কী? কী উপায়ে তিনি আপন কর্তব্য করবেন? আমরা ত চিরকালই শুনে এসেছি এবং জানি যে লেখক ও শিল্পী শুধু তাঁর সৃষ্টি বা রচনা নিয়ে ব্যাপৃত থাকবেন, সামাজিক বা অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রিক সংস্কার বা পরিবর্তন তাঁর দায় নয়। সার্থক সৃষ্টি করতে পারলেই তাঁর দায় শেষ, যার কাজ তারে সাজে। লেখক ও শিল্পীর স্থান হাতির পাঁজের মিনারে না হলেও তার খুব দূরে নয়। লেখক কি খালাসী বা সৈনিকের পোষাক পরবেন নাকি?

দেশের ক্রান্তিকালে, এমন কি সাধারণ সময়েও বুদ্ধিজীবীর কর্তব্য কী? তিনি কি সংগ্রামে লিপ্ত হবেন, তাঁর লেখনীকে, তুলিকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার

করবেন, তিনি কি প্রতিটি সমস্যায় যোগ দেবেন, ভাগ নেবেন? কোনও বিশেষ পক্ষে ঝুঁকবেন, না বিচারকের নৈর্ব্যক্তিকতা রক্ষা করবেন? এ সমস্যা আজ ভারতের প্রত্যেকটি বুদ্ধিজীবীকে ব্যতিব্যস্ত করতে বাধ্য।

আজ রবীন্দ্রনাথের ১০৬ জন্মদিনে আমরা এই প্রশ্নের সামান্য আলোচনার অবতারণা করতে পারি। কারণ, অন্তত আমার মতে আজ এই প্রশ্নই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে মহৎ। কারণ ভারতবর্ষ আজ এক সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রিক, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক সংকটের সম্মুখীন। এ সময়ে বুদ্ধিজীবীর কর্তব্য কি?

রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে আমরা যখনই চিন্তা করি, আলোচনা করি, সর্বপ্রথমই আমরা স্মরণ করি তাঁর কাব্য, উপন্যাস, ছোটগল্প, ছবি, নাটক, পত্রাবলী, দার্শনিক প্রবন্ধাবলীর। এবং সচরাচর সেখানেই আমাদের আলোচনা শেষ হয়। কচিৎ আমরা আলোচনা করি তাঁর বিরাট বক্তব্যধর্মী, আক্রমণাত্মক রচনাবলীর,— বিরাট, প্রবল, অক্ষয় স্রোতের মতো যা সারাজীবন ধরে তাঁর লেখনী বেয়ে প্রবাহিত হয়েছে। যাতে পাই প্রবলতম ক্রোধ, এমন কি বিদ্বেষ, ব্যথা, ক্লেষ, অসহিষ্ণুতা, দেশপ্রেম, জ্ঞানতৃষ্ণা, অস্থিরতা, আশা, নিরাশা, অবজ্ঞা, আঘাত। ভুলে যাই ত্রিশ ষাট বছর ধরে এমন কোনও দৈনন্দিন, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রিক, ব্যবসায়িক সমস্যা তাঁর চোখ বা লেখনী এড়ায়নি, যার উপর তিনি তাঁর বিচারবুদ্ধি, সমবেদনা বা বিদ্রূপ সম্যকভাবে প্রয়োগ করেন নি।

এই বিরাট রচনাবলীর নামাবলী শুধু যদি পড়ে যাই তাহলেই আমাদের স্বীকার করতে একমুহূর্ত দেরি হবেনা যে রবীন্দ্রনাথ হাতির দাঁতের মিনারে বাস করতেন এ ধারণা শুধু যে নিতান্ত মিথ্যা তা নয় আজকের দিনের লেখকের পক্ষে সে ধারণা আঁকড়ে বসে থাকা প্রবল আত্মবঞ্চনার সামিল। এই ধারণা বাংলাদেশের সবচেয়ে সন্তানের প্রতি নির্বোধ অবমাননা এবং আমাদের ঐক্যের সাধনাই যায়, কারণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর দীর্ঘ জীবনে কোনও দিন মুহূর্তের জন্যে আমার এ কাজ নয়, আমার মাথাব্যথার প্রয়োজন নেই, বলে সামাজিক কোন সমস্যা থেকে মুখ ফিরিয়ে, হাত গুটিয়ে বসে থাকার কোন ছুতো খোঁজেন নি। কখনও অহংহাত দিয়ে বলেননি আমার কাজ রচনা এবং সৃষ্টি, সমাজ-সংস্কার, আর্থিক উন্নতি, রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা, বা শিক্ষার বিষয় নয়।

আমি তাঁর কাব্য, সাহিত্য বা দর্শন বিষয়ক রচনার আদৌ উল্লেখ করছিনা।

আমি আজ শুধু উল্লেখ করছি তাঁর সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সমস্যামূলক তর্কবিতর্কাত্মক রচনাবলীর কথা। কৈশোরের য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র থেকে শুরু করে মৃত্যুশয্যায় সভ্যতার সংকট রচনা পর্যন্ত বলা যায় তিনি সৈনিকের বর্ম কোনও দিন খোলেন নি। অসি কোমরে বাঁধাই থাকতো, সামান্য কারণেই কোষ থেকে নিষ্কাসিত হয়ে ঝলকে উঠতো।

অমন সমাজব্যবস্থার উপরই কত শ্লেষ, বিদ্রূপ। যথা : আচারের অত্যাচার, সমুদ্রযাত্রা, বিলাসের ফাঁস, অযোগ্য ভক্তি, পূর্ব ও পশ্চিম, কোট বা চাপকান, নকলের নাকাল, হিন্দুবিবাহ, রমাবাইয়ের বক্তৃতা উপলক্ষে, মুসলমান মহিলা, প্রাচ্যসমাজ, আহার সম্বন্ধে চন্দ্রনাথবাবুর মত, কর্মের উমেদার, আদিম আর্য-নিবাস, আদিম সম্বল, বিদেশীয় অতিথি ও দেশীয় আতিথ্য, ব্যাধি ও প্রতিকার, নেশন কি, ভারতবর্ষীয় সমাজ, স্বদেশী সমাজ, জাতির নাম সঙ্গতি, সফলতার সদুপায়, অবস্থা ও ব্যবস্থা, ব্রতধারণ, দেশীয় রাজ্য, স্বদেশী সমাজের মর্মকথা, পল্লীসমাজ, জলকষ্ট, অহেতুক অসন্তোষ, দেশনায়ক, ইংরাজের আতঙ্ক, রাজা ও প্রজা, প্রবল কথা, মুখুজ্যে বনাম বাঁড়ুজ্যে, অপরপক্ষের কথা, আন্টি-কন্সার্ভেটিভ, বিরোধমূলক আদর্শ, রাজভক্তির মূল্যবৃদ্ধি, বঙ্গবিভাগ, ব্যাধি ও প্রতিকার, বঙ্গভঙ্গ, দেশহিত, ইংরাজ ও ভারতবাসী, রাজনীতির দ্বিধা, অপমানের প্রতিকার, সুবিচারের অধিকার, স্বরাজ, ইম্পীরিয়ালিজম্, রাজভক্তি, যথার্থ অকৃতা, পথ ও পাথেয়, মন্ত্রি-অভিষেক, ভারতবর্ষের ইতিহাস, চীনেম্যানের চিঠি, ঘরোয়াবি মঙ্গল, অভ্যুক্তি, বিজয়া সম্মিলন, সমাজভেদ, ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত,— সামাজিক কোন্ সমস্যার আলোচনা তিনি করেননি নির্ণয় করা শক্ত।

ভারতীয় ঐতিহ্য ও উনিশ ও বিশ শতকের সংস্কারবিষয়ক আলোচনাই বা কত। তাই বা কত বিচিত্র। বিদ্যাসাগর চরিত, ভারতপথিক রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী, বুদ্ধদেব, খৃষ্ট। ভারতীয় ইতিহাস ঐতিহ্যের আলোচনাই বা কত বহুমুখী। ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা, আত্ম-পরিচয়, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, ভগিনী নিবেদিতা, শিবাজী ও মারাঠা জাতি, শিবাজী ও গুরু গোবিন্দসিংহ, কাজের লোক কে, বীর গুরু, শিখ স্বাধীনতা, ভারত ইতিহাস চর্চা, কালীর রানী, ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ, সিরাজদ্দৌলা, ঐতিহাসিক চিত্র।

ভাষাবিভ্রাটে আজ আমরা হাবুডুবু। ভাষা ও শিক্ষাবিষয়েই আজীবন রবীন্দ্রনাথ কতবার কতভাবে লিখেছেন ভাবুন। শিক্ষার হেরফের, ছাত্রদের

প্রতি সম্ভাষণ, য়ুনিভার্সিটি বিল, শিক্ষাসংস্কার, শিক্ষাসমস্যা, জাতীয় বিদ্যালয়, আবরণ, তপোবন, ধর্মশিক্ষা, শিক্ষাবিধি, লক্ষ্য ও শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, শিক্ষার বাহন, ছাত্রশাসনতন্ত্র, অসন্তোষের কারণ, বিদ্যার যাচাই, বিদ্যালয়বাস, শিক্ষার মিলন, বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ, শিক্ষার বিকিরণ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ, আশ্রমের শিক্ষা, ছাত্রসম্ভাষণ। মনে হয় প্রতিটি লেখা ১৯৬৯-৭০ সালের ঘটনাবলীর উপর মন্তব্য, এত প্রাসঙ্গিক, এত আধুনিক, এত সমসাময়িক।

গ্রাম-শহর এবং গ্রামীণ সমস্যা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, সমবায়ের উপরই কত অজস্র লেখা। কর্মযজ্ঞ, পল্লীর উন্নতি, ভূমিলক্ষ্মী, শ্রীনিকেতন, পল্লীপ্রকৃতি, পল্লীসেবা, গ্রামবাসীদের প্রতি, দেশের কাজ, অন্নসমস্যা, হলকর্ষণ, সমবায়ে ম্যালেরিয়া নিবারণ, ম্যালেরিয়া, বাঙালির কাপড়ের কারখানা, হাতের তাঁত, জলোৎসর্গ, সমবায়, ভারতবর্ষে সমবায়ের বিশিষ্টতা, সমবায় নীতি।

স্বাধীনতা সংগ্রাম ও রাষ্ট্রবিপ্লবের উপরেই কত উপলক্ষ্যে কত ভাবে লেখা! আত্মশক্তি, বিবেচনা ও অবিবেচনা, লোকহিত, লড়াইয়ের মূল, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, ছোটো ও বড়ো, স্বাধিকার প্রমত্ত, বাতায়নিকের পত্র, শক্তিপূজা, সত্যের আহ্বান, সমস্যা, সমাধান, যুদ্ধবর্ষ, চরকা, স্বরাজসাধন, রাজভক্তের কথা, বৃহত্তর ভারত, হিন্দু মুসলমান, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, নারী, কনগ্রেস, দেশনায়ক, মহাজাতিসদন, হিজলী ও চট্টগ্রাম, প্রচলিত দণ্ডনীতি, নবযুগ, প্রলয়ের শঙ্কা, আরোগ্য, সত্যতার সংকট।

বিশ্বের যতকিছু সমস্যা আমার, আমার মাথার উপর, তিলমাত্র তফাৎ হলে আমার ঘুম নেই, স্বস্তি নেই, আমাকে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেই হবে, ন্যায়ের, মঙ্গলের, ভবিষ্যতের সমর্থন করতেই হবে, অমঙ্গলকে আঘাত করতে হবে। প্রতিদিন, অনুক্ষণ রবীন্দ্রনাথ যেন এই কথাই বলে গেছেন। অথচ সারাজীবন সৈনিকের কাজ করেও শেষদিনে তিনি অসীম বিনয়ে বলেন

বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার
তারি পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।
অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চির নির্বাসনে
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।
মাঝে মাঝে সেছি আমি ও-পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে
ভিতরে প্রবেশ করি সে-শক্তি ছিলনা একেবারে।

জীবনে জীবন যোগ করা
না হোলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় প্রাণের পসরা।
তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা
আমার সুরের অপূর্ণতা।

এই প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য এই যে রবীন্দ্রনাথ যদি কেবলমাত্র প্রবন্ধকার বা সমাজ সংস্কারক অথবা ঐতিহাসিক বা অর্থনীতিবিদ্ হতেন, তাহলে তাঁর এই সকল রচনাবলীর মূল্য এত মহার্ঘ হতো না। অমূল্য হয়েছে তাঁর কারণ তিনি ছিলেন মূলত দ্রষ্টা, কবি, শিল্পী ও রূপকার, সংস্কারক বা সমাজবিপ্লবী নয়। কিন্তু একান্তভাবে দ্রষ্টা, কবি, শিল্পী ও রূপকার ছিলেন বলেই তিনি জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুভব করেন যে তাঁর সৃষ্টি, কাব্য, শিল্প ততক্ষণ ব্যর্থ যতক্ষণ না মুক্ত, স্বাধীন, সুন্দর, সরল জীবনযাপনের প্রতিষ্ঠা হয়। সমাজ, রাষ্ট্র, জীবন, শিক্ষা, যতক্ষণ মুক্ত, সবল, প্রাণময় না হয় ততক্ষণ তাঁর সৃষ্টি, শিল্প পঙ্গু, অক্ষম থাকতে বাধ্য। সেইজন্যই তিনি মরিয়া হয়ে, তাঁর অনন্যোপায় হয়ে, নিজের সৃষ্টিকে ব্যাহত করে, খর্ব করে, এইসব সমস্যার সমাধানে আত্মনিয়োগ করেন এবং আজীবন নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। তাঁহার সৃষ্টির চেয়ে তিনি যে মহৎ তাই তাঁর জীবনের পথ জাগতিক সংস্কার ও বিপ্লবের পথে ধাবিত হয়। এবং এই পথে তিনি প্রতিক্ষণে স্বদেশবাসীকে আহ্বান করেন। এই পথক্রমের ফলশ্রুতিই তাঁর এই সকল রচনাবলী, আত্মনিয়োগ সার্থক। মানুষের আত্মার, মনীষার শ্রেষ্ঠ কীর্তির সঙ্গে সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থব্যবস্থা যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, অবিচ্ছেদ্য, নিজের জীবনে ও রচনায় তিনি তা প্রমাণ করেন। এইখানেই আধুনিক শিল্পী, লেখক, দ্রষ্টার কাছে তাঁর মূল্য, আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্র সন্নিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর মহৎ দান। এবং এই কীর্তিই বোধ হয় বাঙালী মনীষাকে আজ সবচেয়ে বেশী উদ্বুদ্ধ করবে। তাই বোধ হয় আজকের দিনের বাঙালী লেখক শিল্পীর সংকল্পের পূর্বচ্ছায়া দেখেই তিনি মৃত্যুর বছরের শেষে যে লিখে গেছেন

আমারো ঐ যাকে,
দিনবদলের পালা এল
ঝোড়ো সুরের মাঝে। [১]

১ এই যে নতুন দিনের রাঙা রাজযোটক তার ফলে পটভূমি।

# অ্যাবসার্ড নাট্যরীতি ও নতুন রসতত্ত্ব

দেবব্রত রেজ

এই প্রবন্ধের শিরোনামায় 'নতুন রসতত্ত্ব' নাম দিয়ে যে তত্ত্বের দিকে ইঙ্গিত করেছি তা সম্পূর্ণ স্পষ্ট রূপরেখায় এখনো হয়তো আবির্ভূত হয়নি। অন্তত তার স্পষ্ট বিবৃতি কোথাও আছে কিনা তা আমার জানা নেই। তবে আধুনিক চিত্র, চলচ্চিত্র, সংগীত ও কবিতায় রসবিচারের নানান ধারা এই নতুন রসতত্ত্বের সোমুখীতে ধীরে ধীরে একত্রিত হ'তে চলেছে। এই তত্ত্বের রূপরেখা আমি সাধ্যমতো আমার সহধর্মীদের কাছে বিবৃত করার প্রয়াস করছি।

আমার মনে হয়েছে, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে, হিরোসিমা নাগাসাকি ধ্বংসের নিদারুণ শুভ্র বিপুল বিষপুঞ্জের ছায়ায় তথাকথিত চিরায়ত ( ক্লাসিকাল ) শিল্প-সাহিত্য, চিত্র বা চলচ্চিত্র এবং সংগীতকলার সূর্যাস্ত ঘটার সঙ্গে সঙ্গে নতুন মানবিক বোধের চন্দ্রোদয় ঘটেছে আর সেই চন্দ্রোদয়ে মানবচিত্তের অলক্ষ্য সমুদ্রে উঠেছে নতুন উচ্ছ্বাস। সেই উচ্ছ্বাস নতুন নাটকের আকর্ষ শ্বাসপ্রশ্বাসে ধ্বনিত হয়েছে।

১৯৫০-এর কাছাকাছি কাল বা বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ যেন মানবসভ্যতার একটা রসবিভাজিকা বা রসবিভাজিকা। এই রসবিভাজিকার ওধারে যে মানবসভ্যতা তা বিশেষ রসের সম্মিলিত স্রোতধারায় পুষ্ট; আর এধারে যে রসধারার সিস্টেম বা প্রণালী তা প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ পৃথক। আমাদের চোখে কিন্তু আমাদের কালের অব্যবহিতায় বহমান এই রস-বিভাজনের নদীজলে এখনো স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। একদিন তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে এবং আমরা চিরায়ত ভাবনা থেকে কতো দূরে চলে এসেছি তা একদিন, হয়তো কয়েক দশক পরে, আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারবো। এই নতুন রসস্রোতগুলি আমাদের বহু স্থায়ীবোধের মূল ভেঙে দিয়েছে, বহু কীর্তিকে নাশ করেছে, বহু বিপর্যয়ের ঘাতপ্রতিঘাত বয়ে এনেছে। অনেক সময় আমরা কীর্তনাংকিত হয়ে উঠেছি কিন্তু এই নতুন ধারাপথগুলি নতুন রসে আমাদের মানবিক বোধকে পুষ্ট করছে; নতুন নতুন আদর্শের জনপদ পত্তন করছে; নতুন নতুন ধারায় মানবিক বোধের বিচিত্রপ্রকাশের যে বাণিজ্য সেই বাণিজ্যের পত্তন করছে; এক কথায়, নতুন মানবিকতার রূপরেখা নির্মাণ করে চলেছে। এই নতুন রসধারা সাধারণত

হয়ে একদিকে যেমন নতুন চিত্রকলার দেশে ঘরে চলেছে তেমনি ঘরে চলেছে নতুন সাহিত্যে, নতুন কবিতায়, নতুন, অতি নতুন নাট্যসৃষ্টিতে।

যদিও মানুষের চিত্তলোকে এই ভাববিভ্রান্তিকর সৃষ্টি হয়েছে আমাদের এই একাধারে অভিশপ্ত আর অনুগৃহীত শতাব্দীর মধ্যভাগে তবুও দীর্ঘদিন ধরে তিলে তিলে এর জন্য ভূমি তৈরি হচ্ছিল, দীর্ঘদিন ধরে অতীতের স্রোতগুলি মরে আসছিল এবং মানববোধের ধারার নতুন দিক-পরিবর্তন ঘটছিল নিঃশব্দে। সভ্যতার সমস্ত অতীত যেন এক মুহূর্তে পারমার্থিক বোধার সংহারমূর্তিতে আবির্ভূত হয়ে নিজেকেই ভস্মসাৎ করে দিলো। আরম্ভ হলো যুগান্তর।

বিশেষ স্তরে পৌঁছে, শিল্পভাবনা ও বৈজ্ঞানিক মননের মধ্যে যে বিরোধ তার যেন অবসান সূচিত হলো। বিভিন্ন শিল্প যে নির্মাণরীতির দিক থেকে এক সূত্রে বাঁধা তা স্পষ্ট হয়ে উঠলো ধীরে ধীরে।

নতুন তথাকথিত অ্যাবস্ট্রাক্ট বা অমূর্ত চিত্রকলায় 'বিষয়' হারিয়ে গেল, প্রধান হয়ে উঠলো 'কম্পোজিশন' বা নির্মাণরীতি। শুধু নির্মাণকে আশ্রয় করে বিষয় আবির্ভূত হলো। নির্মাণ ও বিষয়ের দ্বন্দ্ব ঘুচে গেলো। যা নির্মাণ তাই বিষয় হয়ে দাঁড়াল। শিল্পকলার আলোচনায় বিষয় সম্পর্কিত সমস্ত মানদণ্ডকে পরিহার করা হলো, প্রধান হয়ে উঠলো 'কম্পোজিশন' বা নির্মাণ-কর্ম। বা শুধু নির্মাণ। এই কম্পোজিশনের ধারণা চিত্রকলার সমালোচনায় আরোপিত হয়েছে চিত্রকলার বিবর্তনের বেশ পরবর্তী স্তরে। ঐ নির্মাণ সংগীতের ক্ষেত্রে শুরুতেই বর্তমান। অনেকের মধ্যে একজন চিত্র সমালোচক যা বলেছেন তার সারমর্ম এই যে আজকের দিনের রেমব্রান্টের 'Recumbant Negress' বা 'উপবিষ্টা নিগ্রোরমণী' ছবির জাদু আমাদের চোখে আজ আর রমণীর পিঠে নাই, আজ যে জাদু আমাদের মুগ্ধ করে তা 'hundreds of little strokes crisscrossed and juxtaposed in the bewildering variety on the back।' পুরনো ছবির বিচারও আজ বদলে গেছে। কী আঁকা হলো তা আজ গৌণ, অনেকের কাছে অবান্তর। তথাকথিত 'উপযোগিতা' আজ আর শিল্পের লক্ষ্য নয়। কিংবা অন্যভাবে বলা যায় উপযোগিতার সংজ্ঞা গেছে বদলে। টেক্‌নিকাল যুগের যে উপযোগিতা মানুষের শ্বাস রুদ্ধ করেছে সেই উপযোগিতার বাইরে যে শুদ্ধ রীতি, যা নির্মাণ, স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির মুহূর্তে মুহূর্তে সংযোগ আর সংগ্রাম, প্রণয় আর বিরহ, তাই

আজ শিল্পের মূল্য নির্ধারণ করছে। 'কী' নয় 'কেমন করে'। এই 'কেমন করে'-এর মধ্যে 'কী'— হুবহু 'কী'— আত্মপ্রকাশ করছে। যেমন হাইজেনবের্গ বলেছেন পদার্থবিদ্যার প্রসঙ্গে 'Natural Science does not simply describe and explain nature; It is part of the interplay between nature and ourselves; *it describes as exposed to our methods of questioning*' (italics আমার দেওয়া)। অর্থাৎ এখানেও সেই নির্মাণের প্রশ্নটাই বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে— যদিও ঈষৎ অন্য অর্থে।

এই নির্মাণ কোথায় যেন সংগীতের শুদ্ধ নির্মাণের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। চিত্র নির্মাণের সঙ্গে সংগীতের শুদ্ধ নির্মাণের সাদৃশ্য আজ প্রায় স্বীকৃত। পল ক্লে (Klee)-এর একটা বিশেষ ছবি (নানা রঙের চতুর্ভুজ দিয়ে তৈরী একটা প্যাটার্ন) সম্বন্ধে এক বিদগ্ধ চিত্র সমালোচক (Grohmann) লিখেছেন:

In Point of fact this scheme of the chessboard pattern holds certain analogies with Schonberg's twelve tone system, and we might in both cases speak of magic squares. But whereas Schonberg adhered to his scheme for a long time, although permitting of variations, Klee proceeded to new schemata for instance to fugal phrases, translucid bands of colour intersecting at righ angles with or without graphic elements and so on.

Kandinsky সম্বন্ধে ইনিই লিখেছেন:

To him, every work was created as the cosmos was created via catastrophes with the chaotic roar of instruments in the end *shaping a symphony* known as the music of the spheres.

এইভাবে চিত্রকলার সঙ্গে সংগীতের সাদৃশ্য বারংবার উল্লিখিত হয়েছে আধুনিক অমূর্ত চিত্রকলার বিচারে। সংগীতের সঙ্গে আধুনিক নাট্যনির্মাণের সাদৃশ্যও বর্ণিত হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। (সমস্ত শিল্প কি সংগীতের সঙ্গে সাদৃশ্য লাভ করতে চলেছে?)।

Edward Albee-র *Who is Afraid of Virginia Woolf* নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে জর্মন সমালোচক Ivan Nagel সংগীত আলোচনার ভাষা ব্যবহার করেছেন। তিনি এই নাটকের সঙ্গে সংগীতের সাদৃশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন: "যে নির্মাণ-রীতির কাছে বা সৃষ্টি-প্রেরণার কাছে এলবি নিজেকে সমর্পণ করেছেন তাকে সংগীত-নির্মাণ-রীতি বলা যেতে পারে। তিনি এটা

করেছেন নিজেকে ভাচরালিজ্‌মের গতি থেকে মুক্ত করতে। (একটা সাক্ষাৎকারে এলবি আমাকে বলেছিলেন 'দুঃখের কথা আমি কখনো শিরানো বারভাতে শিখি নি') অবসাদ আর ঘৃণায় ভরা অসহ্য এক দাম্পত্য জীবনে দুইপক্ষের মধ্যে সংলাপের যে সংঘাত তা ফর্ম-এর দিক থেকে 'musical numbers'। এক পর্ব উত্তর-প্রত্যুত্তর, অভিযোগ আর তার খণ্ডন শেষ হয়, শুরু হয় আর পর্ব— এর উদ্দেশ্য পরস্পরের অভিযোগ আর তার খণ্ডনের যে তাগিদ তা নয়, এ যেন এক ধরনের সুর বিস্তার। এর প্রয়োজনীয়তা নাটকীয় ঘন্দ্বনিরসনের দিক থেকে বোঝা যাবে না। একে বুঝতে হবে **dynamic melodic** প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে (অর্থাৎ সংগীত নির্মাণের প্রয়োজনে)। মার্থা [নাটকের চরিত্র— স্বামী স্ত্রী] **counterpoint**-এর মাধুর্যকর। তীব্রতায় এই সংলাপের পালা পেয়ে চলেছেন।" এইভাবে আধুনিক নাটকের নির্মাণের সঙ্গে সংগীতের নির্মাণের সাদৃশ্য বা সমতা লক্ষ্য করেছেন নাট্য সমালোচকরা। এইসব উদ্ধৃতি থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে আসছে যে শিল্পের সমস্ত ফর্ম একটাই মৌলিক ফর্মের দিকে— নির্মাণের দিকে— আকৃষ্ট হচ্ছে। সর্বোপরি যে কথাটা আমার বারংবার মনে হয়েছে তা হাইজেনবের্গের ঐ কথা 'It describes Nature as exposed to our method of questioning।' এখানে **questioning** বা জিজ্ঞাসা বুদ্ধির জিজ্ঞাসা নয়,— হৃদয়ের, অনুভবের জিজ্ঞাসা।

না, এটাকে ঠিক 'জিজ্ঞাসা' বলা চলে না। অনুভব আর 'জিজ্ঞাসা' এক নয়। এরা পরস্পরবিরোধী। তাই একে অনুভবের জিজ্ঞাসা না বলে বলা উচিত 'অনুভবের অনুভব'— আবস্ট্রাক্ট অনুভব। যেমন সংগীতাশ্রয়ী অনুভব। একেবারে নির্মাণ (কম্পোজিশন)-আশ্রিত অনুভব। 'কেমন করে' থেকে 'কী'টা আবিষ্কৃত হয়েছে। জগৎ-সংসার সমাজ-ব্যক্তি আমাদের অনুভবের নির্মাণরীতিতে নিমিত্ত হয়ে গেছে।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে এই অনুভব রীতির মধ্যে মৌলিক পরিবর্তন ঘটে গেছে। ঘটে গেছে গুণগত পরিবর্তন। এই অনুভব সমস্ত ঘন্দ্বর, সমস্ত সামাজিক মূল্যায়ণের, সমস্ত ইতিহাসের চাপ থেকে মুক্ত হয়ে গেছে। এখানে আমি অবশ্য সর্বসাধারণের বা বেশির ভাগ মানুষের অনুভূতির কথা বলছি না— বলছি বিশ্বদর্শক শিল্পী-সাহিত্যিক মনীষীদের অনুভবের কথা। এই রূপান্তরের কারণ আমার ইতিহাস। মানুষের সমাজে বিপর্যয়ের পর বিপর্যয় ঘটে গেছে

শতাব্দীর প্রথম থেকে। অপ্রতিরোধ্য নিয়তির মতো ইতিহাস মানুষের, তথা সভ্যমানুষের, সমাজকে তাদের এক অজ্ঞাত পরিণামের দিকে ঠেলে নিয়ে এসেছে। ইতিহাসের চাপেই কিছু-কিছু মানুষ ইতিহাসের বাইরে এসে দাঁড়িয়ে মানুষের মূল্য ও নিয়তিকে প্রশ্ন করেছেন। কিছু কিছু উচ্চকোটির মানুষ মানুষেরই সৃষ্ট সভ্যতার মূর্ত-অমূর্ত বৈধিক-মানসিক মূল্যবোধের কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে সম্পূর্ণ স্বাধীন নিরঙ্কুশ অস্তিত্বে এসে পৌঁচেছেন। মানুষ একদিকে যেমন স্বাধীন হয়েছে, তেমনি হয়েছে নিঃসহায়, নিরবলম্ব। কোন কোন প্রাগ্রসর মানুষ নিজেকে নিজেই অবলম্বন করে এই সূত্রে দাঁড়াতে চেয়েছেন। এই স্বাধীনতা-বোধ থেকে সমস্ত আধুনিক শিল্প উদ্ভূত হয়েছে। মানুষ ( মানুষ বলতে মনুষ্যসমাজের প্রতিভূদের কথাই বলছি ) আজ সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে নতুন করে নিজের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে চলেছে। কিন্তু এই নতুন সংজ্ঞা নির্ধারণের কোনও চিহ্নিত পথ নেই। তাই একশ্রেণীর মানুষ সমস্ত সংজ্ঞাকেই বর্জন করার পক্ষপাতী। ইতিহাসকে বর্জন ক'রে এরা মুহূর্তকে আশ্রয় করেছে। আর এক শ্রেণী ইতিহাসের কোন ভবিষ্যতের মধ্যে মুহূর্তকে বিলুপ্ত করেছে। এ আর এক প্রসঙ্গ। কিন্তু যে-চিহ্নিত পথে মানুষের বুদ্ধি ও অনুভূতি চালিত হয়েছে সেইসব পথ আজ ভ্রান্ত লক্ষ্যের পথ বলে জানা হয়ে গেছে। 'হাঁ' 'না' চিহ্নিত যে লজিক এতকাল মানুষের চিন্তাকে ধারণ করে এসেছে সেই লজিক আজ বিজ্ঞান-চিন্তাতেও পরিত্যক্ত হয়েছে। তেমনি অনুভূতির মধ্যে অন্তর্নিহিত বৈপরীত্য আবির্ভূত হয়েছে, আবির্ভাব হয়েছে প্যারাডক্সের। আজ শিল্পচিন্তা তথা সাহিত্য-নাটক বিষয়ক চিন্তার মধ্যে, তার নির্মাণের মধ্যে, পরস্পরবিরোধী উপাদান তথা প্যারাডক্স আবির্ভূত হয়েছে। ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে এসে শিল্পীও ইতিহাসে পরাঙ্মুখ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। এও এক প্যারাডক্স। আধুনিক অনেক নাটকে কোন পরিণতি নেই। কাল যেন মৃত্যুর মতো। একটা উদাহরণ স্যামুয়েল বেকেটের একাঙ্ক নাটক *The Last Tape* ( শেষ টেপ )-এর প্রথম দৃশ্যের আরম্ভের মঞ্চ-নির্দেশ :

"কোন্ স্টেজের মাঝামাঝি একটা ছোট্ট টেবিল ; তার দু'টো ড্রয়ার কাছাকাছি ; দর্শকদের দিকে খোলা যায়।···টেবিল ও তার চারপাশের খানিকটা তীব্র শাদা আলোয়। মঞ্চের অবশিষ্ট অংশটা অন্ধকার। নাটকের একমাত্র পাত্র ( আর একটি পাত্র আছে তা টেপ-রেকর্ডার— অন্য পাত্রপাত্রী নেই ) ক্রাপ মুহূর্তের মতো নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে, হাতের

ঘড়িটা দেখে, পকেটে হাত পুরে কী যেন খোঁজে। বের ক'রে আনে একখানা গান। আবার পকেটটা খোঁজে, একতাড়া চাবি বের ক'রে আনে, চোখের সামনে তুলে ধরে ( ক্রাপ চোখে কম দেখে ), একটা চাবি বেছে নেয়, তারপর উঠে ( আগে ব'সে ছিল ) টেবিলের সামনে আসে। হেঁট হয়, প্রথম ড্রয়ারটা খোলে, খুলে ভিতরে চেয়ে দেখে, হাতড়ায়, একটা রবিন বের ক'রে আনে, চোখের কাছে এনে খুঁটিয়ে দেখে, আবার সেটা রেখে দেয়, ড্রয়ারটা বন্ধ করে। দ্বিতীয় ড্রয়ারটা খোলে, ভিতরে হেঁট হয়ে চেয়ে দেখে, হাতড়ায়, একটা পাকা কলা বের ক'রে আনে, ছাড়ায়; খোসাটা পায়ের কাছে ফেলে; কলাটাকে মুখে পুরে নিশ্চল হয়ে সামনে শূন্যে চেয়ে থাকে। খানিকটা কলা কামড়ে কেটে নেয়, আধখানা পাক মেরে হাঁটতে আরম্ভ করে; আলোর ক্ষেত্রটার মধ্যে মঞ্চের কানা বরাবর এদিক-ওদিক পায়চারি করে— কিন্তু দু'দিকেই চার বা পাঁচ পায়ের বেশি এগোয় না। কলাটা চিবোতে চিবোতে আপনমনে ভাবতে ভাবতে পায়চারি করে। খোসাতে পা পড়ে, পিছলে পড়ো-পড়ো হয়, সামলে নেয়। হেঁট হয়ে খোসাটাকে দেখে, দেখে হেঁট হয়েই, মঞ্চের কানা বরাবর অর্কেস্ট্রা বক্সের দিকে চলে যায়। আবার এদিক ওদিক পায়চারি করতে থাকে, কলাটাকে খেয়ে শেষ করে। টেবিলে আবার ফিরে আসে, এক মুহূর্ত নিশ্চল হয়ে ব'সে পড়ে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে, পকেট থেকে চাবি বের করে, চোখের সামনে চাবির গোছাটা তুলে ধরে, দাঁড়ায়, টেবিলের সামনের দিকে আসে, দ্বিতীয় ড্রয়ারটা খোলে, আবার একটা বড় কলা বের ক'রে আনে, চোখের কাছে এনে দেখে, ড্রয়ারটা বন্ধ করে, চাবিটা পকেটে পুরে রাখে, এক চক্কর ঘুরে মঞ্চের শেষে আসে, কলাটার ওপর হাত বুলোয়, তারপর সেটা ছাড়িয়ে ফেলে, খোসাটা অর্কেস্ট্রার দিকে ছুঁড়ে দেয়, কলার মুখটা মুখের মধ্যে পুরে নিশ্চল হয়ে দাঁড়ায়, শূন্যে তাকিয়ে থাকে। শেষকালে কী একটা মাথায় আসে, কলাটাকে ওভারকোটের পকেটে পুরে নেয়, খানিকটা কলা বেরিয়ে থাকে, তারপর লাথামতো, দ্রুতবেগে অন্ধকারে মঞ্চের পেছনে চ'লে যায়। হাতে একখানা খাতা নিয়ে আবার আলোর মধ্যে ফিরে আসে। খাতাটাকে টেবিলের ওপর রেখে, মুখখানা কেড়ে নেয়, হাত দুটোকে ওভারকোটের সামনে ঝেড়ে নেয়। দু'হাতে তালি দেয়, তারপর ঘষে।..."

বেকেটের *Waiting for Godot* ( গোদোর অপেক্ষায় ) নাটকে কোন ঘটনা নেই। যা আছে তা কতকগুলি মুহূর্তের পরিস্থিতি। একটার সঙ্গে

অন্তটার কোন যোগসূত্র নেই, কোন পরিণামের পরিপ্রেক্ষিতে। নাটকের দুটো অংশ ; তবে তাদের মধ্যেও পরিণামের দৃষ্টিকোণ থেকে কোন যোগাযোগ নেই।

গুন্টের গ্রাস ( Gunter Grass )-এর একাঙ্কিকা *Hochwasser* ( High Water ) নাটকের দুই অঙ্ক। কোন ঘটনার পরিণামের খাতিরে নয়— একটা পরিস্থিতির তাগিদে : বৃষ্টির আগে আর বৃষ্টির পরে। আধুনিক নাটকের মধ্যে বেশির ভাগই একাঙ্কিকা, যা বিংশ শতাব্দীর নাটকের বিশিষ্ট রূপ। আধুনিক একাঙ্কিকার মধ্যে কোনপ্রকার পরিণামের ইঙ্গিত নেই। নাটক এখানে বিশেষ একটা সিচুয়েশনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। নাটকের পাত্রপাত্রীর কর্মপ্রচেষ্টার কোন লক্ষ্য নেই— এই প্রচেষ্টা কোন লক্ষ্যে উপনীত হয় না। এ কী শুধু তত্ত্বকথা ? শুধু কর্মের জন্য কর্ম ? না, কর্ম এখানে একটা ভাষা— একটা ইঙ্গিত। বিশেষ অনুভূতি-জগৎ নির্মাণের একটা উপাদান।

অনুভব আসলে একটা মানসিক অবস্থা। এই অবস্থার কোন বিশেষ ভাষাভিত্তিক প্রকাশ নেই। নানা ভাষায়— দেহের ভাষায়, চিত্রের রঙ, রেখার ভাষায়, সুরের ভাষায়, বস্তুর ভাষায়— একে প্রকাশ করা সম্ভব। নাটকে আমরা এইসব ভাষাকেই আশ্রয় করতে পারি, একত্রে ! তবে প্রধান যে-ভাষাকে অবলম্বন করে নাটক রচিত হয়ে থাকে ( মূক নাটকের ক্ষেত্র, যথা পুতুল নাচের নাটক ছাড়া ) তা আমাদের কথাশ্রিত ভাষা। যতোই মার্জিত কথাশ্রিত ভাষা প্রয়োগ করা হোক না কেন তা ভাবকে, বিশেষ করে অনুভবকে সীমিত ও খণ্ডিত করবেই। কেননা ভাষা ( এখান থেকে ভাষা বলতে আমি কথাশ্রিত ভাষাই বোঝাবো ) এমন একটা উপায় যা বহু ব্যবহারে ও নানান জটিল ঐতিহাসিক কারণে সরাসরি অভিজ্ঞতা থেকে দূরের কতকগুলি সাধারণীকৃত চিহ্নের সমষ্টিতে পরিণত হয়ে গেছে। অথচ আমাদের এখনই ভাগ্য যে এই ভাষা ব্যতিরেকে অনুভব প্রকাশের বহু কোন উপায় নেই। যেমন কবিতায় তেমনি আধুনিক নাটকে ভাষাকে তার স্বতঃসিদ্ধ অর্থের শেকল থেকে মুক্ত করা হয়েছে। ভাষাকে ব্যবহার করা হয়েছে ভাবের একটা ক্ষেত্র ( ফিল্ড ) তৈরি করতে।

এক ফোঁটা মৌমাছির গুঞ্জন যেমন তাদের উত্তপ্ত অস্তিত্বের প্রবাহ বহন করে তেমনি আধুনিক নাটকের ভাষা অনেক সময় অনুভবের তথা মানসিক অবস্থার বিশেষ রূপ, বিশেষ ব্যঞ্জনা বহন করে। এখানে ভাষাকে ভাষাতীতের প্রকাশের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। তাই প্রচলিত ভাষার ব্যাকরণ, তার

লক্ষিক, তার থেকে যে সংযুক্ত অর্থের শৃঙ্খলকে ভেঙে চুরমার করা হয়েছে। কথা-শৃঙ্খলের লক্ষ্য যে অর্থরূপ পরিণাম— সেই পরিণামকেও বর্জন করা হয়েছে। ভাষার ব্যাকরণকে অস্বীকার ক'রে তাকে অনুভবের ব্যাকরণ প্রকাশের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। ভাষার ধ্বনিকে অনুভবের নির্মাণে ব্যবহার করা হয়েছে। অনুভব মাত্রই মূলত unstructured, তার কোন বিধিবদ্ধ সংগঠন নেই, বাঁধাছাঁদা রূপ নেই : তা একটা বহু ব্যঞ্জনাময়, বহুদিকে বিস্তৃত, বহু অনুষঙ্গে যুক্ত অস্তিত্ব— দেহমূল থেকে চৈতন্যের বহু শাখায় তা বিস্তৃত। যেমন কোন বিজ্ঞানক্ষেত্রে বা বলক্ষেত্রের প্রকাশ সেই ক্ষেত্রে পতিত কোন পদার্থের গতিবিধি দিয়ে, তেমনি কাব্যের বলক্ষেত্রে বা কাব্যের ব্যঞ্জনার ক্ষেত্রে প'ড়ে দর্শক, শ্রোতা বা পাঠকের মনের যে অবস্থান্তর ঘটে তাই দিয়ে এই ক্ষেত্রের পরিমাপ ঘটে। এই ক্ষেত্রের যে অন্তর্নিহিত প্রকৃতি সেই প্রকৃতি পাঠক-দর্শক-শ্রোতার অবস্থাকে নির্ণীত করে। পাঠক-দর্শক-শ্রোতা আপন আপন স্বভাব অনুপাতে সেই ক্ষেত্রের সঙ্গে সংযুক্ত হয় কিংবা তাতে মগ্ন হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই ব্যবহার বা অবস্থা ভিন্ন। মূল ক্ষেত্রটার কোন বিশেষ চেহারা নেই, বিশেষ কোন নির্দিষ্ট অর্থ নেই। তাই বলেছি unstructured, গঠনহীন। অর্থাৎ 'অরূপ'।

তাই অনেক সময় আধুনিক নাটকে মনে হয় নাট্যকার যেন দর্শক-পাঠকদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছেন। কথায় কথায় ধোঁয়ালি রচনা করছেন। এমন কি ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের কথাগুলোর মধ্যেও কোন বিশেষ সূত্র নেই, বিশেষ কোন ক্রম নেই। কথাগুলো আছে মাত্র।

কথারা স্বতন্ত্র বলেই তাদের চারিদিকে অর্থের যে আলোর মণ্ডল তাকে স্পষ্টভাবে চেনা যায়, বস্তুর চারদিকে আলোর ক্ষেত্রের মতো। মুহূর্তটা আকার পায়, ছায়া ফেলে, বাস্তব হয়ে ওঠে, আদর্শ হ'য়ে ওঠে। যা স্বতন্ত্র (particular) তাই দৃঢ় প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মুহূর্তেরা, এই ক্ষণস্থায়ী পলাতক মুহূর্তেরা, এই ক্ষণস্থায়ীরা, নশ্বরা গূঢ় চৈতন্যের বাহক হয়ে ওঠে। অনেক নাটকে কথারাই হ'য়ে ওঠে আশ্চর্য এক নৃত্যনাট্যের পাত্রপাত্রী। ভাষার কাঠামোকে ভেঙে তাকে নতুন করে তৈরি করা হয়। কথা দিয়ে তৈরি অর্থের শৃঙ্খলকে ভেঙে চূর্ণ ক'রে— তাকে নতুন করে জোড়া দিয়ে— একটা নতুন নির্মাণ-রূপকে আহ্বান করা হয়। ভাষার বেড়াজালকে অতিক্রম ক'রে ওপারে উত্তীর্ণ হয় মানুষের বোধ।

শুধু যে তথাকথিত অভিনয়ের পাত্রপাত্রীতে পরিণত হয় তাই নয়— বস্তুরাও নাটকের মূলীভূত হ'য়ে দাঁড়ায়। Gunter Grass-এর *Hochwasser* নাটকে বৃষ্টিই নাটকের কেন্দ্র, মানুষ নয়। Buzzati-এর নাটক *Mantle* বা 'আলখাল্লা'তে, আলখাল্লাটাও একটা পার্ট করে। স্যামুয়েল বেকেটের *The Last Tape* নাটকের সংলাপে টেপ-টাও একটা পক্ষ। অর্থাৎ বস্তুও পার্ট ক'রে চলে। ভোক্তা ও ভোগ্যের মধ্যে, শাসকেই ও অবজেই-এর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। প্রকৃতির আর মানুষের মধ্যে, বস্তু আর বস্তুবেষ্টিত চেতনার মধ্যে ভেদ হয়ে যায় বিলুপ্ত। এ এক আশ্চর্য তন্ময়তা।

জগতের সঙ্গে তন্ময়তার অর্থ তার লক্ষিকের সঙ্গে তন্ময়তা নয়। জগতের যে-রূপ আমাদের কল্পিত মূল্যবোধের কাচের ভিতর দিয়ে প্রকাশমান সেই রূপের সঙ্গে নয়। এই তন্ময়তা ঐতিহাসিক, সামাজিক, অভ্যাসলব্ধ রূপের ও ভাবের অন্তরালে যে নিছক অস্তিত্ব সেই অস্তিত্বের সঙ্গে। এই মানব-নিরপেক্ষ জগতে অস্তিত্বে-অস্তিত্বে কোন ভেদ নেই। রৌদ্রকরোজ্জ্বল এক টুকরো কাচখণ্ডে যে বিস্ময় সেই বিস্ময়ই একটা বিরাট বিপুল তাজমহলে। এখানে ক্ষুদ্রে ও বৃহতে কোন পার্থক্য নেই— জীবনের সরিকে-সরিকে যথা জন্তুতে ও পাখিতে ও কীটে কোন তফাত নেই। একটা শুকনো কাঠের গুঁড়ির সঙ্গে বনস্পতির কোন পার্থক্য নেই। এ শুধু 'অর্থে'র জগৎ— রূপের জগৎ। এই 'অর্থ' কোন ধারণার দ্বারা সৃষ্ট নয়। এই অর্থের সঙ্গে একাত্মতা, এই অর্থের সঙ্গে তন্ময়তাই এই নতুন শুদ্ধ জগৎ-সৃষ্টির লক্ষ্য। তাই নতুন নাটকের রঙ্গপরিবেশ তৈরি করতে যে সব বস্তু ব্যবহৃত হয় তারা বস্তুমূল্যে মূল্যবান নয়, তারা তাদের নিজস্ব গৌরবে গৌরবান্বিত। তারা মানুষের বা প্রকৃতির কোন 'অ্যালিবরি' নয়, তারা স্বয়ংসিদ্ধ, স্বয়ংসম্পূর্ণ। তারা প্রত্যেকে অনন্তের সন্ধেত বহন করে। প্রত্যেকে নিজ নিজ অর্থের কেন্দ্র নিয়ে আবির্ভূত এবং সবাই মিলে এমন একটা অর্থের কিন্তু নির্মাণ করে যে-কিন্তের কোন বাস্তব প্রকাশ নেই। অ্যাবস্ট্র্যাক্ট ছবির মতো। উদ্দেশ্য বা ফলশ্রুতি : ভাষার ও ইন্দ্রিয়-অভ্যাসের সংকীর্ণতা, বিকৃত ও বিবর্ণতা থেকে বস্তুর মুক্তি। বৌদ্ধদর্শনের ভাষায় 'তথতা'র প্রকাশ। এই জগৎ তথাকথিত বস্তুর জগৎ নয়, এ জগৎ মানুষের চিত্তের গভীরে যে জগৎ সেই জগৎ। Klee বলেছেন : 'He [ the artist ] does nothing other than gather and pass on what comes to him from the *depths*. He neither serves nor rules— he

transmits··· He is merely a channel.' এটাই রহস্য। এবং এই রহস্যবাহী যা কিছু, তা ভাষাই হোক, সুরই হোক, চিত্রই হোক, সমস্তই এক-একটা ক্ষেত্রের মতো— বহু অর্থের অজস্র প্রতিধ্বনি ( resonance ) পূর্ণ। সুর যে অর্থে অর্থহীন অথচ প্রকাশময়, অন্যান্য শিল্পও তাই। এই লোকের কোন ভাষা নেই। সিম্বল আশ্রিত ভাষাতেও এর প্রকাশ সম্ভব নয়। এ এমন অনন্ত যে কোন প্রতীকের সাহায্যে একে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাই অতি আধুনিক নাটককে সিম্বলিস্টিক বলা যায় না— বলা উচিত নয়। মানুষ আজ যখন বুদ্ধিনিষ্ঠ মূল্যবোধের কাঠামোর ওপরে দাঁড়াতে ভরসা পাচ্ছে না, তখন সে নিজের কেন্দ্রের দিকে প্রত্যাবর্তন করছে। তার কেন্দ্রগত এই জগৎ vision-এর রূপে ( কর্মে ) আবির্ভূত হচ্ছে। আজকের দিনে তথাকথিত 'উপযোগী' শিল্পের ওপর মানুষের বিশ্বাস যখন বিলুপ্ত হয়েছে তখন মানুষের শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টির তথা নিজের কেন্দ্রের ঐ তথ্যতাকে সে আবিষ্কার করছে। সঙ্গে ভিত্যাবৃত্তিক পদ্ধতির শিল্পকে, তথাকথিত কমিট্‌-মেন্টের প্রয়োজনকে, জ্ঞানকমূলাকে শিল্পী অস্বীকার করেছেন। প্রত্যেক মানুষের কেন্দ্রে যে ( বৌদ্ধ পরিভাষায় ) 'আলয় বিজ্ঞান' বা যুঙ্‌-এর 'সমষ্টি-অবচেতন' (collective-unconscious )-এর মতো প্রায় অপ্রকাশ্য, সাধারণ, অহং-এর সংস্পর্শহীন, অহং উত্তীর্ণ, অনন্তের বোধ আছে সেই অনন্তবোধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দ্রষ্টা ( visionary ) শিল্পী রূপ-উদ্ধার করেন। অরূপসাগর থেকে রূপ উদ্ধার করে আনেন। এই স্বাভাবিক, ভাষার সংস্কারবর্জিত, অতি-মানবীয় জগতের প্রবণতা-বশে, শিল্পীর মানসলোকে অর্থাৎ চেতনলোকে বিভিন্ন রূপ যুগপৎ উপস্থিত হয়। এই রূপেরা একই ক্ষেত্র থেকে আগত—এরা এমন একটা অর্থের ক্ষেত্র সৃষ্টি করে যা সর্বদিকে অনন্তের দিকে প্রসারিত।

দ্রষ্টা এই অখণ্ড বা অনন্তবোধের জগতের সঙ্গে— এই আলয় বিজ্ঞানের সঙ্গে —সংযুক্ত হ'তে নিজের কেন্দ্রের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। এ যেন এক ধরনের যোগ— সামাজিক ঐতিহাসিক সংস্কার থেকে মুক্তি। একদিকে এ যেমন প্রত্যাবর্তন অন্যদিক থেকে দেখলে এ বিবর্তন। নবায়ন। মানুষের কেন্দ্রগত এখনো অবাঙ্‌মনসোগোচর ভূমি থেকে নতুন উত্থান। মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার নব নব প্রকাশ। যে পরিবেশে আমরা রয়েছি সেই পরিবেশ থেকে নিমেষে নিমেষে আমাদের দৈহিক মানসিক সত্তায় অসংখ্য মৃদু-অমৃদু প্রভাব পড়ে চলেছে। পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান বা অ্যাডাপটেশনের প্রয়োজনে,

দৈহিক জীবনযাপনের প্রয়োজনে আমাদের মস্তিষ্ক তথা মন বিশেষ এক শ্রেণীর বিশেষ এক 'গ্রামে'র প্রভাবকে চিনে নেয়, নির্বাচন করে নেয় ও বিবর্তনের প্রয়োজনে নির্মিত অজ্ঞাত দৈহিক মানসিক অভ্যাসের সূত্র ধরে এই বিশেষভাবে নির্বাচিত অভিজ্ঞতাকে আশু প্রয়োজনের তাগিদে শ্রেণীবদ্ধ ক'রে কতকগুলি বাঁধা নিয়মিত ধারায় সাজিয়ে নেয়। বিশেষ কর্মের প্রবণতা রূপে অনুভব করে। কিন্তু অ্যাডাপটেশনের প্রয়োজনে স্বতঃনির্বাচিত এই অভিজ্ঞতার শ্রেণী ছাড়াও অনেক অজ্ঞাত, অস্পষ্ট অভিজ্ঞতা আছে যারা প্রতিনিয়তে দেহমনের ওপরে আঘাত করছে, কিন্তু নিতান্ত দৈব অভ্যাসে যাঁরা মস্তিষ্ক তাদের অপ্রয়োজনীয় ব'লে স্বীকার করে না, অজ্ঞাতসারে অবহেলা করে। শিল্পী সেই আশ্চর্য ব্যক্তি যিনি এই প্রয়োজনের গণ্ডির বাইরে যে আশ্চর্য নতুন অভিজ্ঞতা, তাকে অনুভবের মধ্যে গ্রহণ করতে পারেন। তিনি এই অভিজ্ঞতার প্রতি চৈতন্যের দ্বারটি খুলে দেন— ভাষার বাইরে, লক্ষ্যের বাইরে অজ্ঞাত এই অস্তিত্বের অনুভূতি তাঁকে নতুন রূপকল্প সৃষ্টিতে প্রেরিত করে।

এই প্রত্যাবর্তন বা বিবর্তন— এই আদিম ও নতুন— মানুষের অন্তর্লোকে বিভিন্ন রূপকল্পে আবির্ভূত হয়। এই রূপকল্পগুলি তাদের নিজস্ব স্বয়ংসিদ্ধ অর্থে আবির্ভূত হয়। প্রতীক রূপে নয়, মনস্তাত্ত্বিক চিহ্নের আকারে নয়। এরা নতুন অর্থ বহন করে আনে। যে অর্থের অক্ষর এরাই, আর প্রকাশও এরাই। এরা প্রতীকও নয়, চিহ্নও নয়। বিভিন্ন আধুনিক নাটকের প্রারম্ভিক দৃশ্যগুলো পর্যালোচনা করলে এর সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে। এই বৈশিষ্ট্য প্রাক্-আধুনিক যুগের কিছু কিছু নাটকেও দেখা যায়। মরিস মেটারলিঙ্কের 'অন্ধেরা' নাটকের প্রথম দৃশ্য পরিকল্পনার বর্ণনার একাংশ : "একরাশ এসফোডেল্ ও ফুলে ফুলে ফেটে পড়েছে। রাত্রির গহ্বরে এরা যেন বিবর্ণ হয়ে গেছে : ঘন অন্ধকার কিন্তু এখানে ওখানে চাঁদ উপরে পাতার আবরণটা ভেদ করার চেষ্টা করছে…"

"অস্তমান চাঁদ আকাশে" ('সালোমি'— অসকার ওয়াইল্ড)।

"রাত্রির আকাশ। অস্তের আকারে দুর্গ বা টাওয়ার— লোহার আকরি দেওয়া দরজা। মশালের আলো। ভূমিটা টাওয়ারের দিকে উঁচু হয়ে গেছে" (অসকার কোকোশকা, 'নারীরের অংশ— দৃশ্য')।

"ডানদিকে মঞ্চের পটভূমিতে একটা খালকনি : সেখানে কাপা কাপা পর্দা। এর পিছনে দেখা যাচ্ছে একটা গাছের নিষ্পত্র শাখা-প্রশাখা : এই

শাখা-প্রশাখায় কোন কোনটাকে ঝাঁকড়ে ধরে উঠেছে সবুজ লতা।" ('পরজোভী', এমিলিও কারবালিদো)।

"মাটির নিচে অন্ধকার গুহা— ভেতের প্রদীপের আলোই যার একমাত্র আলো। গুহার উপরে যে মাটি সেই মাটির ওপর একসারি গাছ, তারার আলো, এই গাছ থেকে কয়েকটা মৃতদেহ ঝুলছে। একটা লম্বুকের ছিদ্র দিয়ে তারার আলো প্রবেশ করছে এই গুহায়···" ('আরো একটা ফিনিক্স', জিনেস্টোলার ক্লাই)।

"একটা প্রকাণ্ড ঘোর লাল পর্দা···

মঞ্চের সামনের দিকে একটা টেবিল, তার মোটা ভারি ভারি পায়া— কাঠের একখানা চেয়ার তার উঁচু পিঠ রাখার ঠেস। ঘুল পর্দার ওপর উজ্জ্বল লাল উজ্জ্বল আলো— উপর থেকে ও নিচে থেকে ছড়িয়ে পড়েছে। মাঝখানে কাটা, দুদিকের ছুটো অংশকে একসঙ্গে ঝুললেও মাঝে যে ফাঁকটা থেকে যায়, সেই ফাঁক দিয়ে দেখা যায় তীব্র লাল আলো।" ('পরশমণি', অ্যানটোনিন আরতো)।

"লম্বুজওয়ালা একটা গহ্বরের মধ্যে অন্ধকার অর্ধ-বৃত্তাকার জায়গা: মঞ্চের লম্বুখদিকে···কদলের আঁটি পোরা— পশুর চামড়া দিয়ে তৈরি বস্তা···তিনটি কুৎসিত আধা-মানুষের মতো প্রাণী, নিচু-নিচু একটা আগুনের ছুতে খাবার গরম করছে···এদের দিকে পিছন করে একটা উলঙ্গ লোক বসে রয়েছে···হাতে প্রাগৈতিহাসিক কোন একটা যন্ত্র, এটা দিয়ে সে সামনের দেওয়ালে কী একটা কিম্ভূতকিমাকার ছবির সীমারেখা আঁকছে···কোথা থেকে একটা শব্দ আসছে —একবার মিলিয়ে যাচ্ছে আবার জাগছে···ঘস্ ঘস্ শব্দ হ'ল ছোটার মতো শব্দ, পিস্ দেওয়ার মতো শব্দ, গর্জন করার মতো, পিছলে পড়ার মতো শব্দ···" ('মানবক'—অ্যানথে_ফোন্স, ই. ই. কামিংস্)।

"গুপ্ত দরজা" ('কাইমেরা'—অলীকরূপ, পিরন্দো)

"মঞ্চের সামনে ডানদিকে একটা দরজা। দরজার কাছে দেওয়ালে একটা ছবি টাঙানো। ছবিটা উল্টে ঝোলানো। সামনে বাঁ দিকে পাশাপাশি দুটা ডাস্টবিন— একখানা পুরনো বিছানার চাদর দিয়ে ঢাকা···" ('এন্ড্ গেম', সামুয়েল বেকেট)।

এই ছবিগুলো সাধারণ ছবি নয়। স্বতঃআবির্ভূত ছবি। কবির সাঁয়ালরি দর্শনের মণ্ডলে স্বতঃআবির্ভূত। এরা visionary experience। যারা

যা অতিরিক্ত যা অন্য— কিন্তু অলীক নয়, নিজেরই অর্থে অর্থবান। দুরকম অর্থ। 'The visionary experience is not always blissful. It is sometimes terrible. There is hell as well as Heaven... Like heaven, the visionary hell has its praeter—natural light and its praeter-natural significance'— অতিপ্রাকৃত অর্থময়তা নিয়ে এরা স্বতঃআবির্ভূত।

"And there is the horror of infinity..."

অনন্তের ভয়ঙ্কর আতঙ্ক। 'For the healthy visionary, the perception of the infinite in a finite particular is a revelation of divine immence.' অবিকৃতবোধ দ্রষ্টার সম্মুখে ঐশিক সত্তার আবির্ভাব, সীমিতের মধ্যে অনন্তের অভিব্যক্তি।

'For the others the vast, cosmic mechanism exists only to grind out guilt and punishment, solitude and unreality.'

"For them the universe is transfigured— but for the worse. Everything in it, from the stars in the sky to the dust under the feet is unspeakably sinister or disgusting: every event is charged with hateful significance,...every object manifests the presence of an indwelling horror, infinite, all-powerful, eternal..." (Doors of Perception—Aldous Huxley. Penguin Books, 1959)

এই বিপুল ব্রহ্মাণ্ড যেন মানুষকে পেষণ করার যন্ত্র, পিষে পিষে বের করে আনছে পাপকে, শাস্তিকে, একাকিত্বকে আর অসারবতাকে···আকাশের তারা থেকে পথের ধূলি পর্যন্ত ভয়ংকর অর্থে অর্থবান— প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে অনন্ত, চিরস্থায়ী আতঙ্ক যেন মুখ থুবড়ে রয়েছে।···মানুষ সৃষ্টির মধ্যে শূন্যতায়, ভয়ংকর শূন্যতায় সন্ধুচিন— আন্তোনিন আরতোর বিচারে:

'The condition of man was such because of the unrelenting malignancy of the incomprehensible cosmic powers that govern him. Hence the theatre which reflects the condition of man, must be a 'theatre of cruelty'. (George Wellworth. The Theatre of Protest and Paradox, London, 1965.)

Wellworth বলেছেন যে Arthur Adamov-এর প্রথম দিকে রচিত নাটকগুলিতে আধুনিক নাটকের এই বিশেষ লক্ষণগুলি বিদ্যমান।

আদামভের *Les Retrouvailles* (Recoveries, 1955) এবং *Le Sens de la Marche* (Direction of the March, the Meaning of the Way) এই দুটো নাটকে প্রায় নিরাকার এক মাতৃমূর্তি, আর বিদ্রোহী এক পুত্র, নিছক পিতৃঘাতী।

Drama of Protest নাম দিয়ে ওয়েলওয়ার্থ-এর মতো সমাজ-সন্ধানী সমালোচকেরা নতুন নাটককে এক ধরনের 'সামাজিক ফললতি'— (sociological phenomenon) বলে চিহ্নিত করেছেন। এই ধরনের সামাজিক প্রতিবাদ আজ নতুন নয়। অগ্রণী শিল্পীরা এই প্রতিবাদ দিয়েই আরম্ভ করেন। তাঁরা সমাজের শিলীকৃত আচার ও অভ্যাসের কারাগার থেকে মুক্তি সন্ধান করতে গিয়ে প্রচুর ভাঙেন, কেউ কেউ নতুন কিছু গড়েন, কেউ কেউ শুধু ভেঙেই খালাস। এই প্রতিবাদ কিছু বিংশ শতাব্দীর এই মধ্যভাগের বৈশিষ্ট্য নয়। এ শিল্পীমাত্রেরই বৈশিষ্ট্য। ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্য। শিল্পীর স্বভাবগত যে-বিদ্রোহপ্রবণতা আজকের সব নতুন শিল্প শুধু মাত্র সেই বিদ্রোহের ফললতি নয়। আজকের নতুন শিল্পে মানবচিত্তের আশ্চর্য, অভূতপূর্ব, নবায়ন ঘটে চলেছে। আজকের দিনের উপন্যাস ও নাটককে এই ধরনের সোশিওলজিকাল কার্যকারণ সম্পর্ক দিয়ে বিচার করা কিছুদূর পর্যন্ত সম্ভব হলেও (আমি এটাকে এক ধরনের র‍্যাশন্যালাইজেশন বলি। ঘটনাটা ঘটে যাওয়ার পরে আর একটা ব্যাখ্যা খাড়া করার বুদ্ধিমান প্রচেষ্টা মাত্র) সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। মানব সভ্যতার উষা পর্বে ভাবের, চিন্তার ও অনুভবের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে স্পষ্ট কোন বিভাগ ছিল না। সেদিন যুক্তিতে ও অনুভবে কোন পার্থক্য ছিল না, পার্থক্য ছিল না বিজ্ঞানে ও ম্যাজিকে। মানবচিত্ত একটাই সত্তা ছিল,— চিত্তের যে বিভিন্ন সম্ভাবনার বিভিন্ন প্রকাশ— তাদের মধ্যে সংঘাত তো ছিলই না, পার্থক্যও স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। চিত্ত তখন পর্বে পর্বে আত্ম-প্রকাশ করে নি। তার অনেক পরে মানুষের চিত্ত ধীরে ধীরে বিজ্ঞান, শিল্পকর্ম ও ধর্ম এই তিন প্রধান 'কর্মে' আকার গ্রহণ করেছে। একই চিত্তের ত্রিধা প্রকাশ। অর্থাৎ মানব-চিত্তের মধ্যভাগ দিয়ে তিন-তিনটে দুস্তর ফাটল দেখা দিয়েছে। ভেঙেছে ব্যক্তিত্ব, ভেঙেছে বিবেক। চেতন, অবচেতন ও আলয় বিজ্ঞানে সংযুক্তি বিলুপ্ত হয়ে গেছে— সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে। তিন ধরনের ফাংশন-এর জন্যে মন তিন ভাগে ভেঙেছে। আর এই তিন ভাগের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে আধুনিক মনস্তত্ত্ব।

তার দীর্ঘকাল পরে তারা তারা চিত্তবৃত্তি, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন চিত্তের ক্রিয়া একই অভিমুখের দিকে ফিরে চলেছে। বিজ্ঞানে গিয়ে কর্মে যে চিত্তবৃত্তির বিভিন্নতা এতোকাল মানুষকে ছিন্নভিন্ন করেছে, অথচ মানুষকে টুকরো টুকরো করে ভেঙেছে, মানুষের বুদ্ধি ও অনুভবে, ব্যক্তিত্বে কাটল ধরিয়ে তার মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করেছে, মানুষের চিত্তলোককে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করেছে, সমস্ত জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ভীষণ ভয়ংকর একাকিত্বের শূন্যে তাকে স্থাপন করেছে সেই তার অস্তিত্ব আজ আবার নতুন অর্থে মিলিত হ'তে চলেছে। আশ্চর্যের কথা, আজ সংগীতে, চিত্রকলায়, নাটকে, চলচ্চিত্রে, সর্বক্ষেত্রে সর্বদিকে একই অখণ্ড অভিমুখের দিকে মানুষের চিত্ত চালিত হয়েছে। মানুষ, তার আত্মপ্রকাশের যে বিভিন্ন মাধ্যম— যেমন চিত্রশিল্পীর কাছে রঙ ও রেখা, লেখকের কাছে কথা ও ভাষা, ভাস্করের কাছে ধাতু আর পাথর আর কনক্রিট— সেই বিভিন্ন মাধ্যমের যে বিশেষ প্রকৃতি সেই বিশেষ প্রকৃতির সীমাকে উপলব্ধি ক'রে, তাকে অতিক্রম ক'রে, মানুষের অখণ্ড সত্তাকে তার ঊর্ধ্ব থেকে অধঃ পর্যন্ত, সজ্ঞান থেকে নির্জ্ঞান পর্যন্ত ব্যাপ্ত সমগ্র ও একক সত্তাকে প্রকাশ করার নতুন নতুন উপায় সন্ধান করছে। এবং পেয়েওছে। কর্ম অর্থাৎ 'রূপ'কে, কনটেন্ট অর্থাৎ 'নামে'র সঙ্গে একাকার ক'রে দিয়েছে। একাকার করেছে বললে ভুল হবে— কেননা এ দুয়ের মধ্যে কোন স্বাতন্ত্র্যিক দ্বৈততা নেই। যা নাম তাই রূপ— এ যেন 'কর্ম-কনটেন্ট-কন্টিনিউয়াস'। কম্পোজিশন বা নির্মাণের মধ্যেই রূপ ও রূপায়িত প্রকাশমান। এক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখলে তা রূপ বা কর্ম, অন্য দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখলে তা কনটেন্ট বা 'নাম'। অর্থাৎ এই কম্পোজিশনটাই এক এবং অখণ্ড।

শিল্পতত্ত্বের ব্যাপারে কম্পোজিশন নয়— সাধারণত কমিউনিকেশনকেই অর্থাৎ পরিজ্ঞাপনকেই মৌলিক উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। আর্ট মানে কমিউনিকেশন এটাই ক্লাসিকাল শিল্পতত্ত্বের মূল বক্তব্য। এই কমিউনিকেশনকে শিল্পতত্ত্বের ক্ষেত্রে স্থাপন ক'রে তার সামাজিকতাকে, তার উপযোগিতাকে বড় করেতুলে ধরা হয়েছে। অন্যান্য শিল্পের বেলায় এই কমিউনিকেশনকে যতোটা প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে তার চেয়ে একে অনেক বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে ভাষাশ্রিত শিল্পকর্মে। ভাষার উৎপত্তির দুই মূল: এক মূল তার সামাজিক উপযোগিতা। অন্য মূল তার শুধু নির্মাণের প্রেরণা। মানবঅভিব্যক্তির প্রাথমিক পর্যায়ে ভাষা একই সঙ্গে দুই কাজেই ব্যবহৃত হয়েছে। এখনো শিশুদের

ভাষায়, আদিম মানবগোষ্ঠীর অনুষ্ঠানে ভাষা তার এই নির্বাক রূপে আবির্ভূত। অর্থাৎ ভাষা একদিকে প্রয়োজনের তাগিদে পরিজ্ঞাপক শব্দচিহ্ন রূপে পরিণত আর একদিকে— সংগীতে— সম্পূর্ণ মুক্ত। একদিকে তার অর্থময়তা, অপর দিকে শুধু তার শব্দগুণ। সৃষ্টির আদিতে ছিল শব্দ। শব্দই একদিন সত্য সত্যই ব্রহ্ম ছিল— এখান থেকেই সৃষ্টি— মানবিক সৃষ্টি উৎসারিত হয়েছে। ভাষাকে তথ্য ও মনোভাব জ্ঞাপনের কাজে প্রধানত ব্যবহার করা হয়েছে ব'লে ভাষাশ্রিত শিল্পের মূলে এই জ্ঞাপকত্বকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। একদিকে তা প্রয়োজনের জ্ঞাপক, অপর দিকে তা শুধু নির্মাণ মাত্র। তান্ত্রিক আচারে ব্যবহৃত ওঁ, হ্রীঃ, ক্রীঁ, হ্রীঃ ইত্যাদি শব্দ তার প্রমাণ। এই শব্দেরা এক একটা রূপ— আকার— চেতনায় ঈঙ্গিতে অনন্ত প্রসারিত, অশেষ-অর্থ। ভাষাশ্রিত শিল্পরীতিতে, আধুনিক কালে, অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালে, যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে ( যাকে আমি কালদিগন্তিকা বলেছি তার এদিকে ) সেই পরিবর্তনের প্রধান লক্ষণ হ'ল : শিল্পে ভাষাকে আর জ্ঞাপক পদার্থ রূপে ব্যবহার করা হচ্ছে না, ভাষাকে ব্যবহার করা হচ্ছে কী কবিতায়, কী নাটকে, এমন কী উপন্যাসেও— ব্যবহার করা হচ্ছে বিশ্বের সঙ্গে লেভি-ব্রুল ( Levy Bruhl )-কথিত 'participation mystique'-এর উপায় রূপে।

আজকের দিনে শুধু শিল্প নয় বিজ্ঞানও ( পদার্থবিজ্ঞানের সব চেয়ে অ্যাব্‌স্ট্রাক্ট যে গণিতাশ্রয়ী রূপ ) বিশ্বের সঙ্গে তন্ময়তার উপায় বিশেষ। শিল্প আজ তন্ময়তার প্রকাশ। 'তন্ময়' বলতে 'তৎ' দ্বারা অভিভূত অবস্থা। তৎ -এর সঙ্গে একাত্মতা— তৎ-এর মধ্যে আত্মনিমজ্জন, তৎ-এর মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা। এই তৎ হচ্ছে বিশ্ব, কসমস্ বা সমগ্র সৃষ্টি। বিভিন্ন শিল্প এই তন্ময়তা প্রকাশের বিভিন্ন রূপ বা অর্ঘ। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন শিল্প বিশ্বের সঙ্গে শিল্পীর তন্ময়তার বিভিন্ন পথ। যেমন সংগীত, তেমনি চিত্রকলা, তেমনি কবিতা, তেমনি আধুনিক নাটক ( আর্ত' শার্প নাটক ) সবই শিল্পীর তন্ময়তার ভিন্ন ভিন্ন রূপ মাত্র। তন্ময়তার বিভিন্ন রূপ বলেই একের অর্ঘের সঙ্গে অন্যের অর্ঘ'র কোথাও না কোথাও মিল এসে গেছে। আজ সব কম্পোজিশনের সঙ্গে সংগীতের কম্পোজিশনের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। তন্ময়তার সাধারণ প্রকাশ শুদ্ধ কম্পোজিশনে অর্থাৎ শুদ্ধ নির্মাণে। আগে যেমন বলেছি, আদিম যাদুকরের ঝিনুকমালে, ওঝা, প্রেতসিদ্ধের ম্যাজিক বা ইন্দ্রজালে, শিশুদের খেলায়, এমন কি পাগলের কল্পনায় ও প্রলাপে, জ্ঞাপকার্থনিরপেক্ষ যে অর্থহীন শব্দশৃঙ্খল ব্যবহৃত

ঘরে থাকে তার মধ্যে আছে কোন গূঢ় 'তৎ'-এর সঙ্গে, মানবাতীত কোন কিছুর সঙ্গে তন্ময়তা।

জঁা তারদ্যু (Jean Tardieu) তাঁর একাঙ্ক নাটককে ('সোনাটা ও তিন জন ভদ্রলোক') তিনটে অংশে ভেঙেছেন : প্রথম অংশের নাম সংগীতের ভাষায় লারগো, দ্বিতীয়ের নাম আনদান্তে, তৃতীয়ের নাম ফাইনেল :

**আন্তারী** ( লারগো )

ক—আপনার মনে আছে ?

খ—আমার মনে আছে : 'গ'-এর দিকে— আর আপনি ?

[ বিরাম ]

গ—কী একটা উদারা দিয়ে আরম্ভ

খ—হ্যাঁ সমুদ্রের মতো উদার বিস্তার দিয়ে

গ—সন্ধ্যার সমুদ্রের উদার বিস্তার দিয়ে···

[ বিরাম ]

খ—তারপর সব চুপ।···

**সঞ্চারী** ( আনদান্তে )

ক—সন্ধ্যায়

খ—সন্ধ্যায়

[ অল্প বিরাম ]

ক—সন্ধ্যায়, সন্ধ্যায়

খ—সন্ধ্যায়, সন্ধ্যায়, সন্ধ্যায়

গ—সন্ধ্যায়

খ—সন্ধ্যা

ক—সন্ধ্যা, সন্ধ্যা

গ—সন্ধ্যা, সন্ধ্যা, সন্ধ্যা, সন্ধ্যা।···

**আভোগ** ( ফাইনেল )

ক—এক সকালে··· .

গ—এক সকাল-সকালে···

খ—বেজে উঠেছে "সকাল, সকাল, সকাল"।

গ—যেমন সব সকালে…
খ—সকাল,
ক—সকাল, সকাল
ঘ—সকাল, সকাল, সকাল, সকাল !
…[ বিরাম ]
খ : 'গ'কে : ঘ—?
[ বিরাম ]
গ : …কাল !
ঘ : 'ক'কে : গ— ?
ক :—কাল !
[ তিনজনে পরস্পরকে নমস্কার করে বিদায় নিলে ]

ওয়েস্‌ওয়ার্থ-এর মতো অনেকেই বিশ্বাস করে এই নতুন নাট্যরীতির মূলে আছে নতুন ইনকারনেশন বা সমাচার। বিশ্বাস করে, আজকের দিনের শিল্প আমাদের যুগের প্রতিফলিত রূপ— যুগ বলতে যুগসত্যতার আধি ও ব্যাধির। সামাজিক ভাবনার অভ্যস্ত সমালোচকরা যাঁরা হিস্টরিক্যাল বা ইতিহাসনির্ভর পদ্ধতি ছাড়া শিল্পবিচারের পদ্ধতি কল্পনা করতে পারেন না তাঁদের অভিমত এক ধরনের র‍্যাপস্ট্রালাইজেশন। তাঁদের কাছে নতুন ইন্‌থেটিক্স্-এর রূপরেখা অস্পষ্ট। আজকের ইন্‌থেটিক্স তন্ময়তার ইন্‌থেটিক্স— এর প্রধান ধর্ম বিশ্বের সঙ্গে তন্ময়তা : সমস্ত অভ্যাসকে চূর্ণ করে মনকে সম্পূর্ণ নিরাবরণ করে জগতের মধ্যে নিমজ্জন। এবং তার সঙ্গে মুক্তি। সীমিত মনুষ্যত্বকে উত্তরণ।

দীর্ঘ বহুশতাব্দীব্যাপী বিবর্তনে যে মনুষ্যত্ব আকার নিয়েছে— সেই আকার থেকে মুক্তি। একদিক দিয়ে বিচার করলে এই মুক্তি তার বিবর্তনের সহায়। মানুষের দেহ-মনের মধ্যে নিহিত দুর্লক্ষ্য অসীম সম্ভাবনার কিছুকে সম্ভব করে তোলা।

**'So far as we are animals, our business is at all costs to survive. To make biological survival possible, mind at large has to funnelled through the *reducing* valve of the brain and nervous system. What comes out at the other end is a *merely* trickle of the kind consciousness which help us to stay alive on the surface of this particular planet.'**

**'The which…is called 'this world' is the universe of reduced awareness and expressed, and, as it were, petrified by language.**

The various 'other words' with which human beings erratically make contact are so many elements in the totality of awareness belonging to mind at large.'

'Most people, most of the time, know only what comes through the reducing valve and is consecrated as genuinely *real* by the local language. *Certain persons* however, seem to be born with a kind of by-pass that circumvents the reducing valve. (Doors of Perception, Aldous Huxley, 1959.)

এই *certain persons*-ই শিল্পী। শিল্পীর সৃষ্টি 'is not limited to what is biologically and socially useful.'

চেতন মনের আড়ালে যে মন, যাকে ঐ উদ্ধৃতিতে 'mind at large' বলা হয়েছে, তার যে স্তর বিভাগ করা হয়েছে 'অবচেতন' 'সমষ্টি-অবচেতন' ইত্যাদি নাম দিয়ে সেই স্তরবিভাগের সঙ্গে সংযুক্তি, শিল্পকর্মের প্রেরণা ব'লে ব্যাখ্যাত হয়েছে। এই ব্যাখ্যার মধ্যে সত্য আছে। যদিও চেতন-অবচেতন ইত্যাদি ধারণা মূলত এম্‌পিরিক্যাল ধারণা— নিতান্তই মানসিক ক্রিয়াকলাপকে শ্রেণীবদ্ধ করার প্রয়োজনে নির্মিত ধারণা। এই অবচেতনের সঙ্গে সংযোগ, তন্ময়তার উপায়, তন্ময়তার পন্থা। এই তন্ময়তাকে আগেই ব্যাখ্যা করেছি। এই তন্ময়তা-বিধানের রীতিই শিল্পের রীতি। এই রীতি কোন লজিক্যাল পদ্ধতি-নির্ভর নয়, এ নিতান্তই অমূর্ত নির্মাণ— অমূর্ত কর্ম-নির্ভর। তন্ময়তা কর্ম-রূপেই প্রকাশমান। আগে যেমন বলেছি, 'কী' এবং 'কেমন' করে what ও how-এর মধ্যে পার্থক্য বিলুপ্ত। আর এই কর্ম চতুর্দিকে খোলা— অখণ্ড অস্তিত্ব মাত্র। কোন সীমার মধ্যে সীমিত নয়। সীমা বলতে ধারণার সীমা, কর্মের সীমা নয়। সংগীত এই কর্মের শুদ্ধ রূপ— সংগীত যার মধ্যে প্রকাশমান তা তার কম্পোজিশন।

এই শিল্প 'শিল্পের জন্যে শিল্প' বা 'Art for Art's sake' মতবাদ-জাত শিল্পকর্ম থেকে স্বতন্ত্র— জাতিগতভাবে, কমপ্লেক্সগতভাবে, নামগতভাবে, বিষয়গতভাবে, স্বতন্ত্র। শিল্পের জন্যে যে শিল্প তার মধ্যে কৌশল আছে, গঠন আছে, কিন্তু সেই গঠন এই শুদ্ধ নির্মিতিকর্ম বা কম্পোজিশনে পরিণত হয় না— কারণ তার মধ্যে এই তন্ময়তা নেই, মানুষের বর্তমান অস্তিত্বকে, স্থানে কালে ও জৈব প্রয়োজনের নিগড়ে বদ্ধ অভ্যাসের বাইরে যে অস্তিত্ব,

যে অমূর্ত সম্ভাবনা, তার বিবর্তনের যে মূল ভূমি সেই অস্তিত্ব, সেই সম্ভাবনা, সেই ভূমির সঙ্গে এই ধরনের শিল্পের কোন যোগাযোগ নেই। এখানেই এই ধরনের শিল্পের থেকে আমাদের দৃষ্টিগোচর এই শিল্পের গুণগত পার্থক্য। শিল্পের মধ্যে যে শিল্প তা আমাদেরই অভ্যস্ত ধারণা ও প্রবৃত্তিকে মিশিয়ে নিয়ে তৈরি যে পিটুলি সেই পিটুলি দিয়ে আঁকা আলপনা। এর সঙ্গে আমাদের সত্তীরের কোন যোগ নেই— যে ভূমি থেকে মানুষের চৈতন্যের বিবর্তন প্রসূত সেই ভূমির সঙ্গে এর কোন যোগাযোগ নেই। আধুনিক শিল্প বিচ্ছিন্নতার সন্তান।

আদিম জাতির বিচ্ছিন্নতার যে কর্মপ্রচেষ্টা, সেই কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে নৃতত্ত্ববিদ্‌রা নানা ধরনের অর্থনৈতিক ও জৈবিক প্রচেষ্টার চিহ্ন আবিষ্কারের চেষ্টা করলেও ( যথা কৃষিকর্মের নানান ভঙ্গী বা যৌনব্যবহারের অনুকারক নানান ভঙ্গী ) আসলে এই ধরনের শারীরিক চেষ্টা এক অর্থে নিতান্তই কম্পোজিশনধর্মী।

আধুনিক আঁত্রা গার্দ নাটকে ভাষাও যেমন কম্পোজিশন তার গঠনও তেমনি একটা কম্পোজিশন। তেমনি কম্পোজিশন নাটকে ব্যবহৃত আলোক উপকরণ দৃশ্য ইত্যাদি। ভাষা এক স্তরের কম্পোজিশন, দৃশ্য আর এক স্তরের, ঘটনা পারম্পর্য আরও এক ভিন্ন স্তরের। এখানে ঘটনা পারম্পর্যের মধ্যে কম্যুনিকেশন তথা লজিকের কোন স্থান নেই। ঘটনার সঙ্গে ঘটনা সন্নিবিষ্ট করে এই বিশেষ পরিবেশের আশ্রয়ে বিশেষ ধরনের তন্ময়তা সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। নানান ঘটনা, নানান মঞ্চকৌশল, নানান উপকরণ ভূষার কম্পোজিশনের অঙ্গরূপে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

এই ধরনের নাটকে ঘটনা বা চরিত্র বা ভাষা মোটেই প্রতীকধর্মী নয়। অর্থাৎ তথাকথিত অর্থে অ্যালিগরিক্যাল নয়। যা 'অ্যালিগরি' ও যা 'এথোগরি'-বাচ্য এই দুইয়ের মধ্যে মানগত কোন পার্থক্য নেই, এ এক ধরনের কৌশল মাত্র। প্রতীক সেখানে সিম্বল অর্থাৎ সত্তীর অবচেতন থেকে উত্থিত স্বয়ংসিদ্ধ রূপকল্প ও যার বাচনার কোন তাত্ত্বিক প্রকাশ নেই সেই ধরনের সিম্বল এই শ্রেণীর নাটকে ব্যবহৃত হ'তে পারে। প্রতীক যেখানে কমিউনিকেশন বা জ্ঞাপনকর্মে ব্যবহৃত হয়, সেখানে তার আশ্রয় লজিক। তাই আধুনিক নাটক এই অর্থে প্রতীকধর্মী নয়। আধুনিক নাটকে ঘটনার সঙ্গে ঘটনার কোন লজিক্যাল মিল নেই, যেমন লজিক্যাল

বিশ নেই অমূর্ত চিত্রে এক রঙের সঙ্গে অন্য রঙের—এক কর্মের সঙ্গে অন্য কর্মের। এখানে প্রত্যেক উপাদান তার নিজস্ব মণ্ডল নিয়ে স্বাধীনভাবে আবির্ভূত। আকাশে এক নক্ষত্রের সঙ্গে অন্য নক্ষত্রের অবস্থিতির কোন লক্ষিক্যাল যোগাযোগ না থাকলেও ওরা যেমন একত্রে মিলে এক-আকাশে আকর্ষণরূপে আবির্ভূত এও যেন তেমনি।

আমি একেই বলেছি open form অর্থাৎ মুক্ত নির্মাণ কর্ম। অনেকের ধারণা এই নতুন নাট্যরীতির মূলে রয়েছে নতুন ধরনের কমিউনিকেশন অর্থাৎ আধুনিক জীবনের নিরর্থকত্বের প্রকাশ। আজকের যুগের বিশেষ মানসিক অবস্থার বিবৃতি। সামাজিক ভাবনায় অত্যন্ত সমালোচক যাঁরা, যাঁরা ঐতিহাসিক পদ্ধতি ছাড়া শিল্প বিচারের অপর কোন পদ্ধতি কল্পনা করতে পারেন না, এটা তাঁদেরই স্বকপোলকল্পিত একটা মত মাত্র। আজকের এক্সপেরিমেন্টস-এর প্রধান কথা বিশ্বের সঙ্গে তন্ময়তা।

মানুষ অজ্ঞাতসারে এই এক্সপেরিমেন্টস-এর দিকে চলেছে। আরও একটা কথা, আমার বারংবার মনে হয়, সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে, যুগের ক্রমবিকাশের সঙ্গে, যে কোন কারণেই হোক ( ভেইলার ও পার্সা এর একটা ধারা নির্দেশ করেছেন ), হাক্সলির ভাষায় 'mind at large'। বৌদ্ধ দর্শনের ভাষায় 'আলয় বিজ্ঞান', য়ুং-এর ভাষায় 'কলেকটিভ্ আনকন্সাস' বা সমষ্টি নির্জ্ঞান, 'আর্ডা গার্দ' নাটকের প্রথম আবিষ্কর্তা সমালোচক আরতো (Antonin Artaud)-এর ভাষায় 'supernatural forces surrounding man', যা মানুষের কাছে ধীরে ধীরে স্বাভাবিকভাবেই প্রতিভাত হচ্ছে। বাংলা দেশেরই যত তরুণ চিত্রকরের তুলিতে এই মানুষের চতুর্দিকে অদৃশ্য অনন্ত সাগরের মতো বিরাজমান রহস্য-রহস্য ধরা পড়ছে। মাঝে মাঝে মনে হয় আমরা একটা নতুন উন্মীলনের অপেক্ষায় রয়েছি। এই উন্মীলনের এক পর্যায়ে, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে জগৎ জীবন ও মানুষের নিরর্থকত্ব, সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে মুক্ততা, তা প্রকাশ পেয়েছে ব'লেই যে এই নতুন উন্মীলনের পূর্ণ স্বরূপ সে প্রকাশ করছে তাই নয়। মধ্যযুগের আঁকা একটা জ্যোতির্বিদ্যার বই-এর চিত্রে দেখেছি মানুষ একটা গোলাকার বিশ্বখোলের বাইরে তার মাথাটা বের করে দিয়েছে। এ যুগের মানুষও তার চিন্তা, সংস্কার, বিশ্বাস, অভ্যাসের যে বিশ্ব সেই বিশ্বের খোলটা ভেঙ্গে করে তার অস্তিত্বকে বাড়িয়ে দিয়েছে। সে যেন নিজেকে অতিক্রম করছে। আরতো এই অমানুষ বিশ্বের নিষ্ঠুরতাকে

বড়ো করে দেখলেও, এর মর্ম, আধুনিক নাটকের নির্যাস, —তাই বুঝতে পেরেছিলেন। ওয়েল্‌ওয়ার্থ বলেছেন :

'Artaud would like to have only 'purely irrational assemblages of sounds, denuded of all sense' floating allusively around at *high altitudes* where they can charge the atmosphere with a *pervading emotion* far above the 'deaf ears' of the mind.' (Wellworth, *The Theatre of Protest and Paradox*, P23)

অর্থাৎ আরতো বুঝেছিলেন যে আধুনিক শিল্পের প্রধান লক্ষণ তার 'মর্ম'-এর সীমারেখার অভাব। সে যেন চতুর্দিকে উন্মুক্ত।

এক ধরনের কথা আছে, ঘটনা আছে, বস্তু আছে যা মানুষের মনকে বিশেষ অর্থে, বিশেষ বোধে, বিশেষ দৃষ্টিতে বেঁধে ফেলে, এগুলো যেন দেওয়াল। আর এক ধরনের কথা আছে, ঘটনা আছে, বস্তু আছে, যা মানুষের মনকে বিশেষ অর্থ, পরিবেশ, বোধ ও জ্ঞান থেকে মুক্ত করে— এগুলো যার না যাতায়ন। আজকের শিল্পবস্তু যেন এই ধরনের শতদ্বার, শত যাতায়ন। এক এক দ্বার বা যাতায়ন দিয়ে চিত্তের এক এক লোকের হাওয়া এসে প্রবেশ করে। এই নতুন শিল্পের প্রত্যেক উপাদান গোটে তাঁর ভাষায় 'momentous signatures'— বিপুলের স্বাক্ষর।

'That fig tree, this little snake, the cocoon on my window still quietly awaiting its future—all these are momentous signatures. A person able to decipher their meaning properly would soon be able to dispense with the written or the spoken word altogether.'

['Doors of Perception' বই-এ Aldous Huxley-নির্বাচিত উদ্ধৃতি।]

আজকের দিনের শিল্পের প্রকৃতিতে এই ধরনের গুরুতর পরিবর্তন হওয়ার ফলে জ্ঞান-শিল্পীরা, শিল্পীমন্যেরা, অস্তিত্বের এই ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্যে নিজের সর্বপ্রকার অভ্যাস বা সংস্কারের দেওয়াল পেরিয়ে যাবার জন্যে 'automatism'-এর আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু এইভাবে নিজেকে ছাড়পত্র দিলেই, সমস্ত শৃঙ্খলা ভেঙে উচ্ছৃঙ্খল হলেই যে গভীরে নামা যাবে তা নয়, যে-লোক সাঁতার জানে না, যা খুব অল্পই সাঁতার জানে তার পক্ষে গভীর জলের মধ্যে ডুবে থাকা সম্ভব নয়। হয় সে গভীরে পৌঁছবেই না, কিংবা পৌঁছেই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে সর্বনাশের সম্মুখীন হবে। চিত্তের গভীরের

সঙ্গে যোগাযোগ সিদ্ধ করতে তিনিই পারেন যিনি সহজে ভাঙেন না, যাঁর ব্যক্তিত্ব গভীরের চাপে পড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় না। যাঁরা তথাকথিত শিল্প সাধনার সহজে বিশ্বাস হয়ে ওঠেন, তাঁরা ব্যক্তিগত অবচেতনের লোক পর্যন্ত পৌঁছে নির্বিচারে সেখান থেকে জঞ্জাল উদ্ধার ক'রে আনেন এবং এই মতঃ-উত্থিত জঞ্জালকে শিল্পবস্তু ব'লে জাহির করেন। মহাসমুদ্রের সঙ্গে যেমন তারকার জন্ম হয় না, তেমনি মনের সর্বস্তরে মহান শিল্পের জন্ম হয় না— মহান কেন, কোন শিল্পেরই জন্ম হয় না। শিল্পের জন্যে সাধনা অপরিহার্য। শিল্পের উপাদানের ওপর— শাঁতারুর যেমন জলের ওপর— শিল্পীর অসাধারণ শাসনক্ষমতা প্রয়োজন। এই গভীরের কোন সীমাবিদ্ধ রূপ নেই. এই গভীরের দ্যোতনাবাহী শিল্পবস্তু কোন কিছুর সীমান্তে গ্রাফ করে না, তা সম্পূর্ণ open form— দিকে দিকে যার খুলে যায়। কিন্তু এই গভীরে প্রবেশ না করা পর্যন্ত ঐ সহস্রদ্বার শিল্পবস্তুর সাক্ষাৎ মেলে না।

এই সম্বন্ধে সুন্দর ভাষায় বলেছেন পল ক্লে :

**Presumptuous is the artist who does not follow his road (from type to prototype) through to the end. But chosen one those artists who penetrate to the region of that secret place where primeval power nurtures all evolution. (Paul Klee, *Modern Art*, 1969.)**

যে শিল্পী শেষ পর্যন্ত না পৌঁছে থামলো ( যেমন, যে ব্যক্তিগত অবচেতনের আবর্তনায় থামলো ) তার ঘড় হল ভাঙ। কিন্তু সেই শিল্পীর কপালে পড়বে জয়টিকা যে সেই রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করবে, যে রহস্যময় ভূমিতে আদি শক্তি সমস্ত অভিব্যক্তিকে পোষণ করছে।

**There where the power-house of all time and space— (all its brain or heart of creation— activates every function ; who is the artist who would not dwell there.**

এই সেই সমস্ত স্থান-কালের শক্তিবিতরণ-কেন্দ্র— সৃষ্টির যন্ত্রিকই বলুন আর হৃদয়, যাই বলুন না কেন— এই শক্তি সৃজনকেন্দ্র সমস্ত ক্রিয়াকে সঞ্চালিত করছে— এমন কোন্ শিল্পী আছেন যিনি এখানে পৌঁছতে চান না ?

**In the womb of nature, at the source of creation, where the secret key to all lies guarded.**

প্রকৃতির এই গর্ভাশয়ে, সৃষ্টির এই উৎসে, যেখানে সমস্ত কিছুর চাবিকাঠি সুরক্ষিত রয়েছে···

But not all can enter. Each should follow where the pulse of his heart leads.

কিন্তু সবাই এ লোকে প্রবেশ করতে পারে না। নিজের হৃদয়ের নাড়ী যে দিকে চলে সেই পথ ধরে চলতে হয়।

What springs from the source, whatever it may be called. dream, idea or phantasy— must be taken seriously *only if it unites* with proper creative means to form a work of art.

এই উৎস থেকে যা কিছু প্রসূত হোক, স্বপ্ন হোক, ধারণা হোক, কল্পমূর্তি হোক, তখনই এদের গ্রহণ করা যাবে যখন এই মূল উৎসের সঙ্গে যুক্ত হবে উপযুক্ত সৃষ্টির উপাদান যা দিয়ে তৈরি হবে শিল্পবস্তু।

I said, 'with the proper means', for at this stage it is decided whether pictures or something different be born. At this stage, also is decided the kind of pictures.

বলেছি 'উপযুক্ত উপাদানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে'। এই উপযুক্ত উপাদানের সংযোগই নির্দেশ করবে কী হবে: ছবি হবে, না অন্য কিছু হবে। এই পর্যায়েই নির্দিষ্ট হওয়া যাবে কোন্ ধরনের ছবি হবে।

আমরা সাহিত্য তথা নাটকের ক্ষেত্রেও এই ভাবে বলতে পারি: যখন তা উপযুক্ত নাটকীয় উপাদানের সঙ্গে সংযুক্ত হবে, এই সংযোগই নির্দিষ্ট করবে কেমন হবে সে নাটক, তা নাটক বা অন্য কিছু হবে।

These unsettled times have brought chaos and confusion.

আজকের এই বিভ্রান্ত কাল বয়ে এনেছে অনেক বিশৃঙ্খলা, অনেক অনাসৃষ্টি।

But among artists, even among the youngest of them, one urge seems to be gradually going ground. The urge to the *culture of these creative means to their pure cultivation, to their pure use.*

শিল্পীরা আজ প্রেরণা অনুভব করছেন সৃষ্টির উপায় বা উপাদানগুলিকে তাদের শুদ্ধ রূপে ব্যবহার করতে। অর্থাৎ এই উপাদানগুলির নিজস্ব প্রকৃতিকে আবিষ্কার করতে। এরাই হবে যারা— এরা শিল্পবস্তুকে অসংখ্য দিকে উন্মুক্ত করে দেবে— অসংখ্য সংকেতকে বয়ে আনবে— তথাকথিত অভিজ্ঞের বেওয়াজ-বেড়া চিন্তা থেকে মানুষকে মুক্ত করবে, পৌঁছে দেবে সেখানে, যেখান থেকে মানুষের অভিব্যক্তি সুরু হচ্ছে।

# সাহিত্যের ভাষা ও ধ্বনি-ব্যবহার

সেবাব্রত চৌধুরী

মানবভাষার অন্তরালে অনন্ত রহস্য। তার উন্মোচনে শিল্পীচিত্তের সমুলক্ষ বিস্তার। এই বিস্তার ভাষাশরীরে কত না কারুকাজের শোভনসুন্দর বিন্যাস রচনা করে। শব্দাবলীর সহযোগিতায় শিল্পীর হৃৎস্পন্দন অভিব্যক্ত হয়। এই শব্দাবলীর মধ্যে আছে বিবিধ তাৎপর্যের প্রস্তাবনা। 'ধ্বনি' শব্দটির দুই অভিধা,—ব্যঞ্জনা ও উচ্চারণ,—বিশ্লেষণ ক'রে বিবিধ তাৎপর্যের নিশানা পাওয়া যাচ্ছে। ব্যঞ্জনা মূলত শব্দার্থবিজ্ঞান বা বাগর্থবিজ্ঞানের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে। সাহিত্যের নিবিড়তম প্রত্যন্তদেশে শব্দার্থ বিজ্ঞান বা সেমান্টিক্স-এর ছত্রাকলা লক্ষণীয়। 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়টি মনে রেখেই বলেছিলেন, 'বাহুবের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বন্ধ চারিধারে ঘুরে মানুষের চতুর্দিকে'। প্রসঙ্গান্তরে আরো স্পষ্টভাবে তাঁর উক্তি,—'শব্দ তৈরি হয়েছে ঠিকটা-কী জানবার জন্যে; সেই জন্যে ঠিক-যেন-কী বলতে গেলে তার অর্থকে বাড়াতে হয়, বাঁকাতে হয়। ঠিক-যেন-কী'র ভাষা অভিধানে লেখে দেওয়া নেই, তাই সাধারণ ভাষা দিয়েই কবিকে কৌশলে কাজ চালাতে হয়। তাকেই বলা যায় কবিত্ব।' (ভাষা ও সাহিত্য)। কবি-প্রতিভার এই বিশেষত্ব ভাষাশরীরে যে তাৎপর্য রচনা করে, রবীন্দ্রনাথ সে-কথাটিই এভাবে বিশদ করেছেন, 'জ্ঞানের ভাষায় চাই স্পষ্ট অর্থ; ভাবের ভাষায় চাই ইশারা, হয়তো অর্থ বাঁকা ক'রে দিয়ে।' (ঐ)। কবিতা সমালোচনায় পুরনো শব্দের নতুন দীপ্তি পর্যবেক্ষণে এই ইশারা ও বক্রতার কারিকুরি অনুভব করা যায়। সাহিত্যে ধ্বনিসৌকর্যের আলঙ্কারিক মহিমা ছাড়াও উচ্চারণগত ধ্বনিবৈশিষ্ট্যের প্রতি মনোযোগ শিল্পী-মানসের আত্মপ্রকাশ-মাধ্যমের অন্তর্বিধ চরিত্রলক্ষণ আমাদের সামনে উন্মোচন করে। অভিধা-নিরপেক্ষ ধ্বনিবিজ্ঞানের সূত্রাবলীর সহযোগিতায় ভাষার প্রধান উপাদান শব্দের পাশাপাশি অবস্থানের বিশ্লেষণ ক'রে আমরা এক ধরনের ধ্বনি ও ধ্বনিতরঙ্গের অন্তঃস্রোত লক্ষ্য করবো। অলঙ্কার শাস্ত্রে অনুপ্রাসের ধ্বনিসৌন্দর্যের কথা উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু ধ্বনির পুনরাবৃত্তিতে যে অনুপ্রাস অলঙ্কারের জন্ম, তার নিছক সাঙ্গীতিক নয়নমনোহর মূল্য ছাড়াও যে অন্তর্বিধ তাৎপর্য আছে, ধনিষ্ঠ নিরীক্ষায় তা আমাদের ধারণায় বশবর্তী হয়ে ওঠে। বর্তমান আলোচনায় এই সূত্রের সংক্ষিপ্ত প্রস্তাবনা আমাদের অভিপ্রেত।

ঘোষধ্বনির গাম্ভীর্য ও অনুরণন ধ্বনিসৌকর্যের ফলে শ্রাব্যতে সঙ্গীতের স্পন্দন ও ব্যঞ্জনা সঞ্চার করে। অঘোষধ্বনিতে এই অনুরণনের অভাব লক্ষ্য করা যায়। অঘোষধ্বনি তাই উচ্চারণগত ছোতনা সৃষ্টিতে প্রায়শই অক্ষম। ধনাত্মক আওয়াজ এবং ঋণাত্মক আওয়াজের যে প্রতিগত তারতম্য, অঘোষের সঙ্গে ঘোষ-ধ্বনির পার্থক্য অনেকটা সেরূপ। স্বরধ্বনি ঘোষ, একথা মনে রাখলে ঈন্‌টো-নেশান বা ধ্বনিতরঙ্গের তাৎপর্য অনুভব সহজ হবে। নির্বাচিত গদ্য বা পদ্যাংশে, ঘোষধ্বনি এবং স্বরধ্বনিগুলির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে উক্তি ও উপলব্ধির অর্থাৎ বিবয়ানুগ ভাষার আভ্যন্তরীণ যোগাযোগগুলি ধরা পড়ে। বৈষ্ণব পদাবলীর বিখ্যাত পংক্তি 'চল চল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়া যায়' বিশ্লেষণে এই তথ্যগুলি আমাদের আয়ত্তে আসে—

ক. আটটি শব্দের মধ্যে চারটিতে আনুনাসিক ও নাসিক্যধ্বনি

খ. অন্তত সাতটি ঘোষধ্বনি ·

গ. অ, আ, ই, এ— এই স্বরধ্বনি ব্যবহৃত

ঘ. ল-ধ্বনির অনুপ্রাসে তরল লালিত্য

তথ্যগুলির গাণিতিক সংখ্যানুপাত ব্যতিরেকেও আরো কিছু সূক্ষ্ম পর্যালোচনা এবং মন্তব্য প্রাসঙ্গিক। 'কাঁচা' শব্দটিতে ক্‌-ধ্বনি আনুনাসিক স্বরধ্বনি আ-এর সহযোগে ঘোষধ্বনির গাম্ভীর্য অর্জন করেছে। এখানে ক্‌-এর মূল ধ্বনি ব্যবহার-বৈশিষ্ট্যে রূপান্তরিত হয়ে সহধ্বনিতে পর্যবসিত। অন্যদিকে 'অঙ্গের' শব্দে ঙ্‌+গ এই যুক্তব্যঞ্জনে ঙ্‌-এর ঘোষ উচ্চারণ আরো সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত। ফলে পুরো লাইনটিতে ঘোষধ্বনির প্রাবাহ সামগ্রিক প্রতিষ্ঠিত এবং প্রতিমাধুর্য তর্কাতীত। নাসিক্যধ্বনি ও অন্যান্য ঘোষধ্বনির সহযোগিতা সুন্দর ছোতনার জন্মদাতা। স্বরধ্বনির বিন্যাস লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে, সেখানেও বিশেষ কারিকুরি হয়েছে। স্বরধ্বনিগুলি এভাবে অবস্থিত—

অঅ + অঅ + আআ + অএঅ + আআই + অআই + আইআ + আএ

স্বরধ্বনির এই বিন্যাসক্রম যে ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টি করেছে তার ফলশ্রুতি লালিত্য

এবং কোমলতা। এই লালিত্য ও কোমলতা বর্ণিত বিষয়ের সম্পূর্ণ উপযোগী। অর্থ বস্তুমূলক, কিন্তু শব্দের লাবণ্য বস্তুর অতীত এক ভাবময় ব্যঞ্জনা, অমৃত সরসতা। কবির মনোলোকে উপমার অবিরাম আনাগোনা। বস্তুভাবনা এক উপমাস্রষ্টা অনুক্ত কলকজার মোচড়ে মূর্ত-অমূর্তকে রূপান্তরিত করে। এই প্রক্রিয়ায় শব্দের লাবণ্য সুকোমল তরল সচল বিম্বে পরিণত হয়ে আলোচ্য পংক্তিতে ধৃত। ল-ধ্বনির অনুপ্রাস এবং স্বরধ্বনির তরঙ্গিত বিন্যাস এই লাবণ্য-প্রবাহ বিরচনে সহায়তা করেছে। এই বিশ্লেষণে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, কবি-চিত্তে বিষয়ের আন্তরিক উপলব্ধি বিম্বধর্মী অর্থাৎ ভাবাশরীরে যোগ্য ধ্বনিবিন্যাস রচনা করে।

অনুরূপ সৌন্দর্যের তরল দ্যুতিময় প্রবাহ বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যরচনায় কখনো কখনো যে ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টি করে, একটিমাত্র দৃষ্টান্ত উদ্ধার ক'রে তার প্রতি অভিনিবেশ দাবী করা যাক। রোহিণীর প্রতি শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র ও নীতিবাদী বঙ্কিমচন্দ্রের স্বভাববিরুদ্ধ প্রচলিত ধারণা এবং উপসংহারে রোহিণী সম্পর্কে নীতি-বাদী লেখকের অবিচারমূলক ব্যবহারের কিংবদন্তী বড়ই প্রবল। এই কিংবদন্তীর প্রবল প্রতিবাদ রোহিণীর প্রতি লেখকের শিল্পীজনোচিত সরস দৃষ্টি। রোহিণীর সৌন্দর্য ও অনুলোকের সপ্রাণ আবেগ ও মুগ্ধতা বঙ্কিমচন্দ্র সংবেদনশীলতার সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন। সমবেদনার আন্তরিক উপলব্ধি রোহিণীর বর্ণনায় স্বাভাবিক সহযোগী ধ্বনিলীলার অবতারণা করেছে। বৈষ্ণব কবির উপরোক্ত বিষয়ের সঙ্গে বঙ্কিমের নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনার বিষয়গত অভেদ লক্ষণীয়—

> পিতলের কলসী কক্ষে, চলনের দোলনে, ধীরে ধীরে সে কলসী নাচিতেছে— যেমন তরঙ্গে তরঙ্গে হংসী নাচে, সেইরূপ ধীরে ধীরে গা দোলাইয়া কলসী নাচিতেছে। চরণ দুইখানি আস্তে আস্তে, বৃন্তচ্যুত পুষ্পের মত, মৃদু মৃদু মাটিতে পড়িতেছিল— অমনি সে রসের কলসী তালে নাচিতেছিল। হেলিয়া দুলিয়া, পালভরা জাহাজের মত, ঠমকে ঠমকে, চমকে চমকে, রোহিণী সুন্দরী সরোবর আলো করিয়া জল লইতে আসিতেছিল— এমন সময়ে বকুলের ডালে বসিয়া, বসন্তের কোকিল ডাকিল। [ কৃষ্ণকান্তের উইল। অষ্টম পরিচ্ছেদ। ]

এই অনুচ্ছেদে ল, র, নাসিক্য ( ন, ম, ঙ ) এবং উষ্ম-ধ্বনির প্রবাহ। ব্যবহৃত এই ধ্বনিগুলির পার্শিতিক হিসাব অনেকটা এরূপ—

নাসিক্য—২৯

তরল—৪৫ ( ল - ২৩, র - ২২ )

ঊষ—১৮ ( স, ষ )

নাসিক্য ধ্বনির যৌবতা এই অনুচ্ছেদে সাঙ্গীতিক ভোতনা বিস্তার করেছে। তরল স্বরের সচল ব্যঞ্জনা ঘর্ষিত সৌন্দর্যের মূলনিত প্রবাহকে গতি দিয়েছে। অনুরূপ গতিময়তা আমরা বৈষ্ণব কবির ঘর্ষিত লাবণ্যধারাতেও দেখেছি। উপরন্তু বিলম্বিত শব্দগুলির প্রয়োগনৈপুণ্য উল্লেখযোগ্য—

ধীরে ধীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে
ধীরে ধীরে
আসে আসে
মৃদু মৃদু
তালে তালে

মৃদুতাব্যঞ্জক শব্দদ্বৈতের অধিক ব্যবহারে রোহিণীর যৌবনভারানত চলনভঙ্গিমা লক্ষ্যগোচর হয়ে উঠেছে। এই শব্দগুলির আড়ালে বঙ্কিমচন্দ্রের সচেতন শিল্পভাবনা সম্পর্কে আমাদের নিশ্চিত আস্থা দ্বিধাগ্রস্ত যদিও-বা থেকে যায়, তাঁর অনুভূতির আন্তরিকতা দৃষ্টি এড়ায় না। অনুভূতির আন্তরিক আবেগবশতই অনুরূপ যোগ্য শব্দাবলীর বিন্যাস সম্ভব। অনুভূতির স্পর্শকাতর তরঙ্গপরম্পরা সুকোমল মনোজগতে সূক্ষ্ম শব্দবিন্যাসের আশ্রয় গ্রহণ করে—

চরণ দুইখানি আসে আসে, বৃক্ষচ্যুত পুষ্পের মত, মৃদু মৃদু মাটিতে পড়িতেছিল

এই অংশে চ-বর্গের অঘোষ উচ্চারণ এবং অঘোষ প ও ত বর্গের সঙ্গে যুক্ত ঊষ বর্ণ ( স, ষ ) একটি চাপা ধ্বনিপ্রবাহ রচনা করেছে। এই ধ্বনিপ্রবাহ যেন ফিসফিসিয়ে কথা বলার মত, যার ফলে বৃক্ষচ্যুত পুষ্পের প্রায়-নিঃশব্দ পতন অনুভব করা যাচ্ছে। রোহিণীর চলনভঙ্গিমার মধ্যে বহুমুখী হীরকের দ্যুতি ঝলকে উঠে বিচিত্র আলো বিকিরণ করছে। তাই—

চলনের দোলনে
হেলিয়া দুলিয়া
ঠমকে ঠমকে
চমকে চমকে

এ ধরনের ধ্বনিসচেতন শব্দবিন্যাস অনুচ্ছেদটিকে কারুকার্যমণ্ডিত ক'রে তুলেছে।

৩

রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে দুটি অনুচ্ছেদ পরীক্ষা করা যাক—

ক. রামগিরি হইতে হিমালয় পর্যন্ত প্রাচীন ভারতবর্ষের যে দীর্ঘ এক খণ্ডের মধ্য দিয়া মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা ছন্দে জীবনস্রোত প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে সেখান হইতে কেবল যথাকাল নহে, চিরকালের মতো আমরা নির্বাসিত হইয়াছি।

[ মেঘদূত ]

খ. তখন হইতে প্রাসাদের জোয়ারের মুখ হইতে গোলাপপঙ্কি জলধারা উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকিত এবং শীকরশীতল নিভৃত গৃহের মধ্যে মর্মর-খচিত স্নিগ্ধ শিলাসনে বসিয়া, কোমল নব পল্লবের ব্যজনের নির্মল জলরাশির মধ্যে প্রক্ষালিত করিয়া, তরুণী পারসিক রমণীগণ স্নানের পূর্বে কেশ মুক্ত করিয়া দিয়া, সেতার কোলে, দ্রাক্ষাবনের গজল গান করিত।

[ ছুটির পাথেয় ]

এই অনুচ্ছেদ দুটিতে 'হইতে' অব্যয় পদটির ব্যবহার লক্ষ্য করলে লেখকের বক্তব্য বিষয়ের বিন্যাস-কাঠামো পরিস্ফুট হবে। ক-অনুচ্ছেদে পদটি দু'বার এবং খ-অনুচ্ছেদে তিনবার ব্যবহৃত। খ-অনুচ্ছেদে তৃতীয় প্রয়োগটি ক্রিয়াপদ। এই অপাদান কারকগুলি স্থান, কাল এবং পাত্রের ত্রিবিধ স্তরকে অঙ্কিত করছে। এই ত্রিবিধ স্তরের যোগফল কালচেতনা। অতীত স্মৃতিচারণে মন্থর দীর্ঘ বাক্য কালের মাত্রা বাড়িয়ে শিল্পীমানসে এক অখণ্ড প্রবাহ রচনা করেছে। দুটি দৃষ্টান্তে বিষয়-বিন্যাস এভাবে—

ক

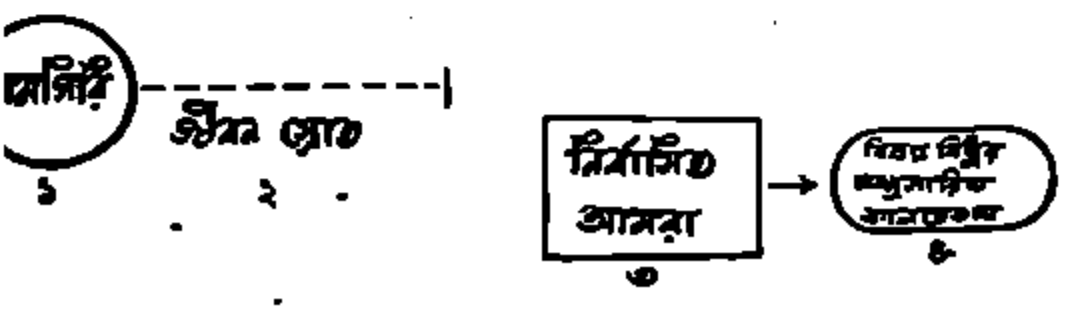

ক. ১. 'গ্রামসিথি' আক্ষরিক অর্থে বস্তুমূলক, নির্দিষ্ট ; এই নির্দিষ্টতা বৃত্তচিত্রে নির্ধারিত।

ক. ২. 'জীবন' ভাবমূলক, কিন্তু 'জীবনস্রোত' বস্তুমূলক চিত্রকল্প, নদীর প্রবাহ-স্মারক।

ক. ৩. 'নির্বাসন' অর্থাৎ বিচ্ছেদ বা বিচ্ছিন্নতা বোঝাতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে ফাঁক রাখা হয়েছে।

ক. ৪. ত্রিবিধ স্তরের যোগফল বিষয়বিধুর দন্তলালিত কালচেতনা।

খ

খ. ১ 'তখন' কালসূচক ; কাল ভাবমূলক এবং পূর্বাপর প্রবাহ-হেতু অনির্দেশ্য, কিন্তু 'তখন' শব্দে নির্দিষ্ট কাল বোঝায়, এই নির্দিষ্টতা বৃত্তে সূচিত। বৃত্তের ভিতরে বৃত্ত 'ফোয়ারা'। ফোয়ারা বস্তুমূলক এবং নির্দিষ্ট, বৃত্তচিত্রে প্রকাশিত।

খ ২. কালস্রোত এবং 'গোলাপগন্ধি জলধারা' সমান্তরাল।

খ. ৩. বৃহত্তর বৃত্ত 'শীকরশীতল গৃহ' ; তার অন্তর্বর্তী ক্ষুদ্রতর বৃত্ত 'গজল গান' সূচক।

খ. ৪. ত্রিবিধ স্তরের যোগফল সেতার ও গজলের সম্মিলিত সমধুর সংলাপ।

৪

ক-চিত্রে প্রথম দুই স্তরের সঙ্গে তৃতীয় স্তরের বিচ্ছিন্নতা আমাদের অজ্ঞাতে যদি মনে হলেও রবীন্দ্রনাথের বিবরণে তার পরিমাণ কেবল 'বর্ষাকাল' নয় 'চিরকালের মতো'। এই বিচ্ছেদ বিষয়টিকে বিষয়-বিধুর ক'রে তুলেছে ; এই বিচ্ছিন্নতার অনুষঙ্গে একটি ভাবগত সমগ্রতা ও ব্যাপ্তি সঞ্চারিত। তরল ও নাসিক্য ধ্বনির সমবায়িক বিন্যাসের ফলে যথাক্রমে প্রবহমানতা এবং সাঙ্গীতিক ব্যঞ্জনা সংযুক্ত হয়েছে। এই অনুচ্ছেদের তাৎপর্যপূর্ণ আভ্যন্তরীণ ধ্বনিবৈচিত্র্যের হিসাব এরূপ—

নাসিক্য—১৭

তরল—১৭ (র ১৩+ল ৪)

নাসিক্য ধ্বনির হ্রস্ব উচ্চারণ—৯

তরল কম্পিত ধ্বনির ( র ) হ্রস্ব উচ্চারণ—৯

কালিদাসের 'মেঘদূতম্' মন্দাক্রান্তা ছন্দের ধ্বনি-মালিন্যের প্রতি রবীন্দ্রমানসে যে তরঙ্গের সৃষ্টি করেছিল, এ অনুচ্ছেদের ধ্বনিসৌন্দর্যে তার অনুরূপ প্রভাব থাকতে পারে। মন্দাক্রান্তা ছন্দের মাত্রা বিন্যাস এরূপ—

ঔ ঔ ঢ় ন্ত | ধ্র ঁ ঁ ঘ ঁ ঁ সৈ | হৈ ঁ ঁ ঁ ঁ ঁ | ঁ ঁ ঁ ঁ ঁ

সেই দিন করে পড়েছিল অবিরল
চিরদিবসের যেন রুদ্ধ অশ্রুজল
আজি করি তোমার উদার শ্লোকরাশি।

প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তিতে নাসিক্যধ্বনির মুক্তবর্ণীয় হলন্ত উচ্চারণ দু'বার করে আছে। এবং এই তিন পংক্তিতে ছেকানুপ্রাসের মতোই ধ্বনি-সংঘর্ষ গাম্ভীর্য সৃষ্টি করেছে। এছাড়া তরল ও নাসিক্য ধ্বনির প্রাধান্য বিশেষ লক্ষণীয়।

৩. প্রতি দণ্ড দিয়ে গেছে নবীন জীবন
তোমার কাব্যের 'পরে কবি বরিষন
নবযুথিবারিধারা, করিয়া বিস্তার
নবঘনস্নিগ্ধচ্ছায়া, করিয়া সঞ্চার
নব নব প্রতিধ্বনি তরুমর্মরের,
স্তম্ভিত করি মোতোবেগ তোমার ছন্দের
মহাতরঙ্গিণীদম।

নাসিক্য ও তরলধ্বনি সমমাত্রিক ১০+১০। এবং চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম পংক্তিতে একবার ক'রে নাসিক্য ধ্বনির মুক্তবর্ণীয় হলন্ত উচ্চারণ ধ্বনিগাম্ভীর্য সৃষ্টি করেছে।

৪. এই ছন্দ মন্দ মন্দ করি উচ্চারণ
নিবেদন করেছে নিজ বিজনবেদন।
সে-সবার কণ্ঠস্বর কর্ণে আসে মম
সমুদ্রের তরঙ্গের কলধ্বনি-সম
তব কাব্য হতে।

নাসিক্য ধ্বনি সর্বাধিক ব্যবহৃত,—২০ বার। নাসিক্য ধ্বনির ব্যঞ্জনায় যে ধ্বনিতরঙ্গের উদ্ভব, তা যেন সংস্কৃত মন্দাক্রান্তা ছন্দের কাব্যপাঠের মন্দ মন্দ উচ্চারণ বহন ক'রে আনে। ভাষাশরীরে ঘোতনাময় নাসিক্য ধ্বনির অনুরণন জাগে।

এভাবে শিল্পীর আন্তরিক অনুভূতি ভাষাশরীরে— গদ্যে ও পদ্যে ধ্বনিবিন্যাসে সঞ্চারিত হয়ে এক অপরূপ মোহ বিস্তার করে।

প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের অপর একটি কবিতার অংশবিশেষ বিশ্লেষণ ক'রে কাব্যের দেহ ও আত্মার অভেদ লক্ষ্য করা যাক। তাঁর 'ভাষা ও ছন্দ'

কবিতাটির সূচনাতে দুর্বার দুর্বার আসন্ন আষাঢ়ের প্রবল আলোড়ন এবং তার সঙ্গে তুলনীয় ভাষাযান কবি বাল্মীকির আবেগ-সংরক্ত গভীর শ্লোকোচ্চারণ-মূর্তিটির অবতারণা করা হয়েছে। কবিতার বিষয়গত অনুভূতির সঙ্গে সমতা রক্ষা ক'রে ভাষাও ধ্বনিবিন্যাসে তরঙ্গিত হয়ে উঠছে—

যেদিন হিমাদ্রিমুখে নামি আসে আসন্ন আষাঢ়
মহানদ ব্রহ্মপুত্র অকস্মাৎ দুর্বার দুর্বার
দুঃসহ অন্তরবেগে তীরতরু করিয়া উন্মূল
ভাসিয়া ঘুঁচিয়া দিয়ে আপনার কূল-উপকূল,
ঘট-অরণ্যের তলে তরঙ্গের তর্জন বাজায়ে
ছিন্ন দূর্বাটির প্রায়, সেই মত বন্যানীর ঘায়ে
বক্ষ চীর ছিন্নগতি স্রোতস্বতী তমসার তীরে
অপূর্ব উদ্বেগভরে সঙ্গীহীন ভ্রমিছেন ফিরে
মহর্ষি বাল্মীকি কবি— রক্তবেগতরঙ্গিত-বুকে
গভীর জলদমন্দ্রে বারবার আবর্তিয়া মুখে
নব ছন্দ ;

এই পংক্তিগুলিতে লক্ষণীয় প্রধান ধ্বনির হিসাব অনেকটা এরূপ—

আনুনাসিক ও নাসিকাধ্বনি = ৪২

তরলধ্বনি (র + ল) ৩৮ + ৯ = ৪৭

উষ্মধ্বনি (শ, ষ, স) = ১৩

নাসিকাধ্বনির যুক্তবর্ণীয় হলন্ত উচ্চারণ = ১৪

আনুনাসিক ও নাসিকাধ্বনির প্রাধান্যের ফলে পংক্তিগুলিতে সংস্কৃতভাষার ধ্বনিসাঙ্গীর্ণ এবং তার মধ্যে এক-তৃতীয়াংশের যুক্তবর্ণীয় হলন্ত উচ্চারণ সাঙ্গীতিক দ্রুতিময়তা সঞ্চার করেছে। তরলধ্বনি ও উষ্মধ্বনির সহযোগে জলস্রোতের প্রবল তরল গতি ও উচ্ছ্বাস আলোড়িত। নববর্ষার দুর্বার জলময় প্রবাহের সঙ্গে বাল্মীকির উদাত্ত গভীর আবেগমথিত নতুন শ্লোকের আবৃত্তিধ্বনি মিলেছে। এই মিলিত ধ্বনির মূল ভাবমণ্ডল ভাষাশরীরের মৃত।

৫

ঋ-চিত্রের প্রসঙ্গে অতঃপর আসা যাক। 'ঘূর্ণিত পাষাণ' থেকে পূর্বোদ্ধৃত গদ্যাংশে ত্রিবিধ স্তরের (কাল, স্থান এবং পাত্র) যোগফল সম্মিলিত সঙ্গীতের সংরাগ। নিভৃত গৃহের গোপন অন্তরালে পারসিক সুন্দরীর সেতারবাদন ও ঘূর্ণিত গজলে সুদূর-অতীতের রহস্য পাপড়ি মেলছে। এই সঙ্গীতের ধ্বনি ও

পরিবেশের স্নিগ্ধতা যে ধ্বনিবিন্যাসের আশ্রয় অবলম্বন করেছে তা এরূপ—

নাসিক্য—২৭

ঊষ্ম—১৬

তরল—৩৮ (র = ২৫, ল = ১৩)

নাসিক্য ধ্বনির প্রাধান্য সেতার ও গজলের সঙ্গীত-ঝোতনার কারক। ঊষ্মধ্বনিতে বিশেষত, 'সেই শীকরশীতল নিভৃত গৃহের' স্নিগ্ধ গোপন অন্তরাল রচিত; এবং তরলধ্বনিতে 'গোলাপসন্ধি জলধারা'র আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

৬

সাহিত্যের মাধ্যম হিসাবে ভাষাশরীর এভাবে ধ্বনিবৈচিত্র্যে লীলায়িত হয়ে ওঠে। অবশ্য সাহিত্যের ভাষা মাত্রেই সর্বদা অনুরূপ ধ্বনি-গুণান্বিত হয়ে ওঠে না; কখনো কখনো দেহ ও আত্মার অভেদ-সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অনুপ্রাস রচনায় শিল্পীর ধ্বনিসচেতনতা লক্ষণীয় হয় বটে, তবে সর্বত্র তা যোগ্য ব্যবহারের নিশ্চায়ক নয়। ভারতচন্দ্রের কাব্যে ধ্বনিবিন্যাস যদিও-বা দেহাত্মার সার্থক অভেদ প্রদর্শন করে, ঈশ্বর গুপ্তের যমক ও অনুপ্রাস প্রায়শই পালোয়ানী বাগ্‌বিস্তার মাত্র। মাইকেল মধুসূদন অমিত্রাক্ষরে অন্ত্যমিল বা অন্ত্যানুপ্রাস বর্জন ক'রে, তার ক্ষতিপূরণ করেছিলেন আভ্যন্তরীণ অনুপ্রাস বা ধ্বনির পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে। এই প্রয়োগকৌশল প্রধানত প্রতিমার ভাবী পালনের অন্যতম শর্ত, তাই সর্বত্র দেহাত্মার অভেদসূচক নয়। কিন্তু তাঁর আন্তরিক অনুভূতি ও শিল্পসচেতন প্রতিভা বর্ণিত বিষয় ও বর্ণনার ভাষায় কখনো কখনো সার্থক সেতুবন্ধন ঘটিয়েছে। তাই শ্রীরূপের জয়লাভের বর্ণনায় নৈশ শোণনতা এবং চরাচরে চাপা আনন্দের অভিব্যক্তি ঊষ্মধ্বনির প্রবল ফিসফিসানো উচ্চারণে এভাবে ধরা পড়ে— 'হাসিলা উষালে পৃথ্বী সে শুভ নিশীথে / বিভা! শঙ্খনাদে ঘোষি ঘনিলা স্বপনে / সমীরণ;' (দ্বারকানাথের প্রতি ক্ষত্রিণী, বীরাঙ্গনা কাব্য)। অথবা সেই মহাজয়ের স্তরে যে আনন্দপ্রবাহ বর্গে বর্গে বয়ে যাচ্ছে তার ধ্বনিলৌকর্য নাসিক্যধ্বনির পুনরাবৃত্তিতে এমন সুন্দরভাবে প্রকাশ পায়—'সঙ্গীত তরঙ্গ রঙ্গে বহিল চৌদিকে!' (ঐ)। সাহিত্যের মাধ্যম ভাষার পদে পদে ধ্বনি-তরঙ্গের লঘ্যব্যবহার আমাদের ঔদাসীন্যজড়িত অমনোযোগের মধ্যেও অগোচরে অবশ্যই সবল হানা দেয়। এবং ফলত শিল্পসকল প্রকাশমাধ্যমের সাহচর্য অনুভূতির কোমল স্তর স্পর্শ করে।

# শোভাযাত্রা

কৌশিক সান্যাল

আসলে আমি কিছু কিনতে বেরিয়েছিলাম। তারপরই এই সব শুরু হল।

সারা গায়ে রোদ লাগিয়ে বড় রাস্তাটা ধরে হনহন করে এগিয়ে যেতে যেতে পাশের সরু গলিটার দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। প্রধানত দুটি কারণে অবাক হয়ে গলিটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম— এক, আমার পাড়ার এত কাছে এই অন্ধকার গলিটা এর আগে কোনদিন ছিল না, আজই যেন হঠাৎ গজিয়ে উঠেছে; দুই, গলিটার ভেতরে সন্দেহজনক অন্ধকার। গলিটার ভেতরে একটু এগিয়ে গেলাম। সরু লম্বা গলিটার ভেতর দিকটা কিছু দেখাই যাচ্ছে না। গভীর রাত্রির মত অন্ধকার। অথচ বেরিয়ে এসে দেখি বাইরের রাস্তায় সেই খাঁ খাঁ রোদ। কি আশ্চর্য! আবার গলির ভেতরের দিকে তাকালাম। ঘুটঘুটে অন্ধকার! দিন-দুপুরে হঠাৎ ওটা কোথা থেকে উড়ে এল? পথ চলতি একজনকে ডেকে গলিটার দিকে তর্জনী তুলে কিছু জিজ্ঞেস করব ভাবলাম, কিন্তু তার আগেই লোকটি আমার দিকে শুধু এক ঝলক তাকিয়েই তাড়াতাড়ি চলে গেল।

আমি আর থাকতে পারলাম না। প্রচণ্ড কৌতূহল নিয়ে সেই অচেনা গলির অন্ধকারে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম। সে গলির যেন শেষ নেই— শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। হঠাৎ বাঁদিকে একটু আলো দেখতে পেলাম। একটি বাড়ীর নীচের একটা ঘরে আলো জ্বলছে। সেই দিনের বেলা, চারিদিকের সেই জমাট অন্ধকার আর নিস্তব্ধতার মধ্যে সেই ঘর, সেই মিটমিটে আলো কেমন যেন একটা ভুতুড়ে আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল। আমি নিশ্চিত ছিলাম সে অন্ধকারে কোন মানুষ থাকতে পারে না। তবুও, যে বাড়ীর ঘরের ভেতর আলো দেখা যাচ্ছিল, আমি সেই বাড়ীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। সামনের দরজাটা খোলা, ভেতরে একটা টানা পথ, দুপাশে ঘর। আমি সেই বাড়ীর ভেতরে ঢুকে, বাঁ-হাতের একটা ঘর থেকে বহু কণ্ঠের গুণ গুণ স্বর শুনতে পেয়ে সেই ঘরে ঢুকলাম।

ঘরের মেঝের ওপর বড় বড় অনেক কাঠের সিন্দুক বসান ছিল আর এক

দিকে যেন কিছু লোক দেওয়ালের দিকে ফিরে খুব নীচু করে গুন গুন করে যেন মন্ত্র উচ্চারণ করছিল। ওদের মুখ দেখা যাচ্ছিল না। শুধু একজন প্রৌঢ় তার শীর্ণ চিন্তিত মুখ এদিকে ফিরিয়ে বসে ছিল। ওকি বুঝতে পেরেছিল আমি কিছু কিনতে বেরিয়েছি? লোকটি এগিয়ে এসে একটার পর একটা সেই পুরনো কাঠের সিন্দুকগুলো খুলে খুলে আমায় দেখাল। সবগুলোই খালি। কয়েকটার ভেতর থেকে কিছু আরশোলা হঠাৎ বেরিয়ে ঘরের মধ্যে এদিক-ওদিক উড়তে লাগল আর তখনই আমি ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম বাড়িটা অনেক পুরনো। ঘরের মধ্যে কেমন একটা স্যাঁতসেঁতে গন্ধ। প্রৌঢ় লোকটি আমায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল, "অত সস্তায় আজকাল কিছু পাওয়া যায় না।" তারপর যেন ধরে ফেলল না এই ভেবে মুখ ফিরিয়ে চলে গিয়ে, যারা গুন গুন করে সেই দুর্বোধ্য মন্ত্র উচ্চারণের মত শব্দ করছিল, তাদের দলে যোগ দিল। আমি তখন সেই ঘর থেকে বেরিয়ে সামনে আরেকটা ঘরের দরজা খোলা রয়েছে দেখে সেই ঘরে ঢুকলাম।

এ ঘরটাও পুরনো। খাট, আলমারী, আলনা ইত্যাদি আসবাবপত্র, মধ্যবিত্ত সংসারের আরও অনেক জিনিষপত্র ওঘরে এমনভাবে রয়েছে, মনে হচ্ছে যেন এই ঘরে এই মুহূর্তে অনেক লোকজন ধর সংসার করছে। ঘরে কোন লোক নেই। শুধু, ঘরের আরেকটা দরজা বন্ধ ছিল, সেই বন্ধ দরজার সামনে একটি ইজিচেয়ারে একটি মেয়ে ক্লান্ত মুখে আধশোয়া অবস্থায় বসে ছিল। মেয়েটি রোগাই ছিল। ওর চোখ দুটো খোলা ছিল কিন্তু চোখের পলক পড়ছিল না। ওর দেহ সম্পূর্ণ নড়। সারা শরীরে এক অবসন্ন ভাব নিয়ে একটা হাত তুলে মাথার তলায় রেখে ও বিশ্রাম করছিল। ঘর থেকে বেরিয়ে যাব কি না ভাবতে ভাবতে মেয়েটিকে দেখতে দেখতে বুঝতে পারলাম, মেয়েটি আসন্নপ্রসবা। আমার মনে হল, পেছনের বন্ধ দরজাটার সামনে বসে থেকে ও যেন ওদিকের একটা ঘর পাহারা দিচ্ছে। ওর চোখ খোলা ছিল বটে কিন্তু বিশেষ কোন দিকে ওর দৃষ্টি ছিল না। সত্যিই ও বেঁচে আছে কিনা নিশ্বাস পড়ছে কিনা দেখবার জন্যে আমি ওর নাকের তলায় হাত রাখলাম। নিশ্বাস পড়ছিল। দেখলাম মুখটা আসলে একটা মুখোস। মুখোসও নয়। যেন বড় একটা কৌটোর মুখের চিত্রিত এক ঢাকনি। এমন কি, কানের ওপর যেখানে যেভাবে চশমার ডাঁটি লাগান থাকে, সেইখানে সেইভাবে একটা ছিটকিনিও লাগান রয়েছে। যেন একটা দরজা— একদিকে ছিটকিনি আরেক দিকে জড়া।

আমি ছিটকিনিটা তুলে মুখের সামনের ভালাটা খুলে ফেললাম। ভেতরে কিছুই নেই। কৌটোর পেছনটাও যেন কেটে ফেলে দেওয়া হয়েছে, শুধু ভালাটা যেখানে থেকেছে, সেই জায়গাটা ফ্রেমের মত হয়ে গেছে। এতক্ষণে দরজার যে অংশ ওর মাথায় আড়ালে ছিল, ওই ফ্রেমের শূন্যতায় দিয়ে, সেই জায়গাটা, দরজার পাল্লার দুটো কড়া আমি দেখতে পেলাম। দেখলাম ও দরজায় তালা লাগান নেই। আমি তখন সেই ইজি-চেয়ারের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গিয়ে সেই বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিলাম। দরজাটা খুলে গেল। আমি ওই ঘরে ঢুকলাম।

ঘরের মাঝখানে চারজন লোক শূন্য-দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে পাশা-পাশি সোজা হয়ে পুতুলের মত অনড় অটল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমি প্রথম লোকটিকে ধরে খুব কাঁকুনি দিলাম। বন্ধ হয়ে যাওয়া ঘড়ি যেমন অনেক সময় ঝাঁকুনি খেয়ে আবার হঠাৎ চলতে সুরু করে লোকটি হঠাৎ চমকে উঠে হাতের ঘড়ির দিকে দেখে সার্টটা প্যান্টের ভেতরে ভাল করে গুঁজে নিয়ে খুব তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেল। আমি দ্বিতীয় লোকটিকে ধরে কাঁকুনি দিলাম, অমনি লোকটি পকেট থেকে একটা ছোট চিরুনী বার করে মাথার চুল ঠিক করে নিয়ে, রুমালে মুখ মুছে খুব তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেল। আমি তৃতীয় লোকটিকে ধরে ঝাঁকুনি দিলাম। অমনি লোকটি কোঁচানো পাঞ্জাবীর বাঁ পকেটে হাত দিয়ে ডান পকেট থেকে সিগারেট আর দেশলাই বের করে সিগারেট ধরাতে ধরাতে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। চতুর্থ লোকটিকে আমি চিনতে পারলাম। নকুলেশ্বরবাবু। বেশ বুড়ো হয়ে গেছেন। মুখে কাঁচা পাকা দাড়ি। আমি ওঁকে ধরে কাঁকুনি দিতেই উনি তাড়াতাড়ি পকেট থেকে চশমা বার করে কাঁচটা মুছে পরে ফেললেন। তারপর ধুতিটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে, ছাতাটা ঘরের কোণে ছিল, সেটা তাড়াতাড়ি হাতে নিয়ে হনহন করে বেরিয়ে গেলেন। আমার মনে পড়ল নকুলেশ্বরবাবু অনেকদিন আগে আমার কাছ থেকে পনের টাকা ধার নিয়েছিলেন। আমি তাড়াতাড়ি নকুলবাবুর পেছনে পেছনে ছুটলাম। নকুলবাবু আর বাকী তিনজন ছুটতে ছুটতে রাস্তায় বেরিয়ে একটা ট্রামে উঠে অফিস চলে গেলেন। আমি পেছনে পড়ে রইলাম। হঠাৎ দেখি সেই মেয়েটি, যাকে একটু আগে ইজি-চেয়ারে আধশোয়া দেখে এলাম, সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা ছুটতে ছুটতে গলি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় আসছে। আমি তাড়াতাড়ি চীৎকার করে উঠলাম "থামো, থামো,

এভাবে কেউ রাস্তায় বেরোয় না! তাছাড়া এই অবস্থায় বেশী দৌড়ঝাঁপ করা একেবারেই উচিত নয়!" কিন্তু কে শোনে কার কথা। দরজায় বাহুড়-ঝোলা লোকজন নিয়ে একটা বাস দাঁড়িয়ে ছিল। মেয়েটি দৌড়তে দৌড়তে সেই চলন্ত বাসে উঠে ভেতরে সেঁধিয়ে গেল। "শাড়ী পরে থাকলে ওভাবে উঠতে পারত না" এই নিরিখ মনস্থ করে ফিরে তাকিয়ে দেখি, রাস্তায় সবাই ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে, কিন্তু তাদের কেমন যেন নিস্পৃহ আর উদাসীন ভাব। শুধু মহিলারা সেই মুহূর্তে তাঁদের দিকে কেউ আর ফিরে তাকাচ্ছে না এই কারণে একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। সকলের চোখের সামনে এই ধরনের একটা ঘটনা ঘটে যাওয়া আমার কাছে এত অসম্ভব আর অস্বাভাবিক বলে মনে হল যে আমি, পাশে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাঁর দুটি বাচ্চা নাতনীকে ইস্কুলে পৌঁছে দিতে যাচ্ছিলেন, তাঁকেই জিজ্ঞেস করে বসলাম, "ব্যাপারটা কি বলুন ত?" তিনি সঙ্গে সঙ্গে বিস্তর শাস্ত্রজ্ঞ আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, "যন্নাবগচ্ছন্ শরুখ, তদ্ মা ভাষিচাঃ"। ওঁর সঙ্গের একটি বাচ্চা বলে উঠল, "দাদু, আমার একটা পেন্সিল কিনতে হবে।" ওঁরা চলে গেল। ওইখানে দাঁড়িয়ে ট্রামে বাসের ভীড় দেখতে দেখতে আমার মনে পড়ল আমাকেও কাজে যেতে হবে। সেই সময় সেখানে ভেতরে, বাইরে, গা-ভর্তি মানুষ নিয়ে একটা ট্রাম এসে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ কোথা থেকে যেন অনেক লোক ছুটে এসে ট্রামে উঠবার জন্যে তীরবেগে দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চীৎকার করতে লাগল, "এগিয়ে চলুন, এগিয়ে চলুন।" ভেতর থেকে সমস্বরে চীৎকার শোনা গেল, "আমরা ত এগিয়ে যেতেই চাই, কিন্তু পারছিনা।" পরে একটু ফাঁকা গাড়ী এলে ওঠা যাবে এই ভেবে আমি চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

কিছুক্ষণ পরে পেছনে কান্নাকাটি আর চিৎকার শুনে চোখ খুলে পেছন ফিরে দেখি একটা বন্ধ দোকানের দরজার সামনের সিঁড়িতে বসে একটি লোক হাউ-মাউ করে কাঁদছে আর বলছে, "আমি যাব না, আমি যাব না।" তার পরণে ময়লা কাপড় আর গেঞ্জি। চুল রুক্ষ। সামনে দুটো ছোট ছেলে মাঝে মাঝে ওর হাত ধরে টানাটানি করছে আর গলায় ত্রাস-কান্না-লজ্জা মিশিয়ে বলছে, "চলনা বাবা, চলনা।" আমায় অবাক হয়ে যেতে দেখে আমার পাশে হাফ-হাতা খাকী সার্ট আর নীল লুঙ্গি পরা একটি লোক বিড়িতে টান দিতে দিতে আমায় বলল, "ও হচ্ছে গোবিন্দ পাগলা। মাঝে মাঝে বাড়িতে থাকে আবার পালিয়ে যায়। বেশ করে তিন চার দিন বাড়ীর বাইরে পড়ে থাকে। ওই যে ওর বৌ।

এ বাড়ী ও বাড়ী কাজ করে সংসার চালায়।" আমি ওর নির্দেশ মত তাকিয়ে দেখলাম একটু দূরে রোগা অল্প বয়েসী একটি বৌ ময়লা লালপাড় সাদা শাড়ী সর্বাঙ্গে জড়িয়ে এই ঘটনার জন্য নিজেকে দায়ী মনে করে লজ্জিত বিব্রত বোধ করে জড়ো সড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে অস্ফুট স্বরে ছেলেদের উদ্দেশ্যে বলছে, "হাত ধরে টেনে আন না।" আঁচলটা মুখের ওপর দিয়ে টানা ছিল, শুধু পায়ের পাতা আর কপাল থেকে নাক পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল। ছেলে দুটো দুজনে দুহাত ধরে বাবাকে প্রায় টেনে তুলেছে সেই সময়ে গোবিন্দ হাত দুটো ছাড়িয়ে নিয়ে আবার চিৎকার করে উঠল, "আমায় ছেড়ে দে, আমি যাব না।" আমি তাড়াতাড়ি চোখ বন্ধ করলাম।

অনেকক্ষণ পরে যখন চোখ খুললাম, দেখলাম রাস্তা আর ফুটপাত ধরে অনেক লোক হেঁটে চলেছে। ট্রাম, বাস, সমস্ত গাড়ী বন্ধ হয়ে গেছে। দলে দলে নিঃশব্দে সবাই হেঁটে চলেছে। আমিও হাঁটতে শুরু করলাম। ক্রমশই লোক বাড়ছে। আমি যেন এক জনস্রোতে গা ভাসিয়ে চলেছি। ঐভাবে এগিয়ে যেতে যেতে ভীড়ের মধ্যে হঠাৎ আমার এক বন্ধুকে দেখতে পেয়ে জিগ্যেস করলাম, "কি ব্যাপার কোথায় যাচ্ছ?" "I am proud of being in the crowd," এই বলে বন্ধু এগিয়ে চলল। আমিও আর কথা না বলে সেই নিঃশব্দ মিছিলের সঙ্গে এগিয়ে চললাম। কিন্তু ভীড় এত বাড়তে লাগল যে মনে হল এভাবে আর এক পাও এগোন যাবে না। সত্যি চাপাচাপিতে আমার দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। বাঁদিকে একটা ফাঁকা রাস্তা দেখতে পেয়ে সেই দিকেই যাব কিনা ভাবতেই দেখি সেই ফাঁকা রাস্তা থেকে একজন আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ভীড় থেকে বেরিয়ে লোকটির কাছে এসে দাঁড়াতে ও আমায় বলল, "আমার সঙ্গে আসুন। এদিক দিয়ে গেলে অনেক সর্টকাট হবে।" এই বলে লোকটি জোরে জোরে পা ফেলে এগিয়ে গেল আর আমি প্রায় দৌড়তে দৌড়তে তার পিছু পিছু চললাম। কিছুদূর গিয়ে আমার সঙ্গী একটা বন্ধ উঁচু বাড়ীর সামনে একটু দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে আমার দিকে একবার তাকিয়েই বাড়ীটার ভেতর ঢুকে গেল। আমিও পাছে আমার সঙ্গীকে হারিয়ে ফেলি এই ভয়ে সেই বাড়ীর ভেতরে ঢুকে গেলাম। ভেতরে ঢুকে, যা ভয় করেছিলাম তাই, আমার সঙ্গীকে আর দেখতে পেলাম না। পাশের একটা ঘরে উঁকি দিয়ে দেখলাম। সমস্ত জানলা বন্ধ করা। ঘরটাকে প্রায় অন্ধকার করে ছ-সাতটি ছেলে মেয়ে খেলা করছিল। আমায় দেখে ওরা প্রথমে নিজেদের

মধ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি তারপর মুখ টিপে হাসতে শুরু করল। ওদের মধ্যে থেকে একজন হঠাৎ বলে উঠল, "হাদার মত বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? আপনিও আসুন।" আমি প্রথমে 'কি কাণ্ডিল ছেলে-মেয়েরে বাবা' ও পরে 'শিশুদের আমার কাছে আসিতে দাও, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই' এই কথা-গুলি বিড়বিড় করে বলতে বলতে ঘরের ভেতরে ঢুকলাম।

ওদের খেলাটা বোঝবার আগেই, ওরা একজনকে ঘরের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে আমায় বলল, "এর চোখ টিপে ধরুন। শক্ত করে,— যেন দেখতে না পায়।" আমি পেছন থেকে ছেলেটির চোখ টিপে ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম। বাকী ছেলেমেয়েরা তখন তাড়াতাড়ি ঘরের নানান জায়গা থেকে বাক্স-প্যাটরা খুলে, জাকাতের মত জিনিষপত্র হাতড়ে হাতড়ে, পয়সাও যতে পারে অল্প কিছুও হতে পারে, কি সব নিজেদের পকেটে পুরতে লাগল। একটি মেয়ে আমার কাছে এসে আমার জামার পকেটেও কি সব ভরে দিল। আমি হেসে বললাম, "কি? ঘুষ?" আমার কথা শুনে ওরা খুব ভয় পেয়ে গেল। আমি তখন ছেলেটির চোখের উপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়েছি। ছেলেমেয়েরা সবাই চুপ করে খুব গম্ভীর হয়ে আমায় লক্ষ্য করতে লাগল, যেন ওরা আমার বিচার করবে। আমার হাসি পেল। যে মেয়েটি আমায় ঘুষ দিয়েছিল ওই দলের পাণ্ডা বলে মনে হল, বলল, "আপনি সরুন এবার আপনার চোখ টিপে ধরা হবে।" আমি বলতে যাচ্ছিলাম, "ঠিক আছে আমি নিজেই চোখ বন্ধ করে আছি, তোমরা যা খুশী তাই করতে পার," কিন্তু তার আগেই বাইরে খুব হৈ-চৈ আর বাজনার শব্দ শোনা গেল। অমনি ছেলেমেয়েগুলো "প্রসেশান যাচ্ছে, প্রসেশান যাচ্ছে" এই বলে হল্লা করতে করতে বেরিয়ে গেল। বন্ধ জানলার কপাটে কয়েকটা ফাটল দেখতে পেয়ে আমি তার ভেতর দিয়ে বাইরের প্রসেশান দেখবার চেষ্টা করলাম।

জানলার কাছেই রাস্তায় কিছু একটা হচ্ছে মনে হল। অনেক রকমের বাজনা বাজছে। জানালার ঐ ফাটল দিয়ে ভাল করে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কালো রঙের কি একটা জিনিষ আমার দৃষ্টি পথটা আটকে রেখেছে। কালো জিনিষটা নড়ল। একটু সরে গেল। কালো একটু আলো দেখা গেল। প্রসেশানের আলো। কালো জিনিষটা নড়ছে। তালে তালে নড়ছে। সেই ফাঁকে ফাঁকে একটু আলো দেখা যাচ্ছে। বাজনার তালে তালে কালো জিনিষটা নাচছে, এগিয়ে আসছে, পিছিয়ে যাচ্ছে, ডান দিকে যাচ্ছে, বাঁদিকে যাচ্ছে,

তারই মাঝে মাঝে আলো দেখা যাচ্ছে। প্রসেশান একটু এগোতেই কালো জিনিষটা আরও একটু ঘুরে সরে গেল। এবার অনেক কিছু দেখতে পেলাম। আসলে ওটা একটা কালো প্যান্ট। নাচছে। অনেকটা দেখা যাচ্ছে— পিঠ, কোমর, উরু, বাজনার তালে তালে নড়ছে দুলছে, ভয়ঙ্কর ভাবে কাঁপছে। হাতের খানিকটা দেখা গেল। মাথে বড় ঝুমঝুমি। ঝুমঝুমি তালে তালে উঠছে নামছে। ঝুমঝুমি, হাত, পিঠ, কোমর, উরু বাজনার উদ্দাম তালে তালে নাচছে, এগিয়ে আসছে, পিছিয়ে যাচ্ছে, ডানদিকে যাচ্ছে, বাঁদিকে যাচ্ছে। বীভৎস উল্লাস ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। প্রসেশান এগিয়ে যাচ্ছে। ঝুমঝুমি উঠছে নামছে। তারই ফাঁকে ফাঁকে প্রতিমার মুখ দেখা যাচ্ছে। একবার দেখা যাচ্ছে। একবার দেখা যাচ্ছে না। এবার বড় ঝুমঝুমি। এবার প্রতিমার মুখ। টানাটানা দুটি চোখ, কপালের ওপর আরেকটি। আবার ঝুমঝুমি।

হঠাৎ কাঁধে হাত পড়ায় চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখি আমার সঙ্গী ফিরে এসেছে। সঙ্গী বলল, "কোথায় ছিলে এতক্ষণ?" আমি বললাম, "প্রসেশান দেখছিলাম।"

ও বলল, "এখন আবার কিসের প্রসেশান?"

আমি বললাম, "বিসর্জনের।"

ও বলল, "এখন আবার কিসের বিসর্জন?"

আমি বললাম, "কিছু একটা বিসর্জন দিতে যাচ্ছে বলেই তো মনে হল।"

"অনেক দেরী হয়ে গেছে, চল" বলে আমার সঙ্গী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ঐ বাড়ীর সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। পেছনে আমি। উঠছি তো উঠছিই। সিঁড়ির আর শেষ নেই। অনেকক্ষণ ধরে ওঠবার পর আমরা একটা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

বারান্দার ধারে এগিয়ে গিয়ে আমি সামনের বড় বড় আকাশ-ছোঁয়া বাড়ী-গুলো দেখছিলাম। উঁচু তলার জানলাগুলো সামনাসামনি দেখা যাচ্ছিল। আধুনিক ধরনের বড় বড় কাঁচের জানলা বিভিন্ন রং-এর পর্দায় ঢাকা। লাল, সবুজ, নরদা রং— বার তলার জানলা, দশ তলার, আট তলার— একই ধরনের জানলা, সাত তলার, ছ'তলার, পাঁচ তলার— কয়েকটা জানলা খোলা — চার তলার, কংক্রীটের খোপে খোপে একই ধরনের জানলা— তিন তলার, দু-তলার, এক তলার জানলা। সামনেই ফুটপাতে কম চুল ময়লা ছেঁড়া পোষাক পরা কয়েকজন, অন্য সময় হয়ত রাস্তায় ময়লা কাগজ কুড়োয়, রাত্রে ঐ

খানেই শুয়ে থাকে, বসে বসে ঘুমে। খেলছে আর একটু দূরে একটা বিকলাঙ্গ ভিখিরি চিৎকার করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে। তার দিকে না তাকিয়েই, দলে দলে লোক পাশের আরেকটা বড় বাড়ীতে ঢুকছিল। সেই বাড়ীর বড় গেটের পাশে উর্দী পরা মোটাসোটা দারোয়ানটা হাই তুলতে তুলতে কোন্ জগতের কথা ভাবছে কে জানে! বড় দরজার ওপর মস্ত কংক্রীটের চাতাল সামনে এগিয়ে এসে রাস্তার খানিকটাও ছেয়ে ফেলেছে। আমার চোখ জানলা বেয়ে বেয়ে আবার ওপরে উঠছে। দোতলার জানলা, বিস্তৃত কাঁচ, পর্দা নেই। দু'জন লোক জানলার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে দেখা যাচ্ছে। তিন তলার জানলার কাঁচ বন্ধ, রঙীন পর্দা, জানলার নীচেই এয়ার কণ্ডিশনিং-এর বাক্স। চারতলার জানলা, পাঁচ তলার, ছ'তলার, সাত তলার, আট তলার— সব জানলারই কাঁচ বন্ধ, রঙীন পর্দা, জানলার নীচেই এয়ার কণ্ডিশনিং-এর বাক্স। ন'তলার জানলার পর্দাটা দেখতে পাচ্ছি। একটি মেয়ের হাত পর্দাটা সরিয়ে দিল, লম্বা-লম্বা আঙুল, নখে লাল রং-এর পালিশ আর একটি হাত আবার পর্দাটা টেনে দিল, হাতে আঙুলের ফাঁকে সিগারেট, দশ তলার জানলা আমার সামনেই। কাঁচ বন্ধ। কাল রং-এর পর্দা। কাঁচের ওপর বারান্দার ছবিকে দেখা যাচ্ছে। আমরাই। আমাদেরই প্রতিচ্ছবি। তারও ওপরে এগার, বার, ষোল, আঠার তলার জানলা। বাইশ তলা, আঠাশ তলা— আমার সঙ্গী সেই সময় আমায় বলল, "একটা গল্প শুনবেন?" এই বলে পকেট থেকে একটা মোটা পাণ্ডুলিপি বার করল।

আমি বললাম, "এই জন্যেই কি আমায় এখানে ডেকে এনেছেন?"

ও বলল, "ঐ বাড়ীগুলোর গল্প। খুবই করুণ।"

আমি বললাম, "তাই নাকি?"

ও বলল, "দেখছেন না, ঐ জানলায় আমাদের দুজনের ছায়া দেখা যাচ্ছে। ঠিক যেন ছুটো জানোয়ার।" আচ্ছা এক পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে— এই ভেবে আমি তখনই বারান্দা থেকে সরে আবার সেই সিঁড়িতে এসে তাড়াতাড়ি আরও ওপরে উঠতে লাগলাম। আরও অনেক উঁচুতে উঠে দেখি সিঁড়ির শেষে আর একটা বারান্দা।

বারান্দা থেকে দেখলাম, সেই বড় বড় বাড়ীগুলো এখন অনেক নীচে কুয়াশা আর ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে আছে। এখানে চারপাশে শুধু মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। কিছু কিছু মেঘ আমায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে আদর করে চলে যেতে লাগল।

আকাশের ক্রমশ সামনে, পেছনে, ডাইনে, বাঁয়ে, ওপরে, নীচে চারিদিকে মেঘ আমায় একেবারে ঘিরে ফেলল। চারিদিকে শুধু মেঘ আর মেঘ। কতক্ষণ এ রকম অবস্থা ছিল জানি না। বোধহয় আমি সেই মেঘের সঙ্গে ভাসতে ভাসতে অনেকটা পথ চলে গিয়েছিলাম, কারণ হঠাৎ নীচের দিকে তাকিয়ে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে অনেক নীচে সবুজ মাঠ, গাছপালা, গ্রাম, নদী এই সব দেখতে পেলাম। কালিদাসের মেঘদূতের কথা মনে পড়ল। তারপরেই আমি সেই সবুজ মাঠ-ঘাটের আকর্ষণে উড়ার মত সোঁ করে মাটির দিকে নামতে লাগলাম। আমি যেন কোন অদৃশ্য প্যারাশুটের সাহায্যে একেবারে একটা ক্ষেতের মাঝখানে গিয়ে নামলাম।

তখন বোধ হয় ফসল কাটা হয়ে গেছে। এবড়ো খেবড়ো শুকনো মাটির ওপর এদিক ওদিক খড়কুটো ছড়িয়ে আছে। সাবধানে পা ফেলে ফেলে আমি এগিয়ে যাচ্ছি এমন সময় শুনলাম, একটি লোক আলের ওপর বসে ছিল, আমায় ডেকে বলছে, "আলের ওপর দিয়ে যান সুবিধে হবে।" আমি ওকে ধন্যবাদ জানালাম না বটে, তবু নিজের চলার সুবিধের জন্যেই আলের ওপর দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম আর এইভাবে ক্ষেত পেরিয়ে এক গ্রামের ভেতরে এসে পৌঁছলাম।

জায়গাটা আমার খুব চেনা চেনা লাগল। ঐ ত রাস্তার ধারে কিছু কিছু শুকনো ঘাস আর তার পাশেই সবুজ ঘাস, ছোট ছোট ঝোপ, কিছু মাটির ঢিবি, হঠাৎ খাড়া নেমে গেছে একটা ছোট ডোবার ধারে। এত খাড়া যে শুধু গরু, বাছুর, আর ছাগলেই সেই পথে নেমে গিয়ে সেই দুর্গন্ধ ডোবার ধারের দুষ্প্রাপ্য বড় বড় ঘাসে মুখ দিতে পারে, তবু একটা ছোট ছেলে কঞ্চি হাতে অনায়াসে সেই পথে নেমে গেল। একটু এগিয়ে যেতেই সেই ছোট চায়ের দোকানটা দেখা গেল। চায়ের দোকানও বলা যায় পান-সিগারেটের দোকানও বলা যায়। এবার মনে পড়ল অনেক আগে পিকনিক করতে এসেছিলাম। দোকানদার কি এখনও আমায় মনে রেখেছে? দোকানের কাছে এগিয়ে গেলাম। বাইরে যে বেঞ্চিটা অনন্তকাল ধরে পাতা রয়েছে তার ওপরে বসে এক বৃদ্ধ চা খাচ্ছে। ওখানে দাঁড়িয়ে আমার ফেলে আসা দিনগুলোর কথা এক এক করে মনে পড়তে লাগল। ভাবলাম, যে পথ বাড়িয়ে এসেছি, সেই পথ যদি আমার পায়ের ছাপগুলো এখনও ধরে রাখত তাহলে আমার বড় সুবিধে হত। "এখন বৃষ্টি পড়লে আর লাভটা কি?" আকাশের দিকে তাকিয়ে বলা

কুঞ্চের এই কথায় আমি আবার সম্বিৎ ফিরে পেলাম। যে লোকটা চা তৈরী করছিল তার কাছে এগিয়ে গিয়ে ছেলে জিগ্যেস করলাম, "চিনতে পারছ?" লোকটি ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তাই তাড়াতাড়ি ওর মনে পড়ার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্যে আমি বললাম, "এখানে একটা ব্যাগ রেখে গিয়েছিলাম। মনে নেই?" এবার লোকটা একটু মুচকি হেসে বলল, "আপনার সঙ্গে একটি মেয়েলোক ছিল না?" কিছু না ভেবেই আমি বললাম, "হাঁ"। লোকটি তখন হাত বাড়িয়ে একটা কাঁধে ঝোলান কাপড়ের ব্যাগ বার করে আমার হাতে তুলে দিল। এ আবার কি? সেই ব্যাগ কি এখনও এখানে পড়ে রয়েছে? অথচ ব্যাগটা বেশ নতুন! কে জানে হয়ত ছোটবেলায় পড়া সেই বৈজ্ঞানিক অ্যাডভেঞ্চারের গল্পের মত লোকটা আমায় অতীতের পথে ঠেলে দিল এই ভেবে আমি ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে আবার সেই গ্রামের পথে বেরিয়ে পড়লাম আর পথের ওপর কোথাও আমার পায়ের ছাপ তখনও পড়ে আছে কিনা খুঁজতে লাগলাম।

এইভাবে আমি একটা ছোট পুকুরের ধারে এসে দাঁড়ালাম। এক বৃদ্ধা পুকুরের ধারে বাসন মাজছিলেন—আমায় দেখে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে লম্বা ঘোমটা টেনে বাসনগুলো তুলে নিয়ে মুখ নীচু করে আমার পাশ দিয়ে চলে গেলেন। আমি অনিমিষ তাবে আশে পাশে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে পুকুরের ধারে গিয়ে বললাম। সামনে একটা বড় বটগাছ ডালপালা আর ঝুরি নামিয়ে পুকুরটাকে ছুঁই-ছুঁই করছে। হঠাৎ পেছনে একটু দূরে, "চন্দ্রিমা, কোথায় গেলে?" ও পেছনে বেশ কাছাকাছি; "এই ত এখানে, এ দিকে আসুন" শুনে পেছনে তাকালাম। পেছনে বেশ কাছাকাছি একটি মেয়ে দাঁড়িয়েছিল। ছেলেটিও তাক শুনে ওর কাছে এগিয়ে এল। "জায়গাটা সত্যিই অপূর্ব। আসুন একটু বসা যাক" মেয়েটি এই কথা বলার পর ওরা দুজনে, একটু আগে যেখানে সেই বৃদ্ধা এঁটো বাসনগুলো রেখেছিল প্রায় সেই জায়গার ওপর, বসে পড়তে যাচ্ছে দেখে আমি বলে উঠলাম, "ওখানে বসবেন না, জায়গাটা নোংরা।" ওরা আমায় দেখতে পেল। অবাক হয়ে আমায় অনেকক্ষণ ধরে দেখল তারপর চলে গেল। যাওয়ার সময় মেয়েটি বারবার পেছন ফিরে আমার দিকে, বিশেষ করে আমার কাঁধে ঝোলান ব্যাগটির দিকে তাকাচ্ছিল।

এ কার ঘোট বয়ে বেড়াচ্ছি এই ভেবে আমি ব্যাগটা কাঁধ থেকে নামিয়ে

ভেতরে কি আছে দেখলাম। ছবি আঁকার খাতা, রং, তুলি ইত্যাদি যাবতীয় সরঞ্জাম। খাতাটা খুললাম। খাতার মালিকের নাম চন্দ্রিমা সেনগুপ্ত। আর্ট কলেজের ছাত্রী। পাতায় পর পাতায় জল রং-এ আঁকা সুন্দর সুন্দর দৃশ্যাবলী। সবশেষে একটি অসমাপ্ত ছবি। একটি ছোট পুকুরের ছবি। পুকুরের ধারে একটা বড় বটগাছ, ডালপালা আর ঝুরি নামিয়ে পুকুরটাকে ছুঁই ছুঁই করছে। এই পুকুরটারই ছবি। আমি মিলিয়ে নিলাম। জলটা এখনও পুরো আঁকা হয়নি। আকাশের নীল রং জলের ওপর পড়ে তাই জলের রং নীল, তাই আমি খাপ থেকে একটা লাল-নীল পেন্সিল বের করে জলের ওপরে তরে তরে খুব আলতো করে নীল রং লাগাচ্ছি আর তাই দেখে একটি মোক সাইকেল চেপে রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে গাড়ী থামিয়ে একটু এগিয়ে এসে এক গাল কৃতজ্ঞতার হাসি হেসে জিগ্যেস করল, "আমাদের পুকুরটা আঁকছেন বুঝি?" তারপর আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে চোখে মুখে কিছুটা কৌতুক অথচ গর্বিত ভাব ফুটিয়ে তুলে পুকুরটার চারিদিক এক নজরে দেখে নিয়ে আবার সাইকেল চেপে পথ দিয়ে চলে গেল। ইতিমধ্যে অর্ধ-উলঙ্গ কয়েকটি ছোট ছেলেমেয়ে জলের ছবি আঁকা হয়ে যাবে এই ভেবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টায় পুকুরের উল্টো দিকের পাড়ে আসলে আমরা এমনিই ঘুরে বেড়াচ্ছি এই রকম ভাব করে চলাফেরা করতে লাগল। শেষে ক্লান্ত হয়ে ওরা আমার কাছে এগিয়ে এসে পেছন থেকে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে যখন দেখল আমি শুধু জলটাই আঁকছি তখন ওরা একে একে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কাটতে লাগল, আর আমি লাল-নীল পেন্সিল হাতে কিছুতেই জলের ছবি আঁকতে পারব না এই ভেবে মনের দুঃখে খাতাটা বন্ধ করে রেখে দিলাম। এরপর ক্রমশ চারিদিকে এমন অন্ধকার নামতে শুরু হল যে মনে হল যেন সন্ধ্যে উতরে রাত হয়ে আসছে। এবার বাড়ী ফিরে যেতে হবে মনে পড়তেই সেই অন্ধকার পথে পা বাড়িয়ে পথ হারিয়ে ফেললাম। যদি তখন রাতও হয়, সে রাতের আকাশে চাঁদ ছিল না। আমি অন্ধের মত এগোতে গিয়ে বারবার ছোট ছোট ঝোপ আর খেজুর গাছ খেয়ে ফিরে ফিরে অন্যদিকে চললাম, এইভাবে অনেক জঙ্গল, মাঠ আর খেত পেরিয়ে গ্রামের সীমায় একটি রাস্তার ধারে এসে পৌঁছলাম।

সে রাস্তার উত্তর, দক্ষিণ, পুব, পশ্চিম, কোথা থেকে এসেছে, কোথায় গেছে কিছুই না জানায় মনে সেখানে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। পেছন থেকে

একটি ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসছে। কাছাকাছি এগিয়ে এলে দেখা গেল সে একজন মানুষ, হাতে একটা পোটলা। সে আমায় জিগ্যেস করল, "আপনি কি বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন?" আমি নীরব। ক্রমশ সেখানে আরও কিছু লোক জড়ো হল। একজন জিগ্যেস করল, "আপনি কোথায় যাবেন?" আমি আর চুপ করে থাকতে না পেরে অত্যন্ত অস্বাভাবিক এক প্রশ্ন, "আমি কোথায় এসেছি?" প্রায় নাটকীয় ঢংএ বলে ফেললাম। ওরা ঘটনা করে নিজেদের মধ্যে কি সব বলাবলি করল। অন্ধকারের মধ্যে থেকে একটি লোক সাইকেল চেপে আত্মপ্রকাশ করছিল এমন সময় ওদের মধ্যে একজন তার কাছে এগিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে কি বলতেই সে আবার সাইকেল নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। ওদের উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে, ওরা যদি খবরের কাগজ পড়ে থাকে আর সেই অস্বাভাবিক ঘটনাটা যদি কাগজে বেরিয়ে থাকে তাহলে ওরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে আমি কোথা থেকে এসেছি এই ভরসায় আমি ওদের বললাম, "সেই যে একটি সন্তান-সম্ভবা মেয়ে চলন্ত বাসে উঠে পড়ল!" কিন্তু ওদের হাবভাব থেকে বুঝলাম হয় ওরা খবরের কাগজ পড়ে না নয়ত ঘটনাটা কাগজে বেরোয়নি। আমি তখন খুবই অপ্রস্তুত হয়ে বলে ফেললাম, "হয়ত মেয়েটি হাসপাতালে আছে, একটা সুন্দর ফুটফুটে বাচ্চাকে আদর করছে। তাছাড়া নকুলেশ্বর বাবুর সঙ্গেও আমার দেখা করতে হবে। বিশেষ দরকার।" ওরা কি বুঝল, কে জানে। একটু পরেই সাইকেলে চেপে সেই লোকটি অন্ধকারের ভেতর থেকে আবার আত্মপ্রকাশ করল, ফিস্‌ফিস্ করে ওদের কি সব বলল। ওরা এখন আমার কাছে এগিয়ে এসে সবাই মিলে এক এক করে বলল, "লাষ্ট ট্রেন চলে গেছে।"

"তার পরেও আজ একটা স্পেশাল ট্রেন ছিল, মুহূর্মু এই মাত্র খবর নিয়ে এল সেটাও চলে গেছে।"

"লাষ্ট বাস চলে গেছে, আবার কাল ভোরে ফার্স্ট বাসটা ধরতে পারেন।"

"মাঝে মাঝে অনেক রাতে দুয়েকটা লরী এই রাস্তা দিয়ে যায় বটে, তবে সেগুলো বড় একটা থামে না।"

তারপর আবার ওরা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল আর আমি কোন না কোন সময়ে নিশ্চয়ই সকাল হবে এই আশা নিয়ে সেই অন্ধকার লাম্পের থামে একেবারে একা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

# কালের নিসর্গ দৃশ্যাবলী

[ একটি দীর্ঘ কবিতার অংশ ]

কৃষ্ণ ধর

১.

সৌম্যেন্দুকে মনে আছে ? বেণ্ডসরাইয়ের ?
বেহালের লোক ধলে খালি গ্যাপাচুয়,
নিটোল নীরব'ধুরা
ভালোমন্দ কিছুতেই ছিল না প্রখর।
শুধু ছিল দুইটি মায়াবী চোখ
আর কণ্ঠস্বর।
কলেজ ষ্ট্রিটের মোড়ে সৌম্যেন্দুর গুলী-বিদ্ধ দেহ
দেখেছি আছড়ে পড়তে,
তাতা ঘুনে ভেসেছিল আমাদের শহরের পথ।
চালবাজি-করা আর সকলকে ফাঁকি দিয়ে
সৌম্যেন্দুই শহীদ হয়েছিল।
হাততালি প্রয়োজন নেই, দরকার নেই তাদের
অনেক শুনেছি কথা, বিশেষণ শোনা গেছে ঢের
সৌম্যেন্দু সেনের মা আজ বেঁচে আছে,
আমাদের সকলের হয়ে
সব জ্বালা কাঁদছেন তিনি।

২.

বিছিবিছি কেন মনে করা ?
এই সব বিস্মরণই ভালো
কী দরকার স্মৃতি দিয়ে, অতীতের ক্ষত
ক্রমশ বাড়তে থাকে, তার চেয়ে ভালো
শুধু অন্ধকারে শুভ্রদন্ত প্রেমিকের চাতুর্য চমকে।

৩.

ও কথা বলো না তুমি, অকৃতজ্ঞ নই আমি কেনো
অপঘাত মৃত্যু থেকে পরিত্রাণ পুজেছে সবাই
এত রক্ত তবু ছিল বাংলার কোমল শরীরে
এপারে ওপারে ?
কিছুই ভুলিনি, স্মৃতি চোরাবালি নয়।

৪.

অস্তিত্বেই সীমাবদ্ধ, বিচ্ছিন্নতা ক্রমে পাড় হয়
কালের যাত্রার ধ্বনি, উষাও সমর
চলে যাই দিল্লি মেলে, ডেকান দুরন্তে
মুখর ম্যাটফর্ম ছেড়ে ঊর্ধ্বশ্বাস ট্রেন
( বনলতা, কোথা তুমি, চারিদিকে সফেন সাগর )
চঞ্চল বুদ্ধাবলী, অজানার সমুদ্র পর্যন্ত
ছুটে যেতে চেউ গোণা শরতের ট্যুরিস্টদেরই
খালি শোভা পায়।
আমরা দেখিনা তারে বৃক্ষশাট ক্রমশ বদলায়।
সৈকতে মেলার ভীড়ে
খালি দিয়ে শুধু ঘর গড়ি
স্মৃতির আগুনে তবু হৃদয় হয়ে মরি।

৫.

তার চেয়ে চলো যাই হেঁটে
ওইদিকে পাড়াগাঁ ছুলিয়া বস্তির দিকে
যদি দেখা পাই
সাদা-মাটা মানুষের মন।
প্রজাপতি নাই কাছে, ফুল শুধু ফোটে আর ঝরে
পলাশ বসন্তে মজে শীতের দুপুরে।
সমুদ্রকে এরা জানে শিশুর মতন
স্নেহাতুর মায়ের মতন
বিবাহের লাল-পাগা কুমারীর চোখের মতন।

৬.

আমরা সৈকতে আসি মুক্তির খোঁজে
ঢেউ ভালো, রোদ ভালো, এ সবই উপরি-পাওনা
হে প্রকৃতি, বুঝে গেছো সভ্যতার চতুর ছলনা।
এইখানে বালি খুঁড়ে পেয়েছিল রমণীর শব
সন্ধানী পুলিশ
অবিকৃত মৃতদেহ, চোখে ছিল অপার বিস্ময়
ঠোঁটে তার উষ্ণতার চুম্বনের দাগ
প্রণয়ের শেষ দায়ভাগ।

৭.

এই ভাবে বহু প্রেম মরে যায়, তুমি জানো নাকো
তুমি শুধু প্রেমই ভালোবাসো
সোনার পিঞ্জরে-বসা পাখির যন্ত্রণা
সারাদিন ঘুনহুটি, শুধু তুমি, আমি
শুধু এক আকর্ষণ, আদিম আবেগ
দেহ ছেপে-ছেপা,
অতিরিক্ত আর কিছু নয়
জানলে না রক্তের বিস্ময়
বিপন্ন গোধূলি ঘিরে অন্ধ কোনো দিগন্তরে খোঁজে।
অবাধ্যতা ? পলিগেমি ? বহুভোগ্যা ? যাই বলো তুমি
ছলনার বশে
বহু নারী এক স্রোতে কাঁকি আরশ্লাওলায় কবে গেছে ছেয়ে।
বহু নর হয়েছে পুতুল,
ওফেলিয়া, দেখো তুমি, ডেনমার্কে কী যে হলস্থূল !

# পুনর্যোজনার কাজ

## চন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়

আমি টের পেয়েছি তোমার চলাচল
মধ্যমিশ্রিতের রক্তিমতায়, মধ্যদিনের ঘূসর ধাঁদায়
তাও শতাব্দীর পুনর্যোজনার কাজ করে চলেছো তুমি—
বিবেক তোমার একমাত্র কুলকাঁটা— বুনে যাচ্ছ
বিচ্ছিন্ন মাথানো ঠাণ্ডা স্তোয় আত্মপ্রবঞ্চনা তবু সত্যতার
চমৎকার নক্সা— ঢেকে দিচ্ছ ঘুনিদের মুখ, লম্পটদের মুখ,
ঢেকে যাচ্ছ মানুষের প্রতি মানুষের রক্তময় পাশবিকতাকে !

আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না
আমাদের বাড়ি-সমাজের ভরসুপ,
অপকাশনার পিছুটান— তুমি চলেছো ছেটবেগে
তোমাকে ডাকবো কোন ভাষায় ?
তোমাকে জড়িয়ে ধরবো কোন আলিঙ্গনে ?

তাও শতাব্দীর পুনর্যোজনার কাজ করে চলেছ তুমি—
বিবেক তোমার একমাত্র কুলকাঁটা— বুনে যাচ্ছ
বিচ্ছিন্ন মাখানো ঠাণ্ডা সুতোয় আত্মপ্রবঞ্চনা তবু সত্যতার
চমৎকার নক্সা !

## সারাটা দিবস

বিমল চক্রবর্তী

সারাটা সকাল যেন ভরে উঠলো
অরুণ আলোয় ; আকাশ
বিস্তীর্ণ মাঠের শস্য, ক্ষুব্ধ নদীর জল
সমস্ত সাধ্যটা নিয়ে অহরহ ঘুরেছি অশকাল।

নিদারুণ ক্ষুধা ছিল দুপুরের তীব্র দাবদাহে ;
মনের মতন এক কবিতার অনুবাদ যেন—
ধীরে ধীরে রসসিক্ত, প্রতিটি শব্দের
বাচ্যাতিরিক্ততায় স্বাদ নিতে নিতে
তোমাকে প্রত্যক্ষ করে পেয়েছি
বিস্ময় অহরহ।

সারাটা দিবস বড়ো যন্ত্রণায় কেটেছে পাশাপাশি ;
বিচিত্র স্বাদে ও বর্ণে গন্ধে সমাকুল
সাংসারিক ঠুংঠাং পেয়ালা পিরিচে
ম্লান অপরাহ্ণে পৌঁছে
শয্যায় ক্লান্তির ভাঁজে, তীব্র অনুরণনে বেজেছি।

বিকেলে পড়ন্ত রোদ সীমাহীন ক্ষমায় উজ্জ্বল ;
অকস্মাৎ দাঁড়ে। সামনে
মাঠ পেরোনোর দুঃখ সাথী করে
অগ্রসর হলে
নিবিড়তা, ক্লান্তি, ক্ষমা চলচ্চিত্রবৎ করে গেছে।

# অরুচি

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

যাদুঘরেই এখন অনেক ভগ্ন বিশেষ স্মৃতির ইতিবৃত্ত এখানে অজস্র স্পেসিমেনে হাজির বলেই আমার ভয় করে তবু এখানেই আমি তাকে খুঁজতে ঢুকে পড়েছিলাম।

কঙ্কালে ট্যাক্সিডারমিতে নামগুলো আমি ভয় ভয় করি অক্ষরগুলো যাবতীয় জীবলক্ষণ ওড়ন্তের নিদর্শন কোথাও-ই তোমাকে চোখে পড়েনা উদ্ভাস টুকরোতে তোমার নাম লেখা নেই।

শিল্পনে তাকাতে সাহস হয়না তোমার ছবি অন্ধকার হয়ে যাবে।

# বিচ্ছিন্নতা প্রসঙ্গে কিছু বক্তব্য

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

একাত্মতার তাগিদেই যে মানুষ কথা সৃষ্টি ক'রেছে, এ অনুমানটা বোধহয় সঠিকতর। একে অপরের সঙ্গে ভাবনাচিন্তার আদানপ্রদান ক'রে সংযোগ-স্থাপনের প্রয়োজন না অনুভব করলে মানুষ মূক হয়েই থাকতে পারত, ভাষা তৈরী হ'ত না। অথচ যত দিন যাচ্ছে দেখছি ভাষার অসম্পূর্ণতা বক্তা থেকে শ্রোতাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দিচ্ছে।

একই ভাষায় কথা ব'লতে অত্যন্ত অতি ঘনিষ্ঠ মানুষের কাছেও নিজের অন্তর রহস্য গুছিয়ে প্রকাশ করার ভাষা খুঁজে পাই না। যা বলি, প্রত্যেকেই নিজেদের ভিন্ন ভিন্ন মানসিক প্রবণতা অনুযায়ী তার অর্থ ক'রে নেয়, কখনো কোন কথার উপর অনাবশ্যক ঝোঁক দিয়ে, কখনো বা বক্তব্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটির প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হ'য়ে। অপরের উক্তির নিজস্ব ব্যাখ্যা ক'রে আমিও হয়তো তাদের প্রতি অনুরূপ অবিচার করি। ভাষার এই যে অসীম ব্যর্থকতা, তা শুধু পরস্পর সম্পর্কে ভ্রান্ত অনুমানের আশংকাকেই বৃদ্ধি করে।

কেবলমাত্র প্রতিবেশী থেকে এই ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্নতাটাই বেদনাদায়ক নয়। শৈশব থেকে যে ভাষায় ব'লতে ও ভাবতে শিখেছি, যখন দেখি সেই ভাষাটাই নিজের চিন্তাগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেছে, প্রায় বিদেশী ভাষা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, তখন কি পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যায় না? এই শরীরে নিজেকে প্রবাসী ব'লে মনে হয়।

আপন ভাষার এই বিরূপপ্রাপ্তি বোধহয় আধুনিক যুগের মানুষের বিচ্ছিন্নতারই (alienation) চূড়ান্ত প্রতীক। এ বিচ্ছিন্নতার বোধ কোন স্তরে বা তীব্র, কোথাও বা এখনও অনানুভূত। আমাদের এই ক'লকাতার যে অগণ্য ছিন্নমূল বাস্তুহারা মানুষ অধিবাসী, পূর্ববঙ্গের ভিটেমাটি থেকে তাদের বিচ্ছেদ সম্বন্ধে তারা সবাই সচেতন। কিন্তু তাদের মধ্যে কতজনের সেই পরিমাণ তীব্র বোধ আছে অন্য এক বিচ্ছিন্নতা সম্বন্ধে?— যে বিচ্ছিন্নতা তাদের সরকারী অফিসের দৈনন্দিন কর্মজীবনে একটা তুচ্ছ অজ্ঞান হাতিয়ারে পরিণত করেছে। প্রতিদিন ফাইল হস্তান্তর বা টাকার অঙ্ক টুকতে টুকতে

তারা কি কখনও খেয়াল করে কি উদ্দেশ্যে, দেশের কোন মুহূর্তের পরিকল্পনার কি অঙ্গ হিসেবে তারা এ কাজ ক'রছে ?

বর্তমান রাজনৈতিক স্তরেও আমরা অনুরূপ বিচ্ছিন্নতার ভুক্তভোগী। ভোট দিয়ে হয়তো সরকার পরিবর্তনে সক্ষম। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলির সততা বিচারে ও সরকার পরিচালনার জটিলতা অনুধাবনে সম্পূর্ণ অক্ষম আমরা শেষ পর্যন্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ শাসনব্যবস্থায় কতখানি প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত থাকতে পারি ? যা ঘটছে তার সত্যিকতা নির্ণয়েও আমরা অপারগ। ভিন্ন সংবাদপত্রে একই ঘটনার ভিন্ন পরিবেশনায় এক এক সময় সন্দেহ হয় সত্য কি ? সত্যের এত কাছে থেকেও তাকে জানতে না পারার এই চূড়ান্ত পরাভবেও কি মানুষের বিচ্ছিন্নতাবোধ নেই ?

এ যুগে আমাদের চিন্তায় ও কর্তব্যে যে দ্বন্দ্ব, তাতেও তো এই বিচ্ছিন্নতা। ভিয়েৎনামে যুদ্ধের সম্প্রসারণের কিম্বা মর্মান্তিক ঘটনা অবগত হ'লে, সাময়িক উত্তেজনায় যে কর্তব্যবোধ জেগে ওঠে, মুক্তিফৌজের সঙ্গে কিছু মুহূর্তের জন্য যে একাত্মতা বোধ করি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাদের ঘৃণায় অংশীদার হয়ে, তা সমস্তই পরবর্তী দৈনন্দিন জীবনের গতানুগতিক স্রোতে, সত্য আষোঢ়ে বা তুচ্ছ বিবাদে পর্যবসিত হয়। অনেকে ব'লবেন এটাই অবশ্যম্ভাবী। আবেগের তরঙ্গশীর্ষে চিরস্থায়ী অবস্থান সম্ভব নয়। কিন্তু তাহ'লে একাত্মতার এই ক্ষণভঙ্গুর অনুভূতির সার্থকতা কি ? নিজের বিবেককে কিছু উত্তেজনার উৎকোচ দিয়ে কিছু সময়ের জন্য শান্ত রাখা ?

মার্কিনী অত্যাচারের সরব প্রতিবাদের সঙ্গে খাদ্যের জন্য ঐ দেশেরই উপর নির্ভরশীলতার কাপুরুষতার কি ক'রে সমন্বয় সাধন করা যায় ? আসলে পাশ্চাত্যের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমাদের চিন্তার এই অসঙ্গতি দীর্ঘকালব্যাপী। একদা আমাদের পূর্বগামীরা দুই ইংরেজ— যে ইংরেজ অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদ ও যে ইংরেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শেক্সপীয়র, শেলী, কীট্স পড়ায়, যে ইংরেজ ভারত-বাসীর ধনলুণ্ঠন ক'রে তাকে দুর্ভিক্ষে ক'রেছে ও যে ইংরেজ এদেশে আধুনিক শিল্পোৎপাদন প্রযুক্তিবিদ্যার গোড়াপত্তন ক'রেছে— এই দুই ভাবমূর্তির সমন্বয় সাধনের দ্বন্দ্বে সারা জীবন কাটিয়েছেন। ইংরেজকে ঘৃণা করেও তার উপর নির্ভরশীলতার এই অপমানকর পরিস্থিতির আজও অবসান হয় নি। অর্থ-নৈতিক ক্রমবিকাশের প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়া দেশগুলির ভাগ্যে এ বিড়ম্বনা হয়তো অনিবার্য।

কিন্তু এর ফলে শিক্ষিত ভারতবাসীর চিন্তাজগতে যে বিচ্ছিন্নতা এসেছে তা মর্মান্তিক। নিজেদের বিবেকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকা ও নিরোধরনের অন্ধ বিদ্বেষের ঘারে চিন্তাবৃত্তিতে যে বিরোধ, যে আন্তর্জীবন বিচ্ছিন্নতা, অনুরূপ বিমূর্তি দেখতে পাই যখন এ দেশের কোন আঞ্চলিক ভাষার সাহিত্যিককে, শুধু আন্তর্জাতিক নয়, ভারতীয় খ্যাতি অর্জন করতে হয় ইংরেজীর সাহায্যে। অথচ, এ ইংরেজী তাঁর হাতে অসাধ্য ঘন্ত্র; কারণ তাঁর আবেগময় ভাবনাচিন্তা, কল্পনা, এ ভাষায় কখনই স্বচ্ছন্দ নয়।

যত দিন যাচ্ছে, এ বিচ্ছিন্নতার এলাকাটা ব্যক্তির জীবনে ক্রমবিস্তীর্ণ হচ্ছে। এক-ই ব্যক্তি তার সংসারে এক রকম ব্যবহারে অভ্যস্ত; তার কর্মক্ষেত্রে ভিন্ন রূপ গ্রহণ করে; আবার তার বন্ধুমহলে অন্য জাতীয় আচরণ করে। এক ক্ষেত্রে পরিচিত স্বভাব থেকে অন্য ক্ষেত্রে ঐ এক-ই মানুষের ভিন্ন স্বরূপের এই বিচ্ছিন্নতা, তাকে কিছুটা কপটাচারী ক'রতে বাধ্য। এবং এই বিচ্ছিন্নতাকে নির্বিবাদে মেনে নেওয়া যায়, তার বেদনা বা বিপন্ন লক্ষণে উদাসীন হবার ফলে নিষ্ঠুর অমানুষিকতা স্বাভাবিক। তাই অবাক হই না, যখন দেখি দুর্ভিক্ষপীড়িতের সাহায্যের জন্য ক'লকাতার জনপ্রিয় শিল্পীদের দিয়ে চটুল নৃত্য-গীতের আসর জমিয়ে আয়োজকারীদের আকর্ষণ ক'রে অর্থ সংগ্রহ ক'রতে হয়। উদ্দেশ্য ও তা সাধনের উপায়ের মধ্যে এই যে অমানুষিক ব্যবধান তা উক্ত আসরের সংগঠকদের আন্তর্জীবন বিচ্ছিন্নতা ছাড়াও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষগুলি থেকে তাদের দূরত্বের দুঃসহ প্রতিফলন।

২

এতৎসত্ত্বেও একাত্মতার মুহূর্তগুলি অবিস্মরণীয়। এই ক'লকাতার মানুষ-ই সারারাত জেগে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে আত্মময় হ'য়ে যেতে পারে বা খোলা ময়দানে কোন জনবিরল কোণে দিনাবসানে আলিঙ্গনের মধ্যে প্রেমিকযুগল কয়েক মুহূর্তের জন্য অতিক্রান্ত একপ্রাণতা অনুভব করে। হয়তো আরও পাঁচটা দায়িত্ব থেকে নিজেকে সাময়িকভাবে মুক্ত করে। বাকি জগৎটাকে বিস্মৃত হ'য়ে, এই একাত্মতার আনন্দ অর্জন ক'রতে হয়। এক স্তরে বিচ্ছিন্নতার মূল্য দিয়ে অন্য স্তরে একাত্মতা প্রতিপাদ্য।

তবুও আপনার বাহিরে আত্মবিলীনতার ক্ষমতা পরম সৌভাগ্য। কাল-বৈশাখীর পূর্বাভাস আমার মানুষকে বাতবিক্ষুব্ধ ক'রে তোলে। বর্ষণে কোন

কোন দিন সিক্ত হ'য়ে উজ্জ্বলিত হ'য়ে উঠি। আবার দিনের প্রাতঃকালীন রৌদ্রের উত্তাপে আত্মসমর্পণও সুখকর। সমুদ্রের ঢেউয়ের পিঠে আবর্তনে আত্মহারা হওয়া যায়। একাত্মতার এত ভিন্ন প্রকার আভাসে চলতো বৈশম্যের কোন অন্তরঙ্গ বা ইঙ্গিতের আদিম অনুরক্তি রয়েছে।

তখন মনে হয় কোনটা স্বাভাবিক? বিচ্ছিন্নতা না একাত্মতা? কোনটা অনিবার্য? নিজের ইচ্ছা ও ক্ষমতার বিবর্তিকের অন্তর্ধি না সুখলাভক সমন্বয়-সাধন? প্রতিবেশী ও সহিত্বর্গ থেকে বিমুক্তি না তাদের প্রতি সংযুক্তি?

এই উভয় প্রবণতা প্রায় সমরূপ বলবৎ ব'লেই, শিল্প-সাহিত্যের রচনায় এবং তার উপলব্ধিতে এত বেশী তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক বিমূর্ত শিল্প বিচ্ছিন্নতায় লালিত। একদিক থেকে বলা যেতে পারে শিল্পীর বিচ্ছিন্নতা-বোধ থেকেই এর জন্ম। নিজের অন্তর্জগতে এবং অপরের সঙ্গে সম্পর্কে, বিচ্ছিন্নতার বোধ শিল্পীকে কিছুটা নির্মম বিশ্লেষণের ক্ষমতা দিয়েছে। ঐ একই বিশ্লেষণী মনোভাব নিয়ে একটা বাস্তবধর্মী চিত্রের গঠনপ্রণালী থেকে শিল্পী তাঁর মূল উপাদান রং ও রেখাকে অবচ্ছিন্ন (abstract) ক'রে বার ক'রে আনতে পারেন। এই বিমূর্তিকরণের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার সর্বশেষ নিদর্শন পিকাসো অঙ্কিত abstraction-এর ভিন্ন অবস্থার দুয়ের চিত্রগুলি। অনুরূপ ভাবেই আধুনিক শিল্পী মনুষ্যদেহের যথাযথ বাস্তব রূপে মোহাচ্ছন্ন না হ'য়ে, নিরাসক্ত দৃষ্টি থেকে দৈহিক আকারের অংশবিশেষ ছেঁটে-কেটে বা বিকৃত বা অতিরঞ্জিত ক'রে কেবলমাত্র বর্ণ ও রেখার ছান্দস সমাবেশের উপর গুরুত্ব অর্পণ করে। যে দর্শক, সেও ঐ মানসিক ভঙ্গিতেই বিমূর্ত শিল্পের বিচারক। অর্থাৎ, মানুষের পরিচিত দেহসৌষ্ঠবের ধারণা থেকে নিজের কল্পনাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে, চিত্রে নিছক বাস্তবের পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপায়ণের আশা না ক'রে, রং ও রেখার অবচ্ছিন্ন রচনাকৌশল উপলব্ধি ক'রতে সে প্রস্তুত হয়। ক্রমে এই অবিচ্ছিন্ন চিত্রে সে আত্মময় হ'তে পারে, যেমন রসজ্ঞ শ্রোতা হয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের কথাশূন্য সুরের লহরীতে। ফলে আবার, বিচ্ছিন্নতার একটা স্তর অতিক্রম ক'রে একাত্মতার নতুন এক স্তরে শিল্পের দর্শক উপস্থিত হয়। এ স্তর অবশ্য নির্বস্তুক বর্ণ ও চিত্রের— মানুষ বা প্রকৃতির চেনা মনোরম আকার থেকে অনেকাংশে বিচ্ছিন্ন।

এই বিমূর্ত শিল্পের রসগ্রাহী হ'য়েও অবনীন্দ্রনাথ বা মিকেলাঞ্জেলোর চিত্রের সঙ্গে কেন একাত্মতা অনুভব করি? 'শিবসীমন্তিনী' বা আদমের চিত্রে মনুষ্য-

দেহের চিরায়ত সৌন্দর্যের যে চরম প্রকাশ, তা আমাদের সেই আদিম এক-প্রাণতার আকাঙ্ক্ষা, সর্বোত্তমের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার যে ঐকান্তিক ইচ্ছা, এই অনুভূতিকেই বারংবার আহ্বান করে। অপর পক্ষে, পিকাসোর চিত্রে নায়ক বা নায়িকার কোন উপলক্ষ্য মাত্র; তাকে অবলম্বন ক'রে যে গঠনশৈলীর মূল উপাদান, তার নিত্যনতুন নন্দনতাত্ত্বিক ব্যবহারই শিল্পীর উদ্দেশ্য। ফলে, এ ক্ষেত্রে আমার ইন্দ্রিয় বাস্তববিচ্ছিন্ন রং ও রেখার ভাষে প্রতিবেদনশীল; আমার অবচেতন মন হয়তো কখনও পুরনো স্মৃতির অনুষঙ্গ খুঁজে পায়।

এ সূত্রের উদ্ভট নাটকের রচনায় এবং মূল্যায়নেও এই বিচ্ছিন্নতা প্রভাব বিস্তার ক'রেছে। এ নাটকের চরিত্রের সঙ্গে দর্শক একাত্মতা অনুভবের তাগিদ বোধ করে না, যেমন করে কোন এক বাস্তবধর্মী নাটকের নায়কের সঙ্গে। কারণ উদ্ভট নাটকের রচয়িতা মনুষ্যসমাজের বিশেষ কোন অবস্থা বা চরিত্রের কোন একটি বৈশিষ্ট্যকে বিযুক্ত ক'রে দেখাবার প্রয়াসী। বিযুক্ত চিত্রে পরিচিত মনুষ্যদেহ যেমন অতিরঞ্জিত বা বিকৃত বা বিলীয়মান, উদ্ভট নাটকে তেমনি চেনা চরিত্রগুলি কোথাও বা জড়বস্তুবৎ, কোথাও বিশেষ কোন চারিত্রিক লক্ষণের অতি প্রকট প্রকাশ। নাটক দেখতে দেখতে কখনো বা দর্শকের মনে পড়ে স্বপ্নে দেখা কোন অবস্থার কথা। কারণ, মানুষের স্বপ্নাবস্থার অনুভূত বিচ্ছিন্নতাটাই বোধহয় একমাত্র বিশুদ্ধ ও স্বতঃস্ফূর্ত; যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ ক'রে তাকে বুঝতে হয় না। স্বপ্নে আমি যখন আমাকে দেখি, আমার আচরণ তখন আমার ক্ষমতার নাগালের বাইরে। নিয়ন্ত্রণের বাসনা সত্ত্বেও, যখন দেখি স্বপ্নাবস্থায় আমার ব্যবহার বা ক্রিয়াকর্ম স্বতন্ত্র পথ ধ'রে চ'লছে, আমার কিছু করার নেই, আমি শুধু কেউ হ'য়ে গেছি, তখন নিজের থেকে আমার এই বিচ্ছিন্নতাটা আপনা থেকেই তীক্ষ্ণ হ'য়ে ওঠে।

বিযুক্ত শিল্পের মত উদ্ভট নাটকও দুর্বোধ্য ব'লে অভিযুক্ত হ'য়েছে। এ অভিযোগ নতুন নয়। কারণ শিল্প-সাহিত্যে বিচ্ছিন্নতাপ্রসূত দুরূহতার নজির অতীতেও পাওয়া গেছে। শিল্পের মূল উপাদান বা মানবচরিত্রের গভীরতম স্তরের রহস্য অনুসন্ধানে নিমগ্ন স্রষ্টা বৃহত্তর মনুষ্যমণ্ডলী থেকে যখনই বিচ্ছিন্ন হ'তে বাধ্য, তার সৃষ্টিকর্ম ও ব্যাপক জনসমাজের কাছে দুর্বোধ্য হবে। আমাদের দেশের লোক-সঙ্গীতের অধিকাংশই সহজবোধ্য, তাতে মানুষের একপ্রাণতার বাণীই ধ্বনিত হ'য়েছে। কিন্তু এই জীবনমুখী স্রোতের পাশাপাশি যদি হঠাৎ এই ধ্বনিটি কানে আসে,

"এ ছেড় মাটিয়ে ভাণ্ড
ভাঙিলে হইবে শতেক খণ্ড
ভাঙিলে ভাণ্ড কোড়া লাগিবে না।"

তখন এই বিচ্ছিন্নতাপ্রসূত দুঃখবাদের প্রকাশকে প্রক্ষিপ্ত ব'লে বর্জন করার কোন কারণ দেখি না। সঙ্গীতকারদের মধ্যে যেমন জীবনের সঙ্গে একাত্মতা-বোধের অনুভূতিও ছিল, খুব স্বাভাবিক ভাবেই এর পরিপন্থী প্রবণতাটাও কোন কোন শিল্পীর ধ্যানে থাকা সম্ভব। জীবনের প্রতি এই যে আস্থাহীনতা বা তার কর্মধারীর নিয়ে দুঃখবাদী সিদ্ধান্ত, এর নেপথ্যে বহু জটিল দুর্জ্ঞেয় প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের ইতিহাস পাওয়া যায়, যা ব্যাপক জনসাধারণের কাছে কিছুটা দুর্বোধ্য বা অযাচিত মনে হ'তে পারে। যেমন দেখতে পাই পুরনো অসমীয়ার ধাঁধা পুস্তক 'সোরণ-বিজয়'-এর এই প্রশ্নগুলিতে—

"কায়া কোথা হতে পাইলা কাহাতে উদয়।
প্রথমে কহিবা গুরু কায়া-পরিচয়
... ... ...
দীপ নিভাইলে জ্যোতি কোথা গিয়া রয়॥
... ... ...
শব্দ উঠিলে ধ্বনি চলি যায় কোথা॥
... ... ...
নিদ্রা কাহাকে বলি চেয়ায় কোন জন॥"

এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে প্রশ্নকর্তা হতাশাব্যঞ্জক সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন কিনা সে কূটতর্কের মধ্যে না গিয়েও অন্তত এইটুকু বলা যায় যে উত্তর অনুসন্ধানের অভিধানে মগ্ন হ'য়ে প্রশ্নকর্তা আর পাঁচজনের সাধারণ জীবনযাত্রা থেকে বিচ্ছিন্ন হ'তে থাকা। একজন গবেষকের বা বিশেষজ্ঞের জীবনধারায় এ বিচ্ছিন্নতা কি রকম অনিবার্য হ'য়ে দাঁড়ায় তা বোঝা যায় যখন দেখি চিকিৎসক বিশেষ কোন রোগের নিরাময়ের আসল উদ্দেশ্য বিস্মৃত হ'য়ে কিছুকাল পরে সেই রোগের জটিল গতিপথ অনুসরণেই ব্যস্ত হ'য়ে ওঠেন। এটা স্বাভাবিক; বিশেষজ্ঞের গবেষণার নিজস্ব নিয়মানুযায়ী মূল দুর্জ্ঞেয়র রহস্য উন্মোচনের নেশা তাকে পারিপার্শ্বিক থেকে ঠেলে বিযুক্ত ক'রে দেয়।

সুতরাং আধুনিক জগতে বিচ্ছিন্নতার প্রকাশ বিচিত্র। কোন ক্ষেত্রে তা বিমূর্ত চিত্রকলার মত উচ্চাঙ্গের শিল্প সৃষ্টি ক'রছে, কোথাও বা বিবেক নির্দেশিত কর্তব্য পালনের অক্ষমতা প্রতিফলিত ক'রছে। এ সমস্যার উপলব্ধি আজকে

পীড়িত ক'রছে, এর প্রতি ঔদাসীন্য আউকে অজ্ঞান অসহায়তায় নিমজ্জিত ক'রছে।

০

সম্প্রতি বাজারে বিচ্ছিন্নতা প্রসঙ্গে বহু বিদেশী বই এসেছে। প্রায় প্রতিটি পুস্তকেই এ সমস্যার নানা সুদীর্ঘ ব্যাখ্যায় পরিসমাপ্তিতে লেখকরা আধুনিক মানুষের এই ব্যাধি নিরাময়ের নানা উপায় বাতলেছেন। কিন্তু সন্দেহ হয়, বিচ্ছিন্নতা কি সত্যিই আরোগ্যসাধ্য ব্যাধি? এ কি অনিবার্য নয়? এ সমস্যা কি মানবজাতির জন্মগত বৈশিষ্ট্য নয়?

এ সন্দেহগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রতে ক'রতে মনে হয় একাত্মতার তাগিদের মত বিচ্ছিন্নতার প্রবণতাটাও মানব ইতিহাসের অতীতে নিহিত। মাতৃজঠরের শিশুর মত শৈশবের মানবজাতি প্রকৃতির অঙ্গ ছিল। পরনির্ভরতা থেকে মুক্ত হ'য়ে শিশুর মত হওয়ার মত, মানবজাতিও ক্রমে ক্রমে প্রকৃতির বশ থেকে মুক্ত হ'য়ে স্বাতন্ত্র্য অর্জন ক'রেছে, প্রথমে বহিঃপ্রকৃতিকে বশীভূত করার জন্য গোষ্ঠীবদ্ধ হ'য়ে, তারপর গোষ্ঠী থেকে বিযুক্ত হ'য়ে ব্যক্তির নিজস্বতা-প্রাপ্তিতে, এক কথায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জন্মে— এই স্তর পরম্পরায়। তাই একাত্মতা চিরস্থায়ী নয়। যদিও এখনও প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগের ক্ষমতায় অতীতের সেই প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতারই প্রতিধ্বনি পাই। বরং ইতিহাসের সাক্ষ্য মানুষের যাত্রা এই ঐকাত্ম্য থেকে দূরে দূরে যাওয়ার, বিচ্ছিন্ন হওয়ার। যেমন পদার্থ ভেঙে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়।

অনেকে আপত্তি ক'রে ব'লবেন— ব্যক্তি মানুষ তো সমাজেরই মানুষ। শৈশব থেকে তার চিন্তাধারা পারিপার্শ্বিকের প্রভাবেই তৈরী। অতএব সমাজবিচ্ছিন্ন বিযুক্ত ব্যক্তিদের বাঁচা কি সম্ভব? সমস্যাটা এইখানেই। আদিম মানুষের মত আধুনিক মানুষ পারিপার্শ্বিকের অজ্ঞান দাস নয়। বহুদিনের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পরিবেশকে আয়ত্তাধীনে আনতে গিয়ে তার নিজের চিন্তাপ্রণালীও পরিবর্তিত হ'য়েছে। একটা প্রতিকূল অবস্থাকে বশে এনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে না ফেলতে আর একটা বিরুদ্ধশক্তি মাথা চাড়া দিয়ে অন্য দিক থেকে তাকে আক্রমণ ক'রেছে। রাবণের মাথার মত সমস্যা নিত্যনূতন। দু'দুটো মহাযুদ্ধের ব্যাপক ধ্বংসের পরও আর একটা মহাযুদ্ধের আশংকা জীবন্ত হ'য়ে উঠছে। তাহ'লে কি মনুষ্যসমাজের নিয়মকানুনগুলো

চিরকালই মানুষের অধীনের বাইরে থেকে যাবে? এই বিরাট জগৎসংসারের ক্রমবর্ধমান জটিলতার সামনে তার অস্তিত্বের সম্বন্ধে মানুষ কি প্রতিদিনই সচেতন হ'চ্ছে না? সমাজের মধ্যে বাস ক'রেও, তার দৈনিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ক'রেও এই আত্মসচেতনতা পরিবেশ থেকে তার বিচ্ছিন্নবোধকে বাড়িয়ে তুলছে। এই জন্যই আজ আমাদের জীবনে একপ্রাণতার আনন্দের মুহূর্তগুলি অল্প; নানা স্তরের বিচ্ছিন্নতার বাধা বাকি সময়টা আচ্ছন্ন ক'রে থাকে। এটা অবশ্যম্ভাবী। কারণ মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তীক্ষ্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে সে আরও একাকী হ'চ্ছে।

একদা যুবক মার্কস্ লেখেছিলেন ('অর্থনৈতিক ও দার্শনিক পাণ্ডুলিপি, ১৮৪৪') বিচ্ছিন্নতা কেবলমাত্র শ্রেণীভক্ত অনুধাবিত সমাজেরই অভিশাপ। বস্তুতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এর চরম প্রকাশ শ্রমজীবীর ভাগ্যে। সে তার সৃষ্ট প্রব্যকল্প থেকে, শ্রম থেকে, এক কথায়, তার নিজের সত্তা থেকে, নিজস্ব মানসিক বিকাশের সম্ভাবনা থেকে বিচ্ছিন্ন। কারণ এ সমস্তের-ই অধিকারী তার মালিক।

কিন্তু আজ এক এক সময় সন্দেহ হয়, ভবিষ্যতের সাম্যবাদী সমাজে যেখানে মানুষের ব্যক্তিত্বের স্ফুরণের সুযোগ আরও ব্যাপ্ত হবে, মানুষের একাকীত্ব কি আরও বাড়বে না? অস্পষ্ট অঙ্গুষ্ঠরেখার বৈচিত্র্য যেমন বিবর্ধক কাচের তলায় উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে, প্রতিটি মানুষের মনের সূক্ষ্ম চিন্তারেখাগুলি সাম্যবাদী সমাজেই জীবন্ত হ'য়ে উঠবে। ব্যক্তিত্বের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির অন্তর্জগৎ নিজস্ব চিন্তার ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ হবে। এ পৃথিবীতে একের অঙ্গুষ্ঠের রেখার কারুকার্যের সঙ্গে অপরের মিল নেই। ঠিক তেমন-ই, এক একজনের ভাবনার গতিপথ অপর থেকে ভিন্ন হ'তে বাধ্য হবে। ভবিষ্যতের এই অনন্য মানুষগুলির বিবর্তিত চিন্তার ভয়ানক পরস্পরবিচ্ছিন্নতা, প্রত্যেকের আনন্দ বা দুঃখের নিজস্ব কারণের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, ব্যক্তির বিমুক্তিবোধকে কি আরও তীব্র ক'রবে না? অতীতের ঐক্যবদ্ধ থেকে মানুষ যত দূরে স'রে আসবে, তার অভাব তাকে তত বেশী পীড়িত ক'রবে, যেমন শৈশবাবস্থার প্রত্যাবর্তন অসম্ভব জেনেও মানুষ তার জন্য আকুল হয়।

আবার মাঝে মাঝে অন্য আশংকা হয়। ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক উৎপীড়ন থেকে মুক্ত হ'য়ে, ব্যক্তি তার নিজস্ব সত্তাকে পুনরাবিষ্কার ক'রে, নিজের চিন্তাশক্তি বা সৃষ্টিক্ষমতার স্বাধীন বিকাশে সক্ষম হ'য়ে, কি আরও বেদনাদায়ক এক নতুন ধরনের বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত হবে না? কারণ, সাম্যবাদী

সমাজে যখন নিজের ভরণপোষণের জন্য কায়িক শ্রমে অধিক সময় যাবের বাধ্যবাধকতা থেকে বিমুক্ত হ'য়ে মানুষ সর্বপ্রথম এতদিনের সুপ্ত ক্ষমতার প্রকাশের নানা সুযোগ পাবে, সেই মুহূর্তে কি মানুষ মানবজীবনের মূল কেন্দ্রগত অন্তর্দ্বন্দ্বটাকে অতিক্রান্ত নিরাবরণ আকারে আবিষ্কার ক'রবে না? অর্থাৎ, তার এতদিনের উদ্দাম কল্পনা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভারমুক্ত স্বচ্ছন্দ ক্ষমতার মধ্যে যে বিস্তীর্ণ ব্যবধান, তার ভয়াবহ ও বেদনাদায়ক স্বরূপ বোধহয় এই প্রথম সে উপলব্ধি করতে পারবে।

শিব গ'ড়তে বানর গড়ার দুঃখ বহুকালের। কিন্তু এতদিন এ অক্ষমতার জন্য আমরা দায়ী ক'রেছি প্রতিকূল পরিবেশকে; সামাজিক বাধানিষেধ অশিক্ষিত শিক্ষার অসুবিধা-প্রভৃতি কারণ দেখিয়েছি। নিঃসন্দেহে, এ কারণগুলি সত্যের পথে বাধাস্বরূপ। কিন্তু মানুষের জন্মগত সামর্থ্য, অনুৎপীড়িত কর্মশক্তি, তার কল্পনাকে যথার্থ রূপদানে কতখানি সক্ষম, তার শেষ বিচার সম্ভব ভবিষ্যতের সাম্যবাদী সমাজেই যেখানে মানুষ তার সমস্ত হৃদয়ের শক্তির স্বাধীন প্রকাশের অধিকার পাবে। এ রূপদান ক'রতে গিয়ে সে যদি অনুভব করে যে সে আসলে একটা পশু দেবতা, অর্থপঙ্কমুক্ত-অর্থভূমিপৃষ্ঠস্থ, অর্থনৈতিক বাধাবিমুক্ত হ'য়েও তার কর্মক্ষমতা সীমিত, তখন সে কাকে দায়ী করবে? তার স্বাধীন জগতে নিঃসঙ্গ এই ব্যক্তিমানুষের বিচ্ছিন্নতাবোধ কি এ যুগের মানুষের যন্ত্রণা থেকে আরও শতগুণ বেশী নয়? আজকে বাঁচতে না জানলে আমরা উপোসের দোষ দিতে পারি; কিন্তু মুক্ত গগনে বিচরণ ক'রতে গিয়ে তালভঙ্গ হ'লে কাকে দোষ দেব? ভবিষ্যতের এই স্বাধীন নির্জনবাসীর অবস্থা হয়তো অনেকটা নাস্তিকের মত। ভগবানে আস্থাবান মানুষ সবকিছুর জন্যই ভগবানের দিকে তাকিয়ে আত্মসন্তুষ্ট হ'তে পারে; কিন্তু নাস্তিক তার প্রশ্নের জবাব না পেয়ে চিরকাল সন্দেহতাড়িত হয়ে যন্ত্রণাপীড়িত জীবনযাপনে অভিশপ্ত।

হয়তো এসব আশংকা অমূলক। তবে মনে পড়ে গেল কিছুকাল আগে কয়াসী দার্শনিক সার্ত্র এক সংবাদপত্র প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে কোন এক সোবিয়েৎ লেখকের মন্তব্য উদ্ধৃত ক'রেছিলেন— মানুষের আসল দুঃখ শুরু হবে সাম্যবাদে, যখন তার সমস্ত আর্থিক মঙ্গল সুনিশ্চিত হবে। জানি না, এই আপাত-আত্মবিরোধী মন্তব্যের আড়ালে উপরোক্ত আশংকার কোন ইঙ্গিত ছিল কিনা।

চিন্তার তার খুঁড়তে খুঁড়তে মনের গভীরতম কোটরে যে প্রশ্নটায় বার

পায় যাতে তা জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধীয়। মহাভারতে যক্ষরূপী ধর্মের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন— প্রতিদিন মানুষের মৃত্যু দেখেও অবশিষ্ট লোকে যে চিরজীবন ইচ্ছা করে, এর থেকে আশ্চর্যের বিষয় আর কিছু নেই। অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর জ্ঞান সত্ত্বেও জীবন-যাপনের অন্ধ আবেগে যে বিচ্ছিন্নতা প্রতীয়মান, এইটেই যোদ্ধার মরুময় জীবনের সমস্ত চিন্তা ও কর্মের অনন্তিত্বের কেন্দ্রস্বরূপ, অন্যান্য স্তরের বিমুক্তির মূল উৎস।

জরা আকস্মিক। রোগ, জরা বা মানসিক ক্লিষ্টতায় জীবন অভিভূত। সর্বোপরি মৃত্যু অবধারিত। এ নিয়মগুলি অনড়, অলঙ্ঘনীয়। এই যুক্তিগ্রাহ্য সত্যগুলি নিতান্ত জেনেও কিন্তু সময় বা মানুষের প্রতি আবেগসঞ্চালিত একান্ত-বোধের জন্য বেঁচে থাকার লোভ সংবরণ করতে পারি না। বুদ্ধির স্থির নির্দেশের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ভাবাবেগের এই লড়াই, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনেও আজীবন মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখার ব্যর্থ চেষ্টার কি অর্থ? কয়েক মুহূর্তের একাত্মতার আনন্দের জন্য দীর্ঘকালব্যাপী কষ্ট পাওয়ার কি প্রয়োজন?

এর উত্তরে অতীতের যুগ থেকে শুরু করে এ যুগের অস্তিত্ববাদী দর্শন (Existentialism) বেঁচে থাকার সমর্থনে নানা আশ্বাস ও যুক্তি উপস্থাপিত ক'রেছেন। আমাদের দেশের হিন্দু ধর্মে কর্মফলের কথা শুনি; পুনর্বার জন্মগ্রহণ ক'রে মর্ত্যলোকের কষ্ট যাতে না পেতে হয় তার জন্য ইহজন্ম সার্থক ক'রে তোলার নির্দেশ পাই। বলা বাহুল্য এ যুগের যুক্তিবাদী মনের কাছে এ আশ্বাস উপহাসযোগ্য।

বেঁচে থাকাটা যুক্তিহীন এবং আজীবন কষ্ট পেয়ে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কাছে পরাজয়ের অনিবার্যতা স্বীকার ক'রে নিয়েও কাম্যু (Camus) মরুজীবনের সংগ্রামের মধ্যে বেঁচে থাকার সমর্থন খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁর সিসিফাস আজীবন বিফলে পাথর ঠেলেও সন্তুষ্ট এই ভেবে যে তার শাস্তির জন্য সে স্বয়ং দায়ী, তার ভাগ্যের স্রষ্টাকর্তা একমাত্র সে নিজে। আর 'মিথ্ অফ সিসিফাসে'র শেষ আশ্বাসবাণী—"শিখরে আরোহণের সংগ্রাম-ই মানুষকে তৃপ্ত করার পক্ষে যথেষ্ট। সিসিফাস যে সুখী, সেটা আমাদের কল্পনা করে নিতে হবে।"

এটা কিছুটা ব্যক্তির অহংকে সন্তুষ্ট করা, কিছুটা মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অন্তর্নিহিত অন্ধ সংগ্রাম স্পৃহাকে স্বীকার ক'রে নেওয়া। যার যার পাথর তুলবার জন্য সিসিফাস যখন অবরোহণ করে, তখনই সে সচেতন হবার সুযোগ পায়, নিজের ভাগ্য বিশ্লেষণের অবকাশ পায়। এই আত্মসচেতনতার মুহূর্তই

কাছে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন— যেখানে সচেতনতা বা অজ্ঞানতা উভয়ই শেষ হয় মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে, কি এসে যায় আত্মবিশ্লেষণের ক্ষমতায়, একমাত্র চিন্তার জন্য সাময়িক সব অনুভব করা ছাড়া? যদি এই বুদ্ধির অহঙ্কারই বেঁচে থাকার পক্ষে একমাত্র যুক্তি হয়, আরও অনেকে তো অন্য কিছু সম্পদের অহঙ্কার নিয়ে বেঁচে আছে।

আর তা ছাড়া, আমাদের এই বুদ্ধি-পরিচালিত আত্মসচেতনতার মুহূর্তগুলি কি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ? পরমুহূর্তেই আমার পাশের তুলনায় বিরক্তিকর গ্লানিটা কি আমাদের চিন্তাশক্তিকে অপমিশ্রিত করে না?

বেঁচে থাকাটা একটা 'অর্থহীন প্রচণ্ড আবেগ' ব'লে মেনে নিয়েও Sartre লাভির স্বীকার ও কর্মযোগে বিশ্বাসী। মৃত্যুর পর ব্যক্তির সঙ্গে জীবিতদের সম্পর্কের মধ্যে তিনি বিচ্ছিন্নতার নিদর্শন দেখেছেন। ব্যক্তির মৃত্যুর পর সে জীবিতদের শিকার হয়ে যায় (Being and Nothingness দ্রষ্টব্য)। কারণ মৃত্যুর পর তার জীবনের শক্তির উপর ব্যক্তির আর কোন প্রত্যক্ষ অধিকার রইল না। তার জীবন নিয়ে জীবিতদের ব্যাখ্যা থেকে সে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। তার জীবন তখন অন্যান্যদের সম্পত্তি হ'য়ে গেছে।

এই প্রসঙ্গে, যারা বিশ্বাস করেন যে মৃত্যুতেই সব শেষ নয়, মৃত ব্যক্তি স্মৃতি হ'য়ে পরবর্তী মানুষদের মধ্যে বেঁচে থাকে, তাঁদের এই আত্মসন্তোষ সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার অসারর্থাই কি আমাদের সমস্যা নয়? অতি ঘনিষ্ঠ পরমাত্মীয় বা বন্ধুর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে আমরা শোকে মুহ্যমান হই, তার স্মৃতি বার বার আমাদের তার অভাবকে মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু তারপর? দৈনন্দিন জীবনের কর্মস্রোতে কতটুকু তাকে মনে রাখি? ভবিষ্যতে যারা আসবে, যারা তাকে চাক্ষুষ দেখে নি, শুধু তার কথা শুনেছে, তাদের কাছে সে তো প্রায় অস্তিত্বহীন। সে যে কোনকালে জীবিত ছিল, সে কথাও তারা ভুলে যাবে। জীবিতদের চিন্তারাজ্যে মৃত এই ভাবেই উপেক্ষিত হয়। এটা স্বাভাবিক। ঘৃণা, ভালোবাসা, ক্রোধের অস্থায়ীত্বের মত, স্মৃতিও ক্ষণস্থায়ী।

তাই এক দিক থেকে মৃত্যু অন্তিম বিচ্ছিন্নতা, যে বিচ্ছিন্নতার বোধ মৃত ব্যক্তিকে আর পীড়িত ক'রবে না। এই সমস্ত বোধশক্তির বিলোপকারক বিচ্ছিন্নতা— মৃত্যু— মনুষ্যজীবনের ক্রমবিকাশের শেষ ধাপ। কারণ ঐক্যাত্মা থেকে ক্রমবিচ্ছিন্নতার যে যাত্রা শুরু তা শেষ হ'তে পারে জীবন থেকে প্রতিবিচ্ছেদে।

একাত্মতা যখন চিরস্থায়ী নয় এবং বিচ্ছিন্নতা যখন অবশ্যম্ভাবী, যুক্তি দিয়ে

এ সত্যটা যদি উপলব্ধি করি, তবে সেই মুক্তির নির্দেশে বিচ্ছিন্নতার চরম প্রকাশ মৃত্যুর দিকে সচেতন ভাবে ক্রত যাওয়াটা কি উচিত নয়? মৃত্যুর ঈপ্সিতে জীবনকে ত্বরান্বিত করাই মুক্তিবাদী মানুষের হয়তো একমাত্র কর্তব্য।

মুক্তির এই অমোঘ উপলব্ধি সত্ত্বেও যখন দেখি মানুষ আত্মহত্যা করতে সাহসী হয় না ভয় পায়, অথচ প্রেমে হতাশা বা অন্যায় ক'রে ধরা পড়বার ভয়ের মত সাময়িক ভাবাবেগে তাড়িত হ'য়ে প্রায়শই আত্মঘাতী হ'চ্ছে, তখন আমার মনে হয় মানুষ পশু দেবতা; তার চিন্তাশক্তি উচ্চমার্গে বিচরণে সক্ষম, কিন্তু তার কর্মক্ষমতা সে চিন্তাশক্তির উপযোগী সহচর হ'য়ে উঠতে পারে নি। তাই বার বার তার বুদ্ধিবৃত্তি, তুচ্ছ ভাবাবেগের কাছে পরাজিত হয়; চিন্তা, কার্যক্রম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়।

বেঁচে থেকে মানুষ বিচ্ছিন্নতাবোধে পীড়িত হ'চ্ছে। অথচ, বিচ্ছিন্নতার সর্বশ্রেষ্ঠ সোপান, মৃত্যুতে, ব্যক্তিমানুষ স্বেচ্ছায় উপনীত হ'য়ে এই আত্ম-পীড়নের ইতি ঘটাতে পারে। কিন্তু কিছু আবেগপ্রবণ অনুরক্তি, কিছু দুরারোগ্য প্রত্যাশার মায়ায় আবদ্ধ মানুষ মুক্তির এই অন্তিম নির্দেশ পালনে ভীত। তাই, যদিও সচরাচর বলা হ'য়ে থাকে মৃত্যুতে জীবনের পরাজয়, আমি মনে করি বেঁচে থাকাটা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির পরাজয়।

# বিষ্ণু দে-র 'চোরাবালি'

অরুণ সেন

'চোরাবালি' সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত প্রবন্ধটি রচিত হওয়ার পর প্রায় তিরিশ বছর পার হয়ে গেছে, কিন্তু ঐ কাব্যগ্রন্থটির উজ্জ্বলতা এখনো ম্লান পায় নি। 'উজ্জ্বলতা' শব্দটি আমি ইচ্ছে করেই ব্যবহার করলাম, কারণ 'উর্বশী ও আর্টেমিসে'র ঈষৎ ভাবালুতার চিহ্নমাত্রও নেই এখানে— সপ্রতিভ, ব্যঙ্গচতুর, মননশীল কবির কখনো তির্যক হাসি, কখনো সংযত ও সচেতন আবেগ কবিতাগুলোতে যেন আছড়ে এসে পড়ছে। এই বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বলতা এতই মৌলিক এবং স্থায়ীগ্রাহী যে, এর নবীনতা এখনো ক্ষুণ্ণ হয়নি।

অথচ এ-গ্রন্থের রচনাকাল ১৯২৬ থেকে ১৯৩৩-এর মধ্যে— অর্থাৎ বিষ্ণু দে-র বয়স যখন আঠারো থেকে আঠাশের মধ্যে। অবশ্য অধিকাংশ কবিতা ১৯৩৩ থেকে রচিত (একুশটির মধ্যে তেরোটি)— অর্থাৎ চোরাবালির অধিকাংশ কবিতা রচিত হয়, যখন বিষ্ণু দে-র বয়স পঁচিশ থেকে আঠাশের মধ্যে।

প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো, অনেকে 'উর্বশী ও আর্টেমিসে'র পরে 'চোরাবালি'কে বিষ্ণু দে-র কাব্য-বিবর্তনের আরেকটি ধাপ বলে মনে করেন। এ ভুল আগে আমিও করেছি। কিন্তু সালের হিসেব দেখিয়ে দেয় যে, 'চোরাবালি' এবং 'উর্বশী ও আর্টেমিসে'র বহু কবিতা একই সময়কালের মধ্যে রচিত, এমনকি 'চোরাবালি'র কিছু কবিতা 'উর্বশী ও আর্টেমিসে'র আগে —যদিও 'চোরাবালি' রচনাকালের ব্যাপ্তি সামান্য বেশি। কোন ভিত্তিতে কবিতাগুলোকে দুভাগে ভাগ করে কবি প্রকাশ করলেন? কবিতাগুলোর মধ্যে বিশেষ পার্থক্য বুঝিয়ে বলার দরকার হয় না। অর্থাৎ দুটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করা প্রায় অনিবার্য ছিল। কিন্তু 'উর্বশী ও আর্টেমিস' বেরিয়েছে ১৯৩৩ সালে, 'চোরাবালি' ১৯৩৭ সালে। শুনেছি, প্রায় একই সময়ে রচিত এই কবিতাগুলো সুধীন্দ্রনাথের পরামর্শেই দুটি ভাগে ভাগ করে প্রকাশিত হয়। অনুমান করা অসংগত নয় যে, সুধীন্দ্রনাথ যে-কবিতাগুলোকে আপেক্ষিকভাবে বেশি পছন্দ করতেন, সেগুলোকেই, অর্থাৎ সমাজসচেতন ও নানার্থব্যঞ্জক কবিতাগুলোকেই 'চোরাবালি'তে স্থান দেওয়ার কথা ভেবেছেন। অবশ্য আমাদের কাছেও এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, শুধু কলাকৌশলের দিক

থেকেই নয়, সামগ্রিক ভাষা-অভিজ্ঞতাতেও 'চোরাবালি' অনেক পরিণত এবং আগেই বলেছি, অত্যাধুনিক পাঠকের কাছে আজও চিত্তাকর্ষক।

বুদ্ধদেব বসুর লেখা পড়ে জানা যায়, বহু কবিতা, বিশেষত সমাজসচেতন ব্যঙ্গ কবিতাগুলো বিচ্ছিন্নভাবে 'প্রগতি' ও 'কবিতা' পত্রিকায় বেরিয়েছিল, পরে সেগুলো একত্রিত করে সাধারণ শিরোনামায় প্রকাশিত হয়। যেমন, 'পাইথ্যাগোরাস' বা 'শিখণ্ডীর গান'। বুদ্ধদেব বসু বলেছেন : 'টি. এস. এলিয়ট ও অন্যান্য কবি রচনাগুলোকে বিক্ষিপ্ত না রেখে যে-ভাবে পারস্পরিক সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ করেছেন (কবি) তাতে প্রচুর নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে'।

অবশ্য নানা দিক থেকে 'উর্বশী ও আর্টেমিসে'র সঙ্গে এ গ্রন্থের যে সম্পর্ক নেই, সে কথাও বলা যায় না। বিশেষত 'উর্বশী ও আর্টেমিসে'র বহু কবিতায় তিনি যে প্রেম সম্পর্কে বিলাস ও বিরক্তি প্রকাশ করেছেন, এমনকি কখনো অপ্রেমও যাচ্‌ঞা করেছেন, তা 'চোরাবালি'তে বরং আরো উগ্র হয়েছে এবং তিনি নিজেও যেন এই দুরবস্থাটা উপভোগ করছেন। 'উর্বশী ও আর্টেমিসে'র কিছু কবিতায় যাযোজ্জ্বল যুবকের যে দীপ্ত প্রেম ফুটে উঠেছে, তা এখানে সামগ্রিকভাবে অনুপস্থিত।

প্রেম সম্পর্কে মোহতন্দ তাঁর সতেরো-আঠারো বছরের নিপুণ কবিতা 'মন-দেওয়া-নেওয়া'তেই প্রকাশ পাচ্ছে। আর্তনাদ নয়, বরং মায়াত্মক যুক্তিবাদী এবং অত্যন্ত পরিণত মনোভাবই প্রকাশ পাচ্ছে এই অতি-তরুণ কবির কণ্ঠে :

'আসল কথাটা আমি যা বুঝি,
প্রেম-ট্রেম বাজে, আসলে নতুন খুঁজি।
নারীকে পুরুষ, পুরুষকে নারী তাই তো খোঁজে—
তার ওপর তো সে জীবের ধর্ম উপরি আছে।
এরি নাম "প্রেম"।'

কিংবা আরো পরে :

'আগেই বলেছি, অজামাই হল প্রেমের নানা,
পরীর মানস, ভাবের বাঈ'···ইত্যাদি।

অবশ্য এটাকে একটা বিশেষ মানসিক অবস্থায় বহিঃপ্রকাশ হিসেবেই কবি উপস্থিত করেছেন, মনে হয়— যেটাকে আমরা আমাদের দেশের বিশেষ

যুদ্ধোত্তর বিকাশের পটভূমিকায় নিরালম্ব নাগরিক মধ্যবিত্তের লক্ষণ বলতে পারি।

'চোরাবালি'র এই পটভূমিকে কুলনে চলবে না। দুই বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ের বাঙলাদেশের, কলকাতার বাস্তবতা এই আত্মঘাতী ব্যঙ্গ কবিতাগুলির পরিবেশ। এ সময়ের রাজনৈতিক-সমাজনৈতিক যে-মুক্ততাকে আমরা অতিক্রম করছিলাম, তা এখন ইতিহাসের বিষয়। কিন্তু, এই কবিতাগুলি সমাজের যে অংশকে মুখ্যত প্রতিফলিত করছে, সেই বাঙালী নগরবাসী উচ্চ মধ্যবিত্ত ও বিত্তবান সমাজ এখনও অল্পবিস্তর সেই চরিত্র নিয়েই আছে। তাই এই সমাজচিত্র এখনো আমাদের খুব চেনা লাগে। শুধু মধ্যবিত্ত সমাজ বললে ঠিক হয় না— কিছুটা কপালজোরে বিত্তবান ইতরজন সমাজ, যারা হয়তো উনিশ শতকের অনেক আভিজাত্যেরই ঐতিহ্য বহন করে নিয়ে চলেছে, তাদের কথাই বলা হয়েছে। এখনও তাদের খুঁজে পেতে হলে স্বর্গমর্ত্য সেচতে হবে না। সম্প্রতি একটি লেখায় তার কৌতুকময় বিবরণ পাওয়া গেল : "এরা সব বালিগঞ্জের ছটাকী-সত্তা কালোবাজারী পরিবারের, যা যেখানে ভাঙচুর-পরে কালো চশমা চোখে প্রচণ্ড-গতি চালিয়ে ছেলেকে যা মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দেয়— স্কুলে তারা পেটকাটা জামা পরা আটির শিখিল কুঁড়ি দেখতে দেখতে আট দেখে"। এখন অবশ্য স্বাধীন দেশে বঙ্গীয় চর্চার উল্টো সফিস্টিকেশন দেখা দিয়েছে, যেখানে অনুবাদের গন্ধ প্রায় সমপরিমাণ উগ্র। আর সেই ভিক্টিমের মুখে তো বলারই নেই, এই কুইকোত চরিত্রহীন কাপুরুষ মধ্যবিত্ত সমাজ অন্ধ অনুকরণে এবং নীরক্ত শৌখিনতার চর্চাতেই ব্যস্ত। এই সমাজই বিষ্ণু দে-র তথাকথিত সামাজিক কবিতাগুলোর ব্যঙ্গের বিষয়।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রকারান্তরে 'চোরাবালি'র কবিতাগুলোকে দুভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমত, 'নামার্থব্যঞ্জক' কবিতা— যার মধ্যে পড়ছে সম্ভবত 'ঘোড়সওয়ার', 'গুকেলিয়া', 'ক্রেসিডা' ইত্যাদি কিছু কবিতা। বলা বাহুল্য, এগুলো শেষের দিককার রচনা এবং এগুলো সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথের অনুরাগ উল্লেখিত— এগুলোর কারণেই বোধহয় তিনি পৃথক-গ্রন্থ প্রকাশের প্রয়োচনা দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, আরেক ধরনের কবিতা, যাকে কখনো তিনি বলেছেন 'ব্যঙ্গ ও ভঙ্গু কবিতা,' কখনো 'যথাযথ সমাজচিত্র'— যেগুলো, তাঁর স্বীকার করতে বাধেনি, তাঁকে অপেক্ষাকৃত কম টানে। তিনি নিজেই এই রুচিবোধের তারতম্যের কারণ নির্দেশ করে বলেছেন, তিনি যেহেতু 'সামাজী-

করণের মোহ' কাটাতে পারেন না, তাই 'বিষয়াতিরিক্ত কারাচর্চা আর নৈর্ব্যক্তিক পুরুষদৃষ্টি' যেখানে ঘটে, 'নৈরাত্মা উপকরণে স্বকীয়তার সৃষ্টি' যেখানে হয়, সেখানেই তাঁর মন সায় দেয়। ব্যক্তিগতভাবে আমার কাব্য-সংস্কার ভিন্ন পথে চলে। বিভিন্ন ধরনের কাব্যোপভোগ সম্ভব বলেই শুধু নয়, কাব্যের মধ্যে সমাজের, একেবারে বিশেষ কালের ও সমাজের ছাপ পড়লে বা তার টান থেকে কবিতার জন্ম হলে, সার্থকতার ক্ষতি হয়, এমন অভিজ্ঞতা আমার হয়নি। তাছাড়া, 'চোরাবালি'র কবিতাগুলোকে এক সঙ্গে পড়তে বা একটি কবিতার স্মৃতিতে ( রেশ থাকতে থাকতে ) আরেকটি কবিতা পড়তে আমি অভ্যস্ত বলেই হয়তো। এরকম বিচারে আমার মন সায়ও দেয় না ( বা হয়তো সম্ভব ছিল না সমসাময়িকদের কাছে, যাঁরা কবিতাগুলোকে বেশ সময়ের ব্যবধানে পত্রস্থ হতে দেখেছেন )।

'চোরাবালি'তে যাকে বলা হয় পাণ্ডিত্য— অর্থাৎ গ্রীক নামের উল্লেখ, ফ্রয়েড-এর তত্ত্ব, 'কেম্ব্রিজ-এর মন্তব্য' ইত্যাদি ইত্যাদি কাজ করেছে। ফলে বহু কবিতাই যথোচিতভাবে হয়তো পৌঁছয় না— অপরিচিত বা অর্ধ-পরিচিত থাকে। এই 'পাণ্ডিত্য' অনিবার্য নয়, এমন কথা যেমন আমার মনে হয় না, তেমনি পাণ্ডিত্যের বিষয়টাই একটা মজার ব্যাপার, এমন কথা আমি বলতেও চাইতে পারি না। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু যখন রবীন্দ্রনাথের উক্তি 'বিষ্ণু দে-র মতো এলিয়ট-ভক্ত কখনো নিছক অন্তঃপ্রেরণায় তাগিদে কাব্য লেখেন না' উদ্ধৃত করে প্রশ্ন করেন : 'তবে কিসের তাগিদায় লেখেন ?'— তখন যেমন বুঝি, শুধু 'নিছক' শব্দটি চোখ এড়িয়ে গেছে বলেই নয়, এই পাঠকের অনাধুনিকতা আরো গভীরে (রবীন্দ্রনাথের বর্তমানভক্ত বুদ্ধদেব বসু আশা করি এখন আর সে-প্রশ্ন করেন না ), তেমনি 'চোরাবালি'র পাণ্ডিত্য-চর্চাতেই যিনি কালক্ষেপ করবেন এবং কোন্ শাস্ত্র না জানলে কবিতা বোঝাই যাবেনা, এই হিসেবে মাতবেন, সেই অরসিকের ছায়া না মাড়িয়ে গ্রন্থটি পাঠ করাতেই আমি পক্ষপাতী।

১৯২৬ থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত মাত্র পাঁচটি কবিতা স্বতন্ত্রভাবে ছাপা হয়েছে — প্রত্যেক বছর একটি করে ( ১৯২৭ সাল বাদ )। তাছাড়া ১৯২৪ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে লেখা ষোলটি ছোট ছোট কবিতা ( কবিতাগুলি বিচিত্র ও তাৎকালিক অভিজ্ঞতার দ্বারা আক্রান্ত ) একসঙ্গে পরে প্রথিত হয়েছে, বোঝা যায়। এই একুশটি কবিতাকে মোটামুটিভাবে সমাজসচেতন বাম কবিতা বলে

প্রবেশ করা যায় এবং এগুলো 'উর্বশী ও আর্টেমিসে'র আগে বা সঙ্গে সঙ্গে লেখা। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, বিষ্ণু দে-র মনে এ-সময়ে বিচিত্র ও বিপ্রতীপ অভিজ্ঞতা কাজ করে যাচ্ছিল। একদিকে 'উর্বশী ও আর্টেমিস' গ্রন্থের 'প্রত্যাক' (১৯৩০), 'সাগর-উর্বিতা'র (১৯২৯) মতো উৎকৃষ্ট কবিতা তিনি লিখছেন, অন্যদিকে ঠিক তখনই তিনি 'চোরাবালি'তে 'বিবমিষা', 'উত্তর', 'প্রথম পার্টি'র মতো কবিতায় ব্যঙ্গ ও বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। একদিকে সমাজসচেতন বাঙ্ময়, অন্যদিকে খানিকটা কবিতা-নির্মিতি আবেগ একই সঙ্গে আসছিল বটে, কিন্তু প্রথম কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের পরামর্শে তিনি দ্বিতীয়ভাগের কবিতাগুলিই যান দেন, বোধহয় খানিকটা বিনয়ী সূচনা করার সুবুদ্ধিতে। বহুদিন পর 'চোরাবালি' গ্রন্থে আবার ঐ উজ্জ্বল সমাজব্যঙ্গমূলক কবিতাগুলো যেন মুক্তি পেল।

'চোরাবালি'র কবিতাগুলিকে কালানুক্রমিকভাবে দেখলে দেখা যায়, প্রথম থেকেই প্রকরণের কী নৈপুণ্য তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। ১৯২৬ সালে রচিত 'ঘন-ঘেওয়া-নেওয়া'র কথা তো আগেই বলা হয়েছে। তরুণ কবির এই বিদগ্ধ নাগরিকতা ও সুতীব্র বিরাগ বিস্ময়কর। তারপর একবছর বাদ দিয়েই ১৯২৮ সালে রচিত হয় 'প্রথম পার্টি'। খানিকটা সেন্টিমেন্টাল পোশাকেও এর অভিজ্ঞতার সততা প্রথম কবির কাজ থেকে দূরে আলাদা— বিশেষত এর চিত্রকল্প রচনার অভিনবত্বে ও শব্দব্যবহারের চাতুর্যে। তারপর ১৯২৯ সালে 'বিবমিষা' এবং ১৯৩০ সালে 'উত্তর'। এই কবিতা দুটোই কিন্তু এক হিসেবে 'উর্বশী ও আর্টেমিস' গ্রন্থের সুরটাকে মনে করিয়ে দেয়— একদিকে 'বিবমিষা' কবিতার তীব্র ঘৃণা, 'উত্তর' কবিতার নিঃসঙ্গতা ও ক্লান্তি এবং অন্যদিকে বাঁধভাঙা আবেগের জন্য দুর্নিবার প্রতীক্ষা।

১. গভীর আষাঢ় ঘৃণা— ঘৃণার এ সমুদ্রের পাশে
প্রেম যে সোনাজল শুধু শ্রাবণের জোয়ার। (বিবমিষা)

২. নিঃসঙ্গতা মুখোমুখি অসলক !
দুপাশে ঘনায় ক্লান্তির মেঘাবেশ। (উত্তর)

বিষ্ণু দে-র কবিতার মূল বিষয় এবং দৃষ্টিভঙ্গি যেন প্রথম কাব্যগ্রন্থেই স্থির হয়ে গেছে, তারপর সারা জীবন ধরে চলেছে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা ও প্রকরণের মধ্য দিয়ে সেই একই সিদ্ধান্তে পৌঁছনো।

১৯০২ থেকে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত সময়ে রচিত কবিতার সংখ্যাই বেশি— এসময়ে তিনি দু-ধরনের কবিতাই লিখেছেন— সেই তথাকথিত সমাজসচেতন

এবং নানার্থব্যঞ্জক কবিতা। তার মধ্যে ১৯৩৯-৪১-৩৫— এই তিন বছরই হচ্ছে সবচেয়ে উর্বর সময়— এ গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলো এ সময়েই রচিত, এ কথাও বলা চলে।

'চোরাবালি' গ্রন্থের মূল ভাব আলোচনা করলে দেখতে পাব, যে কয়েকটি বিষয় পূর্বগ্রন্থ 'উর্বশী ও আর্টেমিসে' ছিল, তা এখানেও ঘুরে ফিরে এসেছে। অর্থাৎ ঘৃণা ও ক্লান্তি, প্রেমের অপরাদ্ধির বা অসাধ্য সম্পর্কে চেতনা এবং শেষ পর্যন্ত প্রেমের একটি দীপ্ত ও প্রসন্ন রূপ। তাই 'উর্বশী ও আর্টেমিসে'র সিগনেট সংস্করণের (বৈশাখ, ১৩৬৭) পেছনের মলাটে লেখা আছে বটে: "ঘৃণা আর হিংসা, হতাশা আর ক্লেদ যখন একশ্রেণীর আধুনিক লেখকদের মূলধন, বিষ্ণু দে-র অবলম্বন তখন প্রীতি আর প্রেম," কিন্তু একথা পুরোপুরি সত্য নয়। এই দুটি কাব্যগ্রন্থেই ঘৃণা বা হতাশা বা ক্লেদ পুরোমাত্রায় আছে— কিন্তু লক্ষ করবার যেটা তা হচ্ছে, এগুলো কোনো নেতিবাচক বা চূড়ান্ত অভিজ্ঞতা হিসেবে নেই এখানে। বরং প্রবল ভালোবাসা ও প্রবল ঘৃণা একই সত্তা থেকে বা একই উপলব্ধি থেকে আসছে, এদের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক তাঁর চিন্তার কাঠামোয় সুনিশ্চিতভাবেই রয়েছে। এটাই বরং আরো স্পষ্ট এবং শাণিত হয়েছে তাঁর পরিণত জীবনের কাব্যে। তুলনা করলে অবশ্য দেখা যায়, চোরাবালি'তে ক্লেদটাই জোরালো, 'উর্বশী ও আর্টেমিসে' যেমন প্রেম।

'চোরাবালি'র বেশ কতকগুলি কবিতাতেই দেখছি ক্লান্তি-হতাশা-নিঃসঙ্গতাবোধ কখনো ব্যক্তিগত উপলব্ধিতে, কখনো ব্যাপকতর সমাজচেতনায় হানা দিচ্ছে— 'উর্বশী ও আর্টেমিসে' যে লক্ষণ আমরা প্রধানত ১৯৩১ সালের কবিতাগুলোতে বারবার পেয়েছি।

১. তোমাকে দেখিনে বটে রি ধরে মোর প্রতিবাহুশিরা·· (বিবমিষা, ১৯২৯)

২. প্রহর যায়,
প্রহর যায়,
একেলা কাটাই নক্ষত্রহীন। (হেলেনিস্ট, ১৯৩২)

৩. ভুলে গেছি কিবা ভুল— দিনগুলি ক্লান্ত হতাশায়
হেমন্তের কুষ্ঠরোগে গতপত্র অরণ্যের মতো। (প্রিয়াকায়েলাইট, ১৯৩২)

৪. কফির পেয়ালা হাতে,
শহরের শুভ্র প্রাতে,

—

বিষাদ ছবিরে
বিদ্ধ আলোয় বলে বিহ্বল রাত্রির
স্মৃতি দেখি··· (খোয়ারি, ১৯৩২)

'উর্বশী ও আর্টেমিস' গ্রন্থে কিন্তু দেখেছিলাম, ১৯৩১ সালের ঐ ক্লান্তি ও বিরাগ থেকে উঠে এসে ১৯৩২ সালের কবিতাগুলোর মধ্যে যেন প্রেমে আস্থা ফিরে পেয়েছেন। অবশ্য দু-এক বছরের মধ্যে এরকম চুলচেরা বিচার করা হয়তো অবান্তর, বিশেষত কবির জীবনের তৎকালীন ঘটনা আমার যখন জানা নেই। বড় জোর বলা যায়, এসময়ের রচনায় দুটো মনোভাবই পর্যায়ক্রমে কাজ করে যাচ্ছিল। কিন্তু আমাদের এখানে মূলত লক্ষণীয়, এ গ্রন্থে একদিকে 'দিনগুলি যায় ক্লান্তিতে উজলি' এবং অন্যদিকে 'এ জীবন এক দীর্ঘশ্বাস' খুব অনিবার্যভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছে। বলাবাহুল্য, পূর্বে উল্লিখিত সামাজিক পটভূমি এবং সে-সম্পর্কে বিষ্ণু দে-র বিভিন্ন স্তরে প্রতিক্রিয়াই এর জন্য দায়ী।

এই মনোভাব থেকেই সংগতভাবে জন্মায় প্রেম সম্পর্কে একটি বিশেষ ধারণা, অর্থাৎ 'প্রেম-প্রেম' সম্পর্কে অবিশ্বাস এবং সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গপরিহাস। প্রথমটা অবশ্য 'উর্বশী ও আর্টেমিসে'ই পেয়েছিলাম, কিন্তু এখানে তার প্রকাশ আরো তীব্রভাবে এবং আবেগের তুলনায় মননের চাপে রূপান্তরিত হয়ে।

১. অভ্যাস, শুধু অভ্যাস, লিলি, তাই তো আসি
তোমার উষ্ণ প্রেমের হাস্যচপল নীড়ে।
(কনফিশন্‌স্ অফ্ হোপ্‌স্, গার্হস্থ্যাশ্রম)

২. সুযোগ পেয়ে তো তবে পাশাপাশি মিলি?
আমাদের ভালোবাসা প্রাকৃতিক লিলি। (আত্মজান, ঐ)

৩. নতুন তো নেই কিছুই! এখন করব কি যে!
করব কি যে?
বেলার ক্লান্ত, শ্রান্ত লাগে! (মন-দেওয়া-নেওয়া)

৪. সে কথা তো জানি তোমাতে আমার ত্রুটি নেই···
হৃদয়দানের সুর কেঁপে যাই অভ্যাসেই। (নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ)

কিন্তু ব্যঙ্গপরিহাসটা নতুন— 'চোরাবালি'তেই প্রথম পেলাম সমাজ-সচেতন ব্যঙ্গ। অর্থাৎ এই ঘৃণা, ক্লান্তি, অবিশ্বাস এগুলো প্রধানত আবেগাশ্রিত উর্বশী ও আর্টেমিসের কবিতায়, চোরাবালিতে সেখানে স্থান নিয়েছে বুদ্ধি ও মনন। আমার ব্যক্তিগতভাবে এই সামাজিক ব্যঙ্গ কবিতাগুলো ভারি পছন্দ।

পরবর্তীকালে এই ধরনের বহু কবিতা লেখা হয়েছে এবং এগুলোর পেছনে বিষ্ণু দে-র প্রভাব বিশেষ কাজ করেছে বলে মনে হয়। উদ্ধৃতি দেওয়া খুব মুস্কিল, সারা গ্রন্থ জুড়েই রয়েছে। তবু আমি একটু বিস্তৃত উদাহরণ দেওয়ার চেষ্টা করব।

১. নাকি আমি সংস্কৃত, প্রাকৃত ও পালি
পড়েছি পারিনে দিতে, তাই চোখে আলো
কৌতূহল নামে বস্তু, অলকা, বলো তো। (পূর্বরঙ্গ, পাঠশালা)

২. লেকে আজকাল সকলেই যায়।
সকলেরই মতো এ-ও সন্ধ্যায়
তুমিও যাচ্ছ! কী দুর্ভোগ! (বেতাল, ঐ)

৩. তোমার পাশে তো তাই বেঁষে এসে মিলি
সিগারেট না খেয়েই হাসত যে লিলি! (আদিত্যেবিল প্রত্যাদেশ, ঐ)

৪. শহরের বুকে পাতভাড়ায়
নেব সখী এক ছোট্ট ফ্ল্যাট!
ট্রাম বাস্ ভিড় নিত্য যার—
উচ্চ বৃক্ষচূড়ে পৌঁছায়
ভিতেতে থেকেও কী বিরালায়!
গোলমাল যেন পায়ের ম্যাট! (কবি কিশোরে)

৫. অতএব, মেসে কাটাও ভরপেটে
দৈনিক বেশ কাজ খালি কোথা রবে
খেলার নেশায় ভিড় তাতো মাঠ ভরে
আর বেশ রসে সিনেমার পোস্টার,
এলবার্ট হলে তারপর সোনো বসে
খোলা ইতিহাসে বানাবাটে উদ্ধার। (বেকার বিহঙ্গ)

৬. দুরেলের সুবর্ণের অঙ্গীল নিশ্বাসে
ভারাক্রান্ত হাওয়া বেশ। (প্রথম পার্টি)

৭. জনের প্রেত শরীরহীন ঘুরে বেড়ায় আজো
ত্রিভিক্ষে— হে অতনু! বীর তবুতে সাজো। (তথকতা)

৮. তবুও যে নেই এই লিলি ধ্রুবা অলকার ভিতে,
গ্রামোফোন-সঙ্গীতের ইন্দ্রজাল বিচিত্র সন্ধ্যায়,

গোধূলি-মায়ায় ঘুম মোটরের সীটে,
চুম্বনতাড়নাকম্পপ্রবাহ সিনেমায়
মেলে নাকো ভিয়োটিমা, তার সিন্ধু আছে কি প্রমাণ ? (ঐ)

৯. সুরেশের অবসরক্ষয়ের বয়ন
তাই
সুরেশের মানসজীবন। (ঐ)

১০. অথবা শোনো—
মানুষ যে পশু প্রমাণ তার
আহার তার।
মুখব্যাদান, দন্তবিকাশ, চর্বণ, ঠোঁটে হাতে মাখামাখি,
অজীর্ণতা
ইত্যাদি সব কী হাল্কা ছক বর্বরতা ! (ঐ)

বলাবাহুল্য, এই ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের উৎস হল আমাদের খুব পরিচিত উচ্চ মধ্যবিত্ত এবং ধনী সমাজের সেই অংশ, যাদের কৃত্রিমতা এবং স্বার্থপরতা শেষপর্যন্ত শ্লীল যুবতীদের রূপ ধারণ করেছে। জীবন তাদের কাছে শাঁসালো গানানো এক কূপ। এদের সম্পর্কে কোনো সামাজিক দলিল আমাদের হাতে নেই। বরং দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালীন এই সমাজের চেহারা সাহিত্য থেকেই পেতে হয়। যেমন, রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'য় আমরা তার কিছু কিছু আভাষ পেয়েছিলাম। বুর্জোয়া সমাজের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সেই চরিত্রহীন সেবকদের সম্পর্কে ঘৃণা জমা করেছেন এখানে বিষ্ণু দে, তাঁরাই তো আধুনিক কবি ও পাঠকের সবচেয়ে পরিচিত জগৎ।

সুধীন্দ্রনাথ এই ধরনের কবিতা, যেখানে 'অর্থবৈচিত্র্য বা বিষয়াতিক্রমের অবকাশ অত্যল্প', তার প্রতি অনীহা থাকার জন্যই অত্যন্তভাবে মন্তব্য করেন। 'কেসিডা বা ওকেলিয়ার মতো এই নিঃসম্বল লিলি-রমা-অলকার ভাগ্যে বিষ্ণু দে-র করুণা-কণা জোটে নি···এবং ফলে এরা তাঁর বিশ্ববীক্ষার দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে নি, শুধুই জুগিয়েছে তাঁর নেতিবাচক অবজ্ঞার উপলক্ষ্য'। ব্যঙ্গের সঙ্গে করুণার যে বিরোধ নেই, একথা সুধীন্দ্রনাথ তখন খেয়াল করেন নি— বরং অনিশ্চিত মানবপ্রীতির সঙ্গেই আছে বিদ্রূপ বা ব্যঙ্গের নিকট সম্পর্ক। নেতিবাচক অবজ্ঞা তো নয়ই। এটা মনে রেখেই শ্লেগেট বলেছিলেন, ব্যাটকে মেয়েটির দুঃখে কারুণ্য ঘটে, কারুণ্য নাও ঘটে। সুধীন্দ্রনাথ যখন বলেন, 'বোকা

যায় না বিষ্ণু দে কখন হাসছেন, কাঁদছেনই বা কখন'— তখন তার জবাবে ব্রেখটের ঐ উক্তির প্রতিধ্বনিতে বলা যায়, তিনি সব সময়ই কাঁদছেনও বটে, হাসছেনও বটে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই বিশ্লেষণেই যেহেতু তাঁর কবিতা শেষ হয়ে যায় না, তাই বোঝা যায় তাঁর মানসিকতার সর্বগ্রাসী সমগ্রতাকে, সমবায়ীর তৎপরতাকে। প্রেম সম্পর্কে একটি সঙ্কুচিত মনোভাব যেমন ঐ যাদের উৎস এবং সেটা খুবই স্বাভাবিক পটভূমির অবিকৃত প্রতিক্রিয়া হিসেবে, তেমনি কবির সীমাতিশায়ী এবং পরাক্রান্ত জীবনচেতনার পরিচয় পাই, যেখানে প্রেম সম্পর্কে তাঁর উৎসাহী মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে— যদিও উর্বশী ও আর্টেমিসের তুলনায় এই বোধ খানিকটা হয়তো এখানে সংকুচিত।

১. বারবার বাতাসের হাতে লেগে লেগে
পুঞ্জীভূত বাতাসের বেগে
ঝরে যাবে বিড়ম্বনা, মুক্তি পাবে মানসবলাকা।
হৃদয় তোমার প্রিয়া আমার মনের নীলে মেলে দেবে পাখা।
তোমার ও দীপ্তি মুক্তি পাবেই আমার চিত্তে, কোনো তপ্ত তমালে,
একদিন, একরাতে, কোনো এক কালে। (পঞ্চমুখ ৩)

২ হে বীর অতন্দ্র, নাচিকেত বল্গু টানো,
দেহদুর্গের রক্ষায় মোরে আনো—
তোমার প্রাকৃত বাহুতে, মহাশ্বেতা। (মহাশ্বেতা)

সুধীন্দ্রনাথের সুলিখিত রচনাটির গুণে এবং আধুনিক বাংলা কবিতার সংকলনগুলোর আনুকূল্যে 'চোরাবালি'র বিশেষ কয়েকটি কবিতা জনপ্রিয়তা লাভ করেছে পাঠকসমাজে। তার মধ্যে অবশ্য তিনটিই সুধীন্দ্রনাথ-কথিত বিবিধার্থক কবিতা : ওফেলিয়া, ক্রেসিডা এবং ষোড়শওস্তার। বাকিটা 'প্রহসনজাতীয় নাট্যরচনা' : টিয়া-চুঁয়ী।

ওফেলিয়া এবং ক্রেসিডা, দুটো কবিতার পেছনেই শেক্সপীয়রের নাটক এবং অন্যান্য বহু রচনা প্রত্যক্ষভাবে কাজ করেছে। অথচ এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, তিনি অসাধারণ মৌলিক দুটি কবিতা রচনা করেছেন— সুধীন্দ্রনাথের ভাষায় 'মৈরাত্ম্য উপকরণে এতখানি স্বকীয়তার সৃষ্টি'। এই অর্থেই তিনি কবিতা দুটিকে বলেছেন 'সংক্ষিপ্ত সামাজীকরণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ'।

আগে বলেছেন, গীতিকবিতা ও নাটোর অপূর্ব সম্মিলন ঘটেছে এখানে। 'বাস্তব ওফেলিয়া যদিচ গীতিকবিতার শ্রেণীভুক্ত; তবু তার ভাববিস্তার একখানা পঞ্চাঙ্ক নাটকের উপযোগী।' অথচ শেক্সপীয়রের এই নাটকের পুনর্বর্ণন করে তিনি কিন্তু ব্যাপকতর সত্যের কথাই বলেছেন—'প্রেমিক সাধারণের দুর্বীর্য জীবনকাহিনীর সারসংগ্রহই শুধু নয়', তাদের অবশ্যম্ভাবী ট্রাজিডিরও। ওফেলিয়া তাই বিষ্ণু দে-র কবিতায় 'সার্বভৌম বিপ্রকর্ষের প্রতীক'। প্রাত্যহিক তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে ট্র্যাজেডির মহিমা আরোপের জন্যই তিনি হ্যামলেটের মধ্যস্থতায় এই কথা বলেছেন এবং 'তাঁর ব্যক্তিগত অভাব-বোধের গোপনে শেক্সপীয়রের বিশ্বমানবিক ছায়া পড়েছে'। ক্লেনিক্স কবিতাতেও আছে এই নাট্যরচনার প্রচেষ্টা— তিনি নাকি এখানে 'বাণী, বিবাদী ও অনুবাদী ভাবের নাটকীয় প্রতিসাম্য ঘটিয়েছেন'। এ বিষয়ে তিনি চসর, হেনরিসন ও শেক্সপীয়রকে একক্রমে গ্রহণ করেন নি, প্রত্যেককেই অসম্পূর্ণ ঠেকেছে, প্রয়োজনমতো তাঁদের মিলিয়েছেন স্বাধীন ও স্বকীয় নির্বাচনে। তিনি দেখাতে চেয়েছেন, 'প্রাণযাত্রার প্রত্যাবর্তন নেই এবং অভ্যাসবশে আমরা ক্রমাগত পেছনে তাকাই বটে, কিন্তু কার্যত পুনরুজ্জীবিত অতীতের সাদর সংবর্ধনা মর্ত্যবাসীর স্বভাববিরুদ্ধ'। কবিতা-দুটি সম্পর্কে এই হচ্ছে সুধীন্দ্রনাথের বক্তব্য।

সন্দেহ নেই, চোরাবালিতে প্রেম সম্পর্কে অবিশ্বাস এবং মোহমর্দন যে বহু সমালোচনামূলক কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে, সেই মনোভাব থেকেই কবিতা দুটি রচিত। অবশ্য উচ্চারণরীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে, তিরিশের কবিদের, বিশেষত সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে-র তৎকালীন কাব্যাদর্শের পরিচয় মেলে। নিজের একান্ত প্রাতিস্বিক অভিজ্ঞতার মধ্যে বিশ্ববীক্ষা নয়, বরং কোনো 'নৈর্ব্যক্তিক উপকরণের' মধ্যেই স্বকীয় অভিজ্ঞতার সঞ্চীকরণ তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। "কবির ব্রত তার স্বকীয় চৈতন্যের রূপায়নে শুদ্ধ চৈতন্যের উদ্বোধন" ( কাব্যের মুক্তি, সুধীন্দ্রনাথ )। এবং তখন এই কাব্যাদর্শের তাগিদেই পাণ্ডিত্য এবং মননচর্চা এবং প্রাসঙ্গিক দুর্বোধ্যতা খানিকটা অনিবার্য ব্যাপার। ইংরেজি সাহিত্যের এই দুটি নারী চরিত্রের মধ্য দিয়েই বিষ্ণু দে তাঁর উপলব্ধির কথা বলতে চেয়েছেন, তার কারণ 'বিশ্বাসঙ্গতের ঘরে অভিমুক্তা' এই চরিত্র-দুটিই তো হতে পারে তাঁর ঐ তৎকালীন চিন্তার সার্থক objective correlative। হ্যামলেট মনে করেছিল, ওফেলিয়া অবিশ্বাসিনী— তাই প্রেম সম্পর্কে তার

সব সাধ-আশা ধূলিসাৎ হয়। ক্রেসিডা-কবিতাতেও ট্রয়লাসের জবানিতে এই অবিশ্বাসিনীকে দেখানো হয়েছে। চসর, শেক্সপীয়র কিংবা হেনরিসনের কাব্যে বর্ণিত এই চরিত্রটি পুনরায় বিষ্ণু দে-র কবিতায় ফিরে এসেছে বিশ্বাস-ভঙ্গের প্রতীক হিসেবে।

এই দুটি চরিত্রের মধ্য দিয়েই তিনি শেষ পর্যন্ত যা প্রকাশ করতে চেয়েছেন, তাতে আমরা বুঝতে পারি তিরিশের যুগের বাংলা দেশের বিত্তবান সমাজের পটভূমিকায় মুক্ত ও সুস্থ প্রেমের অভাব কীভাবে এই নৈরাশ্য ও বৈরাগ্যে পৌঁছে দিয়েছে কবিকে। যে-ওফেলিয়া হ্যামলেটের মন ভুলিয়েছিল, তার মনে জাগিয়েছিল উত্তপ্ত প্রেমের উজ্জ্বল সম্ভাবনা— তিনি দেখতে পাননি মেয়ের বেপরোয়া আড়ালে যন্ত্রের যাওয়া-আসা— ফলে যা ঘটবার ঘটল : 'অমরাবতীর দৈব প্রাচীর চুরমার হল মর্ত্যলোকেই'। হ্যামলেটের মোহ, প্রেম সম্পর্কে আশা এবং সম্ভাবনা বারবার জাগছে বহু চিত্রকল্পের মধ্যে— মাঝে মাঝেই সংশয় উঁকি দিচ্ছে বটে— কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই আলোছায়ার লীলা ভেঙে যায় চূড়ান্ত বিনাশে। ক্রেসিডা কবিতাতেও তাই : আশা ও নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব, স্মৃতি ও বর্তমানের দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত নিষ্ক্রিয়তার অভাবে শেষ হয়। একদা যে-ক্রেসিডা ট্রয়লাসকে ছেড়ে গিয়েছিল, তাকেই আবার তিনি পান অন্যরূপে, ভগ্নঐশ্বর্য রূপে। ক্রেসিডার স্মৃতি বারবার আসে, বারবার মনে পড়ে তার প্রাক্তন লাবণ্যের মাধুর্য— কিন্তু ফেরার উপায় নেই, বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে— শুধু অবশিষ্ট পড়ে থাকে বড় জোর একটি লাইন : 'স্মরণে তোমার হানে আজো ছুরিকারি'।

এই হচ্ছে কেন্দ্রীয় বিষয় কবিতা-দুটির— এই দ্বন্দ্ব— তারই প্রেরণায় আসছে একের পর এক চিত্রকল্প ; অনুভূতির মধ্যে দ্বন্দ্ব আসছে ; চিত্রকল্পের বিন্যাসে, আপাতবিচ্ছিন্ন সমাহারে ও আকস্মিকতায় তার আভাস।

'ওফেলিয়া' এবং 'ক্রেসিডা' কবিতায় 'নৈরাশ্য উপকরণে'র দ্বন্দ্ব দিয়ে যা বলার চেষ্টা হয়েছে, তাই সামাজিক বাস্তবতার ভাষায় বলেছেন তিনি 'টম্মা-টুংরী' কবিতাটিতে। অর্থাৎ আমাদের নাগরিক জীবনের খণ্ডতা ও অসংলগ্নতা এবং নৈরাশ্যের কলশ্রুতি। চোরাবালিতে এলিয়টের প্রভাব গভীর ভাবে কাজ করেছে, সবাই বলেছেন। গীতিকবিতায় নাটকীয়তা বা টেনসন সৃষ্টির যে নির্দেশ এলিয়ট দিয়েছেন, তার ব্যবহার পেলাম 'ক্রেসিডা' ও 'ওফেলিয়া' কবিতায় এবং বস্তুনিষ্ঠতার চূড়ান্ত সাধনা। 'টম্মা-টুংরী' কবিতাতেও

এলিয়টের প্রকরণ-কৌশলের স্পষ্ট ছাপ আছে। এ ধারায় অবশ্য পরবর্তীকালে আরো অনেকে কবিতা লেখেন, যেমন সমর সেন। অর্থাৎ কোনো প্রতিষ্ঠিত কবির কবিতাকে পুনর্লিখন করে বৈপরীত্যটা স্পষ্ট বুঝিয়ে দেওয়া হল দুই যুগের, দুই জগতের পার্থক্য। তাছাড়া কবিতার ভেতরেও সর্বত্র, উপমার চিত্রকল্প উল্লেখে পুরোনো কবিতার ছিন্ন চরণ, টুকরো শব্দ বসিয়ে বসিয়ে কখনো প্রতিতুলনায়, কখনো সার্থক অনুষঙ্গে বিচিত্র মেজাজ তৈরি হয়েছে—আবেগ ও মননের এক জটিল মিশ্রণ, ব্যঙ্গ ও সরলতার দ্বৈতলীলা। কবিতাটি যেন রবীন্দ্রনাথের 'ভাষলী' কাব্যগ্রন্থের 'থমকিত' ও 'অপর পক্ষ' কবিতার পুনরাবৃত্তি। কিন্তু বলা বাহুল্য, এই সম্পূর্ণ মৌলিক কবিতায় রবীন্দ্রনাথের সরল আবেগ অনুপস্থিত, আমাদের খণ্ডিত বর্তমান ফুটে উঠেছে এর বক্রোক্তিতে ও প্রকরণে।

'দাঁড়িয়ে আছে একটা খালি ট্রেন—
যেন আদিকালের প্রকাণ্ড সরীসৃপটার কঙ্কাল···
ডাকলেম নাম ধরে,
কী জানি ছাড়া আর কোনো কারণ নেই
যেন পাগলামির।
তার আশা শূন্য প্লাটফরম্ ছুড়ে ফুলুটিত'। (অপরপক্ষ)

'এল ট্রেন
মথিত করে রক্তের জোয়ার···
হায়রে! আশার ছলনে ভুলি!
কোথায় তুমি! ট্রেন তো এল!
কয়লাখনি জ্বলে পুড়ুক,
ধর্মঘট নাই বা থামল,
ট্রেন তো এল! (টিয়া-টুংরী)

লিপিকার জগৎ, বলাকার জগৎ, কখনো বা লৌকিক ছড়া—পুঙ্খানুপুঙ্খ বাস্তব চিত্রকল্প, তার ঘন আবেগ, কখনো নিকষ গদ্য ('স্বেচ্ছাতন্ত্র ছেড়ে, স্বৈরাচারী ট্রামই ভালো"···), শেষ স্তবকে হঠাৎ ভাবালু আত্মপ্রকাশ, ইত্যাদি ইত্যাদি এক সমাজনাটা তৈরী করেছে, যেখানে ঐ অপ্রাপ্তির নৈরাশ্যই বাজছে

তীব্রভাবে। 'ওফেলিয়া'র পাশে 'টলা-ঢুংরী'র এই পার্থক্য বিষ্ণু দে-র বিচিত্র আঙ্গিক-সাধনার ও পরীক্ষানিরীক্ষার সচেতনতা প্রমাণ করে।

এর পাশে একই বছরে লেখা ( ১৯৩৪ ) 'ষোড়শওয়ার' কবিতাটিকে আমি এই নৈরাশ্য থেকে মুক্তির নিদর্শন হিসেবে দেখি।

'টলা-ঢুংরী' কবিতাটি শেষ হয়েছিল এই আত্ম-সংলাপে :

'হায় রে !
—আমার ফাঁকা লিবিডোকে এখন চালাব
কোন্ বুর্জোয়া খেয়ালের বাঁকা খালে ?
কোন্ রূপদী অবলম্বনের নিদ্রাহীনতায় ?'

লিবিডোকে শেষ পর্যন্ত কোনো বুর্জোয়া খেয়ালের বাঁকা খালে কিংবা রূপদী অবলম্বনে চালাতে হয় নি ; এই লিবিডোরই অবাধ প্রকাশ দেখছি 'ষোড়শওয়ার' কবিতায়। সবাই জানেন, ফ্রয়েড যার যতো যৌনতার প্রাধান্য দেখতেন, মনোবিজ্ঞানী হু- সেই লিবিডো বা জীবনীশক্তিকে আরো ব্যাপক পৌরাণিক ভিত্তিতে দেখেছেন। এই কবিতার পেছনে ফ্রয়েড বা হু- কোনটার প্রভাব অধিক কার্যকর, সে-প্রশ্নও ততখানি জরুরি নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ষোড়শওয়ার শুধু রিয়ংসার রূপক নয়, তাহার উপরে প্রকৃতি-পুরুষ বা ভক্ত-ভগবানের সম্ভোগারোপ সহজ ও শোভন'। অনেকে পরবর্তীকালে বিষ্ণুর বাক্তবিগ্রহ হিসেবেও এটাকে দেখেছেন। বিষ্ণু দে-র জীবনেতিহাস আমাদের কাছে নেই, কিন্তু তবু মনে হয়, শেষোক্ত ব্যাখ্যা কালানৌচিত্য দোষে দুষ্ট হবে, অন্তত কবির প্রেরণা বিচার করতে বসলে। বরং ফ্রয়েড বা হু-নির্দিষ্ট মনস্তত্ত্বের প্রভাব চোরাবালির বহু কবিতাতে আছে মনে করলে, এই কবিতা বিষয়েও সেই তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতাই অনেক যুক্তিসহ।

অবশ্য আমি দেখেছি, এই কবিতা ব্যাপক পাঠক সাধারণের কাছে অনপ্রিয় যে-কারণে, তা হচ্ছে এর কেন্দ্রীয় আবেগ, যে-আবেগ প্রতিটি চিত্রকল্পে, প্রতিটি লাইনে, প্রতিটি পদে সঞ্চারিত। ধ্বনি ও বিষয়ের এমন সুষ্ঠু বিবাহ বাংলা কবিতাতে অল্পই ঘটেছে। সমস্ত কবিতায় প্রতীক্ষার সুর এমন আপাদমস্তক জড়িয়ে আছে, প্রতীক্ষার উৎকণ্ঠা ও আবেগে কাঁপছে যে, কবিতাটির টেনসন সকলকে তাড়িত করে।

নয়নে ঘনায় বারে বারে ওঠা পড়া ?···
আবোজন কাঁপে কামনার ঘোর···

কাঁপে তন্বঙ্গী কামনার থরো থরো।…
কামনার টানে সংহত জেনিয়ার।…

এই ব্যাকুল প্রতীক্ষার পর মিলন ঘটবে যখন, তখন বেলায় থাকবে শুধু, 'হাল্‌কা হাওয়ার হৃদয় আমার ঘরো'। লক্ষণীয় যে, সমস্ত কবিতায় এই 'হাল্‌কা হাওয়া'র সম্ভাবনা বা প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে বার বার।

হালকা হাওয়ার বয়স উঠু ঘরো।…
হালকা হাওয়ার হৃদয় দুহাতে ভরো।…
পাহাড় এখানে হালকা হাওয়ার মোনে…
হালকা হাওয়ার কেটে গেছে কবে / লোকনিন্দার দিন…

এর কোনো মনোবৈজ্ঞানিক গূঢ়তত্ত্ব আছে কিনা জানিনা, আমার কাছে এর মানে আনন্দ বা প্রীতির সেই আকাঙ্ক্ষিত জগৎ, যার জন্য এই প্রাণাবেগের আকুল উৎসার। 'গার্হস্থ্যাশ্রমে'র অন্তর্গত 'গ্রহণ' কবিতাটিতেও এই স্বীকৃতি আছে :

'তোমার কথায় পাখা মিল প্রিয়া আমাকে আকাশে,
নক্ষত্র-কম্পিত লোকে আনন্দের লঘিষ্ঠ হাওয়ায়।
নিয়ে গেল আন্দোলিত রজনীগন্ধার তন্ত্রবনে।…
অন্ধকার চোখে নির্ঝরের যাদুরী ঘনায়।'

উর্বশী ও আর্টেমিস-প্রবেও যেমন সামাজিক বিন্যাসের পর উচ্চারণ করলেন 'হৃদয়ের আবেগে ছেঁড়া তোমার সে নির্ঝরের গান / চিরজীবী যৌবনে আমার'। এই কবিতাটি যে-আবেগের কথা বলছে, তারই রেশ যেন বাজছে বহু-পরবর্তী আরও একটি কবিতাতে— অন্তত আমার তা-ই ভাবতে ভালো লাগছে :

'সবারই গুরুভারে বহুলায় স্বকীয় মর্যাদা
যার দিক সবাইকেই ক্ষিপ্রবীর লঘিমা দুর্বার
লাখো লাখো ষোড়শওয়ার সমুদ্রের ঢেউ—
সবেগ চঞ্চল নুড়ো সমুদ্র ছাড়া কি কিছু কেউ?'

(যত বড়বা / নাম রেখেছি কোমলগান্ধার)

সুতরাং, যতই কালের ও সমাজের প্রভাবে তিক্ততা জমুক, ব্যঙ্গ শাণিত হয়ে উঠুক, এ-সমস্তই আসছে সেই প্রাণাবেগ-চঞ্চল প্রেমিকের কাছ থেকে যিনি হালকা হাওয়ার হঠকারিতার ভীরু ঘর ভেঙে দিতে উদ্যত, যিনি আবেগের

সম্পূর্ণ ভাসবেন অতঃপর নিজের অভিজ্ঞতায় বেওয়ারিশকে ক্রমশ ভাসতে থাকবেন।

চোরাবালির কলাকৌশলের প্রশ্ন খুব মূল্যবান। এর প্রশংসায় অনেকেই মুখর। কেউ প্রবহমান মাত্রাবৃত্তের তারিফ করেছেন, কেউ স্বাবীন্ত্রিক মাত্রাবৃত্তকেও তিনি যে 'নিজের সুরে' বাজিয়েছেন, সেজন্য প্রশংসা করেছেন, কেউ-বা শব্দব্যবহারের অসামান্য চাতুর্যের কথা বলেছেন। সুধীন্দ্রনাথ দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখেছেন, মাত্রা-ঘটনের কৌশলে তিনি কীরকম গদ্য-পদ্যের বিরোধ ভঞ্জন করেছেন কোথাও কোথাও; কথারীতি থেকে তিনি দূরে সরে যাননি, অথচ ব্যাকরণগত নৈরাজ্যও ঘটাননি। কিছু কিছু শৈথিল্যের অভিযোগ করেছেন বটে, কিন্তু সাধারণত এর কলাকৌশলের প্রশংসায় তিনি বিশ্বয়করভাবে প্রগল্‌ভ —বিশেষত সুধীন্দ্রনাথের মতো আধিকল্পচেতন লেখক।

শুধু ছন্দের নৈপুণ্য ও বৈচিত্র্যের কারণেই নয় বা ধ্বনিগৌরবেই নয়, চিত্রকল্প-সন্নিবেশেও তাঁর নূতনত্ব ও অন্যান্য উৎসুক্য দেখা যায়। কখনো-বা রোমান্টিক মেজাজে ইন্দ্রিয়ঘন আচ্ছন্নতায়, কখনো স্বদেশী-বিদেশী শব্দের সমারোহে তিনি নানা মেজাজ তৈরি করেছেন।

১. খরস্রোতা শুচিতার শাখা মেলে চকিত শহরে
কত পেশী মেঘবর্ণে সন্ধ্যা নামে কাস্তি মুখে। (সন্ধ্যা)

২. ধর যৌবনে হৃদয়বিহীন তোমার হিয়া,
হাসি তো তোমার বৃথাই ছড়াল দুবার, প্রিয়া! (পঞ্চমুখ ২)

৩. উদাস উর্ধ্বস্বর নষ্টমিঠে ঘরে
শহরে ছাতেও অকাল দখিনা কবে
উতলা উদাস··· (পৃষ্ঠ ৪···/ পাইথ্যাগরাস)

৪. হে মোনালিসা, হে সাইনারা, স্বপ্নজীবনীর বীজনে
এসো এসো এই মলিন আলোর সাগরের খেত কেশর
শাণু দুপায়ে চেকে। (মোকন্দা)

৫. নয়নে তোমার অদিরেফণ মায়া
তনুচ্ছদ দিল কীশ কটিতটে ছায়া। (মহাশ্বেতা)

# রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ'

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

আধুনিক যুগে মানুষ অবশ্যই রাজ-অর্থ-ধর্মনৈতিক বন্ধন থেকে মুক্তি পায়— শুধু তাই নয়, নতুন ব্যবস্থায় সক্রিয় ও স্বাধীন ভূমিকা পালনের প্রকৃত স্বাধীনতাও তার করায়ত্ত। কিন্তু এই মুক্তিই তাকে নিজের এবং জগতের মুখোমুখি এনে দাঁড় করায়— সে মুক্ত হয় সেই সমস্ত বন্ধন থেকে যে বন্ধন তাকে একদা নিরাপত্তা দিয়েছিল, আশ্রয় দিয়েছিল। জীবন আর তার কাছে সেই সংকীর্ণ বিশ্ব নয়, যার কেন্দ্র মানুষ, সে একই সঙ্গে অসীম ও ভয়ঙ্কর বিশ্বের সম্মুখীন হল। তার সীমাবদ্ধ জগতের সেই নির্দিষ্ট মান হারিয়ে ফেলায় অর্থই দাঁড়াল জীবনের অর্থ, তাৎপর্য সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর হারিয়ে ফেলা। ফলে নিজের সম্পর্কে ও জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে এক দুর্নিবার সংশয় ঘনিয়ে উঠল। মানুষ মুক্ত— অর্থাৎ সে একাকী, বিচ্ছিন্ন, অর্থাৎ সে এই অপরিচিত, অসীম ও ভয়ঙ্কর বিশ্বে আগন্তুক; নতুন মুক্তি তাকে দিল সন্দেহ, একাকিত্ব, দুর্বিষহ ক্ষিধা, নিরাপত্তাহীনতার উপলব্ধি।

বলাই বাহুল্য, যতক্ষণ না মানুষ ব্যক্তি হয়ে উঠছে ততক্ষণ এই বিশ্বের জীবন শূন্যতা ও অসীমত্বের মুখোমুখি সে দাঁড়ায় না। ইয়োরোপে এই ব্যক্তির প্রকাশ রেনেসাঁস, বিশেষত রিফর্মেশনের পরে। লুথারের ধর্মমতই নতুন অর্থবান শ্রেণী ও চার্চের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত মধ্যশ্রেণীর অনুভূতিকে প্রকাশ করল। এবং নতুন অতিমানবিক জনতন্ত্রের উত্থানের সম্মুখে এই মধ্য শ্রেণী অক্ষমতা ও ব্যক্তিক অকিঞ্চিৎকরতার বোধে আক্রান্ত ছিল। ক্যালভিনের প্রচারও এই ভীত মধ্যশ্রেণীর উদ্দেশেই নির্দিষ্ট। প্রিডিস্টিনেশনের তত্ত্ব ব্যক্তির ক্ষমতাহীনতা ও তাৎপর্যহীনতা-বোধকে আরও বাড়িয়ে তুলল। অর্থাৎ নতুন জনতন্ত্র, নতুন ধর্মীয় আন্দোলনের একটা মনস্তাত্ত্বিক এ্যাটমস্ফিয়রই তৈরী হল যার ফল মানুষের অনিবার্য স্বর্গচ্যুতি। রীজন বা যুক্তিবোধ মানুষকে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ার প্ররোচিত করে তাকে মধ্যযুগীয় উদ্যান থেকে বিচ্যুত করল— প্রকৃতির সঙ্গে ঘটল মানুষের বিচ্ছেদ। জীবনের তাৎপর্য, অর্থ, মুক্তি সম্পর্কে মানুষের সংশয়ান্বিত চিন্তা জেগে পড়ল— প্রত্যক্ষভাবে মানুষ ব্যক্তি হিসাবে জগতের সম্মুখে দাঁড়াল। সব কিছুর সমাধানের জন্য আর ব্যক্তি অন্যের নির্ভর নয়— সব সমস্যার সমাধান নিজেকে করতে হবে।

বাংলাদেশে এই ব্যাপারটি ঘটল উনবিংশ শতাব্দীতে। মানুষ এখানেও তার পুরনো আশ্রয়— বিশ্বাস, সংস্কার— ছেড়ে নিতান্ত মুক্তিস্পৃহার পথে বিশ্ব-পৃথিবীর মাঝখানে এসে দাঁড়াল। মনন্তত্ত্বের উত্থানমুহূর্তে ইয়োরোপে যা হয়েছিল, প্রায় সেই ধরনের ঘটনাই এখানে ঘটল। বিশেষত ব্রাহ্মসমাজ নবোদ্ভূত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিবিম্বিত করল। হিন্দু ধর্মকে নৈর্ব্যক্তিকতা, তার নানা বাহ্যাচারসর্বস্বতা থেকে মুক্ত করে মুক্তিময় ব্যক্তিমনিষে উন্নীত করাই হোল এই সভার কাজ— ধর্মক্ষেত্রে ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করা, ব্যক্তিমানসকে বহির্মুখী না করে অন্তর্মুখী করায় সচেষ্ট হোল ব্রাহ্মসমাজ। অর্থনীতিক্ষেত্রের মতো ধর্মক্ষেত্রেও ব্যক্তিস্বাধীনতার দাবী ব্রাহ্মধর্ম মেনে নিল। অর্থাৎ পুরনো স্বর্গ, সে যত সংকীর্ণই হোক না কেন, তার থেকে মানুষ বিচ্যুত হোল। এখানেও ইতিহাসে জটিলতা দেখা দিল আরও স্থূল ভাবে— তাই রামমোহন রায় ও তাঁর ব্রাহ্মধর্মের বিশ্বজনীন মানবধর্ম সমস্যার সমাধানে সক্ষম হোল না। উপনিবেশের অর্থনীতি ও অট্টাবক্রতার যে বিচিত্র মনস্তত্ত্বের, এ্যাটমুলিয়রের সৃষ্টি হোল তা আরও অদ্ভুত। এদিক ক্রম যাকে 'ক্রিতম ক্রম' বলেছেন রামমোহন তা অনেকটাই করলেন, কিন্তু 'ক্রিতম টু'-এর কোন চিহ্নই এখানে দেখা গেল না। এদিকে বঙ্গীয় রিনর্ভেসনের ঝোঁকে, সমাজ-সংস্কারের সৎ প্রেরণায় রামমোহন ইংরেজের ওপর যে আস্থা রেখেছিলেন— সে আস্থাও বাঙালী বুদ্ধিজীবীর পক্ষে রাখা সম্ভব হোল না। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্ত'ই তার প্রমাণ। ক্রমে ক্রমে সামাজিক, অর্থনৈতিক, ফলে মনস্তাত্ত্বিক, কারণে ব্যক্তিও ক্রমশ নিজেকে অসহায় ভাবল। অথচ পুরনো আশ্রয় আর নেই— সে এই ভয়ঙ্কর ও অসীম বিশ্বের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। সব সমস্যার, আত্মিক সমস্যার সমাধানে তার আর আশ্রয় নেই— বঙ্কিম তাঁর হিন্দু উপযোগবাদে পরের জন্য আত্মোৎসর্গই মানবের স্থায়ী সুখের কারণ, মনুষ্যজন্মের সার্থকতা— এই সরলীকরণে এলেন। তিনি, দুঃখের বিষয়, ঠিক প্রশ্নটাই তুললেন না। অন্যদিকে বিদ্যাসাগর, বাংলার নবযুগের আশ্চর্য ব্যক্তি, মুখোমুখি দাঁড়ালেন বিপুল বিশ্বের— ভাবলেন ক্রিতম ক্রম থেকেই বুঝি ক্রিতম টু-তে তিনি যাবেন। সমাজের এই বিপুল বাধা অতিক্রম করলেই মানব-অস্তিত্বের মূল প্রশ্নের ও তার উত্তরের হদিস। কিন্তু এই নিঃসঙ্গ মানুষটিও ব্যর্থ হলেন। এবং এই ব্যর্থতা রামমোহনের ব্যর্থতা থেকে আরও তাৎপর্যমণ্ডিত; আরও প্রতীকী। ওদিকে সেই মুক্ত ব্যক্তি আত্মার প্রশ্নে, মানব-অস্তিত্বের

জিজ্ঞাসায়— জীবন ও পৃথিবীর তাৎপর্যের ভাবনায় অস্থির। উনবিংশ শতাব্দী শেষ হয়ে, যত দিন যেতে লাগল ততই, ধর্মীয় বোধ সমাজসংস্কারের ইচ্ছা অন্তর্হিত হোল— ব্যক্তি, বাংলাদেশের ব্যক্তিই, বিরাট শূন্যতা, বিরাট নিঃসঙ্গতা, একাকিত্বের মুখোমুখি হোল— সমাধান চাইল সব কিছুর। উনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর এই পটভূমিকাই রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ'র আলোচনায় সর্বদা স্মরণে রাখতে হয়— কারণ এই শতাব্দীব্যাপী অন্বেষণ ও মৌলিক প্রশ্ন সমাধানের ব্যর্থ কিন্তু তীব্র প্রচেষ্টারই ফসল এই উপন্যাস।

পূর্বেই বলেছি, উনবিংশ শতাব্দীতে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টা ও তার ব্যর্থতার তাৎপর্য নানাকারণেই সুগভীর। ঈশ্বরচন্দ্র উনিশের শতকের সেই প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ, যিনি কোন ধর্মের আশ্রয়ের কথা ভাবেন নি, পূর্ণ মানুষ হিসাবেই তিনি এই বিশ্বের সম্মুখীন হয়েছিলেন। তিনি কোন মতাদর্শ সৃষ্টি করেননি, কোন ধর্মের প্রবর্তক বা প্রচারক হননি। বিষ্ণু দে-র ভাষায়— 'স্বদেশের ধর্মীয়তা অথবা বিদেশের উপযোগবাদ, প্রয়োজনসিদ্ধিবাদ ইত্যাদি তৎকালীন বাণিজ্যসাম্রাজ্যবাদের কোন তাত্ত্বিকতাই তাঁকে বিশ্বাসে-অবিশ্বাসে বিচলিত করেনি, এমন কি করেছে কি না তা প্রচার করবার প্রয়োজন বোধও করেননি, এমনই তাঁর ব্যক্তিসত্তার নৈর্ব্যক্তিক মানবিকতা বা নিঃসঙ্গতা।' বাস্তবিক এই মানবিকতা ও নিঃসঙ্গতা বিদ্যাসাগর তথা আধুনিক ব্যক্তির প্রধান কথা। কিন্তু কলোনীয় নবজাগরণে বা রিনেসাঁসে যখন তার বিচ্ছিন্নতার জ্বালা হয় ওঠে জাগরূক, সেই স্বাধীন ব্যক্তি তখন 'এ রকম ক্রান্তিহীন সংকটাবস্থা'য় সৃজনধর্মী বা ইতিমূলক কর্মিষ্ঠ প্রকাশোন্মুখ ব্যক্তিস্বরূপ স্বভাবতই তীব্র হয়ে ওঠে উৎক্রমণের প্রকাশপথের মুক্তির চেয়ে, তীব্র আত্মরুদ্ধ সম্পিল সচেতনতা নির্গত হতে চায় প্রকাশের বহির্মুক্তপাষাণের মুক্তিতে।' [ বিষ্ণু দে ] বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার চেতনা, যা তাঁর আত্মসচেতনতারই অনুরূপ, এই মুক্তি খুঁজেছিল সমাজবিপ্লবে এবং এটা তাঁর কাছে বিমূর্ত ছিল না, বা এটা ইয়োরোপে সর্ববিধ জ্ঞানের সর্বজ্ঞ পাঠক হয়েও নেহাতই কতকগুলি ইয়োরোপীয় ধারণার সোলাপ বীজ ছড়ানো নয় তাঁর কাছে— সে কারণেই তাঁর চিঠিপত্রে প্রতিধ্বনিত ভ্রান্তি আরও মর্মান্তিক, আরও করুণ— সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীর ক্রিয়মান ক্ষয়ের ব্যর্থতার প্রতীকী ছবি। যেহেতু ঈশ্বরচন্দ্র প্রাণময়তার, যেহেতু জীবনের নিবিড়তায় অনেক ঘনিষ্ঠ যেহেতু কর্মাটারে শীতলতলের

সাহচর্যে, তাদের সংবেদনায় তিনি মুক্তি পেয়েছিলেন— পশু মধ্যবিত্ত জাগরণের তদ্ভাবহ বিকাশের থেকে তিনি নিশ্বাস ফেলেছিলেন এই মাটিরই কাছে মানুষদের সঙ্গে।

বিদ্যাসাগরের আধুনিকতা ও তাঁর প্রচেষ্টা এবং শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতা রবীন্দ্রনাথকে বারেবারেই চিন্তিত করেছে— বারেবারেই তিনি তাই এই মহান পুরুষের কথা আলোচনা করেছেন— এমন কি উপন্যাসের চরিত্রেও ছায়াপাত করেন এই নিঃসঙ্গ মানুষটি।

তাঁর বিখ্যাত বিদ্যাসাগরচরিতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 'অন্তরস্থ মনুষ্যত্বের এই স্বাধীনতার নামই নিজত্ব। এই নিজত্ব স্বাক্তভাবে থাকি বিশেষের, কিন্তু নিগূঢ়ভাবে সমস্ত মানবের। মহৎ ব্যক্তিরা এই নিজত্বপ্রভাবে একদিকে স্বতন্ত্র, একক, অন্য দিকে সমস্ত মানবজাতির সবর্ণ, সহোদর।' বিদ্যাসাগরের মধ্যে এই অন্তরস্থ স্বাধীনতাকে রবীন্দ্রনাথ পান। আরও বলেন, 'সরল সত্যপ্রিয় শাঁওতালেরাও যে অংশে মনুষ্যত্বে ভূষিত, সেই অংশে বিদ্যাসাগর তাঁহার স্বজাতীয় বাঙালির অপেক্ষা শাঁওতালের সহিত আপনার অন্তরের যথার্থ ঐক্য অনুভব করিতেন।' বিদ্যাসাগর চরিত্রের সর্বপ্রধান গুণই ছিল 'করুণার অশ্রুজলপূর্ণ উন্মুক্ত অপার মনুষ্যত্বের অভিমুখে আপনার দৃঢ়নিষ্ঠ একাগ্র একক জীবনকে প্রবাহিত' করা। 'তিনি যে বাঙালি বড়োলোক ছিলেন তাহা নহে, তিনি যে রীতিমতো হিন্দু ছিলেন তাহাও নহে— তিনি তাহা অপেক্ষাও অনেক বেশি বড়ো ছিলেন, তিনি যথার্থ মানুষ ছিলেন।' অর্থাৎ নিতান্ত মানবিকতাই বিদ্যাসাগর চরিত্রের পরিচিতি, তাঁর আইডেন্টিটি। এই আধুনিক মানুষ বা ব্যক্তির ছায়াতেই রবীন্দ্রনাথ আঁকেন তাঁর চতুরঙ্গ উপন্যাসে শচীশের জ্যাঠামশাই-এর চরিত্র। যেহেতু শচীশের একাকিত্ব, নৈঃসঙ্গ্যের যন্ত্রণা খানিকটা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই [নবজাতকের 'প্রশ্ন' বা বিখ্যাত 'প্রথম প্রশ্ন'— কবিতা দু-টি স্মরণীয় ], যেহেতু এই সিদ্ধান্তের গুরুত্ব আরও বেশি। কারণ শচীশ দুঃসহ একাকিত্ব, অস্তিত্বের যন্ত্রণায় অস্থির সেই ব্যক্তি যার স্বর্গচ্যুতি ঘটেছে— তদ্ভব বিশ্বের প্রথম প্রশ্নের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সে বিহ্বল। সেই ব্যক্তি প্রথমে ভেবেছিল কলোনীর পশু জীবনের বীভৎসতায় বুঝি বিদ্যাসাগরের মুক্তিদাতা অপারমনুষ্যত্ব অর্থাৎ জনমোহনের মুক্তিপূর্ণ নাস্তিকতা বা অন্য অর্থে ধর্মনিরপেক্ষ প্রচণ্ডতা আস্তিকতাতেই মুক্তি। জনমোহন, বিদ্যাসাগরের ( যিনি বেদান্তকে ভ্রান্ত

বলতেও দ্বিধা করেননি ) যতই, 'ঈশ্বর নেই' এই যুক্তি থেকে 'ঈশ্বর মৃত'— এই সিদ্ধান্তে এলেন না। তিনি তাঁর ভ্রাতা হরিমোহনের এক অভিযোগের উত্তরে যে কথা বললেন, তা কি ভঙ্গীতে কি বক্তব্যে মূলত বিদ্যাসাগরীয়।— 'আমরা নিরাকার মানে, তাহাকে চোখে দেখা যায় না। তোমরা সাকারবাদী মান, তাহাকে কানে শোনা যায় না। আমরা সজীবকে মানি ; তাহাকে চোখে দেখা যায়, কানে শোনা যায়, তাহাকে বিশ্বাস না করিয়া থাকা যায় না।' এই 'সজীব' আর কিছুই নয়, রক্তমাংসের মানুষ। বস্তুত বিদ্যাসাগরের সমাজমানসে যে এক ধরনের এমপিরিসিস্ট্ মনোভাব কার্যকর ছিল জগমোহনের ক্ষেত্রেও তাই এবং এ ব্যাপারে তিনি আপোষহীন। বিদ্যাসাগরের যেমনি 'লোকের ভাল' করার ব্যাপারে কোন 'লাভের' প্রশ্ন জড়িত ছিল না তেমনি জগমোহনের নাস্তিক্যভাব, লোকের ভাল করার প্রধান ব্যাপারই ছিল—'তাহাতে না আছে পুণ্য, না আছে পুরস্কার, না আছে কোনো দেবতা বা শাস্ত্রের বক্রশিরের বিজ্ঞাপন বা চোখ রাঙানি।' এবং তীক্ষ্ণ যুক্তির ধারধার পথেই, যুক্তির শাণিত বিচারেই জগমোহনের সব কিছু বলত 'ঈশ্বর নাই'— এই সিদ্ধান্তে আসার প্রক্রিয়া বা নতুন আমাইকে লেখা কৌতুকদীপ্ত সেই 'ঐচরণেষু' চিঠি সবই বিদ্যাসাগরীয় যুক্তির ছাঁদেই ধরা। অথচ জগমোহনের মনুষ্যত্ব অশ্রুজলপূর্ণ আপার মনুষ্যত্ব, যেমন বিদ্যাসাগরের।

সেই মনুষ্যত্বেরই প্রকাশ ঘটল নবিবালা এপিসোডে। নবিবালার সন্তান সম্ভাবনা— তার কাহিনী শোনার সঙ্গে সঙ্গেই 'জগমোহন তো একেবারে আগুন। সেই পুরুষটাকে পাইলে এখনই তার মাথা গুঁড়া করিয়া দেন এমনি তাঁর ভাব। তিনি এ-সব ব্যাপারে শান্ত হইয়া সকল দিক চিন্তা করিবার লোক নন। একেবারে বলিয়া বসিলেন, তা বেশ তো, আমার লাইব্রেরি-ঘর খালি আছে ; সেইখানে আমি তাকে থাকিতে দিব।' এর পরই 'জগমোহন ঝড়ের মতো ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া তাঁর মেঘগম্ভীর গলায় বলিয়া উঠিলেন 'এসো, আমার মা এসো। দুলার কেন বসিয়া!' রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরচরিতে লিখেছেন, 'স্ত্রীজাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের বিশেষ স্নেহ, অথচ ভক্তি ছিল।' বাস্তবিক ঈশ্বরচন্দ্র কাউকেই ঘৃণার পাত্রী বা পাত্র ভাবতেন না— প্রথা, মনুষ্যত্বের প্রতি শ্রদ্ধাই তাঁর সংকর্মের মূলে— হয়তো এমপিরিসিস্ট্ বিদ্যাসাগরের জীবনের কোন

অভিজ্ঞতাও নারীর প্রতি শ্রদ্ধায় তাঁকে প্রণত করেছিল। তবে নারীত্বের তথা মনুষ্যত্বের অপমানই এখানে বিদ্যাসাগরকে আলোড়িত করেছিল। এবং নলিবালার প্রতি জগমোহনের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বিদ্যাসাগরের মনুষ্যত্বচিহ্নিত। জগমোহন কোন প্রশ্ন করলেন না, মেয়েটির বিস্তারিত ইতিহাস জানতে চাইলেন না, এমন কি কন্যা করছেন দয়া করছেন এই গৌরবে বাঙালীসুলভ মাতব্বরিও করলেন না— যুক্তিবাদী জগমোহন ছলছল চোখে জানালেন, 'শচীশ, এই মেয়েটি আজ যে লজ্জা বহন করিতেছে সে যে আমার লজ্জা, তোমার লজ্জা।' এবং এরপর প্রচণ্ড সমাজগত আপত্তি, পাশাপাশি সত্ত্বেও নলিবালাকে তাঁর গৃহে নারীত্বের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করলেন। এমন কি হরিমোহনের পুত্র পুরন্দরের হাত থেকে বাঁচবার জন্য পশ্চিমের কোন শহরেই চলে যেতে চাইলেন।

এই উপন্যাসে তথা আমাদের জীবনে নলিবালা একটি প্রতীকী ঘটনা। জগমোহনের এই অপার অজস্রতাপূর্ণ মানবতাও যে এই উপনিবেশের রাবণ চক্রান্তে মাটিতে শিকড় ছড়াতে পারল না, তারই প্রমাণ নলিবালার আত্মহত্যা। জগমোহন তথা বিদ্যাসাগরের যে মূল্যবোধ, যে নির্বিশেষ মনুষ্যত্ব তার উন্মোচন একদল চরিত্রের আকাশস্পর্শী মহত্বে সমাজমানসে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। যে ব্যক্তিটির স্বর্গচ্যুতি ঘটেছে, যে ব্যক্তি এই ভয়ঙ্কর বিশ্বের সম্মুখীন সে স্বভাবতই এই নলিবালার মৃত্যুতে জগমোহন তথা বিদ্যাসাগরের বীরত্বপূর্ণ প্রয়াসের ব্যর্থতাই দেখল। শচীশ যখন জীবনের সমস্যা সমাধানে গর্ভবতী নলিবালাকে বিবাহ করার সিদ্ধান্ত করল এবং জগমোহন তাতে উল্লসিত, তখন দেখা গেল জীবন আরও জটিল— দীর্ঘ ইতিহাসে লালিত, নানা জটিল মনস্তত্ত্বে বিধৃত মানুষ। সমাজ পরিত্যক্তা, শচীশের ভ্রাতা পুরন্দর-লাঞ্ছিতা ও বঞ্চিতা নলিবালা আত্মহত্যার পূর্বে শেষ চিঠি লিখে গেল— 'তোমার কথা ভাবিয়া এতদিন আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু তাকে যে আজও ভুলিতে পারি নাই।' শচীশ, এই আধুনিক ব্যক্তিটি, দেখল যে ভয়ঙ্কর ও অসীম জীবনের মুখোমুখি সে হয়েছে তার সমাধানে জগমোহনের সমাজগত অপার মনুষ্যত্ব আপাতত ব্যর্থ হোল— কই নলিবালা তো বাঁচল না! শচীশের জীবনের, তথা একাকী বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদের, তথা আমাদের জাতীয় জীবনের একটি স্তরের পরিসমাপ্তি ঘটল। এবং এর পরও জগমোহন তাঁর কাজ করে গেছেন, যেমন বিদ্যাসাগর

চরম ক্লান্তি বোধ করেও অবনমিত হননি বিদ্যাসাগরই চারিত্রিক মাহাত্ম্যে ও নিঃসঙ্গতায়— কিন্তু সেটুকু জীবন উপন্যাসে আর ন্যাঠামশাই পর্যায়ের নয়, সেটুকু শচীশ পর্যায়েরই অন্তর্গত।

যখন দেখা গেল জগমোহনের প্রচণ্ড মানবতা ও সমাজমানস অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের নিঃসঙ্গ প্রচেষ্টার পরিণতিতেও একা, নির্জন, স্বাধীন ব্যক্তিটি জীবনের অর্থ ও সার্থকতা, তন্ময়তার কোন উত্তরই পেল না— তখন সেই ব্যক্তিটির, চতুরঙ্গ উপন্যাসে শচীশের ক্ষেত্রে সমগ্র অস্তিত্ব ও জীবন এক বিরাট শূন্যতার মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো— 'সেই অসহ্য যন্ত্রণার দায়ে শচীশ কেবলই বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিল যে, শূন্য এত শূন্য কখনোই হইতে পারে না : সত্য নাই এমন ভয়ংকর ফাঁকা কোথাও নাই ; একভাবে যাহা 'না' আর-এক ভাবে তাহা যদি 'হাঁ' না হয় তবে সেই ছিদ্র দিয়া সমস্ত জগৎ যে গলিয়া ফুরাইয়া যাইবে।' স্পষ্টতই, এই বিরাট 'না'-কে 'হাঁ' করার জন্য— যে মৌলিক একাকিত্বে শচীশ, তথা স্বাধীন আত্মসচেতন ব্যক্তি, নিমজ্জিত এবং বিশাল জগতের অনুভূতিতে একক মানুষের তন্ময়তার অসহায়, তাকেই অর্থময় করার জন্য— তার থেকে মুক্তির জন্য শচীশের যন্ত্রণা। এবং এ শুধু ঔপনিবেশীয় মানুষের যন্ত্রণা নয়। ইয়োরোপের ঐতিহ্যবাহী বাস্তববাদীদের মানুষের যে একাকিত্ব, নির্জনতার কথা পাওয়া যায়, তার থেকে এই যন্ত্রণা আরও অনেক ব্যাপক, অনেক মৌলিক। আধুনিক যুগের মানুষের মর্মে মর্মে যে জিজ্ঞাসা, এই অসীম ও ভয়ংকর বিশ্বের মুখোমুখি হওয়ার দরুন যে যন্ত্রণা, তার প্রসঙ্গেই শচীশের দুর্নিবার অন্বেষণের ব্যাখ্যা মেলে। এবং এটা শুধু নাস্তিক্যের পথে ও রসের পথে মুক্তি চাওয়া ও উভয় পথের সীমাবদ্ধতার প্রশ্ন নয়— বরঞ্চ প্রচণ্ড ভাবে ঐতিহাসিক অর্থে ও অনৈতিহাসিক বা আরও স্পষ্ট করে অ্যা-হিস্টরিক্যাল অর্থে আধুনিক মানুষের জিজ্ঞাসার প্রশ্ন এখানে জড়িত। জগমোহনের সমগ্র চরিত্র ও তাঁর কার্যাবলী, ভ্যাদুস ঐতিহাসিক পটবিস্তৃত— ভারতবর্ষের উনবিংশ শতাব্দীর নানা জটিলাবর্তে উদ্ভূত প্রথম আধুনিক মানুষের প্রতিচ্ছবি তিনি— এর পথেই শচীশ, সংস্কারের মূলে আঘাত হেনে 'ফিক্সড ফ্রম'-এর পথ বেয়েই জীবনের, অস্তিত্বের, নিগূঢ় একাকিত্বের সমাধান চেয়েছিল। কিন্তু নলিনাক্ষের মৃত্যু প্রচণ্ডভাবেই আঘাত হানল— তখন শচীশ অ্যা-হিস্টরিক্যাল— যে স্বাধীন আত্মসচেতনা তার নবজাগ্রত চেতনার

মর্মমূলে তার বিলম্ব নেই ভাবল বোধহয় সে তার ঈপ্সিত মুক্তি পাবে। এ ক্ষেত্রে সমগ্র ভারতীয় সত্যতাই শচীশের পটভূমিকা হিসাবে সাহায্য করেছে — কারণ সমগ্র ভারতীয় এ্যাটিচ্যুডের, ইতিহাসনিরপেক্ষতা সকলেরই জানা। ঐতিহাসিক ক্যারিকটারিস্টে, ইতিহাসগত ভাবে চিন্তা করতে আমরা আদৌ অভ্যস্ত নই— সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের, ইয়োরোপীয় আধুনিক লেখকদের তুলনায় অনেক সুবিধা ছিল। বাস্তবিক শচীশ তার অস্তিত্বকেই তার ব্যক্তিসত্তাটিকেই পরিপূর্ণ বিসর্জন দিতে চাইল। আমিত্ব-র ভারে বিপর্যস্ত এই ভারতীয় স্বাধীন ব্যক্তি সব কিছু অর্পণ করল দীনানন্দস্বামীর চরণে। এবং শ্রীবিলাস ঠিক বুঝল যে অনেকদিন পরে দেখা হওয়ামাত্র শচীশ যে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল—'সে আমি শ্রীবিলাস নয়, সে আমি 'সবজুড'; সে আমি একটা আইডিয়া।' শুধু তাই নয়, শ্রীবিলাস আরও বুঝল—'শচীশ যে ঘুঘুকে বাস করে সেখানে ঘটনা বলিয়া কোন উপসর্গই নাই ; সেখানে হলাদিনী ও সঙ্গিনী ও যোগমায়া যাহা ঘটাইতেছে সে একটা নিত্যলীলা, সুতরাং তাহা ঐতিহাসিক নহে'—। এই 'ঐতিহাসিক নহে'— এটাই মূল কথা শচীশের দীনানন্দ পর্যায়ের—কারণ শচীশ স্পষ্টই বুঝেছিল—'সে যে ছিল তাহার উপরকার মুক্তি, তখন কাজের ক্ষেত্রে জ্যাঠামশায় আমার হাত-পাকে সচল করিয়া দিয়াছিলেন।' অর্থাৎ সে মুক্তি ছিল ক্রিকম ক্রম-এর। এবং শচীশ সে মুক্তিতে ঈপ্সিত, বলাই বাহুল্য, পায়নি।

বাস্তবিক, শচীশ তার এই ঈপ্সিতকে পেতে চাইল নিজেকে নিঃশেষে মুছে ফেলে। অর্থাৎ সে নিতান্তই নিজের অভিজ্ঞতার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে চায় এবং নিজেরই কোন ব্যক্তিগত ইতিহাস আছে তা অস্বীকার করল। যে মূঢ়তা, একাকিত্ব শচীশের অস্তিত্বের মূলে ছিল তার হাত থেকে মুক্তির জন্যই শচীশ রসের সমুদ্রে নিমজ্জিত। কিন্তু এই পথে অগ্রসরমান মানুষ অন্য মানুষ বা বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনেই কেবল অক্ষম হয় তাই নয়, তত্ত্বগতভাবে মানব অস্তিত্বের উৎস ও লক্ষ্য সম্বন্ধেও নিশ্চিন্তে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে শচীশের সনাতন ভারতবর্ষীয় মুক্তিসাধনায় তার রূপকের জগতে প্রচণ্ড ভাবে আঘাত লাগল— জীবনকে এড়িয়ে, ইতিহাসকে অস্বীকার করে যে মুক্তি শচীশ চায়, তার ওপর জীবন প্রতিশোধ নিল মূর্তিমতী দামিনীর মধ্যে,যে দামিনী 'উত্তুরে হাওয়াকে দিকি পয়সা খাজনা দিবে না পণ করিয়া বসিয়া আছে।' দামিনীর যে

মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবনের জটিলতা দুর্বোধ্যতাকে প্রমাণ করে দিয়েছিল, তেমনি দামিনী তার তীব্র জীবনকৃষ্ণায়, জীবনকে উপভোগ করার নিবিড় আগ্রহে শচীশের আপন জগতে আলোড়ন তুলল। এবং একদিন শীতের দুপুর বেলায় শচীশ, 'দেখিল দামিনী তার চুল এলাইয়া দিয়া মাটিতে উপুড় হইয়া পড়িয়া মেজের উপর মাথা ঠুকিতেছে এবং বলিতেছে, পাথর, ওগো পাথর, ওগো পাথর, দয়া করো, দয়া করো, আমাকে মারিয়া ফেলো। ভয়ে শচীশের সর্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল, সে ছুটিয়া ফিরিয়া গেল।'

এর পরেই গুহার শচীশের নির্মম অভিজ্ঞতার কথা তার ডায়রীতে পাওয়া যাচ্ছে— 'সেই গুহার অন্ধকারটা যেন একটা কালো জন্তুর মতো— তার ভিজা নিশ্বাস যেন আমার গায়ে লাগিতেছে। আমার মনে হইল সে যেন আদিম কালের প্রথম সৃষ্টির প্রথম জন্তু; তার চোখ নাই, কান নাই, কেবল তার মস্ত একটা ক্ষুধা আছে; সে অনন্ত কাল এই গুহার মধ্যে বন্দী; তার মন নাই—সে কিছুই জানে না,কেবল তার ব্যথা আছে—সে নিঃশব্দে কাঁদে।'[১] বাস্তবিক, জীবন সম্পর্কে এই ভয়ঙ্কর চিত্র— তার মাথা নেই, মন নেই, কেবল একটা ক্ষুধা, কেবল নিঃশব্দ কান্নার ব্যথা— স্তম্ভিত করে দেয়। লীলানন্দস্বামীর তত্ত্বাবধানে শচীশের জীবনের অর্থহীনতাকে ভয়ঙ্করতাকে উত্তীর্ণ হওয়ার সাধনা যে ব্যর্থ হয়েছে তা স্পষ্ট। অনন্তকালের আদিম জন্তু এই জীবন একই গুহার মধ্যে বন্দী— নিশ্ছিদ্র অন্ধকার আর ভীষণ ক্ষুধাই যার বড় পরিচয়। জগমোহন মারা যাবার পর অসীম শূন্যতার মুখোমুখি শচীশ দাঁড়ায়, তার থেকে অনেক সত্তীর এই উপলব্ধি। অনেক নির্মমও বটে। আধুনিক স্বাধীন ব্যক্তিটি জীবনের সামনে, অসীম ব্রহ্মাণ্ডের সামনে এক অসহায় শিকারে পরিণত। 'আমার জাগ্রত চৈতন্য এত বড়ো সর্বনাশা অন্ধকারের নিবিড় আলিঙ্গন সহিতে পারে না, এ কেবল মৃত্যুরই সহে' —এই নিজের চৈতন্য, আত্মসচেতনা— যা আধুনিক ব্যক্তি স্বর্গ হতে বিদায়ের দিনে লাভ করেছে— সম্পর্কে শচীশের ভাবনা, আর্তনাদ— আধুনিক মানুষেরই আর্তনাদ। জীবনের যে ভয়ঙ্করতা, অর্থহীনতার বোধ আজ ইয়োরোপীয় সাহিত্যে ক্রিয়াশীল, চতুরঙ্গেও রবীন্দ্রনাথ তাকেই নিজের মতো করে বলেছেন— তবে সেটা একটি পরাজিত, বিবর্ণ-চরিত্রের স্মৃতিচারণায় যা খেয়ালী ভাবনা ও কাজের বর্ণনায় নয়, জীবন সম্পর্কে নির্মম সিদ্ধান্তে আসার

১ চতুরঙ্গের এই বর্ণনায় ফিয়োদর দস্তয়েভস্কির বর্ণনা বারবারই [illegible] চিত্রাঙ্গদার কথা মনে করিয়ে দেয়।

পরিক্রমাকেই, আধুনিক ভারতবর্ষের পটভূমিকায়, সেই চরিত্রের প্রাণপণ সংগ্রামের ইতিবৃত্তকে তিনি এঁকেছেন— ফলে সমগ্র ব্যাপারটা অন্য এক প্রতীকের মর্যাদা পেয়েছে— যে প্রতীকে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষ এবং আধুনিক ব্যক্তির যন্ত্রণা একই সঙ্গে প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

দামিনীর উপস্থিতি ও আকর্ষণ শচীশের নিষ্প্রাণ ইতিহাসহীন আইডিয়ার জগতে জীবনেরই প্রচণ্ড টান হিসাবে উপস্থিত। শচীশকে দামিনী স্পষ্ট করেই তার জীবনাবেগে শোনাল, 'তোমরা আমাকে শাস্তি দিবে? দিনরাত্রি মনের মধ্যে কেবলই ঢেউ তুলিয়া তুলিয়া পাগল হইয়া আছ, তোমাদের শাস্তি কোথায়।' বস্তুত দামিনীকে, জীবনকে, এড়াবার জন্যই, তার ডাককে অস্বীকার করার জন্যই শচীশ 'পূর্বের চেয়ে আরও অনেক বেশী জোরের সঙ্গে করতাল বাজাইয়া নাচিয়া নাচিয়া কীর্তন করিয়া বেড়াইল।' এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল, 'দামিনীকে আমাদের মধ্যে রাখা চলবে না।' কারণ প্রকৃতির মধ্যে জীবনে, 'মিথ্যার ফাঁক এমন স্পষ্ট করিয়া পাতা, দরকার কী সেখানে বাহাদুরি করিতে যাওয়া?' কিন্তু জীবনকে অস্বীকার করব বললেই করা যায় না, জীবন তার সহস্রবাহু প্রসারিত করে ব্যক্তিটিকে চেপে ধরে, দামিনী স্পষ্টই জানিয়ে দিল, 'আমাকে তোমাদের ভালো লাগিবে বলিয়া নিজের ইচ্ছায় তোমাদের মধ্যে আসি নাই। আমাকে তোমাদের ভালো লাগিতেছে না বলিয়া তোমাদের ইচ্ছায় আমি নড়িব না।' তখন একাকী জীবন এই ভাবেই আধুনিক ব্যক্তিকে আবদ্ধ করে — তাকে এড়িয়ে যাবার, অস্বীকার করার কোন উপায়ই নেই। সে এই ব্যক্তির ভালো লাগা, খারাপ লাগার ওপর মোটেই নির্ভরশীল নয়। শ্রীবিলাস তার সাধারণ মানুষের চোখে দেখল, 'শচীশ আজকাল কেমন-এক-রকম হইয়া গেছে। যে খুড়ির দম ছিঁড়িয়া গেছে তারই মতো এখনও হাওয়ায় ভাসিতেছে বটে, কিন্তু পাক খাইয়া পড়িল বলিয়া, আর দেরি নাই।' এবং শচীশ দামিনীকে একদিন জানাল, 'আমাদের সঙ্গে তুমি যোগ দাও, অমন করিয়া তফাৎ হইয়া থাকিও না।' শচীশ তার মুক্তির সাধনায় জগতের জগতে জীবনকেও স্বীকার করতে চাইল—ভাবল এই দুয়ের সহাবস্থানে, মিলনেই বুঝি সে অসীম, একাকিত্বের হদিশ পাবে— অর্থ পাবে। 'দামিনীর যে অসহ্য দীপ্তি ছিল তার আলোটুকু রহিল, তাপ রহিল না।' কিন্তু দামিনী শচীশের কাছে আরও সত্য হয়ে উঠল। এতেই স্পষ্ট করে দামিনীকে শচীশ দেখতে পায় যে বারবারই তার

ভাবের ঘোর কেটে যায়। বুঝি-বা আবার জীবনের প্রত্যাবর্তনেই, জীবনের একাকিত্ব ঘুচল, 'জীবনরসের রসিক' যামিনীই বুঝি শচীশের, আধুনিক ব্যক্তিটির, অধিষ্ঠাতে এসে দিল। কিন্তু এই জীবন দুর্জ্ঞেয়, অর্থহীন, এই সত্তার বিচিত্র বিধান, ছলনাজালে আকীর্ণ—তাই একটি মৃত্যু যে শচীশের জন্মমোহন পর্যায়ের বার্থতা স্পষ্ট করেছিল, তেমনি আর এক মৃত্যু শচীশের সমস্ত অনুভবকে প্রচণ্ড ভাবে নাড়া দিল—তার লীলানন্দ পর্যায়ের সাধনাকে নিতান্তই অর্থহীন বোধনা করে গেল। যামিনীই ছুটে এসে খবর দিল, 'নবীনের স্ত্রী বোধহয় বিষ খাইয়াছে।' নবীন, তার স্ত্রীর মাতৃহীনা বোনের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে এবং নবীনের স্ত্রীর অনুরোধে নবীন সেই মেয়েটিকে বিবাহ করে; বিবাহ সমাপ্ত হলে নবীনের প্রথমা স্ত্রী বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করল।

'সেদিন কোকিলের ঘুম ছিল না। দক্ষিণে হাওয়ায় গাছের পাতা-গুলো যেন কথা বলিয়া উঠিতে চায়, আর তার উপরে চাঁদের আলো ঝিক্‌মিক্ করিয়া উঠে।'— সেই রাতে শচীশকে যামিনী জিজ্ঞাসা করল— 'আমাকে বুঝাইয়া দাও তোমরা দিনরাত যা লইয়া আছ তাহাতে পৃথিবীর কী প্রয়োজন? তোমরা কাকে বাঁচাইতে পারিলে। ·· তোমরা দিনরাত রস রস করিতেছ, ও ছাড়া আর কথা নাই। রস যে কী সে তো আজ দেখিলে? তার না আছে ধর্ম, না আছে কর্ম, না আছে ভাই, না আছে স্ত্রী, না আছে কুলমান; তার দয়া নাই, বিশ্বাস নাই, লজ্জা নাই, শরম নাই। এই নির্লজ্জ নিষ্ঠুর সর্বনেশে রসের রসাতল হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার কী উপায় তোমরা করিয়াছ?' বস্তুত শচীশ আবার সেই প্রচণ্ড ভয়ঙ্কর জীবনের শূন্য প্রান্তরে এসে দাঁড়াল। রসের সাধনা এই নিঃস্বতা, একাকিত্বকে আরও তীব্র করে তুলল। জন্মমোহনের প্রচণ্ড দম্ভাগ্রহে যে ঊনবিংশ শতাব্দীর যুক্তিসাধনার একদিক প্রতিবিম্বিত, তেমনি শচীশের লীলানন্দ পর্যায়ে আর এক দিক। আর সহজ সাধারণ জীবন, যেন অবধি এই রসের মরুভূমি থেকে জীবনের মর্ম ভিক্ষা করে সেই অন্বেষণের মানুষটির কাছে— যে নিজেই এখনও জীবনের কোন সত্য, ভাল, মন্দ কিছুই খুঁজে পেল না। যামিনী বলে, 'তুমি আমাকে এমন কিছু মন্ত্র দাও যা এ সমস্তের চেয়ে অনেক উপরের জিনিস— যাহাতে আমি বাঁচিয়া যাইতে পারি।' শচীশও আবার ফিরল— ছোট পরিশিষ্টে শ্রীবিলাস জানাল— 'কেন শচীশের মতের বদল হইয়াছে।··· আগেকার মতো আবার সে কাজে লাগিয়া গেছে'। এবং 'আমার সঙ্গে যামিনীর বিবাহ হইয়াছে।'

কিন্তু শচীশের পক্ষে— যে দুরন্ত জিজ্ঞাসার উত্তরের জন্য আকুল— এই সহজ জীবনযাপনও আর সম্ভব নয়। তার তীব্র অন্বেষণের, একাকিত্বের যন্ত্রণা সমানই তীব্র। শ্রীবিলাস স্পষ্ট দেখল— 'শচীশ জ্বলিতেছে, তার জীবনটা এক দিক হইতে আর-এক দিক পর্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিল।' শচীশ জানায়—'সহজকে কিসের দরকার? তাকিই সহজ, সত্য কঠিন। এবং এই কঠিন সত্যের মুখোমুখি হয়ে শচীশ, আধুনিক ব্যক্তি, কোন সমাধানই খুঁজে পেল না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নায়ক অপরাজেয়— তাই সে হাল ছাড়ল না, বা সংগ্রামের রক্তাক্ত পথ ছেড়ে আত্মহননের নিরাপদ পরিণতি খুঁজল না— প্রথম প্রেমের, তরুণ অর্থহীনতার উত্তরের জন্য, অর্থের জন্য শচীশ আবার অসীম জগৎ ও জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াল। দামিনীকে জানাল— 'একজন আসে মুক্তি হইতে বন্ধনে, আর একজন যায় বন্ধন হইতে মুক্তিতে, তবে তো দুই পক্ষের মিল হয়।···তিনি বাঁধিতে বাঁধিতে শোনান, আমরা খুলিতে খুলিতে শুনি।' শচীশ আবেগ-বিহ্বলভাবে বলে উঠল— 'ওগো, আমার প্রলয়, আপনাকে আমি তোমার মধ্যে চুরমার করিতে থাকিব চিরদিন ধরিয়া।' তার পরই 'অসীম তুমি আমার, তুমি আমার এই বলিতে বলিতে শচীশ উঠিয়া অন্ধকার নদীর পাড়ের দিকে চলিয়া গেল।' অন্ধকারেই শচীশ তরুণ জীবনের মুখোমুখি হয়ে, তীব্রভাবে তার সমস্যার সমাধান খুঁজল। বাস্তবিক আধুনিক ব্যক্তির যন্ত্রণাদীর্ণ হাহাকারই শচীশের হাহাকারে বেজে উঠেছে। প্রলয়ের মধ্যে চিরকাল মানুষ নিজেকে চুরমার করবে— তার এই অসীম তরুণ জীবনের সামনে দাঁড়িয়ে। অন্তহীন অন্বেষার অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে, অসীম শূন্যতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে, তবু শূন্য, শূন্য নয়— এই দীপ্ত শিখে বারবার যৌন প্রশ্নের সমাধান খুঁজবে। শেষে শচীশ যে নিবিড় অন্ধকারে বেরিয়ে গেল— সেই অন্ধকার আরও ভয়ানক— সেখানে জড়মোহন নেই, লীলানন্দ নেই— এমন কি দামিনীর সহজ জীবনও না। এই জীবন, 'যে একটা ঘড়ার মাথার প্রকাণ্ড শ্রীহীন হাসি, যেন দয়াহীন শুষ্ক আকাশের কাছে বিপুল একটা শূন্য ভিক্ষা-পাত্র একটা ভূকার দরখাস্ত মেলিয়া ধরিয়াছে।' বাস্তবিক আধুনিক ব্যক্তির একাকিত্বের, শূন্যতাবোধের ও প্রায় বিরুদ্ধে সংগ্রামের এক আশ্চর্য দীপ্ত উপন্যাস এই চতুরঙ্গ— যেখানে রবীন্দ্রনাথ শিল্প ও জীবনের ক্ষেত্রে যেমন আপোষহীন তেমনি সাহসী। আমাদের জীবনজিজ্ঞাসাকে

— আমাদের আধুনিক ইতিহাসকে রবীন্দ্রনাথ চতুরঙ্গের প্রতীকে খুলে ধরেছেন— এবং সেটা শুধু কোনকালে আবদ্ধ থাকেনি। শচীশের তীব্র যন্ত্রণায় আধুনিক মানুষই চিহ্নিত— মানুষের একাকিত্ব, শূন্যতাবোধ, তন্ময়তা এত সাহসের সঙ্গে, জীবনের আবেগে, একটি প্রাণময় চরিত্রের ইঙ্গিতে বিধৃত আর কোনও উপন্যাসে হয়েছে কিনা জানিনা। এ প্রসঙ্গে আরও স্মরণীয়, শচীশের অন্তিমময় অন্বেষণেই কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের, জনসাধারণের জীবনযাত্রার আদি-অন্ত দেখেননি। শচীশের প্রতিপক্ষেই তিনি শ্রীবিলাসকে এনেছেন। এবং উপন্যাসের শেষে দামিনীকে বিবাহ করার পর শ্রীবিলাস বীরত্বপূর্ণ সাধারণ মানুষের জীবনই বরণ করে নিয়েছিল — সে জীবনে শচীশের অগ্নি ছিল না সত্য, কিন্তু সেই কর্মিষ্ঠ জীবনের মূল্যও কি কম? শ্রীবিলাস ও দামিনী— দুজনে মিলে যে নতুন জীবন সুরু করল, তাও তো অনাদিকালের—'বাহিরে আমার কাজ আর ভিতরে দামিনীর কাজ, এই দুইয়ে যেন গঙ্গা যমুনার স্রোত মিলিয়া গেল।' এবং মৃত্যুকালে দামিনীর উক্তিও তাৎপর্যপূর্ণ— 'সাধ মিটিল না, জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই।' শ্রীবিলাসের প্রতি এই উক্তিতে শ্রীবিলাস যে জীবনের প্রাঙ্গণে দামিনীকে মুক্তি দিয়েছিল, তার প্রতিই সে তার শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে গেল।

## রবীন্দ্রজিজ্ঞাসা

রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা। প্রথম খণ্ড : ১৯৬৪। সম্পাদক : শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য। বিশ্বভারতী। ১৫ টাকা।

বইটি প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্রশতবর্ষে, প্রস্তাবক ছিলেন নেহেরু। এর প্রথম খণ্ড বেরিয়েছে ১৯৬৪ সালে এবং এখনও পর্যন্ত এটিই শেষ। হয়তো-বা পরবর্তী সমূহের আয়োজন অন্তরালে চলছে, কেননা সম্পাদক মহাশয় এটিকে 'পত্রিকা'ই বলতে চান : বিশ্বভারতীর উদ্যোগে প্রকাশিতব্য একটি বার্ষিক পত্রিকা, রবীন্দ্রগবেষণা যার লক্ষ্য। সে হিসেবে নিয়মিত হতে পারলে রবীন্দ্রচর্চায় হয়তো 'সেক্সপীয়র সার্ভে'র মতো মর্যাদা অর্জন করবে এই ঢেমালা। অন্তত প্রকাশিত এই প্রথম খণ্ডটি গুরুত্বার তথ্যবহ, নিপুণ গবেষণা ও সম্পাদনা-গুণে উৎসুক জিজ্ঞাসুর তৃপ্তিপ্রদ।

সম্পাদক জানাচ্ছেন রবীন্দ্রজিজ্ঞাসা 'সমালোচনামূলক প্রবন্ধ' মূলে ততো উৎসাহী নয়। এর প্রকাশপরিধি হবে : ১ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত রচনা ২. গ্রন্থভুক্ত হয় নি এমন রচনা ৩. পাণ্ডুলিপি-বিবরণ ৪. সংবাদপত্র থেকে আহৃত তথ্যাবলী ৫. রচনাপঞ্জী : মূল ও অনুবাদ ৬. রবীন্দ্রপ্রাসঙ্গিক রচনাবলীর সূচী ৭. অপ্রকাশিত চিত্র ও আলোকচিত্র ৮. স্বরলিপি ও রেকর্ড পঞ্জী।

অর্থাৎ রবীন্দ্রসাহিত্যের বিচার নয়, রবীন্দ্রসাহিত্যের বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখাই পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য। এই কারণে এটি বিশেষজ্ঞের আশ্রয় যতোটা হবে, সাধারণ পাঠককে ততোই খুশি হয়তো করবে না। Textual Criticism-এর ধরনটা এদেশে এখনও তেমন আয়ত্ত ব্যাপার নয় এবং নিছক তথ্যের নীরসতার মধ্যে বসবাস করতে অনেকেই পছন্দ করেন না। কোনো একটি রচনা এক বছর আগে বেরিয়েছিল না এক বছর পরে, কী লেখা হয়েছিল প্রথমে এবং পরবর্তী শোধনই বা কী ধরনের, এর উপর সাহিত্যাস্বাদনের বিশেষ জিজ্ঞাসা সূচিত হয় না তা মানতে হবে। কিন্তু রবীন্দ্রজিজ্ঞাসা-শ্রেণীর আলোচনা প্রকাশের প্রয়োজন যে কতো-তা আমরা ক্রমে

ধরতে পারব, এমন কী 'সমালোচনামূলক' অনেক নতুন লেখার ভিত্তিও হয়তো এর থেকে একদিন তৈরি হবে।

বইটির এই খণ্ডে আছে চারজন রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞের চারটি রচনা। বিজন-বিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদনা করেছেন রবীন্দ্রনাথের অল্পবয়সের একটি পাণ্ডুলিপি-খাতা, যার নাম বলা হচ্ছে মালতীপুঁথি। এই পুঁথি বিষয়ে কালবিচার এবং অন্যান্য বিবেচনার সমৃদ্ধ একটি আলোচনা করেছেন প্রবোধচন্দ্র সেন। রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনের একটি রচনাপঞ্জী প্রস্তুত করেছেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। আর আছে প্রমথনাথ বিশীর দীর্ঘ প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রকাব্যে বস্তুবিচার'।

উল্লিখিত শেষ রচনাটি একটু অন্য ধরনের, হয়তো সেই জন্যেই সম্পাদক এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন : 'সমালোচনামূলক প্রবন্ধ এতে বেশি প্রকাশ করা সম্ভব হবে না। তবে বিশেষজ্ঞের লেখা নূতন তথ্যভূমিষ্ঠ ও মৌলিক চিন্তাসমৃদ্ধ রচনা এই পত্রিকায় সাদরে গৃহীত হবে। বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর রবীন্দ্রকাব্যে বস্তুবিচার তার দৃষ্টান্তস্থল।' শ্রীযুক্ত বিশীর রবীন্দ্র-সমালোচনার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, তাঁরা লক্ষ্য করবেন যে এখানে তাঁর পদ্ধতি একটু ভিন্ন, কবিতার রসবিচারের চেয়ে তথ্যবিচারে এখানে তাঁর উৎসাহ। কথা ও কাহিনী বইটির কবিতাগুলি উপনিষদ পুরাণ ও ইতিহাসের যে মূল বস্তুর নির্ভরে রচিত, সেই মূলের বিস্তারিত বিবরণ এখানে লেখকের উদ্দেশ্য। উপরন্তু তিনি দেখাতে চান এই সব মূলকে কবি কতোটা বদল করে নেন, কতোটা-বা অবিকৃত রাখেন এবং গ্রহণের এই রীতি থেকে কতোটা ধরা পড়ে তাঁর কবিচরিত্র, তাঁর 'অভিপ্রায় ও আদর্শের পরিচয়'। পাণ্ডুলিপি-বিবরণ অথবা পত্রীরচনায় যাঁদের আগ্রহ আছে, তাঁরা এই লেখাটিতে অনেক প্রজার খুঁজে পাবেন, রোমাঞ্চকর ইতিহাসপুরাণের জগতে ঘুরতে পারবেন কিছুক্ষণ।

গ্রন্থটির প্রধান নির্ভর অবশ্য মালতীপুঁথি। মধ্যযুগীয় সাহিত্য আলোচনায় পুঁথি শব্দটির ব্যবহারে অথবা শেক্সপীয়র চর্চায় কোয়ার্টো-ফোলিও'র বিচারে পাঠক অনেকটা অভ্যস্ত, কিন্তু রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে যখন শুনি মালতীপুঁথি, খানিকটা ধন্দাই লাগে আমাদের। বিচার হচ্ছে এই পুঁথির লিপিকাল, তার উর্ধতম ও নিম্নতম আদলীমা, বিবরণ দেওয়া হচ্ছে তার পাতানপদ্ধতি অথবা বিন্যাস বিষয়ে। অল্প বয়সে যে-সব খাতা ছিল রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসঙ্গী, জীবনস্মৃতিতে যার উল্লেখ করেন কবি, আজ তা অপ্রাপ্তীয় বলেই মনে করা

চলে। কিন্তু তেমনি একটি খাতা কেমন করে বেঁচে গিয়েছে, অনেকটা মালতী সেনের হাত থেকে ঘুরে এসেছে রবীন্দ্রভবনে। এই থেকেই মালতীপুঁথি নামের উদ্ভব।

খাতাটি পুরো ছাপা হয়েছে রবীন্দ্রজিজ্ঞাসায়। প্রবোধচন্দ্র সেন খাতাটির ইতিহাস জানিয়েছেন আমাদের, এবং যেমন তিনি করতে অভ্যস্ত, সমকালীন ও উত্তরকালীন অনেক তথ্যের যোগাযোগে নীরস বিচারেও অনেকটা আকর্ষণ সঞ্চার করেছেন। দীর্ঘ আলোচনার উপসংহারে লেখক এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিয়েছেন : 'নীলখাতা ও লেইন্ ডায়ারির পরে যে তৃতীয় খাতা রবীন্দ্রনাথের কবিতার আশ্রয় বা বাহন হয়ে উঠেছিল, এই মালতীপুঁথি সেই তৃতীয় খাতা।'

২

'খাতাটি ছাপা হয়েছে পুরো' এই কথাটির অবশ্য সংশোধন দরকার। পাণ্ডুলিপি থেকে আটটি পৃষ্ঠার ব্লকমুদ্রণ আছে এ-বইতে, তার থেকে আমাদের ধারণা হতে পারবে খাতাটি ছিল কেমন। কিন্তু যে মুদ্রিত মালতীপুঁথিটি পাচ্ছি এখানে, তা থেকে কি খাতাটির পুরো পরিচয় ধরা পড়ে? ইতিহাস-পরিচয় নয়; সে কাজ তো প্রবোধচন্দ্র করেছেন। বহিরঙ্গপরিচয় আমরা কতোটা পাব এই হচ্ছে সমস্যা। পুঁথি থেকে নির্বাচিত এক শুদ্ধ রচনার চেহারা দেখাবার জন্য কিন্তু মালতীপুঁথি মুদ্রণের বিশেষ প্রয়োজন বুঝি না। কবিতায় যারা আগ্রহী তাঁরা অন্যত্র এসব দেখতে পাবেন এবং যেসব কাব্য পাবেন না তার জন্য হয়তো খুব একটা আগ্রহ নাও তৈরি হতে পারে। কিন্তু এ-ধরনের কাজের মূল্য হচ্ছে প্রামাণিকতার মূল্য, কোন্ শব্দ লিখতে কবি কোন্ শব্দ লিখেছিলেন, কী ভাবে সাজানো ছিল স্তবক, কোথায় ছিল বিরতি, এমন কী যতিচিহ্ন এবং থামানোর চেহারা ছিল কেমন, কাটাকুটি ছিল কী ধরনের : এসব তথ্যই পাণ্ডুলিপি পাঠকের প্রয়োজন।

তেমন পরিচয় দেওয়া সম্ভব কি? সম্পাদনায় সেটা একেবারে অসম্ভব মনে হয় না। সম্পাদক জানাচ্ছেন যে স্থানাভাববশত সেরকম পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেওয়া হলো না। তাহলে সময় বা শক্তির সমস্যা নয়, সমস্যা ছিল স্থানের। বইটির শেষ দিকে সম্পাদক পাণ্ডুলিপির দু পৃষ্ঠার বিশদ বিবরণ লিখেছেন নিদর্শন হিসেবে, অনুমান করি বাকিটাও তাঁর হাতে এইভাবে প্রস্তুত আছে। সেক্ষেত্রে, যদি রবীন্দ্রজিজ্ঞাসা প্রথম খণ্ডটি পুরোই মালতীপুঁথি এবং তার বিবরণ হতো, কী ক্ষতি ছিল? স্থানাভাবের সমস্যা তাহলে উঠত

না হতো। সেই বিবরণের অভাবে এই পুঁথির সম্পাদকীয় সূত্রে কিন্তু অনেকটা অকিঞ্চিৎকর লাগে। স্বভাবতই সম্পাদক সেখানে কোনো ব্যাপক নির্দেশে পৌঁছতে পারেন না, প্রায়ই নিজেকে নিবদ্ধ রাখেন টুকিটাকি বানানপ্রসঙ্গে অথবা কয়েকটি শব্দের যোজনা বা লুপ্তি বিষয়ে।

ফলে মালতীপুঁথির মুদ্রিত এই চেহারাটি নিয়ে আমাদের অনেকটা অস্বস্তি থেকে যায়। আমরা যারা ব্যাপারটা সম্পর্কে একেবারে অনভিজ্ঞ, আমাদের মনে অনেক প্রশ্ন হয়তো জাগতই না যদি পাণ্ডুলিপিচিত্র সেই সঙ্গে দেখতে না পেতাম। সম্পাদক নিজেই যথেষ্ট অবহিত, তাহলেও সেই ছবির সঙ্গে মিলিয়ে আমাদের অন্তরঙ্গ যে সংশয় তৈরি হয় তার দু'একটি এখানে উল্লেখ করি।

১. 'হ্ন' এবং 'ন্ন' ব্যবহার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ধারণা নিয়ে সম্পাদক মন্তব্য করেছেন। বস্তুত এ-বানানটিতে অল্পবয়সে তাঁর দ্বিধা যে কতোটাই ছিল তার একটি পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে পাণ্ডুলিপি-পৃষ্ঠা 13/৭ক-এর ছবিতে, যেখানে তিনি 'ন'-এর নিচে 'হ' লিখে তার নিচে আবার 'ন' বসিয়েছেন। এ তথ্য আমরা জানছি ছবি থেকে, মন্তব্য থেকে নয়। সম্পাদকীয় সূত্রে বানান এবং লিপি বিষয়ে এ ধরনের কৌতূহলজনক সব খবর আমরা পাচ্ছি তো?

২. এই পাণ্ডুলিপিতেই 'মধ্যাহ্ন-কিরণ' শব্দযুগ্ম হাইফেনযুক্ত হয়ে আছে, মুদ্রিত অংশে হাইফেনটি লুপ্ত। এ-রকম হয়তো দু'একবারই মাত্র হয়ে থাকবে, কিন্তু পাঠক সংশয় করতে পারেন: মুদ্রিত যেসব অংশের মূল ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি না তাকে কতোটা হুবহু বলে গ্রহণ করা চলবে? পাণ্ডুলিপি 66/২৯খ-তে দেখতে পাচ্ছি 'হে কবিতা—হে কল্পনা—'লাইনটি বাকি অংশের সঙ্গে সমান রেখে বসানো নেই, একটু বাঁদিকে সরানো, মনে হয় অভিপ্রেত-ভঙ্গিই। অভিপ্রেত না হলেও সম্পাদকের করণীয় কিছু নেই, মতাং তদ্বিষিতং হচ্ছে পাণ্ডুলিপি মুদ্রণের নীতি। কিন্তু মুদ্রিত অংশে দেখছি বাঁদিক সমান। কোনো কোনো পৃষ্ঠায় কবি লিখছেন একাধিক স্তরে সাজিয়ে (57/৩০ক), কোথাও-বা দুই চরণ একই লাইনে টানা (26/১৩খ), সে সব অংশেও স্তর বা পংক্তি সংস্থানের উল্লেখ বাঞ্ছনীয় মনে হয়। কখনো-বা জীর্ণতাবশত কিছু পদ মুছে গেছে, আংশিক পাঠ সম্ভব। কিন্তু মুদ্রিত বইতে সে-অংশকেও বর্জন করা হচ্ছে, সম্পাদকীয় মন্তব্য থেকে তার বিবরণও আমরা পাচ্ছি না কিছু। পাণ্ডুলিপি 57/৩০ক-এর সঙ্গে তার মুদ্রিত প্রতিরূপ তুলনা করে এই তথ্য বহু পক্ষে।

৩. অবলুপ্ত শব্দ বা শব্দাংশকে অনুমান করে তাকে যথাযথো বিন্যাস করা নিশ্চয় সংগত পদ্ধতি। কিন্তু অনুমানের সূত্র কী হবে? যদি লেখা হয় '[ ছিন্ন ] যাপ' বা এই ধরনের ছোটখাট ব্যাপার, তা হয়তো আমরা বুঝে নিতে পারি। কিন্তু যখন '[ হা ] দেবী [ তেমনি য ] দি, থাকিতাম চিরকাল [না ফুরাত সেই ] ছেলেবেলা' ( ১১/২৮৭ ) এ-রকম ছাপানো হয় তার সপক্ষে সম্পাদকের অবশ্যই কোনো যুক্তি থাকে, হয়তো-বা তিনি পূর্বমুদ্রিত কোনো পাঠের সঙ্গে তুলনা করে এই অংশ পাচ্ছেন বা ওই রকম কিছু। কিন্তু সেই যুক্তিক্রমের উল্লেখ থাকা ভালো।

৪. কখনো কখনো সম্পাদকীয় মন্তব্যও পাঠককে চিন্তিত করছে। যেমন, পা. ২৫/১৬খ-এর তোলাপাঠ বিষয়ে তাঁর টীকা। পাণ্ডুলিপিতে আছে 'তুমি যদি হও মোর সংসারের ধ্রুবতারা—তাহোলে কখনো আর হব না ক' পথহারা'। এই টুকরো দুটির উপরে লেখা আছে 'তোমারেই করিয়াছি' এবং 'এ সমুদ্রে আর কভু'। একই রকম এই দুই ব্যাপারে সম্পাদকের সিদ্ধান্ত কিন্তু ভিন্ন রকমের। প্রথমটির বিষয়ে : 'স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এই অংশের পরিবর্তে তোমারেই করিয়াছি করাই কবির অভিপ্রেত' কিন্তু পরবর্তীটি সম্পর্কে : 'বোধ হয় কবি কোন্‌টা ভাল সেটা বিচার করে দেখছিলেন তখনও মনঃস্থির করতে পারেননি।' দুটিই বা তবে কেমন করে স্পষ্ট বোঝা গেল?

৩

রবীন্দ্রজিজ্ঞাসার পাঠক সবচেয়ে বিহ্বল বোধ করেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সংকলিত রচনাপঞ্জীতে পৌঁছে। 'বহু বৎসর ধরিয়া কবির রচনার তালিকা' করেছিলেন প্রবীণ এই ক্ষেত্রের গবেষক, রবীন্দ্রজীবন বিষয়ক তথ্য তাঁর উপরেই আমরা সবচেয়ে বেশি নির্ভর করতে শিখেছি। কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক, হয়তো-বা কোনো অন্যমনস্কতায়, পূর্বপ্রস্তুত সেই তালিকাকে এখানে তিনি যেভাবে সাজিয়েছেন তার তাৎপর্য আমরা ভালো ধরতে পারছি না। এসব জিনিস যদি গবেষকের ব্যবহারযোগ্য না হয় তাহলে এ আর কোন্ কাজে লাগবে? সেরকম ব্যবহারযোগ্যতা আছে তো এই রচনাপঞ্জীর?

তালিকাটি খুব বড় নয়। 'রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা : কালানুক্রমিক সূচী' এই শিরোনামে সংকলয়িতা এখানে সাজাতে চেয়েছেন '১২৮৪ সাল হইতে ১২৮৮ সাল পর্যন্ত ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত রচনার তালিকা'। কিন্তু এর

বিন্যাসের মধ্যে যে-সব অসংগতি আমাদের পীড়িত করছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে বলতে চাই।

১. প্রস্তাবিত রচনাপঞ্জীটি শেষ হচ্ছে হঠাৎ, ১২৮৮ সালের অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে। কেন? ঐ বছরের শেষ তিন মাসে কবির রচনা কিছু নেই ভারতীতে, অব্যবসায়ীর মনে হঠাৎ এমন সন্দেহ দেখা দিতে পারে, অথচ সেটা সত্যি নয়। অনুমান করি এখানে খৃস্টাব্দ এবং বঙ্গাব্দে কোনো অনক্য গোলযোগ ঘটে গেছে, ১২৮৮ সালে শেষ করবেন ভেবে বস্তুত তিনি খেয়ে গেছেন ১৮৮১ খৃস্টাব্দে। মাসের হিসেবেও এই দ্বিধার পরিচয় পুরো তালিকাটিতে অত্যন্ত প্রকট। ভারতীয় প্রকাশতারিখ স্পষ্টতই বাংলা মাস অনুসরণে। সেখানে, অকস্মাৎ কখনো ইংরেজি ধরন নেবার ফলে অগ্রহায়ণ-পৌষ বা আশ্বিন-কার্তিক লিখতে হয়। এমনও অবশ্য নয় যে পূর্বাপর গৃহীত হয়েছে সেই রীতি।

২. যদি লেখা যায় 'আশ্বিন-কার্তিক', তার অন্তর্গত কোন্ লেখাটি আশ্বিন কোন্‌টি কার্তিকের— সব সময়ে তা বুঝবার উপায় নেই। সংকলনের রীতি অনুসারে রচনাটির নিচে পুনরপি দেওয়া আছে প্রকাশের সাল তারিখ, কিন্তু সর্বত্র নয়। তার ফলে একটা এলোমেলো বিভ্রান্তির অবস্থা তৈরি হয়, এমন কী এক মাসে প্রকাশিত রচনা অন্য মাসের তালিকাগত হয়ে যায়। যেমন '১২৮৮ ভাদ্র/১৮৮১ সেপ্টেম্বর' এর অন্তর্গত হয়ে আছে ভাদ্র আশ্বিন দুয়েরই লেখা; আবার 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ ( উত্তরপ্রত্যুত্তর )' নামে যে লেখাটি বেরিয়েছিল ভাদ্র মাসে, তার নিচে নির্দেশ দেওয়া আছে 'আশ্বিন'। ১২৮৪'র কার্তিকের তালিকায় পাচ্ছি ভাদ্র বা ফাল্গুনের লেখা।

৩. যেমন দুই মাস একত্রে এসেছে অনেক সময়ে, তেমনি আবার কখনো একই মাসকে সাজানো হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে। কেন? উদাহরণ: ১২৮৮ সালের বৈশাখ মাসের রচনাবলী বিন্যস্ত আছে পর পর তিনটি অংশে; শ্রাবণে দুটি, ভাদ্রে দুটি। এর তাৎপর্য?

৪. বিন্যাস প্রসঙ্গে দেখতে পাচ্ছি মুদ্রণবিষয়ক যাবতীয় বিশৃঙ্খলা। সংকলন শুরু হয়েছিল অনেকটা এই পরিকল্পনায়। প্রথমে ছোট হরফে ভারতী পত্রিকার সংখ্যা, সাল, তারিখ; নিচে একটু বড়ো হরফে রচনার নাম বাঁদিকে সরানো, বন্ধনীবদ্ধে রচনার প্রকৃতি উল্লেখ, স্বাক্ষরিত অথবা অস্বাক্ষরিত তার নির্দেশ। তার নিচে একটু ডান দিকে সরানো রচনাবিষয়ক তথ্যাবলী:

পত্রিকার কতো পৃষ্ঠায় মুদ্রিত, অন্য কোন্ বইতে ছাপা হয়েছে, তার পৃষ্ঠা এবং পাঠভেদ— এই সব বিবরণ।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে অল্প একটু এগোতেই দুরূহমান হয়ে পড়ছে সব কল্পনা। কখনো শিরোনাম থেকে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে পত্রিকার নাম, কখনো ফিরে আসছে। রচনার নিচে কখনো-বা থাকছে পত্রিকার সংখ্যানির্দেশ, কখনো থাকছে না। বন্ধনীপ্রয়োগের প্রয়োজনেও এমনি অসংবদ্ধতা; টাইপ এবং রেফের ব্যবহারেও নেই কোনো স্থির সংগতি, ফলত বোঝা যায় না কোন্‌টি কিসের নির্দেশ। অল্প পরেই মুদ্রণকার্যে সব মিলিয়ে একটা ধাঁধা তৈরি হয় এবং এই তালিকার ব্যবহারযোগ্যতা বিষয়ে মস্ত সংশয় জেগে ওঠে।

৪. সূচিসংকলনের পদ্ধতিও সবসময়ে ভালো বলতে পারি না। ১২৮৪সালের ভাদ্র মাসের (এ রকম কোনো শিরোনাম নেই যদিও, শ্রাবণের তালিকাতেই পাওয়া যাচ্ছে) সূচিতে হঠাৎ দেখছি 'দান্তের কবিতার অনুবাদ : প্রেমবন্দী ছবি আর সুকোমল মন।' এর কী মানে করবেন পাঠক? এই রকম স্বতন্ত্র কোনো অনুবাদ ছাপা হয়েছিল ভারতীর পৃষ্ঠায়? এর ঠিক উপরেই দান্তেবিষয়ক রবীন্দ্রনাথের খাস প্রবন্ধটির নাম আছে, কবিতাটি সেই রচনারই অন্তর্গত। এর স্বতন্ত্র উল্লেখ করতে গেলে ঐ প্রবন্ধে ব্যবহৃত আরো যে অনেক অনুবাদ আছে তার প্রসঙ্গেও বলতে হয়, নইলে ছেড়ে দিতে হয় পুরোটাই। প্রবন্ধের অন্তর্লীন একটি কবিতার নির্দেশহীন এই আকস্মিক উল্লেখ সম্ভবত খুব বৈজ্ঞানিক প্রণালী নয়।

৬. কখনো বা কোনো একটি মাস তালিকার বাইরে থেকে গেছে। যেমন, ১২৮৫ সালের ফাল্গুন মাসের হিসেব কই? অথবা, ভাদ্র? ১২৮৬ সালের অগ্রহায়ণ, পৌষ? মনে রাখতে হবে যে এসব মাসের ভারতীতেও রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন।

৭. অল্প কয়েক বছরে একটিমাত্র পত্রিকায় যা কিছু লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তারও খুব নির্ভরযোগ্য বিবরণ কি এটি? আমাদের অনভিজ্ঞ চোখেই কয়েকটি রচনার অভাব ধরা পড়ছে। ১২৮৪ সালের আশ্বিনে প্রকাশিত 'লীলা' এই সূচিতে নেই, কবিতাটি পরে ছাপা হয়েছিল সৈশবসংগীত বইতে।

৮. তথ্যগত অল্পবিস্তর ত্রুটিও বিস্তর। 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র রচনাগুলি পত্রিকাতে প্রায়ই স্বাধীন শিরোনামে ছিল না, এইকথাটা বলা থাকলে ভালো হতো। নাম নেওয়া হয়েছে বইতে। তেমনি একটি শিরোনাম এখানে বলা

হচ্ছে 'অন্তোক্তিক্রিয়া', কিন্তু তার নাম 'অন্যোন্যসংকার'। 'অপরা-প্রেম' কবিতাটিকে বারংবার বলা হচ্ছে 'অপরার প্রেম'। 'কবিতা সাধনা' যে 'কবিতা সাধন' ছাপা হয়েছে, এ হয়তো মুদ্রণপ্রমাদ। কিন্তু একবিতার প্রথম লাইন ভারতীতে ছিল 'তাকি আমি, আয়রে হেথায়।' প্রভাতবাবুর তালিকায় প্রথমেই দেখছি : 'অনন্ত এ আকাশের কোলে পৃঃ ৪০৭'। তাঁর থেকে কি ধারণা করব এটিই ভারতীর প্রথম লাইন? পরে অনেকগুলি পাঠান্তর অবশ্য দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু মূল লাইনটি কোথাও বলা নেই। একবার এই পর্যন্ত যায় আছে : তাকি তোরে আয়রে হেথায়। পরাজয়সংগীতের প্রথম লাইনও 'ভালো করে বুঝিলিনে, হলো তোরি পরাজয়,' 'হলো তোর পরাজয়' নয়।

৯. এ ধরনের সূচিসংকলনে বানান, পদবিন্যাস বা যতিচিহ্ন বিষয়ে সংকলয়িতার কী নীতি হবে? সম্পূর্ণভাবে মূলের অনুসরণ হওয়াই উচিত। মনে হতে পারে, এসব হলো খুঁটিনাটি, কী-ই বা এতে যায়-আসে! কিন্তু তথ্য-প্রামাণিকতার দাবিতে এদিকেও পুরো চোখ রাখতে হবে, তা নইলে Textual Criticismএর ভিত তৈরি হয় না, যথেষ্ট দায় নেওয়া হয় না। আমাদের মনে রাখতে হবে, ভারতীতে রবীন্দ্রনাথ 'ভি প্রোফণ্ডিস' লিখেছিলেন, প্রোফাণ্ডিস নয়; 'পিত্রার্কা ও লরা', পিত্রার্ক ও লারা নয়; 'গেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ', গেটে নয়; 'নর্ম্যান জাতি ও অ্যাংলো নর্ম্যান সাহিত্য', নর্ম্যান জাতি ও আংলো নর্মান জাতি নয়; এই সব এবং আরো এমন কিছু হয়তো কেবলই মুদ্রণপ্রমাদ, কিন্তু অন্তত এধরনের কাজে এরকম ঘন ঘন মুদ্রণদোষ ভালো নয়।

১০. বস্তুত মুদ্রণ এবং বিজ্ঞানের পুরাপর অনগতির ফলে তিরিশ পঞ্চাশ এই তালিকাটি শেষ পর্যন্ত কারো কাজেই আর ব্যবহার্য থাকে না। যদি লেখা হয় :

১৮৮৪ অব্দ্রায়ণ | ১৮১১ অক্টোবর-ডিসেম্বর

কান্দীর রাণী—[ অ অসম্পূর্ণ ] পৃ. ১৪৪-৪৬।

ভারতী, ১মবর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, কার্তিক, পৃ ২০০-০৬।

[ অ. ইতিহাস, বিশ্বভারতী। ...ইত্যাদি ]

তাহলে এর থেকে কী মর্ম উদ্ধার করা সম্ভব? বহুতর অনুরূপ বিপর্যয়ের এই হলো এক ছোট উদাহরণ। এখানে মনে রাখা ভালো যে অল্প আগেই অঙ্ক রচনা প্রসঙ্গে লেখা আছে 'ভারতী, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা। পৃ. ২০০-০৬'। পঞ্চম নয়, চতুর্থটিই কার্তিক সংখ্যা। কিন্তু কার্তিক সংখ্যার পৃষ্ঠা যদি হয় '২০০-০৬', অগ্রহায়ণ সংখ্যার কী আসে '১৫৪-৫৬'?

অনুমান করতে পারি কতো বিপুল শ্রম ও নিষ্ঠায় সম্ভব হয় রবীন্দ্রজিজ্ঞাসার মতো সংকলন। তাই উপরে যে-সব অসংগতির উল্লেখ করা হলো তা নিছক নিন্দার্থে নয়, যদি কখনো এ বইয়ের সংস্করণ হয় তাহলে পাঠকের পক্ষে উপযোগিতার কথা ভেবে এ-বিষয়ে সম্পাদক এবং সংকলয়িতা আরো একটু বিবেচনা করবেন, আরো একটু নির্দেশ রেখেন, আমাদের মনে এই রকম প্রার্থনা। একটি বড়ো প্রতিষ্ঠানের সাহায্য এর পিছনে আছে, প্রাচীন ও যোগ্য ব্যক্তিরা এর সহায়ক, তাই আশা হয় যে পূর্ণতর রূপে এর পরবর্তী খণ্ডগুলি ক্রমশ আমাদের হাতে পৌঁছতে পারবে।

শঙ্খ ঘোষ

# ডিরোজিও-র জীবনী

**Henry Derozio the Eurasian Poet and Reformer, by Elliot Walter Madge, edited by Subir Ray Chaudhuri ; Metropolitan Book Agency, 93 Park Street, Calcutta 16. Price Rs. 5'00. only.**

যাঁদের লেখা ডিরোজিও-নিবন্ধটির পুনঃপ্রকাশ জিজ্ঞাসু পাঠকদের কাছে সুসংবাদ। বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ লক্ষ্য করছি উনিশ শতক বিশেষ করে তার প্রথম দিকটি সম্বন্ধে তথ্য সন্ধানের স্পৃহা যেন বেড়েই চলেছে। এই লেখাটি পেয়ে তাঁরা নিশ্চই খুশি হবেন।

হিন্দু কলেজের প্রতিভাবান শিক্ষক নব্যবঙ্গের গুরু ডিরোজিও সম্বন্ধে একটি বই-ই মোটামুটি আমাদের জানা ছিল। টমাস এডওয়ার্ডসের লেখা *Henry Derozio : The Eurasian Poet, Teacher and Journalist* বইখানি ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে বেরিয়েছিল। বইটি অবশ্য প্রথম বেরিয়েছিল ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায়। তারপরে গ্রন্থাকারে ডিরোজিও-র কোনো জীবনী দীর্ঘকাল বেরোয়নি। শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ ১৯৬১-তে 'বিদ্রোহী ডিরোজিও' প্রকাশ করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে আলাদা বই না হলেও বিভিন্ন উপলক্ষে ডিরোজিও সম্বন্ধে নানা সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, বিশেষ করে যদুনাথ ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের জীবনীতে এবং যোগেশচন্দ্র বাগল 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা' (১ম ও ২য় সংস্করণে) বইতে। প্রেসিডেন্সি কলেজের শতবার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপন-সূত্রে অধ্যাপক সুশোভন সরকার হিন্দু কলেজের পুরনো কাগজপত্র ঘেঁটে ডিরোজিও সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকায় এবং *Studies in the Bengal Renaissance*, 1958-তে। ডিরোজিও সম্বন্ধে মূল তথ্য-নির্দেশ হিসাবে এগুলি উল্লেখযোগ্য। তা না হলে সাধারণ ভাবে তাঁর উল্লেখ আরো অনেক হলেই আছে। এই ধরনের লেখার মধ্যে স্মরণীয় শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' এবং প্যারীচাঁদ মিত্রের *A Biographical Sketch of David Hare*, 1877। কয়েক বৎসর আগে বসুমতী সাহিত্যমন্দির দ্বিতীয় বইটির পুনর্মুদ্রণও করেছেন।

ডিরোজিও সম্বন্ধে এই সব বিভিন্ন আলোচনার মধ্যে Elliot Walter

Madge-প্রণীত *Henry Derozio the Eurasian Poet and Reformer*, 1884 প্রবন্ধটির একটি বিশেষ মূল্য আছে। এই অগ্রণীবী ব্যক্তিটির সম্বন্ধে যাবতীয় প্রাপ্ত তথ্য টমাস এডওয়ার্ডসের বইতেই সংকলিত হয়েছে বলে ধরা হত। ইদানীং যারা এ বিষয়ে লিখেছেন এডওয়ার্ডসের বইকেই মূলত তাঁরা আশ্রয় করেছেন। ম্যাজের লেখাটি ছোটো বই হিসাবে ১৯০৪-এ বেরোয়। বর্তমান আলোচ্য বইয়ের সম্পাদক বলছেন ম্যাজ এবং স্টার্ক ১৮৯২-তে *East Indian Worthies, being Memoirs of Distinguished Indo-European* নামে একটি বইতে ডিরোজিও সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটি লেখেন এই বইটি বস্তুত সেখান থেকেই নেওয়া। এই লেখা দুটিতেই টমাস এডওয়ার্ডসের কোনো কোনো ভ্রম সংশোধন করা হয়েছিল। যেমন ডিরোজিও-র জন্মতারিখ ১০ই এপ্রিল না হয়ে হবে ১৮ই এপ্রিল ১৮০৯। অবশ্য 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' বেরিয়ে যাওয়ার পর ডিরোজিও-র মৃত্যু তারিখ এবং অন্যান্য কয়েকটি তারিখ জানার সুবিধা হয়েছে। ম্যাজের বিশেষ কৃতিত্ব ডিরোজিও-পরিবারের পরবর্তী ইতিহাস উদ্ধার। এই কৃতিত্বের জন্য টমাস এডওয়ার্ডস্‌ও ম্যাজকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

ম্যাজের এই রচনাটির সঙ্গে বর্তমান সম্পাদক আরও দুটি রচনা মুদ্রিত করেছেন—*The Oriental Magazine*, 1843 থেকে ডিরোজিও সংক্রান্ত অজ্ঞাতনামা লেখকের একটি রচনা এবং *Reis and Rayyet* থেকে ম্যাজের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়। ম্যাজ প্রথম লেখাটি থেকে যথেষ্ট উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। এই লেখাটির গুরুত্ব এই যে এটি ডিরোজিও-র প্রায় সমকালীন রচনা। লেখক নিশ্চয়ই ডিরোজিও-কে ব্যক্তিগতভাবে জানতেন। এতে তাঁর প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ বর্ণনা পাই। টমাস এডওয়ার্ডস্‌ও ম্যাজ দুজনেই সেকালের কাগজপত্র ঘেঁটে ডিরোজিও-র জীবনী রচনা করেন। তাঁরা যথাসাধ্য করেছিলেন, তবু অনেকটাই যে বাকি ছিল, ইদানীন্তন গবেষণা দেখলে তা সহজেই মনে হবে। ক্যালকাটা গেজেট পত্রিকায় ডিরোজিও সম্বন্ধে অনেক খবর বেরিয়েছিল। ক্যালকাটা গেজেটের সম্পাদক জন গ্রাণ্ট ডিরোজিও-র একজন শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। ডিরোজিও-র প্রথম কবিতা এই পত্রিকাতেই বের হয়। ডিরোজিও-র মৃত্যুর পর জন গ্রাণ্ট ডিরোজিও সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তাতে এই তরুণ কবিব্যক্তিত্বের শিক্ষাদীক্ষা এবং প্রতিভার বিকাশ সম্বন্ধে সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিন

থেকে বর্তমান সম্পাদক যে গুরুত্বপূর্ণ লেখাটি পেয়েছেন, তারই সঙ্গে জন গ্রাণ্টের লেখাটি যদি ছেপে দিতে পারতেন তবে আজকালের পাঠকদের অনেক সুবিধা হত। এ রকম আর একটি লেখা ডেভিড হ্যামন্ডের। *The Weekly Examiner* পত্রিকায় ডিরোজিও-র শিক্ষক হ্যামন্ড তাঁর ছাত্রটির সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন তার কোনো কোনো অংশ ম্যাজ উদ্ধৃত করেছেন ( পৃ ১৯-২০ )। এ লেখাটি নিশ্চয়ই খুব মূল্যবান, বলাই বাহুল্য। এ লেখার উল্লেখ আমি অন্যত্র দেখেছি, কিন্তু হ্যামন্ডের লেখাটি দেখার সুযোগ হয়নি। পত্রিকাটি পাইনি। লেখাটি আর কেউ ব্যবহার করেছেন বলে মনে হয় না। এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করছি। বাংলার নবশিক্ষিত তরুণসমাজের উপর ডিরোজিও-র প্রভাব সম্বন্ধে সর্বপ্রাচীন আলোচনা কোন্‌টি? ডিরোজিও-র জীবিতকালে তাঁকে নিয়ে কলকাতায় যথেষ্ট আলোচনা-আন্দোলন হয়েছে, যার ফলে ডিরোজিও-কে কর্মচ্যুত হতে হয়েছিল। সেই সময়ে তাঁর পোষিত মতামত নিয়ে নানা কথাও লেখালেখি হয়েছে। কিন্তু ঐতিহাসিক পটভূমিকায় ডিরোজিও-কে স্থাপন করে এ দেশের পরিবর্তমান চিন্তাধারায় তাঁর প্রভাব সম্বন্ধে প্রথম আলোচনা সম্ভবত ১৮৩৭-এ ২২ মে *Calcutta Monthly Journal*-এ প্রকাশিত *The Hindu* নামে ধারাবাহিক প্রবন্ধটি। সমস্ত লেখাই *Englishman* থেকে সংকলিত। এটি কার লেখা বলতে পারি না— স্বাক্ষর ছিল শুধু 'P'।* তবে লেখক এ-দেশীয় বলেই মনে হয়। প্রবন্ধটি থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করি—

The liberal party consists of a small class of juvenile Hindus almost all of whom have been educated either at the Hindu College or at Mr. Hare's school. When they first began to learn English language the system of education then pursued in those institutions was in a great measure inefficient in properly developing their moral or intellectual energies and the only improvement which they had made for some years in their studies was in acquiring the geographical position of different countries, cities, rivers, mountains, islands and peninsulas; in learning the particulars of some events relative to ancient and modern history, the respective rules of arithmetic algebra and

* প্যারীচাঁদ মিত্র *কি*? ডেভিড হেয়ারের জীবনীতে প্রকাশিত তাঁর অভিভাষণের সঙ্গে এই প্রবন্ধের ভাষা তুলনীয়।

drawing and to belong able to recite some pieces from Shakespeare, Pope, Milton and Campbell. The teachers in whose charges they were, had sadly neglected the entire *cultivation of their hearts*, and consequently they were for sometime not a bit better than their countrymen in point of morality. But when Mr. Derozio was appointed an assistant teacher at the Hindu College, he introduced wonderful innovations into the former method of instruction. It was he that first awakened in the minds of his pupils a curiosity and a thirst for knowledge. It was he who thought it his principal duty to *refine their feelings*. It was he who roused them to think *for themselves*.

ডিরোজিও-র মৃত্যুর ছয় বছরের মধ্যে এই মূল্যবিচার বিস্ময়কর। কেননা নব্যবঙ্গের আন্দোলন তখনও থেমে যায় নি। ১৮৩৮-এ সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা স্থাপিত হবে; সেই সভাতেই ডিরোজিও-র ছাত্ররা সে চিন্তা এবং মননের নতুন অধ্যায় শুরু করবে—এই প্রবন্ধটিতে তারই পূর্বাভাস এবং গুরুকল স্বীকৃতি। ডিরোজিও-র জীবিতকালেই তাঁর সম্বন্ধে নানা-নিন্দাপ্রশংসা হয়েছে। বাঙালি ভদ্রলোকেরা তাঁর শিক্ষকতার ফলাফল সম্বন্ধে সন্দিহান। ডিরোজিও-র নিজের সম্প্রদায়ের লোকেরাও তাঁর কবিক্ষমতা সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্ত। এমন কি ডিরোজিও-র মৃত্যুর পর যখন তাঁর স্মৃতিরক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে, কিছু টাকা উঠেছে সে-সময় ইংরেজি কাগজে একে বাড়াবাড়ি বলেই মন্তব্য করা হয়েছিল। এ সম্বন্ধে তর্কিত উক্তি যথেষ্টই করা হয়েছে। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই আধুনিক বাংলায় ডিরোজিও-র ভূমিকার এই মূল্যবিচার ঐতিহাসিক দূরদৃষ্টিরই পরিচয় দেয়। একালে ডিরোজিও ও নব্যবঙ্গ সম্বন্ধে এই অভ্যাবোধেরই পুনরাগমন ঘটেছে। টমাস এডওয়ার্ডস্ এবং ম্যাক কেউই বাঙালি নয়। এ দেশের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁরা ঔদাসিক হয়ে যদি ডিরোজিও-কে অতিরিক্ত বড়ো করে দেখান, সেটা হয়তো বিস্ময়জনক হত না, কিন্তু আজ গৌড়জনেরাই তো ডিরোজিও-কে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে নিচ্ছে।

আজ আমরা ডিরোজিও-কে স্মরণ করি কেন? ডিরোজিও-স্মরণ কি কেবল প্রত্নতাত্ত্বিক ঔৎসুক্যের চরিতার্থতা সাধন? তাঁর কীর্তিতে এমন কি ছিল যা একালেও সমভাবেই সঞ্জীব হয়ে আছে? ডিরোজিও-র কবিতা পরিমাণে নেহাৎ উপেক্ষণীয় নয়। তাঁর কবিতার মূল্য অবশ্য বিনা দ্বিধালোচকেরা স্থির

করুন। রিচার্ডসন তাঁর সংকলনে ডিরোজিও-র তিনটি কবিতাকে স্থান দিয়েছেন, ম্যাজ উল্লেখ করেছেন তাঁর প্রথম কবিতাগুচ্ছ লণ্ডনের পত্রিকাতেও বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছিল। কিন্তু আমরা আজ বিশেষ করে আগ্রহ বোধ করি তাঁর কবিতায় নবজাত ভাবধারার প্রত্যক্ষ প্রতিফলনে— যে ভাবধারা বাংলার সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে। ডিরোজিও-র আগে আর কে সমগ্র ভারতবর্ষকে সম্বোধন করে স্বদেশভাবনাকে কাব্যে বা গদ্যে রূপ দিয়েছেন? স্বদেশের জন্য উৎকণ্ঠা কয়েকটি চমৎকার সনেটের ফসল ফলিয়েছে। অধ্যাপক সুশীলকুমার দে লিখেছেন, মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের প্রত্যক্ষ প্রেরণা ছিল ডিরোজিও-র 'ফকির অব জঙ্গীরা'। ডিরোজিও-র কাব্য কালের স্রোতে আমাদের হাতে এসে এসেছে; তাঁর গদ্য রচনা কিন্তু আসেনি, একমাত্র হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষের অভিযোগের উত্তরে তাঁর উত্তরটি ছাড়া।

স্পষ্ট করে বলতে পারি না কেন, তবু এই তরুণ শিক্ষকটির সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহ ক্রমেই বাড়ছে। তাঁর সম্বন্ধে তথ্য প্রচুর নেই। কলেরায় মৃত্যুর সময়ে তাঁর বর্ণনাটুকু ছাড়া ডিরোজিও-র ছাত্রজীবন বা শিক্ষক জীবনের খুঁটিনাটি বর্ণনা কিছু জানি না। তিনি এ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশন স্থাপন করে তাঁর প্রিয় ছাত্রদের তর্ক করতে শেখাতেন কিংবা ইস্ট ইণ্ডিয়ান ও হেসপারাস নামে পত্রিকা বের করেছিলেন, তিনি কাণ্টের দর্শনের এক অসাধারণ মৌলিক সমালোচনা লিখেছিলেন যদিও সে রচনাটি পাওয়া যায়নি, তিনি স্কটিশ স্কুলের দার্শনিকদের সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন, পলিটিক্যাল ইকনমি ও ল-র ওপর লেকচার দিয়েছেন— আমরা তথ্য হিসাবে এ সবই শুনেছি। কিন্তু কোনো কিছুরই পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাইনি। এ ক্ষোভ বোধহয় কোনো কালেই দূর হবে না। এই শূন্যতার মধ্যে কেউ যদি ছিটেফোঁটাও সংগ্রহ করতে পারেন সেও পরম লাভ বলেই গণ্য করি। শ্রীযুক্ত সুবীর রায়চৌধুরী-সংকলিত এলিয়ট ওয়ালটার ম্যাজের বইটি তেমনি একটি লাভ।

ভবতোষ দত্ত

---

প্রবীর ঘোষ কর্তৃক ৩৯ বালিগঞ্জ প্লেস, ১/১ রামরাম বসুমল্লিক স্ট্রীট-কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ৭৮ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৯ হইতে প্রকাশিত।